পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান জেলা সংখ্যা

১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

// পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ৩০ ❀ সংখ্যা ৩২-৩৬

২১ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৭, ১৪ ও ২১ মার্চ ১৯৯৭

প্রধান সম্পাদক : তরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক : মুকুলেশ বিশ্বাস

সহকারী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল ● উৎপলেন্দু মণ্ডল

প্রচ্ছদ : ডোকরা শিল্প // দরিয়াপুর

চতুর্থ প্রচ্ছদ : দামোদর নদ

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : রমনাবাগান মৃগদাব

তৃতীয় প্রচ্ছদ : সাক্ষরতা অভিযান

কৃতজ্ঞতা : বর্ধমান জেলা সংখ্যায় প্রকাশিত পুরাকীর্তি, দ্রষ্টব্য স্থান, লোকশিল্প প্রভৃতির আলোকচিত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাকীর্তি বিভাগ, বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল দাস, মুন্সি আসিফ ইকবাল প্রমুখের সৌজন্যে

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : তিরিশ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

সুভাষ সরকার, তথ্য আধিকারিক

বিতরণ শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ● কলকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২২১-৪২৯৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিস্তৃত পরিচিতি-সহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। বর্ধমান জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হল। আশা করি, পাঠকবর্গ সমৃদ্ধ হবেন এবং জেলা সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারবেন। জেলা-পরিচিতি সংখ্যায় আমরা শুধুমাত্র পুরাকীর্তি, প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরতে চাই না, সাম্প্রতিককালে জেলার কৃষি শিল্প সংস্কৃতি সাক্ষরতা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঘটেছে তারও অনুপুঙ্খ তথ্য সন্নিবেশ করার চেষ্টা করেছি। এই ব্যাপক সমীক্ষার ফলে এক জেলার মানুষ অন্য জেলা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন।

বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ জেলা। অন্য জেলা থেকে এই জেলার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদে এই জেলার স্থান অগ্রগণ্য। একদিকে সোনার ফসল ও অন্যদিকে কয়লা ও লৌহ শিল্পের সমন্বয়ে বর্ধমান জেলা অনন্য। কৃষিসভ্যতার সুমহান ঐতিহ্যলালিত সংস্কৃতির পথ বেয়ে এসেছে অপরূপ সব লোকশিল্প। নাগরিক এলাকার বিস্তৃতি যেমন ঘটেছে, তেমনই কৃষিভিত্তিক লৌকিক শিল্প তার প্রাণময়তা ও উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে জেলায় অটুট রয়েছে।

স্বাধীনতার সংগ্রামে বর্ধমান জেলার উজ্জ্বল ভূমিকা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনে বর্ধমান রাজ্যে অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে সকল মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এই জেলায় সেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই, কিন্তু সাম্প্রতিককালে সাক্ষরতার আন্দোলনে বর্ধমান জেলা যে দৃষ্টান্ত রেখেছে তা বিস্ময়কর। সবুজায়ন ও সামাজিক বনসৃজনেও এই জেলা অগ্রপথিক।

যাঁরা এই সংখ্যায় বর্ধমান জেলার সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁরা সকলেই জেলার বিশিষ্ট জন, প্রাজ্ঞ মানুষ, সমাজবিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বর্ধমান জেলা পরিষদ লেখা নির্বাচন ও সংগ্রহে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

বর্ধমান জেলার অহঙ্কার

বিজয়-তোরণ ॥ বর্ধমান

তালিতগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ : গড়তালিতগ্রাম

আটচালা মন্দির ॥ আমদপুর
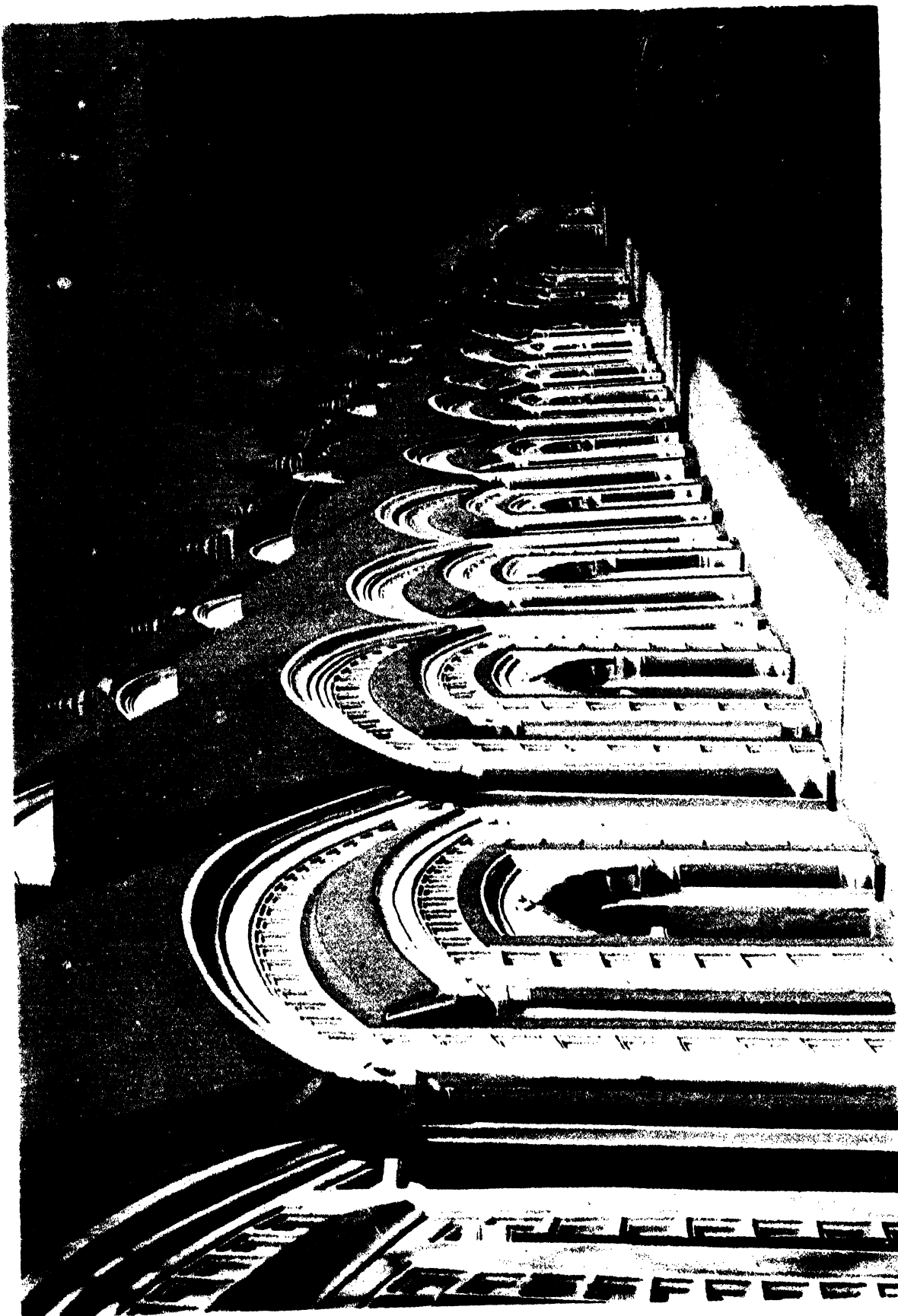
একশ' আট শিবমন্দির ॥ নবাবহাট

শিবমন্দির ॥ বৈদ্যপুর

বর্ধমান বিজ্ঞানকেন্দ্র ।। বর্ধমান

মজলিশ সাহেব মসজিদ ।। কালনা
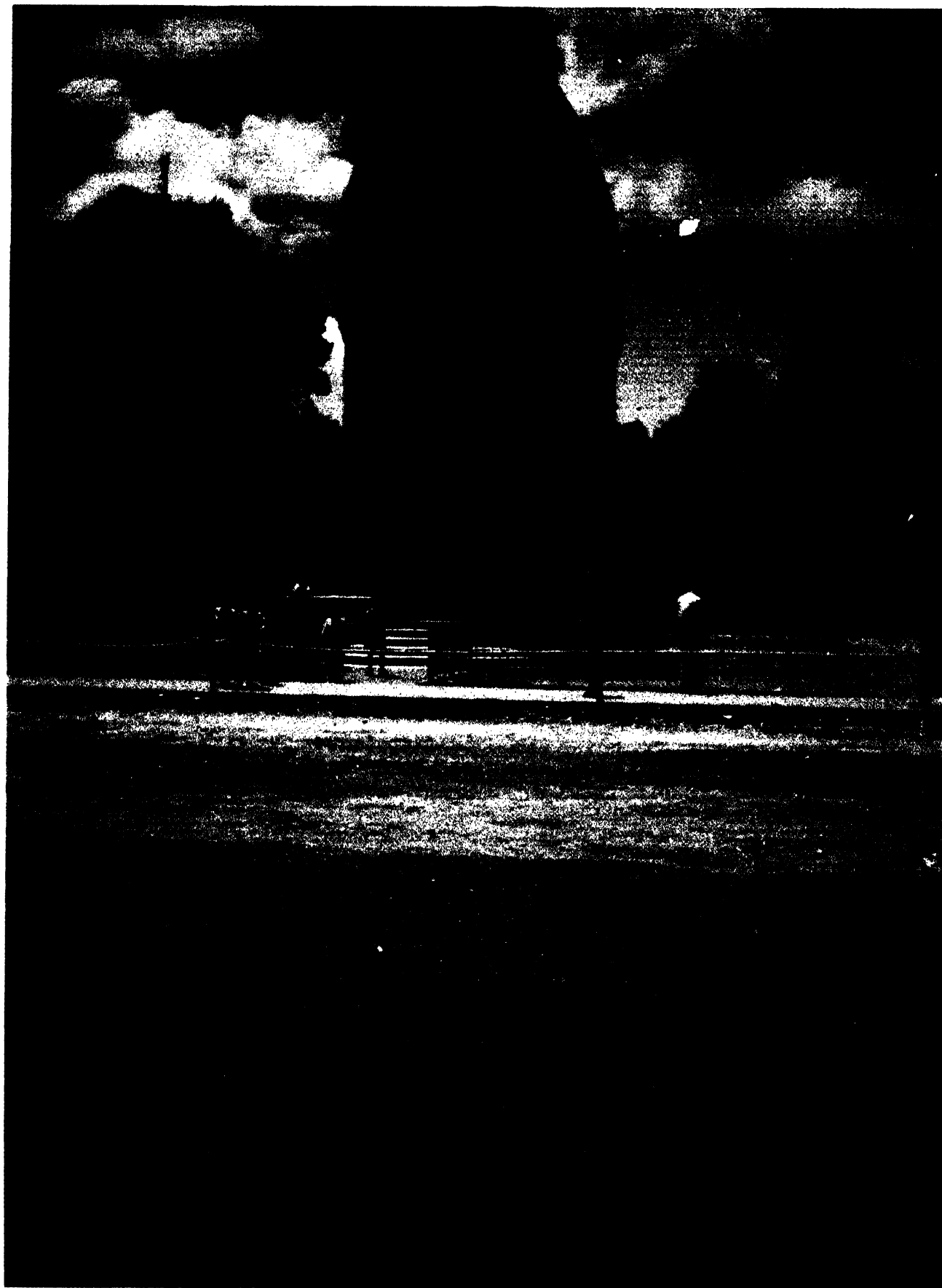
খাজা আনোয়ার নবাববাড়ি : বর্ধমান

হাওয়ামঞ্জিল : বর্ধমান

প্রতাপেশ্বর মন্দির ।। কালনা
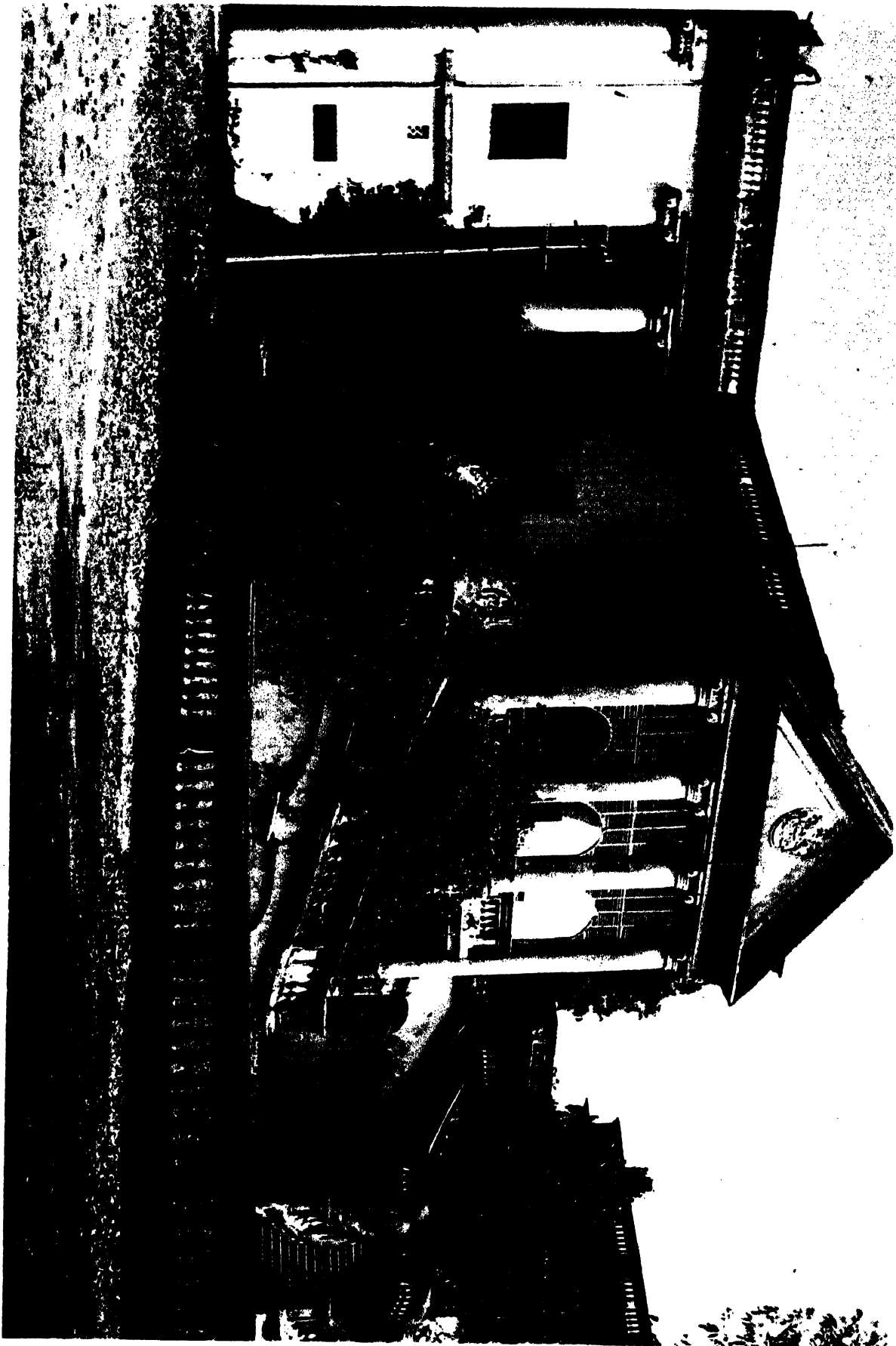
দারুল বাহার : বর্ধমান

নবাববাড়ি : বর্ধমান

শিবমন্দির ॥ বনপাস ॥ কামারপাড়া

রাধাগোবিন্দ মন্দির : জগদানন্দপুর : কাটোয়া
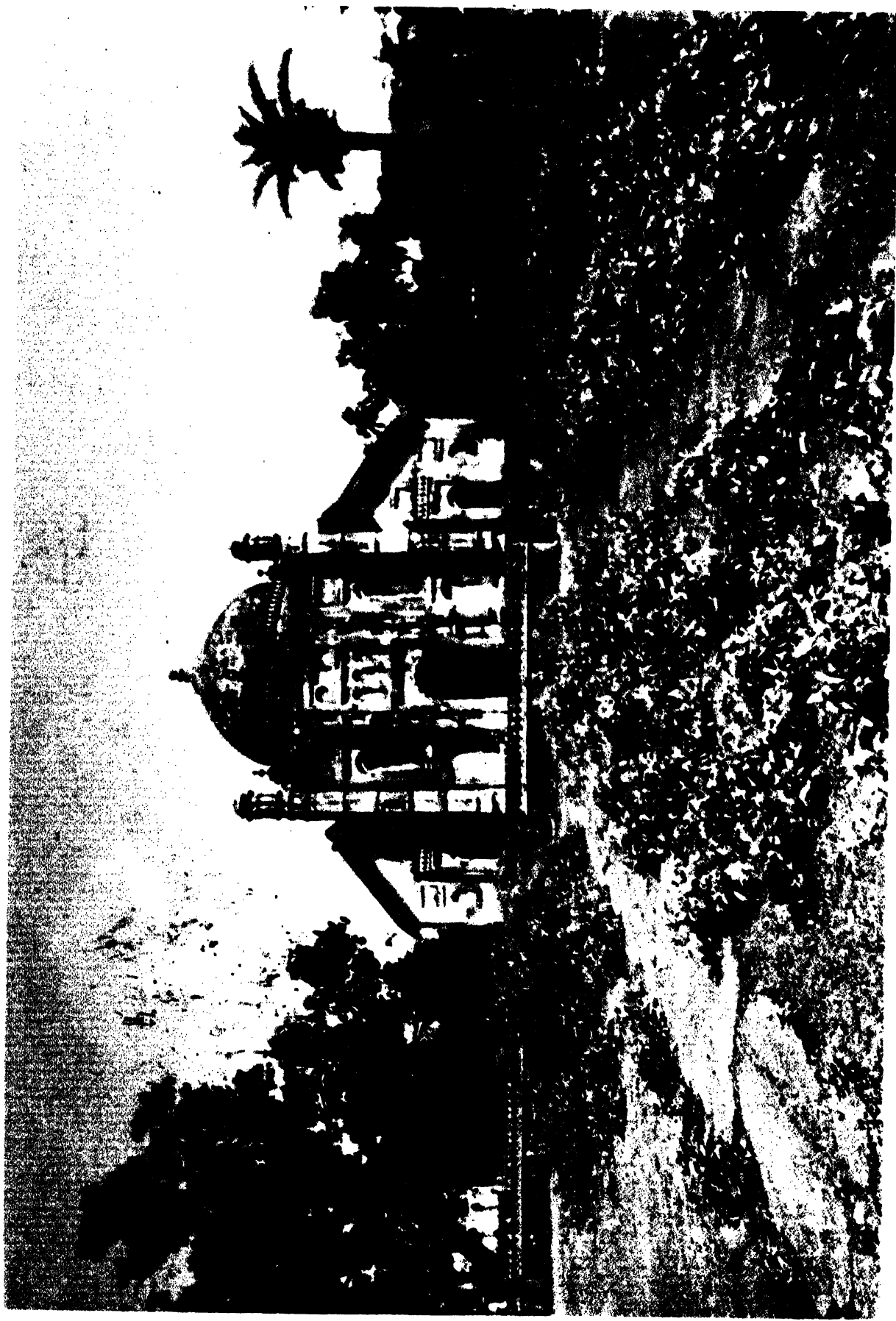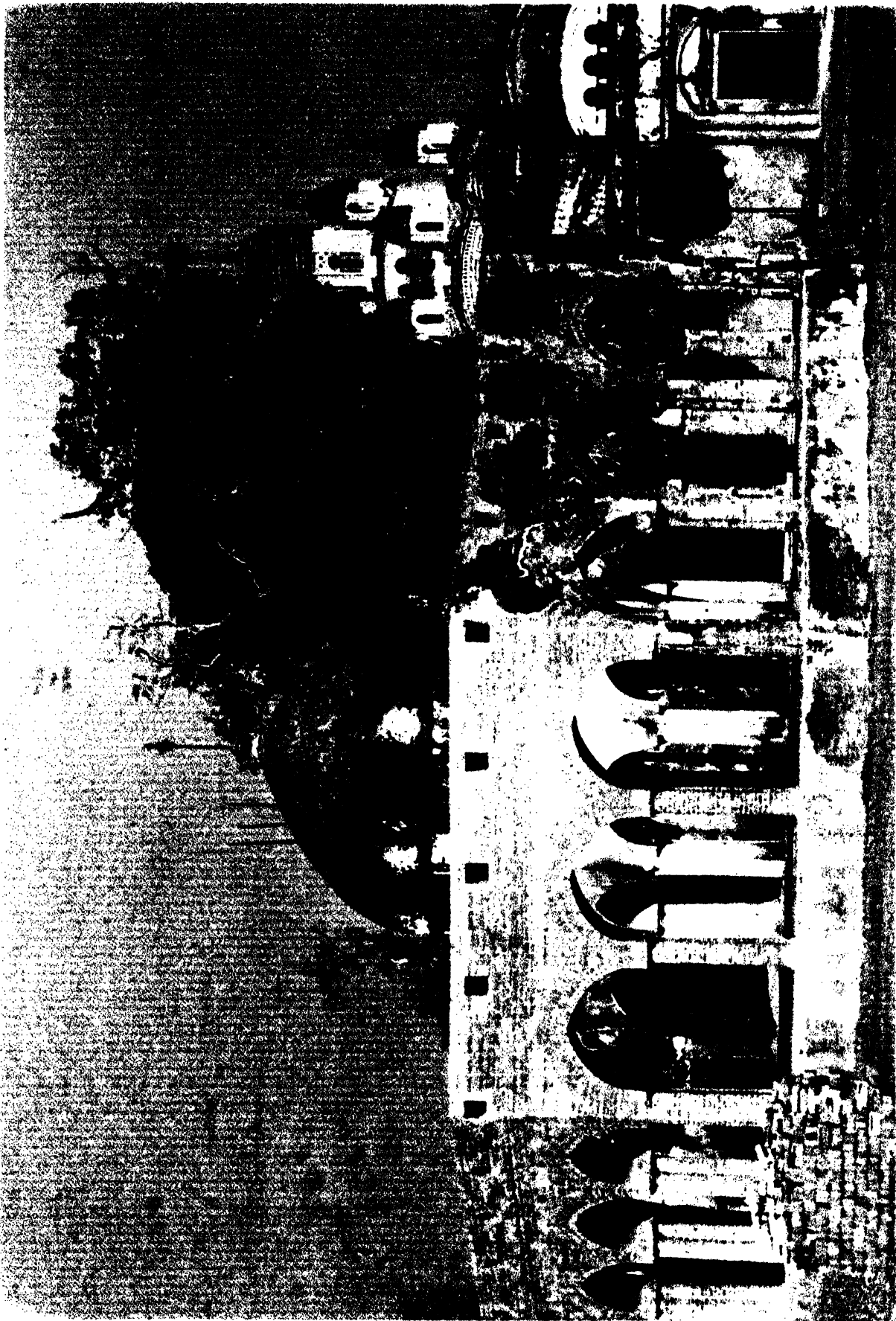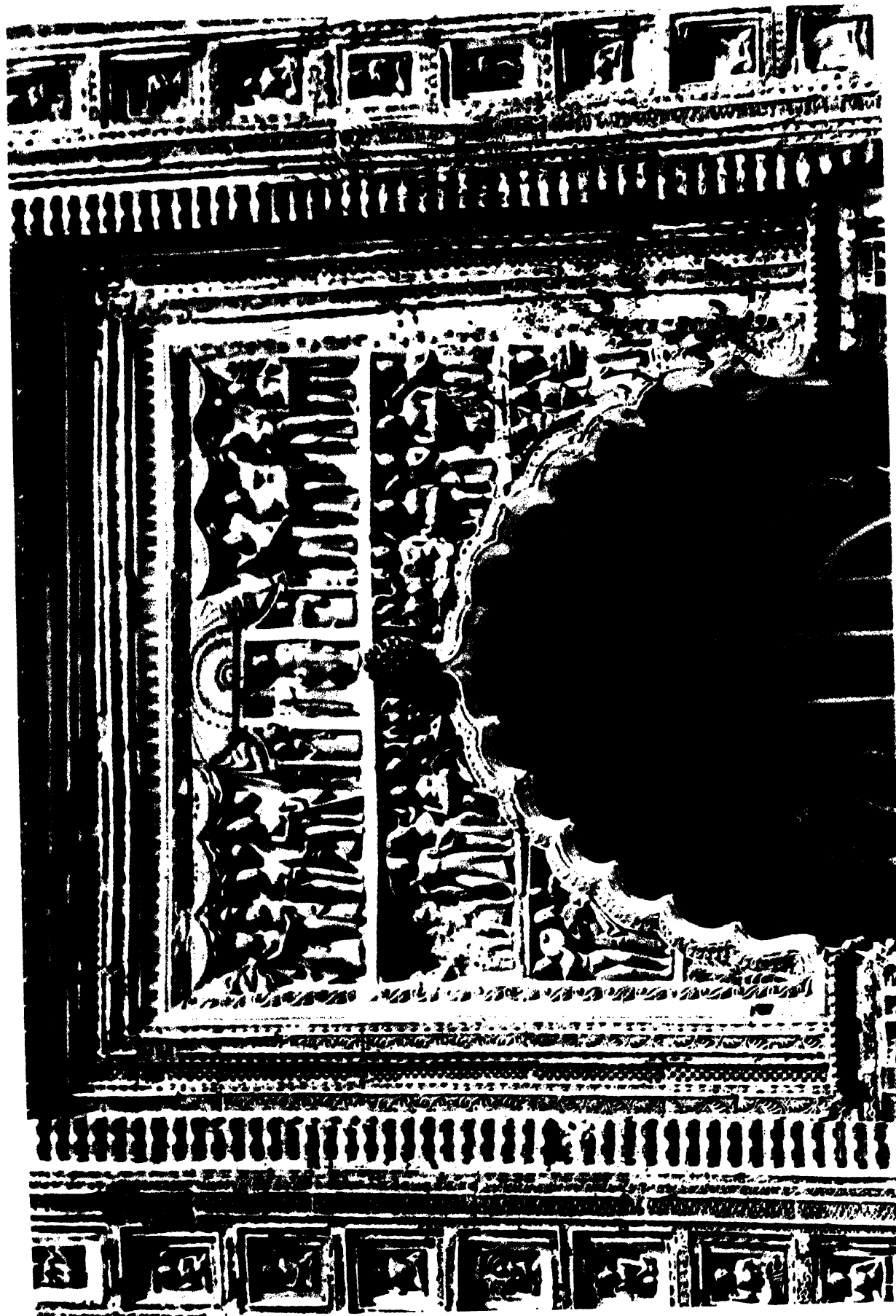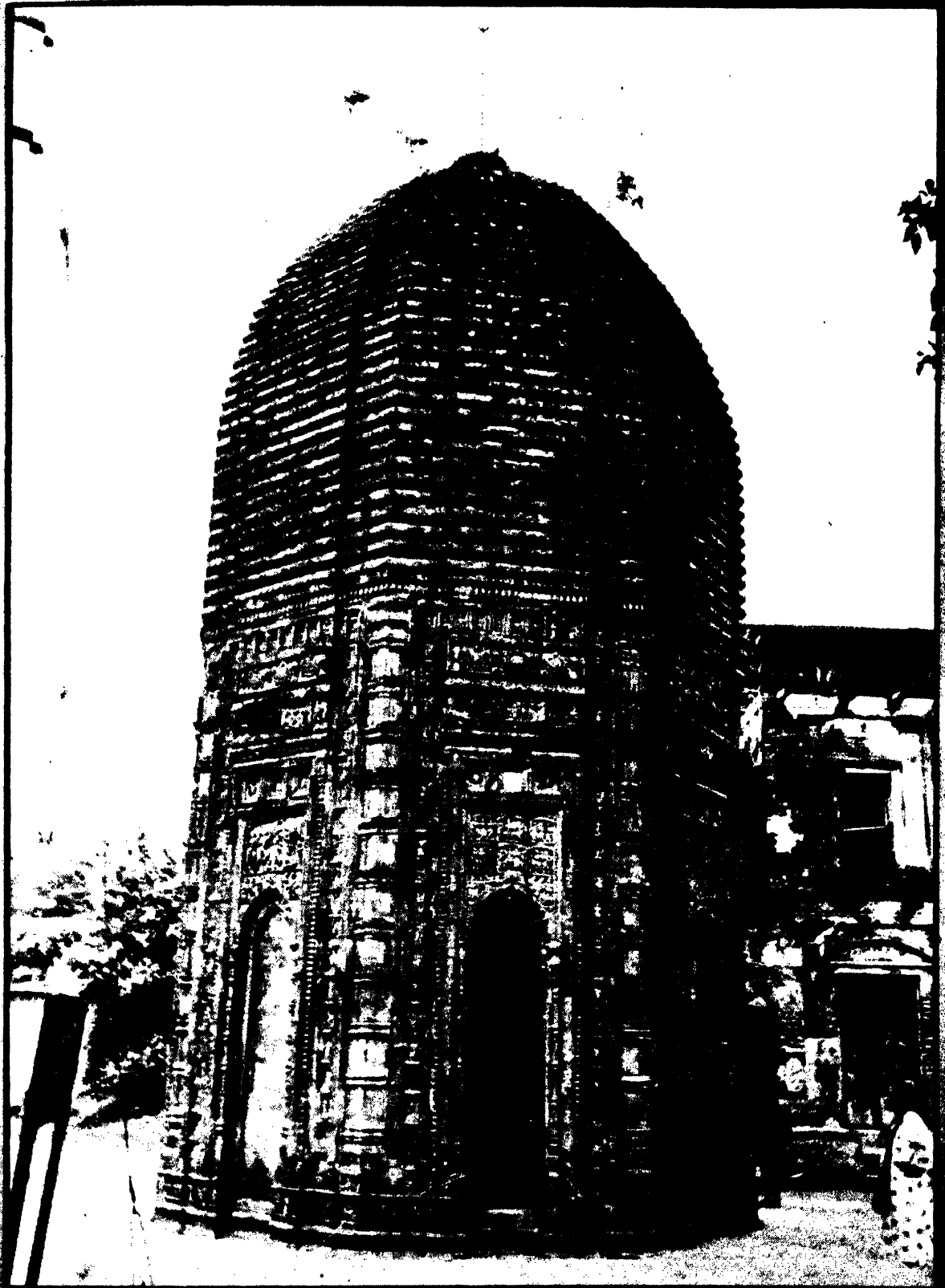
পাণ্ডুরাজার ঢিবি
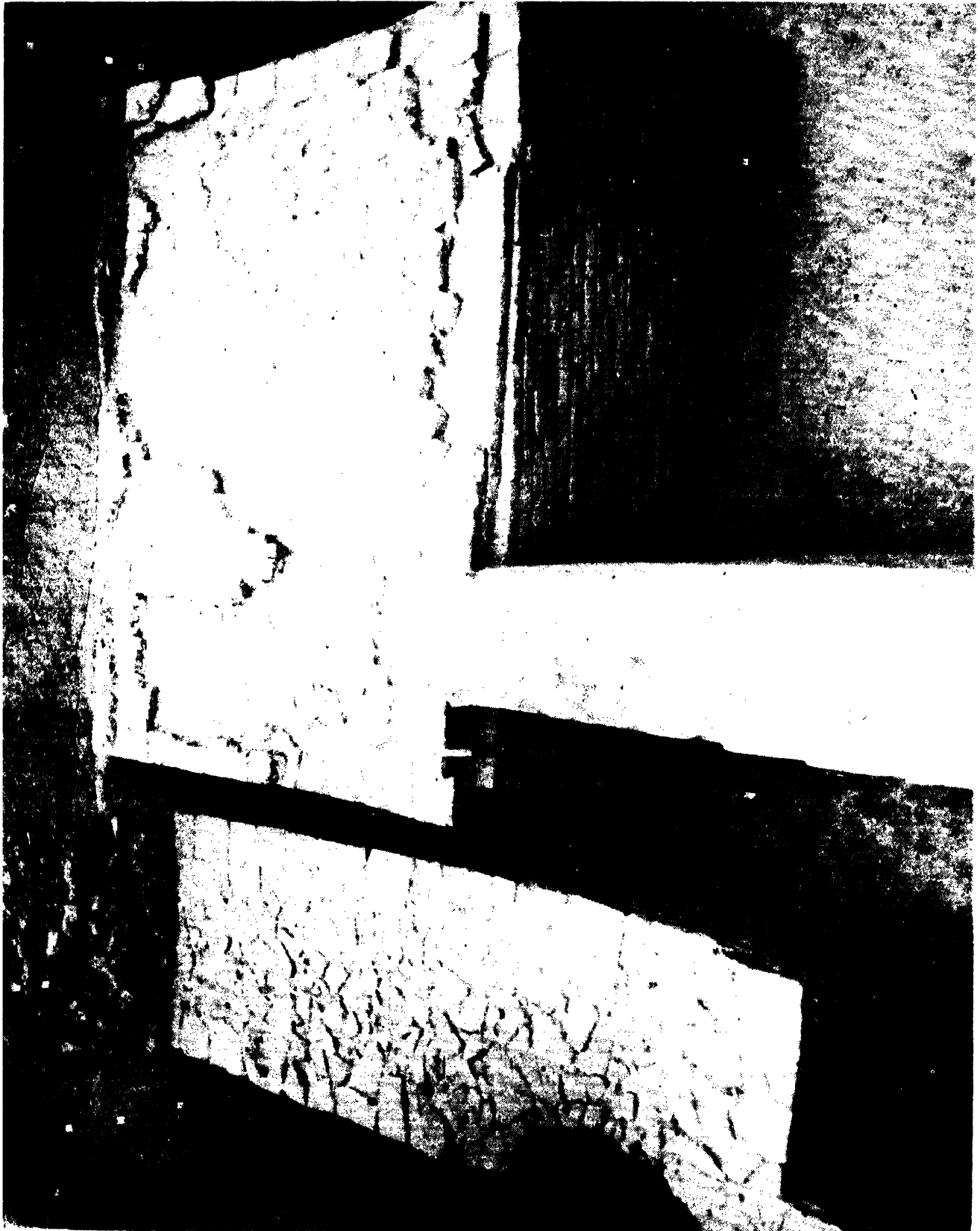
স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান জেলা

বিনয় চৌধুরী

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ধারা ও কংগ্রেসী ধারা বর্ধমান জেলায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই সক্রিয় ছিল। মানিকতলা বোমা মামলার অন্যতম প্রধান সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খানা জংশনের কাছে চান্না গ্রামে। তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য গোপনে দেশীয় রাজ্য বরোদায় গিয়ে সেখানকার সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। শ্রীঅরবিন্দ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে, বরোদা কলেজে এসে যোগ দেন। বিলাতে থাকতেই অরবিন্দ বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং বরোদায় এসে যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হন এবং ক্রমশ বাংলায় এসে এখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে থাকেন এবং তাদের সংগঠিত করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কারণে তখন বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই উত্তাল ছিল। দমন-পীড়ন খুবই বেড়েছিল। বিপ্লবী সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে মিসেস কেনেডিকে মারেন। প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারের আগেই আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এর ফলশ্রুতিতে মানিকতলা বোমা মামলা। অন্যদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত হন। রাসবিহারী ঘোষের বাড়ি বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার তোড়কোনা গ্রামে। তিনি শুধু একজন প্রথিতযশা

আইনজীবী ছিলেন তাই নয়, তিনি কংগ্রেসের নেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। আর একজন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর আদিবাড়ি রায়না থানার সুবলদায় হলেও, তাঁর কর্মস্থল ছিল প্রধানত উত্তর ভারতে বিশেষ করে সৈনিকদের ছাউনিতে। তিনি সামরিক বিভাগের কমিশরিয়েটের কর্মচারী ছিল। ইনিই পরবর্তীকালে সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার অর্পণ করেন। এরপর ১৯১৫ সালে বর্ধমানের পঞ্চানন চৌধুরীর বাড়ি বড়পলাশনে বিপ্লবী কাজের জন্য রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হন—জ্যোতিষদার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর একজন বোরহাটের আমার বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের মেজদা অনুকূল চট্টোপাধ্যায় নদিয়া জেলার একটা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে আন্দামান যান এবং প্রায় ১২ বছর পর মুক্তি পান। এরপর ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বর্ধমানের প্রতিটি মহকুমায় অনেকে যোগ দেন। সদর মহকুমায় পাঁজা মহাশয়, বিজয়দা, হায়াৎ সাহেব, জহেদ আলী সাহেব, প্রমথদা, শচীদা ও অনেকে। কাটোয়ায় ডাঃ গুণীবাবু, হরেকৃষ্ণ মণ্ডল, ক্ষুদিরাম মোদক ও অনেকে, কালনায় অন্নদা মণ্ডল প্রভৃতি। আসানসোলে ভীমদা, অমূল্যদা প্রভৃতি।

১৯২৮ সালের শেষে কেন্দ্রীয় আইন সভায়, পাবলিক সেফ্‌টি বিল আলোচনার সময় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা ফেলেন। বটুকেশ্বর দত্তের বাড়ি বর্ধমান জেলার ওঁয়াড়ি গ্রামে। ১৯২৭ সালের শেষে বর্ধমান শহরেও সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিরাট মিছিল হয়েছিল। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজির অনুরোধে এক বছর পেছিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য সর্বত্র পাঠ করা হয়। বর্ধমানেও হয়।

১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহ

গান্ধীজি ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে ডান্ডি মার্চের মাধ্যমে গুজরাটের সমুদ্র উপকূলে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং সমস্ত দেশবাসীকে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। আমি, সরোজ মুখার্জি প্রভৃতি শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময়েই (১৯২৮ সালে) যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলাম। তখন অতুল্যদা ও প্রফুল্লদা শ্রীরামপুর থেকেই কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করতেন। বর্ধমানে আমরা পাঁজা মহাশয় এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এবং বর্ধমানে এলেই ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। এই সময়ে ছাত্র ও যুব আন্দোলনেও আমরা যুক্ত ছিলাম এবং বর্ধমানে ফকিরদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, ছাত্র ও যুব সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র ও যুবদের সংগঠন শুরু করি। যুগান্তর দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরাও এই লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই এবং পাঁজা মহাশয় ও বিজয়দাকে আমরা এই আন্দোলনে যোগ দেব বলে জানাই। ওঁরা খুশি হয়ে, আমাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে এবং তার দায়িত্ব নেবার অনুরোধ করেন এবং তখন আমরা শচীদা, আমোদা, মথুরাদা প্রভৃতিকে নিয়ে বর্ধমান শহর ও জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করি। দুর্গাপুর ও আসানসোল অঞ্চলেও যোগাযোগ করি। এই ব্যাপারে অমূল্য ঘোষ এবং বনওয়ারীলাল ডালুটিয়া আমাদের সাহায্য করেন। লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলে, পাঁজা মহাশয়ের নেতৃত্বে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক কালনা রোড ধরে ২৪ পরগনা জেলার মহিষবাথানে লবণ তৈরির জন্য রওনা হন। শিবশংকর চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল মেদিনীপুর জেলার কাঁথির পিছাবনীতে যান এবং এখানে পুলিশ সুপার দোহার হাতে তাঁরা খুবই নির্যাতিত হন। উভয় দলই পরে গ্রেপ্তার হয়ে দমদম জেলে কারাবাস করেন। ক্রমশ জেলার বিভিন্ন অংশের প্রায় এক হাজারের উপর কারাবরণ করেন। আমার উপর ভার পড়ে বর্ধমান শহরে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়ে, বর্ধমানের কার্জেন গেটে বেআইনিভাবে তৈরি লবণ বিক্রি করা। আমাকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান জেলে রাখা হয়। এই সময়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারও গ্রেপ্তার হন এবং বর্ধমান জেলে ছিলেন। বর্ধমান জেলে প্রায় ২০০ জনের উপরে এই সময়ে জেলে বন্দী ছিলেন। আমোদা ও শচীদা দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার হন। দুর্গাপুরের এক সভার সভাপতি হওয়ার দরুন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩ মাসের জন্য ওই অঞ্চল থেকে বার করে দেওয়া হয়। সুকুমার বর্ধমানে এসে আমাদের বাড়িতে থাকে। সরোজ আসানসোল থেকে গ্রেপ্তার হন এবং তাকে ও ওখানকার অনেককে দমদম জেলে পাঠানো হয়। দাশরথিদাও এই সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে দমদমে যান।

১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সূর্য সেন, গণেশদা, অনন্ত সিংয়ের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার দখল করে নেওয়া এবং জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। পরে বাইরে থেকে সৈন্য নিয়ে এসে, জালালাবাদ পাহাড় ঘিরে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অগ্রদ্বীপের সুবোধ চৌধুরীও ছিলেন। তিনি তখন মামার বাড়িতে থেকে চট্টগ্রামে পড়াশোনা করতেন। যুব বিপ্লবের এই খবরে বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। আমাদের ভিতর প্রস্তুতি চলতে থাকে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে ১৯৩২ সালে আগস্ট মাসে বেগুট কেসে হরেকৃষ্ণের ৬ বছর সাজা হয় এবং তাকে আন্দামানে পাঠানো হয়। আমরা কয়েকজন আত্মগোপন করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। ১৯৩৩ সালের মে মাসের প্রথম দিকে আমি গ্রেপ্তার হই। আমাকে হরেকৃষ্ণের কেসে বিচারের জন্য বর্ধমান জেলে নিয়ে আসে। সেই কেসে আমাকে সেভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে না পারায়, আমাকে ডেটিনিউ করে—কয়েকমাস বর্ধমান জেলে রেখে—পরে আমাকে বগুড়া জেলে ইনটার্ন করে। পরে সেখান থেকে সিউড়ি জেলে নিয়ে আসে এবং বীরভূম

ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে। এই মামলায় আমি ছাড়াও আসানসোলের হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমর ভট্টাচার্য ছিল। ৮ মাস বিচার চলার পরে আমার সাড়ে পাঁচবছর জেল হয়। হরিপদের ৬ বছর জেল হয় এবং তাকে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়। অমর ভট্টাচার্যকে ডেটিনিউ করা হয়। হরেকৃষ্ণ কেসে বিপদ রায় ও আমার আর এক ভাই ধর্মদাস চৌধুরী আত্মগোপন করে থাকার পর তাদেরও বিচার হয় কিন্তু তাদেরও বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করতে না পারায় ওদের ডেটিনিউ করা হয়। এ ছাড়া ১৯৩০ সালেই ফকিরদাকে গ্রেপ্তার করে ও ডেটিনিউ করে তাঁকে প্রায় ৬ বছর দেউলীতে রাখা হয়। কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেটিনিউ করে বহরমপুর জেলে রাখা হয়। সরোজকেও ডেটিনিউ করে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়। ১৯৩১ সাল থেকেই আমরা কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকি। ১৯৩২ সালে বর্ধমান জেলা কনফারেন্সে—সরোজ, আমোদা, আমি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করি এবং সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করাই। তাতে তখন ভীষণ হইচই পড়ে যায়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ওই সম্মেলনের পরই যুব সম্মেলন হয় বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে। কংগ্রেসের থেকে কয়েকজন আমাদের সভা পণ্ড করার জন্য পিকেটিং করে, তবে সভার কাজে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বঙ্কিমদা এই যুব সম্মেলনে এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিল। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বর্ধমান বিভাগীয় সমাজবাদী সম্মেলন। এতে তখনকার অনেকগুলি সংগঠন যাঁরা সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করতেন তাঁরা যোগ দেন। এরপর থেকেই আমি আর সরোজ মুখার্জি সাইক্লোস্টাইলে 'সাম্য' নামে একখানি পত্রিকা বেশ কয়েকমাস চালাই। এই সময় থেকেই আমরা যুগান্তর দলের থেকে বেরিয়ে এসে, ইন্ডিয়ান সোসিয়োলিস্ট রেভোলিউশনারি পার্টি গঠন করি। বিজয়দা, পাঁচুদা প্রভৃতি পরে এর নাম পরিবর্তন করে ইন্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ন রেভোলিউশনারী পার্টি রাখা হয়। এ ছাড়া এই সময়ে গণ আন্দোলনের প্রয়োজন বুঝে আমরা কৃষক সংগঠনের দিকে জোর দিই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে থাকি। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৩৩ সালের মে মাসে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে হাটগোবিন্দপুরে বর্ধমান জেলা কৃষক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সরোজ মুখার্জি উপস্থিত ছিলেন। আমার মেজদা রমেন চৌধুরী সম্পাদক হন। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ পরবর্তীকালে ক্যানেল আন্দোলনে আমরা যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলাম তার ভিত্তি এর মাধ্যমে তৈরি হয়। '৩৫/৩৬ সাল থেকে হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ক্যানেল আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৫ সালের অক্টোবরে ৫ জনকে নিয়ে বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। কমরেড শাহেদুল্লাহ্ সম্পাদক হন। ১৯৩৮-৩৯ সালে দামোদর ক্যানেল করের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ধমানে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে, আসানসোল-রানীগঞ্জ খনি অঞ্চল থেকে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির জয়লাভ। এ সময় মুজফ্‌ফর সাহেব ও আরও অনেকে আসানসোল অঞ্চলে প্রচারে আসেন। জয়লাভের পর, ১৯৩৮ সালে কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীকে পাঠানো হয়। টাটা থেকে ধানবাদ, আসানসোল, রানীগঞ্জ অঞ্চলে তখন টাটায় যিনি শ্রমিক নেতা থাকতেন—তাঁকেই এই সমগ্র অঞ্চলের নেতা হিসাবে গণ্য করা হত। ওই সময়ে মানেক হোমী টাটার শ্রমিক নেতা ছিল। তাঁর প্রভাব আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে ছিল। বিহারে কংগ্রেস সরকার হওয়ায় শ্রমিকদের ঝোঁক কংগ্রেসের দিকে এল। তখন রানীগঞ্জ কাগজকল ও রানীগঞ্জের সিরামিক ইউনিয়নের শ্রমিকরা অমূল্য ঘোষের কাছে এসে, তাদের ইউনিয়ন চালনার ভার নেবার অনুরোধ জানালেন। অমূল্যদা নিত্যানন্দের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পরে কাগজকল ইউনিয়নের সভাপতি হন বঙ্কিম মুখার্জি, সহ-সভাপতি হন আবদুল মোমিন সাহেব, সম্পাদক হন নিত্যানন্দ চৌধুরী এবং সহ সম্পাদক হন সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৩৮ সালে ১৩ নভেম্বর থেকে রানীগঞ্জ কাগজকলে ধর্মঘট শুরু হয়, ১৫ নভেম্বর সকালে শিফট্ পরিবর্তনের সময় ইউনিয়ন অফিসের সামনে একটা লরি করে ধর্মঘট ভাঙার জন্য বাইরে থেকে লোক নিয়ে যাচ্ছিল। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওই লরিকে আটকান। কাগজকলের ম্যানেজার লো সাহেবের হুকুমে কাগজ কলের ইঞ্জিনিয়ার ব্রাউন সাহেব সুকুমারের বুকের উপর দিয়ে লরি চালিয়ে দেয়। সুকুমার শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে শ্রমিক ছাড়াও অফিস কর্মচারি ও উচ্চপদস্থ কিছু অফিসারও ধর্মঘটে যোগ দেন। প্রায় ৫ মাস এ ধর্মঘট চলে। নিত্যানন্দ চৌধুরী, আমি, বলদেও ও দাশী বাউরী, যশবন্তিয়া ও আরও তিনজন মহিলা শ্রমিক গ্রেপ্তার হন। আমাদের ৬ মাস সাজা হয়। কিছুদিন আসানসোল জেলে রাখার পর আমাকে ও নিত্যানন্দকে আলিপুর জেলে নিয়ে যায়। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ৩৯ সালের শেষে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমি আত্মগোপন করি। খড়গপুর, ধানবাদ ও ঝরিয়া অঞ্চলে কিছুদিন কাজ করে, পরে হরেকৃষ্ণকে নিয়ে আমি কুমারডুবি অঞ্চলের এক গোপন আড্ডা থেকে ক্রমশ আত্মগোপন করে কাজ শুরু করি। এই অঞ্চলে ও ক্রমশ বরাকর অঞ্চলে ওয়েস্ট ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারি, রামনগর কোলিয়ারিতে, জামুরিয়া অঞ্চলে বাঁকাশিমুলিয়া ৭ নং, ৮ নং, ১০ নং, ১১ নং কোলিয়ারিতে এবং দিশেরগড় কোলিয়ারিতে চিনাকুড়ি ও অন্য ২/৩টি কোলিয়ারিতে, শ্রীপুর ও নিঘা কোলিয়ারিতে ইউনিয়ন গড়ি। ১৯৪২ সালের আগস্টের কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর বাইরে

বেরিয়ে 'বেঙ্গল কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' গঠন করা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি সভাপতি হন ও আমি সম্পাদক হই। ক্রমশ এই ইউনিয়ন খনি অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালের শেষে খনি অঞ্চলে অনেকগুলি খনি নিয়ে ধর্মঘট শুরু হয়। তৎকালীন লেবার কমিশনার এস এল যোশী দিল্লি থেকে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ওই ধর্মঘটের মীমাংসা করেন। এতে খনি শ্রমিকদের মধ্যে খুবই উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

১৯৪৩ সাল থেকে শুরু করে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত বার্ণপুরে ইস্কোতে ইউনিয়ন গঠন করা হয়। বঙ্কিম মুখার্জি, আমি, কে এল মহেন্দ্র, আমোদা, রঞ্জিৎ গুহ প্রভৃতি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। মহেন্দ্র সম্পাদক হন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই ইউনিয়ন কাজ করেছিল। তারপর আবদুল বারি—তিনি টাটা ইউনিয়নের নেতা—আমাদের হটিয়ে ইউনিয়ন দখল করে। পরে আবার ১৯৪৫ সালে অ্যাকশন কমিটি গঠন করে আবার বার্ণপুর ইস্কোর ইউনিয়ন দখল করা হয়। এবার তাহের হোসেন সম্পাদক হন। ১৯৪৪-৪৫ সালে পানাগড়ের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে আমরা ইউনিয়ন দখল করি। এই সময়ে ওখানে কাশীনাথ হাজরাচৌধুরী, সুনীল বসুরায়, অনিল রায় প্রভৃতি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন। অতএব স্বাধীনতার আগেই বর্ধমান জেলায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের এবং সংগঠনের বেশ কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল।

বন্যাত্রাণ

দামোদর বন্যার ১৯৪৩ সালের রিলিফের কাজে আমাদের অংশগ্রহণ। ১৯৪৩ সালের বন্যায় শক্তিগড়ের কাছে রেললাইন ও জি টি রোড ভেঙে যায়। দামোদরের প্রবাহ বাঁকা নদী ধরে দুকূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং সদর, মেমারি, মন্তেশ্বর, পূর্বস্থলী ও কালনার বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হয়। আমাদের সব কর্মী এবং অন্যান্য দলের কর্মী বন্যাত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও তৎপরতার সঙ্গে করতে পারায়, জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের মনে খুব ভাল প্রভাব পড়ে। এর ফলে আমাদের গণভিত্তি প্রসারিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে এদের অনেকে কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠে।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের রিলিফ ও মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন বিভিন্ন অঞ্চলে কিচেন খুলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। প্রধানত মেয়েরা এর দায়িত্ব নেন—ছেলেরা তাদের নানাভাবে সাহায্য করত। এর মাধ্যমে বহু দুঃস্থ মানুষের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং পরে যখন তারা নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যায়, তখন আমাদের কর্মীরা তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং সেইসব অঞ্চলেও সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে খাদ্য সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থাই মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এরই প্রয়োজনে বর্ধমান শহর ফুড কমিটি গঠিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ভুজঙ্গ সেন। পাড়ায় পাড়ায় ফুড কমিটি গঠিত হয় এবং বণ্টনে দোকানগুলির উপর নজরদারি করা হত। সদর মহকুমা ফুড কমিটি সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্। এইগুলি নির্বাচিত কমিটি ছিল। এই নির্বাচন যখন টাউন হলে হয় তখন কিছু লোক গোলমাল করে, নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে আমি কার্যোপলক্ষে বাইরে ছিলাম। আমি ফিরে এসে সি এম এস স্কুলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করাই। তারপর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য উকিলকে অনুরোধ করি তাঁরা মাসে একবার ফুড কমিটির অফিসে আমাদের কাজকর্ম কীভাবে চলছে দেখবার জন্য এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার জন্য। জ্ঞান মুখার্জি, দিবাকর কোঙার, দ্বিজেন মণ্ডল প্রভৃতি আরও ২-৩ জন প্রতি মাসে আসতেন। কিছু ব্যক্তি নালিশ করে ভিজিল্যান্সকে দিয়ে আমাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়েছিলেন। তখন জ্ঞান ব্যানার্জি দারোগা ভিজিল্যান্স ছিলেন। তিনি একদিন আমায় বললেন, এই ধরনের পাবলিক ইন্সটিটিউশনে এত ভাল হিসাব আমি আমার চাকুরি জীবনে দেখিনি। বার লাইব্রেরিতেও জ্ঞানবাবু, দিবাকরবাবু, দ্বিজেনবাবু আমাদের প্রশংসা করতে লাগেন। ফলে জনমানসে খুব ভাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। এর ফলে শহরে আমাদের সমর্থন ক্রমশ বাড়তে লাগল।

অজয়ের বাঁধ বাঁধার আন্দোলন

অজয় নদীর বাঁধ ভেদিয়ার কাছে ভেঙে যাওয়ায় এবং তা না সারানোর দরুন প্রায় প্রতি বছর ওই অঞ্চলে বন্যা হত এবং ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হত। ১৯৪৫ সালে এই বাঁধ-বাঁধার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এর দাবিতে একটা বড় জমায়েত করা হয় এবং সেখান থেকে প্রস্তাব নিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে পাঠানো হয়। তাতেও কোনও কাজ না হওয়ায় ৯টি ইউনিয়নের সকল সদস্য পদত্যাগ করেন। ক্রমশ আন্দোলন তীব্র হতে থাকে, অবশেষে সরকার বাঁধ বাঁধতে বাধ্য হয়। তৎকালীন সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জি মণ্ডল আমাকে বলেন এখন জুন মাস পড়ে গেছে, এ বছর আর হবে না। পরে শুরু করব। আমরা বললাম, না—যত লোক দরকার আমরা জোগাড় করে দেব আপনারা শুরু করুন। তারপর প্রতিদিন ৫-৬ হাজার লোক জড়ো করে বর্ষার আগেই বাঁধ শেষ করা হল। এই বাঁধ ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত টিকেছিল। এই আন্দোলন ওই অঞ্চলে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বর্ধমান জেলায় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

বংশগোপাল চৌধুরী
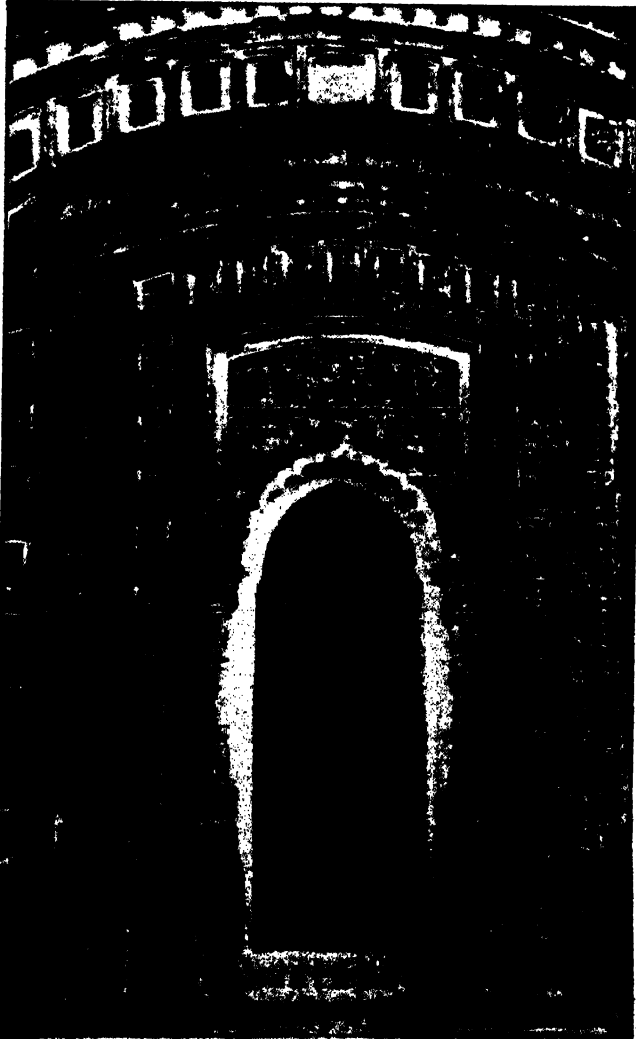
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা আলোচনা করতে হলে তৃণমূলস্তরের মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বর্ধমান জেলার কারিগরি শিক্ষার চিত্র উপস্থাপিত করতে হলে স্বাভাবিকভাবে তার সুযোগ এবং শিল্পক্ষেত্র থেকে তার সহায়তার দিকটি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আর্থার ডি লিট্ল, আই সি আই সি আই, (কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে) প্রাইস ওয়াটার অ্যাসোসিয়েটস্ (ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের মাধ্যমে) এবং পার্থ এস ঘোষ অ্যাসোসিয়েটস্ (পঃ বঃ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমে) প্রভৃতি রিপোর্টগুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে।

অ্যাকোয়াকালচার, ইলেকট্রনিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, হর্টিকালচার, ফুড-প্রসেসিং, হাইড্রোকার্বন, সফ্টওয়্যার, লেদার এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বিদ্যুৎ, টেলিকমিউনিকেশন, হাউসিং, পোর্ট, রাস্তা) ইত্যাদির গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে।

খনিজভিত্তিক শিল্প, পরিষেবাক্ষেত্র ও আন্তর্জাতিক ব্যবসাভিত্তিক শিল্পের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক সুপারিশগুলির মধ্যে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ার অংশে খাদ্যশস্য, আলু, পাট ও রেশমতন্তুর কথা বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিল্পের ক্ষেত্রে রুগ্ন পুরোন শিল্পগুলির (সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে) আধিক্য আছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি জাতীয়স্তরে সেরা শিল্প হিসেবেও স্বীকৃত।

এইরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(১) কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি।

(২) শিক্ষার মানের উন্নয়ন।

(৩) স্বনিযুক্তি প্রকল্প। উদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎসাহদান।

শিল্পগুলির আরও ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন—যেহেতু তারাই কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্তদের গ্রহণ করে।

রাজ্যের পলিটেকনিকগুলি প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫০০ জন কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র তৈরি করে। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা প্রকল্পের ফলে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও আই টি আই ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যাও যুক্ত হয়।

বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে বর্ধমান শহরে ১টি, আসানসোলে ২টি পলিটেকনিক, রূপনারায়ণপুরে নতুন ১টি পলিটেকনিক (বর্তমানে যেটির ক্লাস কল্যাণপুরে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীকালে রূপনারায়ণপুরে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হলে স্থানান্তরিত হবে), রানীগঞ্জের মাইনিং ইনস্টিটিউট এবং দুর্গাপুর আই টি আই জেলায় কারিগরি শিক্ষার কাজে যুক্ত আছে। এছাড়া নতুন একটি মহিলা কলেজ আই টি আই বর্ধমানে স্থাপিত হয়েছে। কলা নবগ্রামে জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল (যা আই টি আই স্তরে উন্নীত হচ্ছে) এই কাজে যুক্ত আছে।

দুর্গাপুরে রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশাপাশি আসানসোলে অপর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মতো বর্ধমান জেলাতেও বর্ধমান এম বি সি পলিটেকনিককে কেন্দ্র করে কৃষি এলাকায় এবং আসানসোল ও রানীগঞ্জের ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে শিল্প এলাকায় কমিউনিটি পলিটেকনিক স্কিমের কাজে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি পলিটেকনিক স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকায় বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কমিউনিটি পলিটেকনিকের অপরদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রযুক্তি চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে। একাজে বিজ্ঞানমঞ্চ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যুক্ত হতে পারে; যদিও এ বিষয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া যায়নি।

পাঞ্জাব, কেরালার ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে ক্র্যাফট্‌সম্যান ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকদের কিছুটা সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এই কাজের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগগুলির যেমনভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন তা করেনি বলেই মনে হয়। এজন্য বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর আই টি আই থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্তরা ডি পি এল, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বা দু-একটি সরকারি সংস্থায় কিছু সুযোগ পেলেও উৎসাহের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে।

আবার স্বনিযুক্তি প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা হলেও কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাও এই সমস্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রদের কিছু পরিমাণে হতাশ করে। তবে সারা রাজ্যে আই টি আই শিক্ষাপ্রাপ্তদের ঝোঁক হচ্ছে যে কোনও শিল্পে স্থায়ীভাবে কাজের ব্যবস্থা করা। বিচ্ছিন্নভাবে কোনও উদ্যোগ এই মনোভাব দূর করতে পারবে বলে আশা করা যায় না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে গভীর সংযোগ এ-কাজে সাহায্য করতে পারে।

আমাদের রাজ্যে শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রেও নতুন শিল্পগুলিতে এ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে। এজন্য জেলা পরিকল্পনা কমিটি, কারিগরি শিক্ষা বিভাগের মধ্যে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। শিল্পগুলি ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র গ্রহণ করবেন তা জেনে পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

পলিটেকনিক, আই টি আই-এর পাশাপাশি এই ধরনের বিশেষ ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বেসরকারি উদ্যোগ/যৌথ উদ্যোগে একাজ করা যায়। এদের সার্টিফিকেট স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন দিতে পারে।

এন জি ও-দের মধ্যে তৃণমূলস্তরে কৃষি এলাকায় নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বরে জেলা পরিষদের সহায়তায় স্বল্প পরিসরে এই কাজ শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে এটিকে সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টার পাশাপাশি জেলা পরিকল্পনা কমিটি এটিকে লোকশিক্ষা পর্ষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারে।

এ ধরনের ট্রেনিংয়ের ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে না এবং এইগুলি শুধুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি করে। পরবর্তী দশকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভলপমেন্ট গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ, রাস্তা, টেলিকম-পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ম্যান পাওয়ার ট্রেনিংয়ের সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। সরকার ও শিল্পক্ষেত্র এ বিষয়ে যুক্তভাবে কাজ করতে পারে।

আমাদের কারিগরি শিক্ষার ধারা বদলের প্রশ্নটি বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। পুরোন পদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য শিল্পগুলির সঙ্গে যুক্তভাবে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন, পরবর্তীকালে দেশে স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাহিদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু থাকবে। হয়তো সমস্যা সমাধানের জন্য এই পদক্ষেপ বিশেষ ভূমিকা নিতে পারবে না। তবে নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের এগিয়ে যেতে কিছু সাহায্য করবে।

বর্ধমান জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান ইতিহাস

শ্রীধর মালিক ও কবিলাল মার্ডি
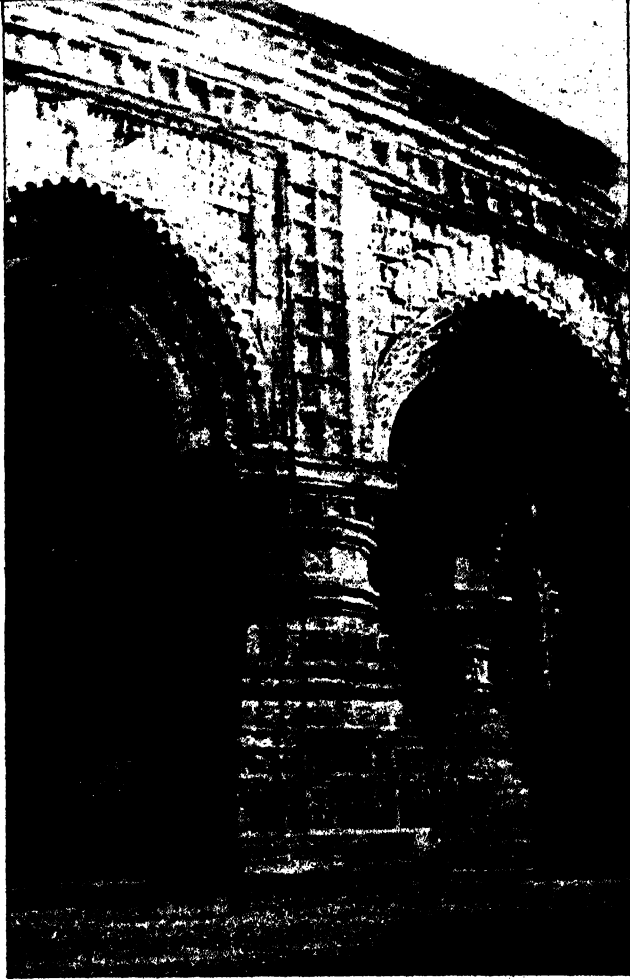
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা বর্ধমান। প্রাচীন রাঢ় জনপদের মধ্যস্থলে এই জেলার অবস্থিতি। তাম্রশাসন ও পুরাণে বর্ণিত বর্ধমান জেলার অবস্থান বর্তমানের থেকে অনেক বেশি বৃহত্তর ছিল। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের কোনও প্রামাণ্য দলিল নেই, যার ফলে প্রাচীন যুগের ইতিহাস সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস নির্ধারণ করাটাও যথেষ্ট সন্দেহাতীত বিষয় হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও একই সমস্যা। এই জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনার বিষয়টি একদেশদর্শীদোষে দুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়। অজয় নদের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডুক গ্রামের পাণ্ডু রাজার টিবির খননকার্য থেকে তাম্রস্বর যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রায় ৪,০০০ বছর আগে। খননকার্য ঠিকমতো করা হলে হয়তো প্রস্তর যুগের সন্ধান ও অনেক কিছু পাওয়া যেত। প্রাচীন যুগের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় প্রস্তরনির্মিত বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র থেকে। প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে বর্ধমান জেলায় শিকারজীবী মানুষেরা বসতি স্থাপন করে। প্রস্তর যুগের মানবগোষ্ঠী ছিল যাযাবর ও পশু-শিকারি, পরবর্তীকালে খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে উৎপাদনের কলাকৌশল আবিষ্কারে সক্ষম হয়। নব্য প্রস্তর যুগে খাদ্য উৎপাদনই জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিকা ছিল। যার জন্য কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা

গড়ে উঠেছিল এবং এই সমাজজীবনের উন্নততর পর্যায়ে তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতা গড়ে ওঠে। কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনই ছিল প্রধান। অন্য দিকে ধাতু যুগের সূত্রপাতের ফলে পরবর্তীকালে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

রাঢ়ের মধ্যবর্তী জেলা বর্ধমান। জেলার পূর্বভাগ ভাগীরথী, দামোদর, অজয় নদ-প্রবাহিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যার মাটিও খুব উর্বর। উন্নত কৃষিপ্রধান জমি। অন্য দিকে পশ্চিমাঞ্চল খনি ও শিল্পাঞ্চল। যার মধ্য দিয়েও দামোদর, অজয় ও বরাকর নদী প্রবাহিত। স্বাভাবিকভাবে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই এই জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি নজিরবিহীন উন্নত জেলা।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের জাতিগোষ্ঠীর বিন্যাস ঘটেছে। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এই জেলায় যাযাবর শিকারি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অনার্য জাতির মানুষ ছিল। পরবর্তীকালে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক বহিরাগত মানুষের এই জেলায় আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের অনেকেই পরাক্রমশালী ব্যক্তিও ছিল। একটি উর্বর স্থান হিসেবে তারা বসবাস করার উপযুক্ত স্থান এই জায়গা বেছে নিয়েছে। কোথাও কোথাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে শাসক হিসেবে। প্রচলিত হয়েছে রাজা-প্রজা, শাসক-শোষিত সমাজব্যবস্থা। আদিবাসী যাযাবররা সভ্য সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। তাই তারা আশ্রয় নিয়েছে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ি এলাকায়, সেই কারণে জেলার জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকা হিসেবে কাঁকসা, আউসগ্রাম ও আসানসোল মহকুমাতেই এদের অবস্থিতি দেখা যায়। প্রধানত ফলমূল ও শিকার করা পশুর মাংসই এদের আহারের প্রধান খাদ্য ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে বর্ধমানে সীমিত সংখ্যক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইতিহাস প্রমাণিত হলেও একটি উর্বর জেলা হিসেবে একদিকে কৃষিকার্য ও অন্য দিকে খনি ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমের কাজে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গা থেকেও আদিবাসীদের আনা হয়েছে। কারণ আদিবাসীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাই অত্যন্ত কঠিন শ্রমসাধ্য কাজগুলি করা এদের পক্ষেই সম্ভব। মজুরের কাজ ছাড়াও এরা রাজা, মহারাজা, সামন্ত প্রভুদের যুদ্ধকালে তীর, ধনুক, কুঠার, বর্শা নিয়ে সৈনিকের কাজও করেছে। এই জেলার জঙ্গলমহলে (আউসগ্রাম, কাঁকসা) ইছাই ঘোষের শাসনকালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীই তার সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান সৈনিক ছিল। আবার সেই সব আদিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে শাসক প্রভু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার অনেক কাহিনী বংশ-পরম্পরায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চলে আসছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাধারণত শান্ত, নিরীহ, নির্বিবাদী। অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাই কৃষিকাজের জন্য জেলার সর্বত্রই এরা ছড়িয়ে আছে। গ্রামের বাইরে কোনও একটি পাড়ায় এদের অবস্থান। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে এরা পৃথকভাবেই জীবনযাপন করে থাকে। প্রাচীন যুগ থেকে বসবাসকারী যে-সমস্ত আদিবাসীরা জেলায় বসবাস করে আসছে তার থেকেও অনেক বেশি মানুষ কৃষি ও শিল্প শ্রমিক হিসেবে এখানে এসেছে। এ ছাড়াও ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল। মূলত বিহারের দুমকা ও বীরভূম জেলায় সাঁওতালরা ব্রিটিশ শাসক ও তাদের তাঁবেদার রাজা, মহারাজা, জমিদার, মহাজনদের নির্মম অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রায় ৮ মাস ধরে এই বিদ্রোহ চলে। সশস্ত্র ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ জীবন দেয়। সেই সময়ে ওই সব এলাকা থেকে সাঁওতালদের অনেকেই অজয় নদী পার হয়ে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম, কাঁকসা, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকার জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। অনেকেই স্থায়ীভাবে এখানে থেকে যায়। সিধু-কানু দুই ভাই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই সাঁওতাল হুল (সাঁওতাল বিদ্রোহ)-এর দিনটিতে অর্থাৎ ৩০ জুন তারিখটি একটি উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী থেকে নাচ, গান, নাটক রচনা হয়ে থাকে। জেলার প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই এই উৎসব পালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এই উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে, তা ছাড়া সারা ভারত কৃষকসভার বর্ধমান জেলা কমিটি সর্বতোভাবে এই উৎসবে সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে সব আন্দোলন হয়েছে সে সব আন্দোলনে এই জেলার অগণিত মানুষের অংশগ্রহণের যথেষ্ট নজির আছে। এমনকি ব্রিটিশ ও তাদের পেটোয়া জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এলাকায় নানা ইস্যুতে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। সেই সব আন্দোলনে গ্রামের বিত্তবান কৃষক থেকে শুরু করে গরিব মানুষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে। সেই সব আন্দোলনের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা নেতৃত্ব দিয়েছে। গরিব কৃষক, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, সম্প্রদায়গত হিসেবে যারা তফসিলি জাতি-উপজাতি ও গরিব মুসলমান শ্রেণীর সেই সব মানুষই সবচেয়ে বঞ্চিত। শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন এরা ভোগ করে আসছে। এই সব শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মূল সংগ্রাম ছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সভার—জেলায় জোতদার-জমিদার পরিবারের বহু আদর্শবাদী মানুষও সেই সব সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। স্বাধীনতার পরও শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিটি বামপন্থী আন্দোলনে গরিব সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে অগণিত গ্রামের গরিব মানুষ দলে দলে যোগ দিয়েছে। আর এই সব সংগ্রামের পটভূমিতেই জন্ম হয়েছে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার—গরিব শ্রমিক, মজুর, কৃষকের সংগ্রামের হাতিয়ার'। এই স্লোগানে মুখর হয়ে উঠল গ্রাম-গঞ্জ-নগর-বন্দর। ভূমিরাজস্ব দপ্তর জোতদার,

জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে গরিব ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বর্গাদারের ন্যায্য ভাগ ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষেতমজুরদের বাঁচার মতো মজুরির দাবি ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধুমাত্র সরকারি আইনের দ্বারা দীর্ঘদিনের এই শোষণের জগদ্দল পাথরকে সরানো যাবে না। তাই বন্ধু সরকারের সদিচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কৃষকসভা সংগ্রামের আহ্বান জানায়। সরকারি সদিচ্ছা ও কৃষকসভার আন্দোলনের ফলে গ্রামের শোষিত মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়। জমি দখলের কাজ শুরু হয়। জোতদার, জমিদার কোথাও কোথাও নগ্নভাবে আক্রমণ করে। চৈতন্যপুরের ঘটনা তারই একটি দৃষ্টান্ত। জমি দখলের লড়াইয়ে জমিদারের গুলিতে দুজন গরিব ক্ষেতমজুর শহিদ হয়।

যুগ যুগ ধরে অমানবিক শোষণ, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় শান্ত, নিরীহ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরাও সংগ্রামের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে লড়াই অত্যন্ত জঙ্গি রূপ ধারণ করে। জোতদার, জমিদারদের আক্রমণে অনেকেই শহিদ হলেও সে সংগ্রাম থেমে থাকেনি।

ধনিকদের সেবায় দীক্ষিত কেন্দ্রের শাসক কংগ্রেস দল ষড়যন্ত্র করে দুটি যুক্তফ্রন্টকেই ভেঙে দেয়। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বিপুলভাবে বামপন্থীদের জয়লাভ ঘটে। কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক কিছু দলের সাহায্যে বাংলা কংগ্রেস ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প কিছু সংখ্যক গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার চালানোর অনিশ্চিত অবস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্য মাত্র আড়াই মাস পরই বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়।

এল ১৯৭২ সাল। আবার বিধানসভার নির্বাচন। এবার আর শাসক কংগ্রেস ভুল করল না। খুন, জখম, সন্ত্রাস, হামলা, গুণ্ডামি করে, রিগিংয়ের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করল। সাধারণ মানুষ ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। শাসক কংগ্রেস ক্ষমতায় এল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী। অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। শুরু হল আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বীভৎস, নগ্ন আক্রমণ। এই হিংস্র আক্রমণের শিকারে পরিণত হল গ্রামের অধিকাংশ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ। এই জেলায় গণ-আন্দোলনের তীব্রতা ছিল খুব বেশি। বিশেষ করে, গ্রামের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলন। তাই এখানে শাসক শ্রেণীর ঘাতকবাহিনীর হাতে সবচেয়ে বেশি মানুষকে আত্মদান করতে হয়েছে। প্রায় ২১২ জন মানুষকে শহিদ হতে হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে। অসংখ্য মানুষকে বিনা বিচারে কারাবরণ করতে হয়েছে। আর অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, ধর্ষণ তো প্রতিনিয়তই ছিল। একদিকে গুণ্ডাবাহিনী, অন্য দিকে পুলিশ-সি আর পি-র অত্যাচার। এই আক্রমণের বড় শিকারে পরিণত হয়েছে জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। আউসগ্রাম, কাঁকসা এলাকার জঙ্গলমহলে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ চালাত। বাড়িতে যা-কিছু থাকত সব লুঠ হত। এমনকি হাঁস, মুরগি, ছাগল পর্যন্ত। আদিবাসী রমণীদের ওপর নির্বিচারে ধর্ষণ করা হত। যাদের মনে হত প্রতিবাদী, তাদের পাইকারি হারে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হত। প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষকে বিনা বিচারে সে দিন হাজতবাস করতে হয়েছে। এই পৈশাচিকতার হাত থেকে হাজার হাজার মানুষ নিজের বাসভূমি ছেড়ে দিয়ে বীরভূম, দুমকার দিকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের ভিতর থেকে মাথায় একটা পুঁটলি নিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাত ধরে সারিবদ্ধভাবে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোনও শান্তিপূর্ণ জায়গার সন্ধানে চলে যাচ্ছে। গতরই তাদের পুঁজি। তাই যেখানেই যাবে গতর খাটিয়েই তারা বেঁচে থাকবে। তবে যদি কোনোদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে তবে তারা আবার ফিরে আসবে। অত্যাচারের কাছে তারা মাথা নত করবে না। যে অধিকার তারা পেয়েছিল তা ছিনিয়ে নিয়েছে শুধু নয় তার জন্য অনেক কঠোর শাস্তিও পেতে হয়েছে। তাই তাদের দৃঢ় প্রত্যয় অন্ধকারের কালো হাতের বিরুদ্ধে তারা যেখানেই থাকুক সংগ্রাম করবে। হরণ করা অধিকারকে ছিনিয়ে আনবে।

এল ১৯৭৭ সাল। কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্রেসের পতন হয়েছে। ফিরে এসেছে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু হল এ রাজ্যে দিনবদলের পালা। 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ' আজ গর্তে ঢুকেছে। বিগত রক্তমাখা অন্ধকার দিনের অবসান হয়েছে। বামফ্রন্ট সমাজের গরিব শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থে সরকার পরিচালনার অঙ্গীকার করল। সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ তফসিলি জাতি-উপজাতি মানুষের স্বার্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। জমি, মজুরি, বর্গা রেকর্ড, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির প্রতিষ্ঠা, তা ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাপ্রসূত বামফ্রন্ট সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছরে এই জেলার সামগ্রিক সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। এই জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মনেও নতুন জীবনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ২০ বছরের বামফ্রন্ট শাসনকালে উদ্বৃত্ত খাস জমির একটা বড় অংশই এদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মজুরি জেলার বেশির ভাগ এলাকাতেই আদায় হয়েছে। সেচের প্রসার, কৃষির ক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতায় জন্য কৃষির বিকাশ ঘটেছে। জেলায় ৬০ ভাগ জমিতে দুটি ফসল এবং ২৫/৩০ ভাগ জমিতে ৩টি করে ফসল উৎপাদন হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকাজে শ্রমদিবস বেড়েছে অন্য দিকে মজুরিও বেড়েছে। তা ছাড়া পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়ন

প্রকল্পের বেশির ভাগ অর্থ শ্রমনির্ভর। তাই সেখানেও বেড়েছে কাজের সুযোগ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। যদিও আরও অগ্রগতি প্রয়োজন ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির অভাবজনিত কারণে যথোচিতভাবে কর্মসূচি রূপায়ণে ঘাটতি লক্ষ্যণীয়। এ ব্যাপারে একটি খতিয়ান এখানে উল্লেখিত হল।

সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প

(আই টি ডি পি)

বর্ধমান জেলা

* **সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন এলাকা :** ৮টি থানার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল
* **থানাগুলির নাম :** আউসগ্রাম, বুদবুদ, কাঁকসা, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, বরাবনী, সালানপুর
* সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা—২টি
* জেলার মোট ব্লকের সংখ্যা—৩১টি
* প্রকল্পের আওতাভুক্ত ব্লকের সংখ্যা—৭টি
* প্রকল্পাধীন ব্লক :

ব্লকের নাম		আই টি ডি পি নং
আউসগ্রাম-১ ও ২, কাঁকসা, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, বুদবুদ,	—	৩০
আসানসোল, সালানপুর, বরাবনী	—	৩১

* প্রকল্পাধীন মৌজার সংখ্যা : ১৬৮
* প্রকল্প এলাকার মোট ভৌগোলিক আয়তন : ৫৯২.৯৫ বর্গ কিমি
* জেলার মোট আয়তনের হার : ৮.৪৪ শতাংশ
* জেলার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১) : ৬০,৫০,৬০৫
* জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১): ৩,৭৬০
* জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার হার : ৬.২১ শতাংশ
* প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১) : ৬৯,৪২০
* প্রকল্প এলাকার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১) : ৫৬,৪৫২
* প্রকল্প এলাকার মোট জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার হার : ৮১.৩২ শতাংশ
* জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার হার : ১৫.০১ শতাংশ প্রকল্প এলাকার আওতাভুক্ত।
* প্রকল্প এলাকায় আদিবাসী জনসংখ্যার মূলকর্মী : ৪৬.৩৬ শতাংশ
* আদিবাসী মূলকর্মীর :
  - কৃষিকর্মী – ১২.৩০ শতাংশ
  - ক্ষেতমজুর – ৭১.৩৮ শতাংশ
  - অন্যান্য – ১৬.৩২ শতাংশ
* প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠী : সাঁওতাল, কোরা, মুণ্ডা, ওরাঁও ও মাহালি
* জেলার মোট ল্যাম্পসের সংখ্যা : ৭টি
* জেলায় মোট আদিবাসী ছাত্র / ছাত্রীদের জন্য আশ্রম / হোস্টেলের সংখ্যা :
  - চলছে : ৯টি
  - নির্মীয়মাণ : ৫টি
  - অনুমোদিত : ৪টি
* জেলায় (১৯৯৫-৯৬) বছরে আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের (রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, স্কুলবাড়ি, ক্ষুদ্রসেচ ইত্যাদি) জন্য আর্থিক বরাদ্দ: ৭ লক্ষ টাকা।
* জেলায় বিশেষ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ: ৮.৩৮ লক্ষ টাকা
* জেলায় (১৯৯৫-৯৬) বছরে গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আর্থিক বরাদ্দ: ৬ লক্ষ টাকা।
* জেলায় (১৯৯৫-৯৬) বছরে আদিবাসীদের জন্য পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বরাদ্দ:

আর্থিক বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

লক্ষ্যমাত্রা	অনুদান	প্রান্তিক ঋণ	ব্যাঙ্ক ঋণ	মোট
৪,৪৫০	২২২.৫০	২২.২৫	২০০.২৫	৪৪৫.০০

আই টি ডি পি এলাকা (বর্ধমান উত্তর ও দুর্গাপুর মহকুমা)

* এলাকাধীন ব্লক: আউসগ্রাম, বুদবুদ, কাঁকসা, ফরিদপুর এবং দুর্গাপুর
* মৌজার সংখ্যা : ১১১
* এলাকার ভৌগোলিক আয়তন : ৪৬৮.৮১ বর্গ কিমি
* এলাকার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১) : ৪৩,৩১২ জন
* এলাকার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১) : ৩৩,৭৫৮
* এলাকার মোট জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা : ৭৭.৯৪ শতাংশ
* রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত : ০.৮৮
* এলাকার উল্লেখযোগ্য নদনদী : অজয়, দামোদর

এলাকার প্রধান ফসল : ধান, গম, আখ এবং বিভিন্ন ডাল

এলাকার মোট জমি	: ৪৬৮.৮১ হেক্টর	
কৃষিজমি	—	৪৪.০০ শতাংশ
বনভূমি	—	২৮.০০ শতাংশ
পতিত জমি	—	২২.০০ শতাংশ
কৃষিযোগ্য পতিত জমি	—	৬.০০ শতাংশ
এলাকায় সেচ-সেবিত জমির অনুপাত	—	২.০৩ শতাংশ
জমির প্রকৃতি	—	অসমতল, ঢালু পাথুরে জমি
খনিজ সম্পদ	—	কয়লা, পাথর
সমস্যা	—	সেচ, ভূমিসংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও চিকিৎসা।

আই টি ডি পি এলাকা (আসানসোল মহকুমা)

* এলাকাধীন ব্লক : আসানসোল, বরাবনী, সালানপুর
* মৌজার সংখ্যা : ৫৭
* এলাকার ভৌগোলিক আয়তন : ১২৪.১৪ বর্গ কিমি
* এলাকার মোট জনসংখ্যা (১৯৯১) : ২৬,১০৮ জন
* এলাকার মোট আদিবাসী জনসংখ্যা (১৯৯১) : ২২,৬৯৪
* এলাকার মোট জনসংখ্যার মধ্যে আদিবাসী জনসংখ্যা : ৮৬.৯২ শতাংশ
* রাজ্যের আদিবাসী জনসংখ্যার অনুপাত : ০.৬০
* এলাকার উল্লেখযোগ্য নদনদী : অজয়, দামোদর

এলাকার প্রধান ফসল	: ধান, গম, মেজ ও সবজি	
এলাকার মোট জমি	: ১২,৪১৪ হেক্টর	
কৃষিজমি	—	২০.০০ শতাংশ
বনভূমি	—	২.০০ শতাংশ
পতিত জমি	—	৬১.০০ শতাংশ
কৃষিযোগ্য পতিত জমি	—	৭.০০ শতাংশ
এলাকায় সেচ-সেবিত জমির অনুপাত	—	৭.০৪ শতাংশ
জমির প্রকৃতি	—	রুক্ষ, অসমতল, পাথুরে
খনিজ সম্পদ	—	কয়লা, পাথর

সেচ, ভূমি সংরক্ষণ ও সংস্কার, পানীয় জল, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও সমস্যা আছে। এগুলির ক্ষেত্রে বর্তমান বছরে অনেক বেশি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছরে অনেকটাই ঘাটতি পূরণ হবে।

জেলায় আদিবাসী জনগণের উন্নয়ন-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের তদারকি করার জন্য জেলা স্তরে একটি জেলা মঙ্গল কমিটি আছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি এই কমিটির

স্থায়ী সভাপতি। আবার জেলা মঙ্গল কমিটির মতোই প্রতি পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি ব্লক মঙ্গল কমিটি আছে। এই দপ্তরের কাজকর্ম এই কমিটিতে অনুমোদনসাপেক্ষে হয়ে থাকে। জেলা স্তরে এই কমিটির কাজ বেশ সক্রিয়, কিন্তু ব্লক স্তরে এই কমিটির সভা করার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে। তবে এই দপ্তর শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, ভূমিসংস্কার, সার্টিফিকেট প্রদান ইত্যাদি কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আশ্রম ছাত্রাবাস ও প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করা হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই কেনার অর্থ, আবশ্যিক ফি, গ্রন্থাগার বাবদ ফি ও ভরণপোষণ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এই সব সুযোগ-সুবিধা থেকে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য পঞ্চায়েত থেকেও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও আর্থিক দিক দিয়ে সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারি নির্দেশ যাতে ঠিকমতো কার্যকরী হয় তার জন্য জেলা মঙ্গল কমিটি ও বিভিন্ন স্তরের কমিটির সদস্যগণ, পঞ্চায়েত, পৌরসভা সব সময়েই সজাগ থাকে। আদিবাসী যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা অনুদান পেয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে ঋণ ও অনুদানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সব কর্মসূচির জন্য আদিবাসী পরিবারের অনেকেই আজ কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় জীবন-জীবিকার উন্নতমানের স্বার্থে সেচ, বৃক্ষরোপণ, জমির সংস্কার, কুটিরশিল্প, প্রাণিসম্পদের

বিকাশ, রেশন দ্রব্য, ল্যাম্পস-এর কাজ ও বিভিন্ন ধরনের ত্রাণের কাজ যাতে ঠিকমতো করা যায় তার জন্য সমস্ত দিক থেকেই নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। জেলার প্রায় অধিকাংশ আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকে সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প চালু রয়েছে। এর কাজ বেশ সন্তোষজনক।

এই জেলায় ১৯৯০ সাল থেকে সাক্ষরতার কাজ চলছে। জেলায় এই প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। সাক্ষরতার অভিযানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আগ্রহ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ফলে এই স্তরের মানুষদের একটা ব্যাপক অংশই সাক্ষর-সম্পন্ন হতে পেরেছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। জেলা সাক্ষরতা সমিতির পরিচালনায় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এই জেলায় খুব পরিকল্পিতভাবে হয়ে থাকে। প্রায় এক মাস ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিযোগিতায় আদিবাসী ঘরের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ বিশেষভোবে উল্লেখযোগ্য এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গান, নৃত্য, কাঠিনাচ, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এদের নিষ্ঠা, দক্ষতা সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই দপ্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর সেমিনার, কর্মশালা, উৎসব, অনুষ্ঠান গ্রাম স্তর পর্যন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। অগণিত পুরুষ-মহিলারা এই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে এবং শিল্প-সংস্কৃতির আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। সরকারি পরিকল্পনার বাইরে এই কাজে সারা ভারত কৃষকসভার বর্ধমান জেলা কমিটি ধারাবাহিকভাবে জমি, মজুরি ইত্যাদি অর্থনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি ক্রীড়া-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই সব বঞ্চিত মানুষদের জীবন-বিকাশের প্রক্রিয়াটি ১৯৮৭ সাল থেকে করে চলেছে। কৃষকসভার সংগঠন থেকেও এ ব্যাপারে আলোচনাচক্র, কর্মশালা, উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতার কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ৩০ জুন তারিখের 'হুল' উৎসব সমস্ত এলাকাতেই পালিত হয়ে থাকে। মহাসমারোহে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে শুধু আদিবাসী সম্প্রদায়েই নয়—অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরাও বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর গান, নাটক ইত্যাদি পরিবেশন করে থাকে।

খেলাধুলার আসরেও এরা বেশ ভাল জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বর্তমানে পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার আজ অভূতপূর্ব পরিবর্তন স্বীকার করতেই হবে। যদিও অনেক কিছুই করার রয়েছে। তবে হাজার হাজার বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে এরা আজ মুক্ত হচ্ছে। আজ এদের অধিকারবোধ জেগেছে এবং তাকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে। এ রাজ্যের বামফ্রন্ট অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সমস্ত রকম সহযোগিতা করে চলেছে।

এই জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অতীত অপেক্ষা বর্তমান বিশেষ করে, বামফ্রন্টের ২০ বছরে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে তার পুরোপুরি একটি পরিসংখ্যান দিলে চিত্রটা আরও পরিষ্কার হত। কিন্তু তা সম্ভব হল না। সে ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি। তবে দু-একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় উন্নয়নের বিষয়টি। যেমন—আউসগ্রাম ১নং ব্লকের অন্তর্গত যাদবগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের, সেখানে প্রায় ২০০ একরেরও অধিক জমি যার সবটাই প্রায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সেখানে কোনও সেচের ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে একটি গভীর নলকূপ ও অসংখ্য ইন্দারা খননের মাধ্যমে বছরে দুটি ফসল নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া ক্যানেলের জলও আছে। সেই সব ডাঙা জমি সংস্কারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। দুটি বিশাল পুকুর খনন করা হয়েছে। পুকুরপাড়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ ও পুকুরে মৎস্যচাষ হচ্ছে। ওই এলাকায় কিছু 'মহলী' সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। তারা মূলত বাঁশ ও বেতের কাজ করে। তাদের প্রত্যেককে অনুদান দিয়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও লাভজনক করা হয়েছে। একটি কমিউনিটি সেন্টার এবং সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। প্রাইমারি স্কুল-সংলগ্ন একটি আশ্রম হোস্টেল আছে। সেখানে ৫০ জনেরও বেশি ছাত্র হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। একটি সরকারি অনুমোদিত জুনিয়র হাইস্কুল আছে। যার ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রীই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। স্কুল-সংলগ্ন একটি সুন্দর খেলার মাঠ, অসংখ্য বৃক্ষশোভিত পরিবেশটি সবার কাছেই আকর্ষণীয়। অতীতের দারিদ্র্য, বঞ্চনা, সামাজিক নিপীড়ন থেকে আজ তারা মুক্ত। এখানকারই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ধনেশ্বর সোরেন দীঘনগর (২) গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। পাশেই লক্ষ্মীগঞ্জ গ্রাম। বেশির ভাগ মানুষই আদিবাসী। তাই বাহামনি সোরেন নামে এক মহিলা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। এখানকার আর্থ-সামাজিক সমস্ত স্তরেই উন্নয়নের দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয় এই জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থাটা।

আমাদের দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে বুনো, জংলি ইত্যাদি আখ্যা আজও দেওয়া হয়ে থাকে। আদিবাসীদের যে একটা সংস্কৃতি আছে, যার মধ্যে সহজ,

সরল, সভ্যতা বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে কোনও সশ্রদ্ধ ধারণা সাধারণত আধুনিক ভারতীয়রা মনে করেন না। অবশ্য তাঁরা খোঁজও রাখেন না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আর্য সভ্যতার বহু পূর্বেই এদের আবির্ভাব। নৃতাত্ত্বিকদের মতে এরাও বহিরাগত। তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করলে আদিবাসীরাই যে এ দেশের বনিয়াদী অধিবাসী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মানুষরা ভারতীয় সমাজের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকার কথা বললেও তা সত্য নয়। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য যতগুলি সংগ্রাম হয়েছে সেই সব সংগ্রামে এদের অংশগ্রহণকে অস্বীকার করা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরত্বপূর্ণ ও আত্মত্যাগের ইতিহাসকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা কারও নেই। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিতে বামফ্রন্ট একে যথাযথভাবে মর্যাদা দিয়ে আসছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর শহিদ 'সিধু-কানু'-র নামে কলকাতায় সিধু-কানু ডহর। সিউড়িতে সিধু-কানু চর্চাকেন্দ্র, আমাদের জেলায় ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে 'সিধু-কানু' স্টেডিয়াম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অবশ্য এ রাজ্যের সাহিত্যিক, ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস, সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীগুলিকে নিয়ে সেমিনার, কনভেনশন ইত্যাদি করা হচ্ছে। বর্তমানে এ রাজ্যে একটি অনুকূল গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। অধিকারবোধ বেড়েছে। চাহিদাও বাড়ছে। এ চাহিদা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইবে। তাই ঝাড়খণ্ড, হড় সমাজ, বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রতি মুহূর্তে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছে। আমাদের জেলাতেও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোবল দিচ্ছে। প্রশাসন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা এ ব্যাপারে সদা সতর্ক রয়েছে। তবুও এদের উন্নয়ন, জীবন-বিকাশ, এদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলিকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরও নজরদারি বাড়াতে হবে। সামাজিক দিক দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে এই জনগোষ্ঠীর বুকের ওপর যে শোষণ-নিপীড়নের জগদ্দল পাথরটা চাপানো রয়েছে তাকে সরানোর পরিকল্পনা এ রাজ্যে চলছে। আমাদের জেলায় সেই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে করে যেতে হবে।

বর্ধমান জেলার সাহিত্য : প্রাচীন যুগ থেকে

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধের শিরোনামের একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এখানে সাহিত্য বলতে আমরা বুঝব বাংলা সাহিত্য। প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যের একটা পরিচয় আমাদের জানা আছে। সে সাহিত্যকে জেলাভিত্তিক ভাগ করে দেখা যায় কিনা বা দেখা উচিত কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। বর্ধমান জেলার সাহিত্য, হুগলি জেলার সাহিত্য, এভাবে বাংলা সাহিত্যকে ভাগ করা কঠিন। বাংলা সাহিত্য একটা প্রবল স্রোত। সে স্রোতে বিভিন্ন জেলার জল মিশেছে। মিশে একাকার হয়ে গেছে। জলের রং চেনা সহজ নয়, স্বাদ পাওয়াও দুষ্কর। তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ থেকে বর্ধমানের ভূমিকা-প্রসঙ্গও এসে যায়। এখন চেষ্টায় নামি।

বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। যদিও উদ্ভবকাল দশম শতাব্দী দেশ, কাল, ভাষা, জাতি সম্পৃক্ত সাহিত্যই যথার্থ সাহিত্য। সে সাহিত্য মুসলমান শাসনকালে অর্থাৎ মধ্যযুগে বাংলাদেশে পাওয়া গেল। তার আগের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের খনিগর্ভ থেকে তোলা বস্তু মাত্র। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যে বাংলা সাহিত্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা মূলত বর্ধমান জেলার সম্পদ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বড় মাপের কবি বর্ধমান জেলার। যেমন, মালাধর বসু, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, জ্ঞানদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস, নরহরি দাস, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু, গোবিন্দ দাস, রূপরাম চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।

এই প্রাচীন কবিদের দিকে লক্ষ রেখে আমরা বর্ধমান জেলার সাহিত্য পটভূমির দুটি দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার দুটি নদীর কথা ভাবতে হবে—একটি দামোদর, অন্যটি গঙ্গা। বর্ধমান জেলার প্রধান নদী দামোদর। গঙ্গা বর্ধমান জেলার উত্তর পূর্বে। বর্ধমান জেলাকে যদি এই দুটি নদী-কেন্দ্রিক ভূস্থানে ভাগ করি তাহলে দেখব পুরনো বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এই দুটি ভাগকে উত্তর বর্ধমান ও দক্ষিণ বর্ধমান রূপে দেখা যেতে পারে। বর্ধমানের উত্তরে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয় পাই মধ্যযুগে তা মূলত পরিশীলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি। তা অনেকটা 'আরবান'। আর দক্ষিণ দামোদরে বা দক্ষিণ বর্ধমানে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি দেখি তা মূলত আটপৌরে, গ্রাম্য। বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য জীবনী ও কীর্তন গান বাঙালির পরিশীলিত সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচায়ক। তার ভৌগোলিক পরিবেশ উত্তর বর্ধমান। আর চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের দক্ষিণ বর্ধমান। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বর্ধমানের পরিশীলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি যার নাম দিতে পারি বৈষ্ণব সংস্কৃতি তা গড়ে উঠেছিল শ্রীখণ্ড কাটোয়া, কাঁদড়া, অগ্রদীপ, কালনাকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চল গঙ্গাবাহিত। মধ্যযুগে উত্তর বর্ধমানে বৈষ্ণব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে গঙ্গা নদীর ধারে ধারে। এই গঙ্গার তীর ধরেই মধ্যযুগে কীর্তন গানের বিকাশ। কীর্তন গানের যে তিন প্রধান ঘরানা মনোহরশাহী কীর্তন, রেনেটি বা রানীহাটি কীর্তন ও গড়াহাটি বা গরাণহাটি কীর্তন—তা গঙ্গাবাহিত তিনটি অঞ্চল থেকে গড়ে উঠেছে। মনোহরশাহী কীর্তন কাটোয়া অঞ্চলের, রেনেটি কীর্তন কালনা অঞ্চলের এবং গড়াহাটি কীর্তন আদি গঙ্গার তীরে, কলকাতায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে রায়ের প্রাচীন সংস্কৃতি-সম্পদ কীর্তন গান একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ বর্ধমান অর্থাৎ দামোদরবাহিত অঞ্চল কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন গানের ভূস্থান নয়। বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্য জীবনীও এভাবে উত্তর বর্ধমানের বিশিষ্ট সম্পদ। দামোদরের দক্ষিণে এই সাহিত্যের বিকাশ ঘটেনি। ঘটেছে গ্রাম্য সাহিত্যের—চণ্ডীমঙ্গলের, ধর্মমঙ্গলের।

এখন পরিশীলিত ও গ্রাম্য সাহিত্য বলতে কী বুঝি তার দুটি উদাহরণ দিই।

পরিশীলিত সাহিত্য : বৈষ্ণব পদাবলী
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
গ্রাম্য সাহিত্য : মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল
নগর বার্য়াতে নারি সত্যে মরি লাজে।
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগ দেখি লোক গজে॥

এই দুটি উদাহরণের ভাব ও ভাষা লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও ভাষা বিশিষ্টভাবে 'আরবান্'। যেমন রবীন্দ্রনাথের। আর চণ্ডীমঙ্গলের ভাব ও ভাষা খাঁটি রেঢ়ো। বর্ধমানের দু অঞ্চলের এই যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য তা ভেবে দেখার মতো।

নদীর দিক দিয়ে দেখলে গঙ্গা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তথা উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির মূল নদী। দামোদর অন্ত্যজ শ্রেণীর। দামোদর অঞ্চলের শাখা নদীগুলিও অন্ত্যজ শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু রাজা হলে অভিষেকের সময় তার মাথায় দেওয়া হয়েছিল কংস নদীর জল। এই নদী এখন মজে গেছে। বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের ওপর দিয়ে এই নদী বয়ে গিয়েছিল। মজা নদী এখনও স্পষ্ট। কবি ব্রাহ্মণ হয়েও ব্যাধের রাজ্যাভিষেকে অন্ত্যজ-সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন।

পুরনো বাংলা সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা—বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যকে আমি 'জানপদী সাহিত্য' বলতে ইচ্ছুক। এই শ্রেণীর কাব্যগুলিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট জনপদের জীবন, ভাষা, সমাজ, কাল ব্যক্ত। বাংলা দেশের বিশিষ্ট ছবি প্রথম এইসব কাব্যে ধরা পড়েছে। 'মঙ্গলকাব্য' বলে এইসব বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্যকে একটু ধর্মের কোঠায় ঠেলে দেওয়া হয়। তাই জানপদী সাহিত্য বলাই ভালো। আগেই বলেছি বৈষ্ণব সাহিত্য উত্তর বর্ধমানের বিশিষ্ট সম্পদ। এই অঞ্চলে জানপদী সাহিত্য অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য তেমন রচিত হয়নি। তবে ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ কাহিনীর পটভূমি বর্ধমানের উত্তরে অজয়-প্লাবিত এলাকায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা এই অঞ্চলের নন। মধ্যযুগে উত্তর বর্ধমানে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে বিস্তার তার পেছনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ভৌগোলিক কারণ কিছু আছে কিনা দেখা যাক। ভৌগোলিক দিক দিয়ে নবদ্বীপ ও গৌড় উত্তর বর্ধমানের কাছাকাছি। নবদ্বীপ চৈতন্যের জন্মস্থান আর গৌড় সেকালের নগর-রাজধানী। এই দুটি স্থানের সঙ্গে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের বিশেষ যোগাযোগ ছিল। ভক্তির দিক দিয়ে নবদ্বীপ ও রাজ সম্পর্কের দিক দিয়ে গৌড়। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের অনেকেই রাজবৈদ্য ছিলেন। এই ভক্তি-যোগ ও নগর-রাজ-যোগ শ্রীখণ্ডে ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে এক নবীন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এই বৈষ্ণবদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ধনী ব্যবসায়ী শিষ্যরা। ফলে এক পরিশীলিত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের সঙ্গে বিদ্যাচর্চা সূত্রে নবদ্বীপ ও মিথিলার যোগ ঘটে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী এই বিদ্যাচর্চার পথে নবদ্বীপে ও পরে শ্রীখণ্ডে আসে বিদ্যার্থীদের দ্বারা। অদূরে জয়দেবের প্রভাব তো রয়েইছে। এভাবে দরবারী সাহিত্যের ছোঁয়া লাগে উত্তর বর্ধমানে। যার সার্থক প্রকাশ বৈষ্ণব সাহিত্যে। এ সাহিত্য প্রেম-ভক্তি-সুন্দরের।

মধ্যযুগে দক্ষিণ বর্ধমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রেমের নয়, ভক্তির নয়, সুন্দরের নয়, অনির্বচনীয় সঙ্গীতের নয়। তা একান্তভাবে গার্হস্থ্য জীবনরসের। সেখানে জীবনে খাওয়া পরার সমস্যা আছে, কোন্দল আছে, সতীন-সমস্যা আছে, শাপ-শাপান্ত আছে, বশীকরণের ওষুধ আছে, পঞ্চ ব্যঞ্জনের

আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতি আছে, পারিবারিক উৎসবের আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, ঠগ আছে, মিথ্যাবাদী আছে। আর আছে হাসি-কান্না। সব নিয়ে আটপৌরে বাঙালি-জীবন আছে। বাঙালির সংসার জীবন। এই জীবন-সংস্কৃতির রূপকার মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মূল কাঠামো গড়ে উঠেছিল বর্ধমান জেলার কবিদের হাতে। একদিকে গীতি-সাহিত্য অর্থাৎ পদাবলী, অন্যদিকে কাহিনী-সাহিত্য অর্থাৎ পাঁচালী। পদাবলীর অবলম্বন প্রেম রস, ভক্তি রস। পাঁচালীর অবলম্বন গল্প রস। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ গল্পরসের জোগান দিলেন বর্ধমান জেলার দু কবি—কুলীন গ্রামের মালাধর বসু ও দামুন্যার কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী। মালাধর গল্পরস নিয়ে এলেন পুরাণ থেকে আর মুকুন্দ নিয়ে এলেন বাস্তব জীবন থেকে। বর্ধমান জেলার কবি মালাধর বসু একটু অন্যরকম ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। মালাধরের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সাল-তারিখযুক্ত গ্রন্থ। ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থটি রচিত। এই এক কথা। অন্য গুরুত্ব হল, চৈতন্যের আবির্ভাবের ছ' বছর আগে মালাধরই প্রথম বাংলাদেশে কৃষ্ণভক্তির ঢেউ জাগান। মালাধর বসুর গ্রন্থ পৌরাণিক পাঁচালী কাব্য। ভাগবত পুরাণ অনুসরণে লেখা। যে কৃষ্ণকথা সংস্কৃত ভাগবত পুরাণে লিপিবদ্ধ ছিল তাকে লোকভাষায় অর্থাৎ বাংলাভাষায় তিনি প্রচার করেন। বাংলাদেশে পুরাণ কাহিনী প্রচারে এবং সাধারণ মানুষকে লোকশিক্ষা দেবার জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করেন বর্ধমান জেলার এই কবি। মালাধর বলেছেন,

ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে।
লোকভাষা রূপে কহি সেই সে কারণে॥

বাংলাভাষার প্রতি কবির এই টান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো। আরও একটা কথা। তুর্কী আক্রমণের পর ভীত-সন্ত্রস্ত হতোদ্যম বাঙালিকে জাগিয়ে তোলার জন্যে মালাধর সম্ভবত হিন্দু ঐতিহ্যের পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনীকে টেনে এনেছিলেন। এবং মনে রাখতে হবে তিনি ভাগবতের কৃষ্ণের বীরত্বের কাহিনীগুলিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। বাঙালি এই প্রথম বীররসের আস্বাদ পেল। এই বীররসই জাতীয় জীবনে উন্মাদনা আনতে পারে। অনেকটা এই ধরনের কাজই করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনকালে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায়। দু যুগের এই দুই সাহিত্যিকের একটা অন্যরকম মিলও আছে। দুজনেই ছিলেন রাজসম্পর্কযুক্ত। মালাধর গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণিরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। এ তাঁর রাজযোগের ফল। আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ইংরেজ সরকারের ডেপুটি। দুজনেই শাসকের দিকে না তাকিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। বর্ধমানের কুলীন গ্রামের কৌলীন্য তাই আলাদা।

ভাগবতের প্রচারে যেমন ব্রতী হলেন মালাধর বসু তেমনই মহাভারতের প্রচারে কৃতিত্ব দেখালেন বর্ধমান জেলার কবি কাশীরাম দাস। মহাভারত অনুসরণে বাংলায় অনেক কবি কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু কাশীদাসী মহাভারত যে রকম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা আর কোনও মহাভারত কাব্য করেনি। মধ্যযুগে পুরাণ-ইতিহাস প্রচারে বর্ধমান জেলার ভূমিকা বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল।

পৌরাণিক কাহিনীর বাইরে এসে দক্ষিণ দামোদরের কবিরা রূঢ় বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনায় ব্রতী হলেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় মাপের কবি হলেন দামুন্যার মুকুন্দ চক্রবর্তী। মুকুন্দের কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'। কাব্যটিতে রোমান্সের কোনও ঠাঁই নেই, কোনও বড় আদর্শের প্রচার নেই, বড় মাপের চরিত্র নেই। আছে জীবনাশ্রয়ী সাধারণ বাঙালি। এই বাঙালি রূঢ় বাস্তববাদী, স্বপ্নবিলাসী নয়। গার্হস্থ্য জীবনই এই কাব্যের কাহিনীর অবলম্বন। তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি মুকুন্দের বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালির জীবন সমস্যা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আধুনিক কালের উপন্যাস ছাড়া আর কোনও সাহিত্যকর্মে পাওয়া যাবে না। মুকুন্দের কাব্যে জোর পড়েছে নারীর ওপর। বাঙালি সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী। ভালোবাসাতেও নারী, কোন্দলেও নারী, রন্ধনেও নারী, পরামর্শেও নারী। মুকুন্দের কাব্যে দেবতা কথায় নারী, সংসার কথাতেও নারী। নারী সংসারের খুঁটি-নাটি বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। নারী-সমস্যা রূপায়ণেও কবি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেকালে সতীন-সমস্যা ছিল একটি সামাজিক সমস্যা। কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ও ধনপতি-খুল্লনার কাহিনীতে এই সামাজিক সমস্যাটিকে কবি রূপায়িত করেছেন এমনভাবে যে কাব্যটিকে মধ্যযুগের একটি সামাজিক দলিল হিসাবে গণ্য করা যায়। কাব্যটিতে সেকালের হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের নিখুঁত চিত্র আছে। বাংলা দেশের প্রকৃতি ও মানুষের এমন পরিপূর্ণ ছবি অন্যত্র সহজলভ্য নয়। দরিদ্র ও শোষিত মানুষের ছবি বাস্তবে ও রূপকে এমন করে কেই বা এঁকেছেন? কবি জীবনের রূপকার। মধ্যযুগে এই বাস্তব কাহিনীর মধ্যেই আধুনিক উপন্যাসের বীজ খুঁজতে হবে। বর্ধমান জেলাতেই এই বীজ উপ্ত হয়েছিল।

মধ্যযুগে বর্ধমান জেলার আর এক সাহিত্য গৌরব হল চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ। বাংলায় প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ রচনা করলেন দেনুড়ে বৃন্দাবন দাস। আর তিন প্রসিদ্ধ কবিও—জয়ানন্দ-লোচন-কৃষ্ণদাস—বর্ধমান জেলার। চৈতন্য আবির্ভূত হলেন নদিয়া জেলায় নবদ্বীপে। আর বাংলায় তাঁর জীবনী রচিত হল বর্ধমান জেলায়। নদিয়ায় হল না। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। আর এই জীবনী রচিত হল উত্তর বর্ধমানে, দক্ষিণে নয়। বর্ধমানে এ এক নব্য সাহিত্য। এই প্রথম কোনও এক জীবিত মানুষকে নিয়ে সাহিত্য। চৈতন্যের জীবন জীবনী হয়ে উঠেছিল। সে জীবন ছিল ৪৮ বছরের।

তাঁর প্রথম ২৪ বছরের জীবন নবদ্বীপ-জীবন; শেষ ২৪ বছরের জীবন নীলাচল-জীবন। প্রথম ২৪ বছর সামাজিক জীবন, শেষ ২৪ বছর দিব্যজীবন। একটি মানুষ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, অধ্যাপনা, সামাজিক নৃত্য ও অসাধারণ সন্ন্যাস ব্রতে বাঙালিকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন সব একাকার হয়ে গিয়ে এক নবীন বাঙালির জন্ম হল। বাঙালির কর্ম ও ধর্ম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ল। জীবন ইতিহাস হয়ে গেল। এই জীবনীর সার্থক রূপকার বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস। নবদ্বীপে চৈতন্যের ভক্ত-অনুরাগীর অভাব ছিল না। কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁর জীবনী নবদ্বীপে বা নদিয়ায় লেখা হয়নি। কেন? বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে জানতে পারি যে চৈতন্যের জীবৎকালেই বৈষ্ণবদের মধ্যে বেশ দলাদলি বেঁধে গিয়েছিল। চৈতন্য নীলাচল চলে গেলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ। অদ্বৈত থাকতেন নদিয়ায় শান্তিপুরে; আর নিত্যানন্দ রাঢ় অঞ্চলে ও অন্যত্র। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরোধ ছিল তা চৈতন্যও জানতেন। কেননা, অদ্বৈত এক হেঁয়ালি ছড়ায় তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পুরীতে অবস্থানরত চৈতন্যকে। পুরী যাবার পর নবদ্বীপে চৈতন্য মহিমা কি ফিকে হয়ে গিয়েছিল? প্রথম জীবনে শাক্ত অদ্বৈত কি একটু সরে এসেছিলেন? অথবা, স্মার্ত পণ্ডিত ও শাক্তরা নবদ্বীপে চৈতন্যের অনুপস্থিতিতে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন? এ সবই অনুমান। চৈতন্য জীবনী রচিত হল বর্ধমানে। প্রধানত নিত্যানন্দ শিষ্য বৃন্দাবন দাসের দ্বারা আর খানিকটা শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের প্রভাবে। নরহরির সঙ্গে গৌড় দরবারের যোগ ছিল। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী গৌড় দরবারে ছিলেন। পরে চৈতন্যের আদেশে বৃন্দাবন চলে যান। সেই বৃন্দাবনে বসে রূপ-সনাতনের 'পদে যার আশ' সেই কৃষ্ণদাস মহাগ্রন্থ রচনা করলেন 'চৈতন্যচরিতামৃত'। বর্ধমান জেলার ঝামটপুরের পণ্ডিত-কবি। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ রচনায় এভাবে নবদ্বীপের নদিয়ার পরিবর্তে বর্ধমানের প্রাধান্য ফুটে উঠল।

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চায় বর্ধমানের বৈষ্ণব পাটগুলির অবদানও কম নয়। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল কালনার অদূরে বাঘনাপাড়ার পাট। জাহ্নবা-শিষ্য রামচন্দ্র গোস্বামী এই পাটের কেন্দ্রীয় পুরুষ। কালনার কাছেই পিয়ারি-নগরেও বৈষ্ণব পাট গড়ে উঠেছিল। অগ্রদ্বীপ ও ঝামটপুরের পাট ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দেনুড়ের পাট বৃন্দাবন দাসের জন্যে খ্যাত। শ্রীখণ্ড ছিল সম্ভবত কেন্দ্রীয় পাট। এই পাটের মুখ্য ভক্ত নরহরি দাস—যিনি 'সরকার ঠাকুর' রূপে পরিচিত ছিলেন—সেকালে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। গৌড়ের দরবারের সঙ্গে এঁর যোগ ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে নরহরির ভূমিকা বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল। চৈতন্যতত্ত্ব ও মহিমাকে শুষ্ক সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে না রেখে 'গৌর-নগরী' ভাবের প্রবর্তন করে নরহরি চৈতন্যলীলাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর শিষ্য লোচন দাসের কৃতিত্বও কম নয়। এভাবে বর্ধমান জেলা থেকেই চৈতন্য কথায় এক নতুন ভাবের উদ্ভব ঘটে।

পুরনো বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল শাখা বৈষ্ণব পদাবলী। বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস শুরু দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের হাতে। তা সংস্কৃতে রচিত। খাঁটি বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসের হাতে। এই সময় আর একটি স্রোত এসে মিশেছিল পদাবলীতে মিথিলা থেকে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। পদগুলির ভাষা ব্রজবুলি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেখছি বৈষ্ণব পদাবলী ত্রিভাষাবাহীর পরিবর্তে দ্বিভাষাবাহী হয়ে দাঁড়াল—বাংলা ও ব্রজবুলি। আমরা আগেই বলেছি বৈষ্ণব পদাবলী পরিশীলিত সাহিত্য, এক ধরনের 'আরবান্' কবিতা। এই আদর্শ তৈরি করেছিলেন প্রধানত জয়দেব ও বিদ্যাপতি। চণ্ডীদাস গভীর প্রেমের কবি। কিন্তু সে প্রেম বিদ্যাপতির মতো উজ্জ্বল নয়। চণ্ডীদাস মূলত পল্লীকবি। বৈষ্ণব পদাবলীর এই ত্রিস্রোত ষোড়শ শতাব্দীতে এক নতুন পথবাহী হল বর্ধমান জেলার কবি জ্ঞানদাসের হাতে। পরে দার্শনিক ও নান্দনিক মর্যাদা পেল এই জেলারই আর এক কবির হাতে। তিনি হলেন গোবিন্দদাস। এই দুই কবির 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা' ছিল। জ্ঞানদাস বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এক জায়গায় মিশেছে। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির নব আবির্ভাব। বস্তুতপক্ষে বর্ধমান জেলা থেকে পদাবলীর এক নবীন যাত্রা শুরু হল। জ্ঞানদাস কিভাবে যাত্রা শুরু করলেন তার একটু নমুনা দেওয়া যাক।

> রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
> প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
> হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
> পরাণ পুতলি লাগি. থির নাহি বান্ধে॥

জ্ঞানদাসের এই পদে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সম্মিলন। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' অংশে বিদ্যাপতি, 'গুণে মন ভোর' অংশে চণ্ডীদাস। আবার 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' অংশে বিদ্যাপতি, 'হিয়ার পরশ...মোর কান্দে' অংশে চণ্ডীদাস। এবার চৈতন্যভক্ত কবির আর্তি—'পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বান্ধে।' অতঃপর বৈষ্ণব পদাবলী কী হবে তা যেন ঠিক করে দিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসের পদাবলীর ভাব ও ভাষা (বাংলা ও ব্রজবুলি) একান্তভাবেই 'আরবান্'। রবীন্দ্রনাথের মতো। গোবিন্দদাস এরই সঙ্গে তাঁর বৈদগ্ধ্য মিশিয়েছেন—যদিও তাঁর ভাষা-পথ ব্রজবুলি। এভাবে বর্ধমান জেলার উত্তরে এক 'আরবান্' সাহিত্যের জন্ম হল। এরই উত্তরসূরি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ।

বৈষ্ণবের কথা এসে গেলেই শাক্তের কথা এসে যায়। বৈষ্ণব কবিতার এক অনির্বচনীয়তার আস্বাদ। তার সঙ্গে প্রেম ভক্তি মিশেছে। শাক্ত পদাবলী মূলত ভক্তের আকুতি। বিশেষত

বর্ধমান জেলার কালনার শাক্ত কবি কমলাকান্তের। তবে বৈষ্ণব কবিতায় বর্ধমানের যে গৌরব তা শাক্ত পদাবলীতে নয়।

আধুনিক যুগে নামবার আগে আমরা যদি মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখব সে সাহিত্য সাম্প্রদায়িক ছিল না। বাংলা সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যের চর্চা হয়েছিল পুরো মুসলমান শাসনকালে। শাসক জোর করে সব কিছু বন্ধ করে দেননি। রামায়ণ-ভাগবত-মহাভারত চর্চা নির্বিরোধে হয়েছিল। মুসলমান কবিরাও বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে পাচ্ছি, রামকথা শুনতে শুনতে যবনেরাও কাঁদছে। চৈতন্যকে কাজী বলেছেন, 'নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় মোর নানা/সেই সূত্রে হও তুমি আমার ভাগিনা।' মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের এই ছিল সহজ পরিবেশ। তা প্রধানত চৈতন্যের গড়া। এই ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন বর্ধমান জেলার কবিরা।

।। দুই ।।

আধুনিককালে অর্থাৎ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলা থেকে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রবণতা আমরা লক্ষ করি :

(১) পত্র-পত্রিকা-প্রকাশন
(২) সাহিত্য সৃষ্টিতে রাজ-পোষকতা
(৩) বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন দিক উন্মোচন
(৪) রবীন্দ্র-কবিতার বাইরে নতুন হাওয়া—বিদ্রোহের সুর
(৫) পল্লীজীবন-প্রীতি
(৬) সাহিত্য গবেষণা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই ছটি দিকে বর্ধমান জেলার সাহিত্যিক-গবেষকের ভূমিকা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিককালে বাঙালি জীবনে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলেছে সংবাদপত্র ও সাহিত্য-পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের মূলে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাকে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। কী উনবিংশ শতাব্দীতে, কী বিংশ শতাব্দীতে। পত্র-পত্রিকাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে একটা সাহিত্যগোষ্ঠী। যেমন হয়েছিল বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, কল্লোল ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। সাম্প্রতিককালে এ ব্যাপারে 'দেশ' পত্রিকার কথাও স্মরণ করতে হবে। এই যে বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্ভাবনা ও গুরুত্ব তা প্রথম এদেশে যিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার লোক—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ করলেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'। দেশীয় ভাষায় এই প্রথম সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত বহড়া গ্রামে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই যে নবচিন্তা বিশেষত বর্ধমান জেলার এক গ্রামীণ মানুষের তা বিস্ময়কর। পত্রিকাটি হয়তো উচ্চাঙ্গের নয় বা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা তেমন গৌরবেরও নয় কিন্তু এই এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে মর্যাদা দিতেই হয়। পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এক 'ভোরের পাখি'।

সাহিত্য সৃষ্টিতে রাজ-পোষকতা এক পুরনো রীতি। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি মালাধর বসু, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আনুকূল্যে বৈষ্ণব সাহিত্য-শাস্ত্রের চর্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সবই সেকালের ব্যাপার। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ একালে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে ও প্রচারে বর্ধমান মহারাজাদের কৃত্য স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের বাংলা অনুবাদ বেশ ভালোই হয়েছিল। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ (১৮২০-১৮৭৯)। ইনি বহু কবি পণ্ডিতের পোষ্টা ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের যেমন অনুবাদ হয়েছিল তেমনি রাজমুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়ে তা বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। শুধু সংস্কৃত গ্রন্থ নয়, 'সেকেন্দর নামা', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তাই' ইত্যাদি ফারসি ও উর্দু কাহিনীর অনুবাদও হয়েছিল এবং সেগুলিও ছাপা হয়ে বিনামূল্যে বিতাড়িত হয়েছিল। মহাতাপচাঁদ নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। গান ও কবিতা রচনা করতেন আবার সভাকবিকে দিয়েও করাতেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৩০-৭০) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার পেছনে প্রতিস্পর্ধী হিসাবে ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ।

শুধু সাহিত্য সৃষ্টিই নয় এক নতুন ধরনের লিপির উদ্ভাবনেও তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই লিপির নাম ছিল 'মহতাবি লিপি'। এ লিপি 'নতুন কিছু করোর ফসল'। প্রচলিত হয়নি। লিপির বাইরে সংবাদপত্র প্রকাশেও মহারাজার ভূমিকা লক্ষ করবার মতো। তিনি ১৮৫০ সালে 'সংবাদ বর্ধমান' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

বর্ধমান রাজসভার আনুকূল্যে দক্ষিণ বর্ধমানের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ইনি মহারাজা কীর্তিচাঁদের আনুকূল্য লাভ করেন। কবি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এভাবে—

> মহারাজ কীর্তিচন্দ্র করিয়া কল্যাণ।
> শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।

ভারতচন্দ্রও বর্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এসব পুরনো কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে রাজ-প্রসঙ্গ এসে গেছে। দুর্গাচরণ রায়ের (১৮৪৭-৯৭) 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে বর্ধমান রাজ-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে বিবৃত। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ও সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ইংরেজের তৈরি কলকাতা নগরীর বাইরে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমানের

মহারাজাদের যে ভূমিকা তা দেশীয় মানুষের উজ্জ্বল কীর্তির স্বাক্ষর। বর্ধমান থেকে এ এক নতুন প্রেরণা।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস শুরু হল উনবিংশ শতাব্দী থেকে। প্রথম যথার্থ উপন্যাস সৃষ্টি হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশিত হবার পর বাংলা কথাসাহিত্যে একটা নতুন ঢেউ জাগল। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি সাধারণ বাঙালি জীবনের থেকে দূরে রোমান্স-ইতিহাস-ধনী দাম্পত্য জীবনের কাহিনী আশ্রয়ী। বাঙালি নতুন স্বাদ পেল কিন্তু পরিপূর্ণ বাস্তব জীবনের ছবি দেখতে পেল না। রবীন্দ্রনাথ আর এক ধাপ এগোবেন। জীবনের রহস্য ও মানব-মানবীর সম্পর্কের জটিলতা দেখাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনিও রয়ে গেলেন এ পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে। শরৎচন্দ্র বেড়া ডিঙোলেন অর্থাৎ সাধারণ বাঙালির সংসারে প্রবেশ করলেন। কিন্তু নামহীন গোত্রহীন সমাজ থেকে দূরে যে রূঢ় বাস্তবাশ্রয়ী মানুষগুলি তারা তখনও সাহিত্যে অনাদৃত। বাংলা কথাসাহিত্যের তিন প্রধান বর্ধমান জেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তাই এই জেলা থেকে কথাসাহিত্যে নবীন প্রেরণা উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তেমন লক্ষ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে নতুন দিক উন্মোচিত হল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৯০০) হাতে। বর্ধমান জেলার খনি অঞ্চলের অর্থাৎ রানীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় অঞ্চলের আদিবাসী কুলি-কামিনদের রূঢ় বাস্তব জীবন এই প্রথম ফুটে উঠল বাংলা কথাসাহিত্যে। এক এক নবীন চিহ্ন। শৈলজানন্দের 'রেজিং রিপোর্ট' (প্রবাসীতে ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত) এই ধরনের প্রথম গল্প। বাংলা কথাসাহিত্যে এই যে প্রকৃত বাস্তবিকতা তার জাগরণ ঘটল বর্ধমানের পটভূমিতে। সমাজের যারা অন্ত্যজ শ্রেণী, যারা খানিকটা উপেক্ষিত সেই সাঁওতাল-বাউড়িদের নিয়ে যে সাহিত্য হয়, কয়লাকুটির দেশ যে সাহিত্যে উজ্জ্বল হতে পারে তা দেখালেন শৈলজানন্দ। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাইরে বাঙালি পাঠক এক নতুন খোরাক পেল আর উদ্দীপনা জাগল নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে। তীক্ষ্ণ অনুভব ও তীব্র অভিজ্ঞতার পরিবর্তে সাহিত্যে এল অপরিচিত ও অনাবিষ্কৃত জীবনের গহনে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। গল্পের ভাষা গেল পাল্টে। জীবন ধরা পড়ল জীবন্তভাবে। শৈলজানন্দের এই ধরনের কথাসাহিত্যের আদিতে আছে 'নারীর মন' (কল্লোল, ১৩৩০) এবং শেষে 'জোহানের বিহা' (কালি-কলম, ১৩৩৩)। বাংলা কথাসাহিত্যে বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলের জীবন ও ভাষা যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল তার একটু নমুনা দেওয়া যাক।

> 'ভুলি তাড়াতাড়ি আড়কাঠির নিকট গিয়া বলিল,—কাখে খুঁজছিস হে? লোকটা তখন স্টেশন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, বলিল,—টুরনী মেঝেনকে। কোথায় আছে বলতে প্যারিস্?
> ভুলি তাহার হাত ধরিয়া আর একটু সরাইয়া লইয়া তগয়া বলিল,—টুরনী আমারই বোন, সে যাবেক্ নাই। চল্ আমি যাব।'

গল্প-উপন্যাসে শৈলজানন্দ যেমন, কবিতায় বর্ধমানের নজরুল ইসলাম এক নতুন সুর তুললেন। সে সুর বিদ্রোহের, সে-সুর প্রতিবাদের। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয় প্রভাবের খানিকটা বাইরে এসে নজরুল বাঙালিকে চমকে দিলেন তাঁর কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রকাশে। একটা দমকা হাওয়া নিয়ে প্রকাশিত হল 'অগ্নিবীণা' (১৯২২)। এ বীণা রবীন্দ্রনাথের হাতে তেমন বাজেনি যেমন বেজেছে নজরুলের হাতে। এক পরিপূর্ণ তারুণ্য, সতেজ জীবন, তীব্র প্রতিবাদ, নির্ভীক চেতনা নিয়ে বলিষ্ঠ ভাষায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' (প্রবাসী, ১৩২৯) প্রকাশিত হল তখন যেন বাংলা কবিতায় একটা নতুন পথ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতায় যে এ সুর ফোটেনি তা নয় তবে নজরুলের মতো বলিষ্ঠ জীবনধর্মী নয়। ভাষাও এত জোরালো নয়। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' যেন একটা অসহায় জাতিকে আত্মবিশ্বাসে জাগিয়ে তোলে। সে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াতে চায়। কৃপার থেকে কৃপাণই তার অবলম্বন। এই যে আত্মমুক্তির দীক্ষা তা এল চুরুলিয়ার কবির কাছ থেকে। নজরুল মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ নন। কিন্তু সমসাময়িক বাঙালি জীবনকে নাড়া দিয়ে তিনি এগিয়ে চলার মন্ত্র দিয়ে গেছেন। এ মন্ত্র বাঁচার মন্ত্র। শেকল ভাঙার গান।

এই সময় কবিতায় একদিকে জাগল বিদ্রোহী মনোভাব, অন্যদিকে নগরমনস্কতা ও বৈদগ্ধ্য। শহুরে শিক্ষিত কয়েকজন যুবক কলকাতা থেকে প্রকাশ করলেন 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩)। রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে আসার ও আধুনিক হবার বাসনায় কবিরা লেখনী ধারণ করলেন। একটা শহুরে মনোভাব ও বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে কল্লোলের কবিরা বাংলা কাব্যে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ তো শুধু কলকাতা নিয়ে নয়, বাঙালি চেতনাও তো একান্তভাবে শহরকেন্দ্রিক নয়। তাই এরই বিপরীত মেরুতে দাঁড়ালেন বর্ধমান জেলার দুই পল্লীকবি কালিদাস রায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বর্ধমান জেলা থেকে যে বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী ঝংকার জেগেছিল নজরুলের কবিতায় তা কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮২) বা কালিদাস রায়ের (জন্ম ১৮৮৯) কবিতায় দেখা গেল না। যদিও তাঁরা বর্ধমান জেলারই কবি। আবার কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কবিতায় নগর-চেতনা ও অতি আধুনিকতাও ফুটে উঠল না। পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষের রূপ ও স্নিগ্ধতা, ধর্মীয় বাতাবরণ ও জীবনের গ্রাম্য সরলতা আশ্রয় করল তাঁদের কাব্যকবিতায়। কবিতায় এই মাটির গন্ধ ভেসে উঠল। একদিকে নজরুলের 'বিষের বাঁশী' অন্যদিকে কুমুদরঞ্জন-কালিদাসের 'রাখালিয়া সুর' বাংলা

কবিতায় বীররস ও শান্তরসের সৃষ্টি করল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই হল বর্ধমানের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপ্রবণতা।

কুমুদরঞ্জন একান্তভাবেই পল্লীনিষ্ঠ। তার ওপর তিনি ভক্ত-বৈষ্ণব। দেশের মাটির পরে কবির গভীর মায়া, পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি আবিষ্ট। তাঁর কাব্যগুলির নামকরণে কবি-প্রকৃতি ব্যক্ত। যেমন, 'বনতুলসী' (১৯১১), একতারা (১৯১৪), রজনীগন্ধা (১৯২১) ইত্যাদি।

কালিদাস রায় গ্রামজীবনের কবি। গ্রামের প্রতি কবির ছিল আমৃত্যু (মৃত্যু ১৯৭৫)) টান। —

জন্মেছিলাম পাড়াগাঁয়ে সুখেই ছিলাম বেশ।
আশেপাশেই দশখনা গাঁই ছিল আমার দেশ।

কবি শেষ জীবনে শহর কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু পল্লীস্বপ্নে ছিলেন মশগুল—

দেহ মোর শায়িত শহরে
মন মোর দূর্বাশ্যাম পল্লীতে বিচরে।...
পল্লী মোরে লেখায় কবিতা
নগর শেখায় গদ্য যদিও তা বৃক্ষ।

জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র কবি হলেও এরকম পল্লীপ্রিয়তা তাঁর নেই। বাংলা কবিতায় যথার্থ পল্লীচিত্র, পল্লীর প্রকৃতি ও পল্লীর গার্হস্থ্য-চিত্র কালিদাস রায়ের কবিতায় যেমন পাব তেমন অন্যত্র লভ্য নয়। কালিদাস রায় যেন নগর জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' (১৩১৫) থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য-গবেষণা সাহিত্য-সৃষ্টিও বিচারের অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলায় সাহিত্য-গবেষণার সূত্রপাত। এই গবেষণায় একদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ ব্যাপারে পথিকৃৎ বলা চলে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য গবেষণায় যাকে প্রায় কিংবদন্তি পুরুষ বলে মনে করি তিনি বর্ধমান জেলার গোতানগ্রামী সুকুমার সেন (১৯০০-৯২)। দীর্ঘকাল সাহিত্য-গবেষণায় অভিনিবিষ্ট এই আচার্য বাংলা সাহিত্য গবেষণার একটা যথার্থ আদর্শ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মূলানুসন্ধান কাজে তিনি যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা এখনকার গবেষকদের প্রধান আশ্রয়। তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকৃত আকর গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব থেকে অতি আধুনিককাল পর্যন্ত যে বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস তিনি লিখে গেছেন তা তুলনারহিত। বাংলাভাষার ইতিহাস রচনাতেও তিনি সমান যোগ্য। ভাষা নিয়ে জাতি, জাতি নিয়ে দেশ। বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালি জাতি, বাঙালি জাতি নিয়ে বাংলাদেশ। এই ভাষা-জাতি-দেশ নিয়ে সুকুমার সেন যা কাজ করেছেন তা এক জাতীয় গৌরব। বর্ধমান থেকেই এঁর উত্থান। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান সাহিত্যসভার ভূমিকা স্মর্তব্য।

সাহিত্য-গবেষণা ছাড়া মৌলিক গ্রন্থ রচনাকেও সুকুমার সেন প্রতিষ্ঠিত। বাংলায় ডিটেকটিভ গল্পের অভাব নেই। কিন্তু কালিদাসের কালকে ধরে আধুনিক পাঠকদের উপযোগী করে তিনি এক নতুন ধরনের ডিটেকটিভ গল্পের সূত্রপাত করলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কালিদাস তাঁর কালে' প্রথম প্রচেষ্টা। এ ধরনের গ্রন্থগুলিতে সুকুমার সেনের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সহজাত রসবোধ মিশে গেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি বাঙালিকে যা দিয়ে গেছেন, তার জন্যে বর্ধমান গৌরববোধ করতে পারে।

গত দু-দশক ধরে বর্ধমান জেলা থেকে তেমন বড় মাপের কবি-সাহিত্যিক উঠে আসেননি। অথচ সাহিত্যচর্চাও কম হচ্ছে না। নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক কথা; কিন্তু বিশিষ্ট হয়ে উঠছে না। কোনও নতুন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে না। অথচ এই জেলা মধ্যযুগে ছিল বিশিষ্ট, সাহিত্যকর্মের দিক থেকে। আধুনিককালেও অভিনবত্বের অভাব নেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তেমন ঔজ্জ্বল্য লক্ষ করা যাচ্ছে না। বর্ধমান জেলায় স্পষ্ট দুটি ভৌগোলিক পরিবেশ লক্ষ করা যায়—একটি শিল্পাঞ্চল, অন্যটি কৃষি-অঞ্চল। আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল; কালনা-কাটোয়া কৃষি অঞ্চল। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র হিসাবেও এই জেলাকে দুটি অঞ্চলে দেখা যেতে পারে। যতদূর দেখছি, শিল্পাঞ্চলে সাহিত্যচর্চা যত বেশি, কৃষি-অঞ্চলে তত নয়। এই শিল্পাঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয় বেশি। এর হয়ত একটা অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে। সঙ্গে নগরায়নের কথাও ভাবতে হবে। এখনকার বাংলা সাহিত্য মূলত নগরকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার সর্বগ্রাসী প্রভাব, কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সাহিত্যিকরাও অর্থনৈতিক প্রলোভনে আকৃষ্ট। হয়ত আগের তুলনায় বেশি। এসব সত্ত্বেও গত দু-দশকে এই জেলার কিছু সাহিত্য-প্রচেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। আসানসোলের কবি-ঔপন্যাসিক জয়া মিত্র একটু নতুন দাগ কেটেছেন। কবি হিসাবেই তিনি বেশি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু উপন্যাসেও জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন 'হনুমান' উপন্যাসে।

আগেই বলেছি বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে সাহিত্য-প্রচেষ্টায় উদ্যম বেশি। কৃষি অঞ্চলে তুলনায় কম। সে প্রচেষ্টায় কিছু আগে যাঁরা নিমগ্ন ছিলেন এবং এখন যাঁরা আছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আসানসোলের কালীপদ ঘটক একটু বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন। সাঁওতাল জীবন নিয়ে লেখা তাঁর 'অরণ্য কুহেলী' একটু দাগ কেটেছিল। কুলটির কবি যতি মুখোপাধ্যায় জেলায় পরিচিত নাম। চিত্তরঞ্জনের

মানব চক্রবর্তী গল্প-উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন। রূপনারায়ণপুরের অরুণ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের সুধাংশু সেন সাহিত্যচর্চায় পরিশ্রমী। রানীগঞ্জের মনোজ চক্রবর্তী উপন্যাসে ('তৃতীয় পাণ্ডব') এবং আবদুস সামাদ কবিতায় ও গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য সম্মেলন ও চর্চাব মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলকে পরিচিত করে তুলেছেন রাণীগঞ্জেব রামদুলাল বসু।

শিল্পাঞ্চলে গত দু-দশকে এবং তাব কিছু আগে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলিকে আশ্রয় করে নবীন সাহিত্যিক উঠে আসছেন। বিশিষ্ট কয়েকটির উল্লেখ করছি। বার্ণপুর থেকে 'শ্রীলেখা', অণ্ডালের 'ইস্পাতেব চিঠি', দুর্গাপুরের 'জলপ্রপাত', 'কৃষ্ণপ্রস্তর', 'স্বাগত', 'সমকণ্ঠ' ইত্যাদি।

কৃষি-অঞ্চল বর্ধমান-কালনা-কাটোয়ায় সাহিত্যচর্চা গত দু-দশকে এবং তারও আগে কম হয়নি। উল্লেখযোগ্য কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। বর্ধমানের কবি-ঔপন্যাসিক চিত্ত ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত নাম। কবি কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ও কবি-গল্পকার নীলা কর এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। নাটক-রচনায় ও প্রযোজনায় গত দু-দশক ধরে বর্ধমান শহরে একটা প্রচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন মৌলিক নাট্য গোষ্ঠী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্মী-সংগঠক মৃদুল সেন ও শহরের দেবেশ ঠাকুর। দু-একটি পত্র-পত্রিকা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। যেমন, 'মুক্তবাংলা', 'নতুন চিঠি', 'ধ্বনি'। তাব আগে 'দামোদর', 'আর্য পত্রিকা', 'বর্ধমান'।

কালনার মানবেন্দ্র পাল কথাসাহিত্যে মোটামুটি পরিচিত নাম। কালনার কবি জগদীশ রায় দীর্ঘদিন সাহিত্যসাধক। অনেকটা কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায় ঘরানা। বৌদ্ধ-সাহিত্যিক নির্মলচন্দ্র বড়ুয়ার স্বতন্ত্র সাহিত্যচর্চা উল্লেখযোগ্য। কালনার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় গল্প-উপন্যাসে পবিচিত নাম। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে এক সময়ের উল্লেখযোগ্য নাম 'পল্লীবাসী'। নবীনরা 'অম্বুকণ্ঠ' পত্রিকাকে আশ্রয় করে জেগেছে। আরও দু-একটি নাম—'অম্বিকা সমাচাব', 'সীমায়ন', 'চিন্তা'।

কাটোয়ার সৌরীন ঘটক ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'ধূলা মন্দিব' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম। গল্পকার হিসাবে অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ঘোষ; নাট্যকার অগ্নিমিত্র (অনিল সেনগুপ্ত) ও সুনীল চক্রবর্তী বিশিষ্ট নাম। কবি হিসাবে বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত ও মহরম আলি ও রামকুমার মণ্ডল সুপরিচিত। পত্র-পত্রিকা—'কবির ডায়েরী', 'সাপ্তাহিক কাটোয়া', 'কাটোয়ার কলম', 'কাটোয়া দর্পণ' জেলায় সংবাদ সাহিত্যচর্চায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে।

গত দু-দশকে বর্ধমান জেলার ইতিহাস রচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র দাঁ, শ্যামাপদ কুণ্ডু, এবং তার আগে নারায়ণ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে অভিধান রচনায় সুপ্রতিষ্ঠিত নাম কাটোয়ার সুভাষ ভট্টাচার্য।

বর্ধমান জেলা থেকে নতুন সাহিত্যের সম্ভাবনা ছিল। এই জেলার আর্থ-সামাজিক পটভূমি পাল্টাচ্ছে। প্রাচীন ঐতিহ্যও এখানে কম নেই। ভূমিসংস্কাব ও পঞ্চায়েতীরাজের ফলে গ্রামের চিত্র বদলাচ্ছে। শহবের বিস্তৃতি ও ব্যবসার প্রসার মানসিক পরিবর্তন আনছে। নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমগ্র দেশের সঙ্গে মূল্যবোধের অভাব মানুষের জীবনে জটিলতা নিয়ে আসছে। এ-সব নিয়ে নতুন 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' হতে পারত। কিন্তু সাহিত্যিক কই? সবাই যেন গতানুগতিকতায় ভুগছে। ভাঙার আগ্রহ বা গড়ার আগ্রহ কোনটাই লক্ষ করা যাচ্ছে না। হতাশায় ও স্থিতাবস্থায় সবাই যেন ক্লিষ্ট। শিল্প ও কৃষিতে উন্নত জেলা থেকে সাহিত্যে নবীন প্রবণতা কি দেখা দেবে না?

উপসংহারে এই প্রবন্ধ সম্পর্কে একটু জবাবদিহি করতে হয়। এই প্রবন্ধে আমি বর্ধমান জেলার কবি-সাহিত্যিকদের তালিকা করতে বসিনি। প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার তালিকাও নয়। তাই অনেক নাম এখানে নেই। যাঁরা খুঁজতে বসবেন তাঁরা ব্যর্থ হবেন। আমার উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন। সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলা থেকে যে বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি দেখা দিয়েছিল আমি সেগুলি ধরবার চেষ্টা করেছি। সেই প্রবণতার ক্ষেত্রে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য আমি তাঁদেরই উল্লেখ করেছি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ধমানের ভূমিকাকে অন্তরঙ্গে দেখতে হবে, বহিরঙ্গে নয়।
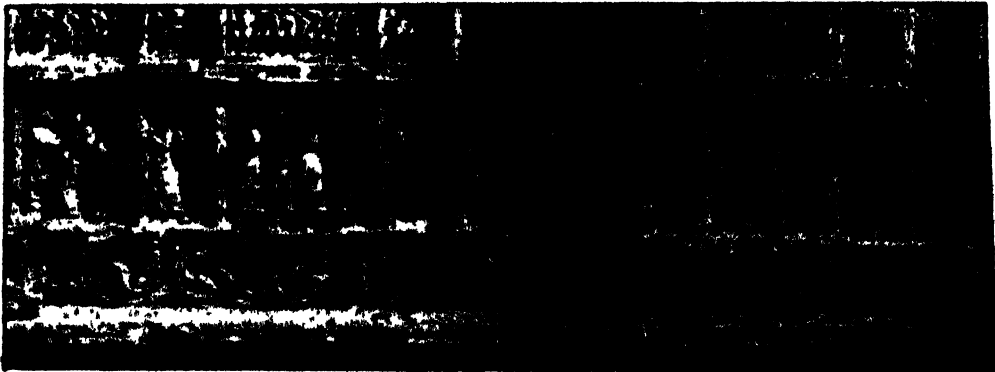
সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

রামশঙ্কর চৌধুরী

বেশ কিছুকাল পূর্বে বর্ধমান জেলার গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বন্ধুদের পরামর্শ দিয়েছিলাম, বর্ধমান জেলার সব মহকুমারই শিল্পী এই সংঘে যখন মিলিত হয়েছি, তখন আমরা বর্ধমানের আর্থরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতে পারি এবং তা যদি করি, তাহলে সত্যকারই একটি প্রামাণ্য ইতিহাস আমরা বর্ধমানের মানুষের হাতে দিতে পারব। কিন্তু বন্ধুরা কই গ্রহণ করলেন সে প্রস্তাব! আজ তাই বিপদে পড়তে হয় এর ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্বে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে Heritage of Burdwan নিয়ে আলোচনা সভায় বন্ধুবর অমল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে গিয়ে লোক সংগীত বিষয়ে বলার জন্য হলে বসিয়ে দিয়ে আসেন এবং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে একটুখানি আলোচনার সুযোগ পাই এবং অতি সামান্য অংশই উপস্থিত করতে সমর্থ হই। কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় বিশেষ করে কোন্ গান কোথায় গাওয়া হয় এই বিষয়ে।

আজ দায়িত্ব এসে পড়েছে—বর্ধমানের সাংস্কৃতিক সামাজিক ঐতিহ্য নিয়ে লেখার জন্য। বিষয়টি বিরাট। বিশেষ করে 'সাংস্কৃতিক' বলতে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা নিয়েই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কাজেই কোনও প্রকার প্রশ্নের অবতারণা করার সুযোগ না দিয়ে, যেমন সংস্কৃতি কথাটি সম্বন্ধে একটি আংশিক, ফলে প্রায়শই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যবিত্ত

শিক্ষিত সমাজে চলছে। এই ধারণা হল, সংস্কৃতি আমাদের জীবনচর্যার যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা কল্পনা বদ্ধ হোক তাই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য কিয়দংশ সংগীত নাট্যকলা, কল্পনাবদ্ধ সুন্দর সৃষ্টি হল আমাদের সাহিত্যদর্শন ইত্যাদি।[১] 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে 'কৃতিই' হল মূল। সম উপসর্গ দিয়ে গোপাল হালদার অর্থ করেছেন, সমূহ, সবার জন্য, মানুষ আসার পূর্বে এবং মানুষ আসার পরে আমরা যে প্রভেদ বা পার্থক্য দেখি, তা সংস্কৃতির পার্থক্য। মানুষ থাকলেই সংস্কৃতি থাকবে। সে মানুষ যেখানেই থাকুক। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে, বর্ধমানে প্রথম যখন মানুষ আসেন, সেই দিন থেকে ইতিহাস লিখতে হয়। একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করে 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকৃত হচ্ছে না। হারস্কোভিটস-এর কথায় Culture is the man made part of the environment[2] আরও সব ব্যাখ্যা আছে। বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতবর্গ যথা ক্রোবার আর ক্লার্ক হোন (১৯৫২) সংস্কৃতি কথাটির ১৬৩ রকমের প্রচলিত অর্থ—পারিভাষিক ও লৌকিক দুই রকমেই খুঁজে বের করেছেন।[৩] কাজেই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে যেন অর্থে এতদিন গ্রহণ করা হয়েছে, তাই গ্রহণ করে বর্ধমানের সাহিত্য, নাট্য ও দর্শন আলোচনা করতে চাই। এবং তাও করতে হবে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং এই উদ্দেশ্যেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে আমি প্রারম্ভ যুগ ধরছি।

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতির পর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের দীপ হর্ষবর্ধনের হাতে ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে নানা বিন্দুতে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি নতুন অবয়ব গ্রহণ করে পূর্ব ভারতে একাধিপত্য করতে লাগল বটে, কিন্তু নবম শতকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের জীবনাদর্শে গুরুতর পরিবর্তন সাধন করলে এবং অব্যবহিত পরেই রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবপ্রবাহে অদ্বৈত ও নির্বাণশূন্যতা ভেসে গেল। ক্রমে এলেন সুফি-সাধকবৃন্দ, কবীর, নানক এবং সকলের শীর্ষে শ্রীচৈতন্য। অতঃপর রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিলুপ্ত হলেও একটি সর্বভারতীয় ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠার বিলম্ব হল না।[৪]

এই বিষয়ে ভাবৈক্যের রূপটি কীরূপ ছিল তা ব্যাখ্যা করলে চৈতন্যের ভাবোন্মাদনাকে অবলম্বন করে যে বিরাট ব্যাপক বৈষ্ণব এবং পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা একান্তভাবে সেই যুগের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করেছে। ভাবগুরু রামানুজাচার্যের ও রামানন্দ সম্প্রদায়ের মতবাদ পরবর্তী ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে অভিনব শক্তিরূপে কাজ করেছে এবং সুফিভাবের মিশ্রণে আজও ভারতবাসীর চিত্তে একটি মৌলিক প্রবণতারূপে বিদ্যমান রয়েছে। এই মতবাদে বিশ্ব ও জীবনকে অনিত্য বলে অস্বীকার করা হয়নি। দ্বাদশ শতক থেকে ভারতীয় সাহিত্যে মূলত এই ভাবধর্ম বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্য ভারতে কবীর, দাদু, সুরদাস, মীরাবাঈ, তুলসীদাস এবং বাংলায় জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসাদি ওই ভাবধর্মের সাহিত্যিক প্রতিমা। ঠিক এই সময় সংস্কৃত মহাকাব্য ও মানবীয় প্রেম কাব্যের মহিমা জনমানসে প্রায় লুপ্ত হয়েছে, তেমনই সংস্কৃত ভাষা-ভঙ্গির সরল উদার সৌন্দর্য তিরোহিত হয়ে শব্দচাতুর্যই ক্ষীণদীপ্ত কবিদের প্রয়াস আশ্রয় হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক পরিবর্তনের যুগে অমর, রাজশেখর, শরণ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী প্রমুখ বহু অবাচীন সংস্কৃতের কবি প্রকীর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিক প্রেম কবিতার উজ্জীবনের প্রয়াস করেছেন।[৫]

উক্ত বিশ্লেষণের পর আলাদা করে চৈতন্য ভাবকেন্দ্রে অবস্থান করে সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটা ভালো সংখ্যক সংস্কৃত ভাষার কবি, শাস্ত্রকার ছিলেন। বর্ধমানে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সংস্কৃতের টোল ছিল এবং পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। আমাদেরই এক বন্ধু (বলগনা) ম্যাট্রিক পাশ করে টোলে অধ্যয়ন করেছেন। এই লেখক, তাঁর গ্রাম তিঘুড়ী (বাঁকুড়া)-তেও টোলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেছেন। অনেকে বলেন, রাঢ়ের অধিবাসী সিদ্ধল গ্রামবাসী ভট্ট ভবদেব সংস্কৃতে স্মৃতি শাস্ত্র, তন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা। কিন্তু কোন্ রাঢ়ের অধিবাসী তা নিয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলেন দক্ষিণ রাঢ়ের, কারও অভিমতানুসারে উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। তথ্য প্রমাণ সহ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে, রূপ ও সনাতন কেতুগ্রামের নিকট ওই থানার অন্তর্গত নৈহাটি গ্রামের মানুষ।[৬] হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের রচয়িতা, তাঁরই বংশে কবি জয়ানন্দের জন্ম বর্ধমানের শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। নরহরিও শ্রীখণ্ডের মানুষ সংস্কৃত ভাষায় 'ভক্তিচন্দ্রিকাপটল' 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' 'ভক্তামৃতাষ্টক' 'গীত চন্দ্রোদয়' 'নামামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীখণ্ড নিবাসী গোবিন্দদাস ছিলেন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। তাঁর দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, একটির নাম 'সঙ্গীত সাধক' নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামে অন্য একটি সংস্কৃত গ্রন্থ। তাঁর পৌত্র ঘনশ্যামদাস 'গোবিন্দ রসমঞ্জরী' স্বরচিত শ্লোক সংকলন করেন। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা, নিত্যানন্দ যুগলাষ্টক রসকল্প সারষ্টক প্রভৃতি রচনা করেন। যদিও তিনি বর্ধমানের সন্তান নন, তবু নিত্যানন্দের নির্দেশে তিনি বর্ধমানের দেনুড়ে বাস করেন এবং এই সময়েই 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন। ঝামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনী কাব্য হল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। বাংলায় জীবনী লেখায় তিনিই প্রথম পুরুষ। অষ্টাদশ শতকে ধাত্রীগ্রাম নিবাসী অভয়রাম তর্কভূষণ ও তাঁর পুত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (বুনো রামনাথ) শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে মাড়ো মানকর নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন এবং আজও তাঁর রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের টীকাগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। ইনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে রামরসায়ন একটি। এটির রচিত সাল ১২৩৮ তখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর। এই রামরসায়নে রঘুনন্দন তাঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন। এটি এইরূপ : নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ বর্ধমান জেলার নেতা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গোপীজনবল্লভের পুত্র রামেশ্বর ইছাবট গ্রামে চলে যান। তাঁর পুত্র নৃসিংহদেব মাড়ো

গ্রামে বসবাস করছিলেন। বংশ তালিকাতে দেখা যায় নিত্যানন্দ প্রভুর বংশের অষ্টম পুরুষ ছিলেন কিশোরীমোহন। কিশোরীমোহনের প্রথমা পত্নীর (প্রথমা পত্নী ছিলেন এড়ালবাহাদুরপুরের কন্যা) গর্ভে রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্ম। রামদুলাল তর্কবাগীশ (১৭১৫-১৮১৫) ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ রাজা তেজচন্দ্রের তুষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলাবৃদ্ধি নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। রামদুলালের কনিষ্ঠ ভাই গৌরীচরণ, গৌরীচরণের পুত্র ছিলেন কাশিনাথ। এই কাশিনাথ ছন্দশাস্ত্রের একটি (পাঁচ পরিচ্ছেদে) বই ১৭৫৩ শকাব্দে রচনা করেন।

মাড়ো-মানকরে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রই ছিল বলা যায় ভট্টাচার্য ও মিশ্র পরিবারে। মানকরের মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম, কৈলাসনাথ ও অযোধ্যানাথ সার্বভৌম প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। জানা যায় মহারাজ কীর্তিচাঁদের গুরুবংশ ছিল মানকরে। সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে আরও কয়েকজন পণ্ডিত ছিলেন, তা আর উল্লেখ করলাম না।

বর্ধমান জেলায় কয়েকজন মহিলাও সংস্কৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানচর্চায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তথ্যের অভাব হেতু সবাইকার নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি সত্য কিন্তু দুজন বিদুষী মহিলার নাম জানা যায়। একজনের নাম রূপমঞ্জরী ও অপরজনের নাম হটি বিদ্যালঙ্কার। রূপমঞ্জরী ছিলেন আউসগ্রাম থানার কলাইঝুটি গ্রামের ও হটি বিদ্যালঙ্কারের রায়না থানার সোঁয়াই গ্রামে নিবাস ছিল। উভয়েই কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। রূপমঞ্জরী জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে স্বগ্রামে ফিরে এসে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। হটি বিদ্যালঙ্কার কাশীতেই টোল স্থাপন করেন এবং ওই টোলে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা করেন। ইনি ভট্টাচার্যের ন্যায় বিদায় ও দক্ষিণা গ্রহণ করতেন। এই দুইজন ছাড়া আরও একজন মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁর নাম কুড়নী দেবী, অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জননী। এঁর ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। কুড়নীদেবীর স্বামীরও চতুষ্পাঠী ছিল, স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই মহিলা শাকনাড়া গ্রামে চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন।

উনবিংশ শতকে কালনা নিবাসী তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন বর্ধমানের গর্ব। সংস্কৃত ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তৎকালে পণ্ডিতমহলের অভিমতে—বাচস্পত্য অভিধান ৮এটি হয় খণ্ডে প্রকাশিত ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বাচস্পাত্য অভিধানের (চৌখাম্বা সিরিজ) জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গোল্ডস্টুক, কাওয়েল ও উইলসন ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাও রচনা করেছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ৭ আষাঢ় কাশীধামে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁকে তখন বলা হত 'জীবন্ত বিশ্বকোষ'। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করে আক্ষেপ করেছিলেন—"ভারত পণ্ডিত শূন্য হইল।" সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ E. B. Cowel তারানাথকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' প্রকাশের দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায় এই যখন সরকার চিন্তা করছেন তখন কাওয়েল সাহেব তারকনাথের নাম প্রস্তাব করে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন—"I question if any one in Bengal is equal to him."

বিদ্যাচর্চা ব্যতীত তারানাথ কালনার দরিদ্র ছাত্র ও আত্মীয়দের জন্য উৎপাদনমুখী ব্যবসায়ের পত্তন করেন, যাতে ছাত্র ও আত্মীয়রা স্বাবলম্বী হতে পারে। কুড়নীদেবীর পুত্র প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের কথা আগেই বলেছি। প্রেমচন্দ্র ছিলেন তারানাথের সমসাময়িক এবং ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ হতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি সুকবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮৬৭) রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর মোট এগারোখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকার মধ্যে দণ্ডি রচিত কাব্যাদর্শের টীকায় প্রেমচাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। এঁকে 'দ্বিতীয় মল্লিনাথ' বলা হত। এঁর মৌলিক রচনা হল 'পুরুষোত্তম রাজাবলী কাব্য' নানার্থসংগ্রহ অভিধানও একটি অলংকার গ্রন্থ। ৩১ বছর তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করার পর ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায়ের পর Cowel সাহেব সরকারকে জানান—In this kind of labour he is quite unrivalled among the modern Pandit of Bengal. I know of no Pandit who has an equal power of writing elequant Sanskrit Poetry and Prose.

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম অ্যাডমস একটি রিপোর্ট সরকারকে দেন, তাতে জানা যায় বর্ধমানে ১৯৫টি চতুষ্পাঠী ছিল এবং ওই সকল চতুষ্পাঠীতে অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এটা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সব গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যাও বা আছে (এবং থাকা সম্ভব) সেগুলি পারিবারিক গৃহদেবতা হয়ে রঙীন কাপড়ে মোড়া অবস্থায় পুজো পাচ্ছেন। আশ্চর্য সব বিশ্বাস, বড় বেলুনে নাকি এখনও এ সব পুঁথি কিছু আছে।

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী জানাচ্ছেন, এক সময় অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ক্ষীরগ্রামের পুঁথির একটি বিরাট অংশকে উদ্ধার করেছিলেন এখনও যদি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান জেলা এই কাজে অগ্রসর হয় তবে একটা বিরাট ধ্বংসের হাত থেকে হয়তো বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারকে বাঁচানো যাবে।

বাংলা সাহিত্য :

ড. সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-এর প্রথম খণ্ডে চর্যাগীতিগুলির আলোচনা করেছেন চতুর্থ পরিচ্ছেদে। ড. সুকুমার সেন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতকে সমর্থন করেই বলেছেন, চর্যাগীতিগুলির সিদ্ধাচার্যদের কাল দশম

মুকুল দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থির করেছেন। "ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুই তিন অথবা ততোধিক শতাব্দী পিছাইয়া লইতে চান নানা কারণে সুনীতিবাবুর মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।" যাই হোক এটিই বাংলা ভাষার প্রথম বই। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বত থেকে তালপাতায় লিখিত আরও কয়েকটি চর্যাগীতি নিয়ে এসেছেন, এগুলির মধ্যে প্রাপ্তগ্রন্থের গান যেমন আছে, তেমনই নতুনও আছে। যাই হোক এতকাল পরে নতুন করে কেউই নতুন ব্যাখ্যা কিছু দিতে পারেননি। বরং ড. সেনই বলেছেন, "ওড়িয়া বাংলা ও অসমীয়া এক মূল পূর্বপ্রান্তীয় কথ্য ভাষা হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বাল্যাবস্থায় তিনটি ভাষার মধ্যে মিল থাকিবেই। কোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে প্রাচীন ওড়িয়া ও প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না।" (ঐ পৃ: ৫৫)

বাংলা সাহিত্যের অবস্থা—পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে বাংলা সাহিত্যের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। চর্যাগীতির পরেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে অনেকে বললেও ড. সুকুমার সেন স্বীকার করেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখিত আছে যে চৈতন্য চণ্ডীদাসের গান শুনতে ভালোবাসতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের স্থানে স্থানে যে আদিরসাত্মক গানগুলি শুনতে ভালোবাসতেন তা কখনই নয়, তবে ইনি কি কেতুগ্রামের চণ্ডীদাস? বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত বইয়ের ভাষা প্রাচীন বলে মনে হলেও রাধাগোবিন্দ বসাক বলেছেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের এদিকের নয়। বিনীতভাবে জানাই এই লেখক মনে করেন মানভূমের যে অংশ শালতোড় থানার নিকট এবং শালতোড়া থানার কথ্য ভাষা এই রকমই, আমার কাছে খুব প্রাচীনতা ধরা পড়েনি। এখনও এই শব্দগুলি লোকমুখে কথিত হয় এবং নাসিক্য ধ্বনির ব্যবহার বেশি।

একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হয় বাংলা সাহিত্যে এ জেলার দান গর্ব করার মতো।

কবি কৃত্তিবাস ওঝা পয়ার ছন্দে ও ত্রিপদী ছন্দে বাল্মীকির রামায়ণের যে বাংলা করেন, তা বাঙালির রামায়ণ হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণকে রাম পাঁচালীও বলা হয়ে থাকে। জয়ানন্দ তিনজন কবির নাম করেছেন—এঁরা হলেন কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান ও চণ্ডীদাস। কৃত্তিবাস ছিলেন ফুলিয়া গ্রামের মানুষ। 'ফুলিয়া' নামটি কী করে হল, তাই নিয়ে একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন ড. সেন। কারও জানার ইচ্ছা থাকলে ড. সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পড়তে পারেন। চণ্ডীদাস সম্ভবত দ্বিজ চণ্ডীদাস। গুণরাজ খান বিষয়ে বলার পূর্বে কৃত্তিবাস সম্পর্কে আরও একটু বলার আছে, তা হল এই সেই কালে। কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পুঁথিটি এক এক খণ্ডে লেখেন এবং তা ভিন্ন ভিন্ন সময়েই। এই খণ্ড খণ্ডগুলি নিয়ে কেউ কেউ কাজ করেছিলেন জানা যায়। পরে সম্পূর্ণ রামায়ণ শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয়।

এই সময়েই আরও একজন কবির সন্ধান মেলে। এঁর গ্রামের নাম কুলীন গ্রাম, নাম মালাধর বসু। গৌড়েশ্বর তাঁর নাম দেন গুণরাজ খান। এঁর প্রথম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণবিজয়। কৃষ্ণবিজয়কে বাংলায় ভাগবতের অনুবাদ বলা যায় এবং এটি গাইবার জন্যই লিখিত হয়েছিল। গুণরাজ তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন—

> ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
> লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি গাহিয়া॥

যে গৌড়েশ্বর মালাধরকে গুণরাজ খান উপাধি দিয়েছিলেন, তাঁর নাম রুকুন-উদ-দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)।

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোনও কোনও পুঁথিতে রাধা ও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকাবিলাসের বিবরণ পাওয়া যায়, এই অংশ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথম সংস্করণে নেই। ড. সুকুমার সেন মনে করেন এই বর্ণনা কৃষ্ণমঙ্গল থেকে প্রক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বাৎসল্য রসই প্রধান। একটি বিষয়ে গুণরাজ খান অগ্রগণ্য কবি সে বিষয়টি হচ্ছে গুণরাজ খানই ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার সার কথা সরল স্পষ্টভাবে দেশি ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। নানা কারণে এই অধ্যাত্মচিন্তার সার কথাটি মূল্যবান তাই একটু অংশ তুলে দিই :

> সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি
> সকল হৃদয়ে গোসাঞী রন তনু ধরি
> গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে
> একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে
> সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ
> আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥
> নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তারে জানে
> তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥
> কর্ণধার, বিনে যেন নৌকা নাহি যায়
> তেমনি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়॥
> ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন
> একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন॥

চৈতন্যচরিতের লেখক ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস জয়ানন্দ, এঁরা সকলেই বর্ধমানের।

বাংলায় লেখা প্রথম চৈতন্য জীবনীর লেখক ছিলেন বৃন্দাবন দাস। ওঁর লিখিত কাব্যের প্রথম দিকে নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল' তারপর সেটি 'চৈতন্যভাগবত' নামকরণ করা হয়। বৃন্দাবন দাসের পিতার নাম জানা যায়নি, আজও কেউ জানেন না। মায়ের নাম নারায়ণী। বৃন্দাবন নিজের পরিচয়দান করেছেন নিত্যানন্দের 'সর্বশেষ ভৃত্য' বলে। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর বৃন্দাবন দাস কালনা মহকুমার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে বাস করেন। পরে বৃন্দাবনে চলে যান এবং ওখানেই মৃত্যু ঘটে।

বৃন্দাবন দাসের পর চৈতন্যের জীবনী কাব্য লেখেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্য চরিতামৃত" ইনি নৈহাটি গ্রামের নিকট ঝামটপুর গ্রামের মানুষ ছিলেন। ইনি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর ঘরে গৃহদেবতা ছিল। গৃহদেবতার নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল। এ কাজ করতেন গুনার্ণব মিশ্র। কৃষ্ণদাস বৈদ্য জাতি ছিলেন কিনা, বোধহয় আজও জানা যায় না, তবে ও 'কবিরাজ' উপাধিটি বৈদ্যত্বের জন্য নয়, ওটি পাণ্ডিত্যের জন্য প্রদত্ত উপাধি। সুকুমার সেনের

ধারণা উনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং চৈতন্যের সাহচর্য কিছুকাল পেয়েছিলেন।

লোচনদাসের পুরো নাম লোচনানন্দ দাস। এঁর কাব্যের নাম চৈতন্যমঙ্গল। ইনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এতে জানা যায়, তিনি বৈদ্য ছিলেন। এঁর পিতৃকুল মাতৃকুল দুই-ই বর্ধমান জেলার কোগ্রামে মঙ্গলকোটের নিকটে। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী, মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয়া দাসী। উভয় বংশের লোচনই একমাত্র পুত্র সন্তান। খুব আদরেই মানুষ হয়েছিলেন। বড়ো মানুষের আদুরে ছেলের যা হয় লোচনেরও তাই হয়েছিল, অর্থাৎ লেখাপড়া করতে চাইতেন না। মাতামহ জোরজবরদস্তি করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। চৈতন্যের এক আদ্য ও প্রিয় অনুচর শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস সরকার লোচনের 'প্রেমভক্তিদাতা' গুরু ছিলেন। লোচন সম্বন্ধে আরও একটু জানার আছে, সেটি হল এই যে, তিনি নিত্যানন্দের আদেশে বিবাহ করেন, লোচনের পত্নীর নাম কাঞ্চনা। গুরুর নির্বন্ধে বন কাটিয়া কাঞ্চননগরে বাস করেছিলেন।

কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। জয়ানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যেই স্থানে স্থানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বন্দ্যঘটি গাঁই। নিবাস মধ্যরাঢ়ে আমাইপুরী গ্রামে। ডঃ সুকুমার সেন বলছেন "এ গ্রামেব সন্ধান নেই। তিনি মনে করেন গ্রামটি হয়ত বর্ধমান জেলার সাতগেছে থানার অন্তর্গত বড়োয়াঁ গ্রামের অনতিদূরে ছিল বা আছে।" "ষোড়শ শতাব্দীতে যে বর্ধমান প্রসিদ্ধ ছিল, তা বর্তমান বর্ধমান নয়। তখনকার বর্ধমান এখন স্বাভাবিক ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে বড়োয়াঁ হয়েছে।"[৯] জয়ানন্দের মায়ের নাম রোদনী।

জ্ঞানদাস ছিলেন কাঁছড়া গ্রামের মানুষ, পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের সমতুল্য কবি ছিলেন জ্ঞান। এই লেখক জ্ঞানদাসের বাড়িটি দেখে এসেছেন। জ্ঞানদাসকে নিত্যানন্দের গান বলে ধরা হলেও "তিনি মাহ্ বা দেবীর অনুচর"। ড. সুকুমার সেন বলেছেন "নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবা ব্রজধামে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন। তখন তাঁর পরিজনের মধ্যে জ্ঞানদাসও ছিলেন।"

অম্বিকা কালনার নিত্যানন্দের শ্বশুরের ভাই গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁর ছিল। বৈষ্ণব কবি রামানন্দ বসুর নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। 'বঙ্গভাষার' লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, শিবানন্দ সেনের পৈতৃক নিবাস ছিল কুলীন গ্রামে। শিবানন্দের তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ বা কবি কর্ণপুর (জন্ম ১৪৪৯)। শিবানন্দ চলে যান কাঁচড়াপাড়ায় চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত পূর্বস্থলী থানার মামগাছিতে মদনমোহন বিগ্রহ সেবার ভার পান, তিনি পদকর্তাও ছিলেন।

গোবিন্দদাসের 'কড়চা' নামে যে বইটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তা প্রামাণিক নয় বলে পণ্ডিত সমাজ এমন কি ডঃ সুকুমার সেনও মন্তব্য করেছেন।[১০] 'কড়চাটি যখন প্রামাণিক নয়, তখন তদন্তরগত কোনও কথার প্রামাণিকতার অভাব ঘটে, কাজেই কড়চায় বর্ণিত
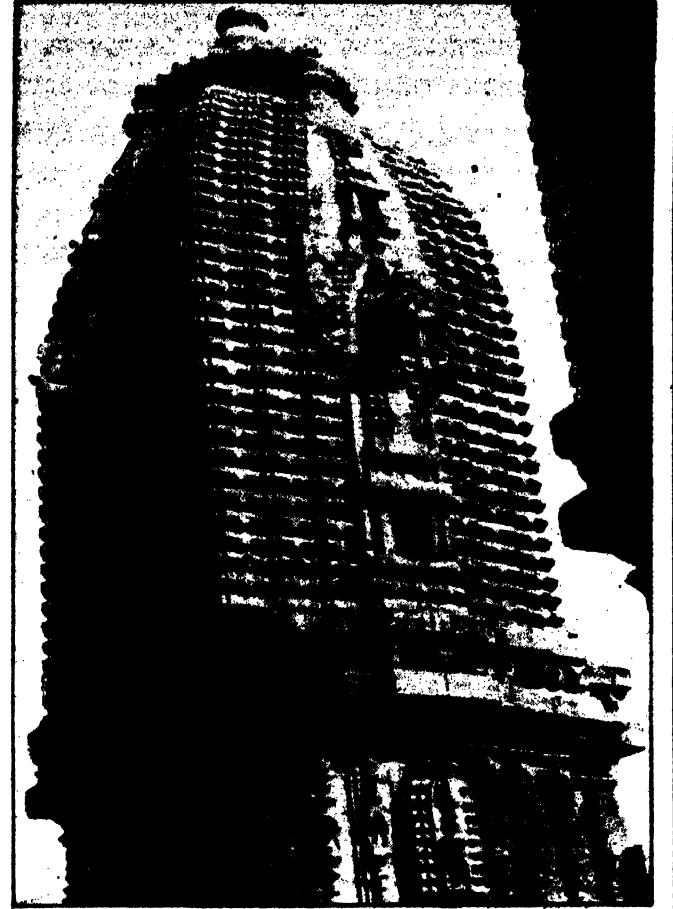
চিরঞ্জীব সেনের যে সব বিবরণ দিয়েছেন তা গ্রহণীয় নয় বলেই মনে করি।

পদাবলী সাহিত্যের রচয়িতা কাঁছড়ার জ্ঞানদাসের অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন মনোহর দাস কাঁছড়া গ্রামে বসবাস করতেন। আরও কয়েকজন বৈষ্ণব কবির পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা বর্ধমান জেলার বাসিন্দা যেমন আত্মারাম (শ্রীখণ্ড), কানুদাস (শ্রীখণ্ড), চৈতন্যদাস (কেতুগ্রাম)।

'মাধবসঙ্গীত' একটি বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ। এই গ্রন্থের লেখক পরশুরাম রায়। এই লেখকের নিবাস ছিল চম্পক নগরে। এই চম্পকনগর কোন জেলায় তা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। কেউ বলেন, মেদিনীপুরে, কেউ বলেন বর্ধমানে, কেউ বলেন শিখরভূমে। শিখরভূমে সেরগড় আছে, কিন্তু চম্পকনগর আছে বলে জানি না। যাই হোক খোঁজ করব। শ্রীগোকুল বৈষ্ণব হয়ে ভক্তি রত্নাকর লেখেন, তিনি কাটোয়ার মানুষ, পরে ডিসেরগড়ে এসে বাস করেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা শশীশেখর ও চন্দ্রশেখর ছিলেন শ্রীখণ্ডের। শশীশেখরের পদগুলি কীর্তনের রূপ ধরে এ যুগের মনোহরসাহী কীর্তনের ঢঙে গীত হয়।

বৈষ্ণব কবিদের আরও অনেকের নাম-ঠিকানা অবর্ণিত থেকে গেল।

যেমন বর্ধমানে রামায়ণ লিখিত হয় তেমনই মহাভারতও রচনা করেন কাশীরাম দাস। এঁর আবাস সিঙ্গি গ্রামে। কাশীরাম দাস

নিজেই তাঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন একটি দীর্ঘ কবিতায়, যার প্রথম কটি লাইন তুলে দিচ্ছি—

ভাগীরথী তীরে বাস ইন্দ্রায়নী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম
অগ্রদীপ গোপীনাথ বাসপদতলে।
নিবাস.আমার সেই চরণ কমলে॥

স্যার প্রতাপচন্দ্র রায় মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদ ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলারকে পাঠান এবং তিনি দারুণ খুশি হয়ে একটি অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করেন।

মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্ভবস্থল হল বর্ধমান জেলা, পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, মঙ্গলকাব্যের উপাদান কোনও দেবীর দৈবী নির্দেশে নয়। স্থানীয়ভাবে লোকমুখে যে কাহিনীগুলি চলিত ছিল, সেইগুলিই ছিল মঙ্গলকাব্যের উপাদান। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মানুষ অত বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তৎকালের রাজনৈতিক কারণে, তা ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক গোপাল হালদার। সংক্ষেপ করার জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যায় আমি গেলাম না।

মালাধর বসু মঙ্গলকাব্যের সূচনা করেন কিন্তু পরিণতি লাভ করে মুকুন্দরামে। মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন তাঁর দেশ রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে হলেও তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয় এবং নিজের গ্রাম পরিত্যাগ করে তিনি মেদিনীপুর জেলার আড়াগ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং সেখানেই মঙ্গলকাব্য রচনা করেন।

মঙ্গল শব্দটির সঙ্গে সাংসারিক পারিবারিক মঙ্গল বোঝায়, বিবাহের পর পুত্রের ঘরে নববধূ নীত হলে এই চণ্ডীমঙ্গলের গান গাওয়ানোর রীতি ছিল এ আমি দেখেছি।

মুকুন্দর 'চণ্ডীমঙ্গল'কে শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং মুকুন্দকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই সময়ে তবুও পরিতাপের বিষয় এঁদের প্রশংসা করা সত্ত্বেও বাঙালি পণ্ডিত সাহিত্যিক সমাজ মুকুন্দকে তখনও স্থান দেননি। ভাষা বিজ্ঞানী গ্রীয়ারসন্ (মি. এ) ও ই বি কাওয়েল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর এবং মি. কাওয়েল কর্তৃক অনুবাদের পর, বাঙালী পণ্ডিত সমাজ তখন সাদরে চণ্ডীমঙ্গল ও তার রচয়িতাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি দিতে কার্পণ্য করেননি। রবীন্দ্রনাথও এই কাব্যের প্রশংসা করেছেন।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র 'বাশুলিমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। পুঁথিটি রায়না থানা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কবির গ্রাম বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল রচিত হয় ১৫৬০ শকাব্দে। ক্ষেমানন্দের বাসস্থান বিষয়ে যেটুকু পাওয়া যায় তা হল তাঁর বর্ধমানের সেলিমাবাদ পরগনায় তাঁর বাসস্থান ছিল, পরে পিতামাতা সহ আক্কর্ণ রায়ের পরামর্শে সেলিমাবাদ ত্যাগ করে রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই ভরামল্লের আশ্রয়ে আয়ে বাস করতে থাকেন। কালিদাস রচিত একটি মনসামঙ্গল পাওয়া যায় কানাইডাঙ্গা গ্রামে। এই গ্রামে পুঁথিটির অনুলিখন শেষ হয়। মেনভূম পরগনার কাঁকুটে-নন্দনপুর গ্রামে রসিক মিশ্রের মনসামঙ্গল পাওয়া যায়, তিনি পরে বাঁকুড়ার আখ্যাশোল গ্রামে চলে যান।

আরও সাতজন 'ধর্মমঙ্গলের' কবির সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের নাম এবং গ্রামের নাম দিলাম—

নাম	গ্রামের নাম (থানা)
রূপরাম চক্রবর্তী	কাইতি শ্রীরামপুর/রায়না থানা
যদুনাথ রায়	দোম (দোমহানী)/আসানসোল মহকুমা
ঘনরাম চক্রবর্তী	কুকুড়া-কৃষ্ণপুর (রায়না থানা)
নরসিংহ বসু	প্রথম গোপভূম পরগনার বসুধা গ্রাম পরে দক্ষিণ দামোদরের কৃষ্ণপুরের নিকট শাঁখা গ্রাম
রামকান্ত রায়	মেহাড়া (রায়না থানা)
রামদাস আদক	জাড়গ্রাম (জামালপুর থানা)
হৃদয়রাম সাউ	খুরুল (ভাণ্ডার থানা)

বিভিন্ন গ্রামের আটজন কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালি লেখেন, 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বাংলায় অনুবাদ করেন দুজন কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ছিলেন বর্ধমানের ভুরসুট পরগনার পেড়ো এখন গ্রামটি হাওড়া জেলায়।

শাক্ত পদাবলী ও শ্যামসঙ্গীতের আগমনী সঙ্গীতের চার/পাঁচ জন কবির নাম পাওয়া যায়।

পাঁচালি গানের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজ সচেতন কবি ছিলেন দাশরথি রায়। এর বাড়ি ছিল কাটোয়া থানার বাঁধমুড়া গ্রামে। ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ধবনী গ্রামে কৃষ্ণ যাত্রার প্রবর্তক ছিলেন নীলকণ্ঠ, এই লেখক নীল নীলকণ্ঠকে দেখেননি, কিন্তু তার মৃত্যুর পরে, তাঁর যাত্রাদল দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, এক ভাগ চালাতেন কমলাকান্ত তাঁর পুত্র এবং অন্য একটি দল পরিচালনা করতেন গোবিন্দ রাগ এই দুই জনের যাত্রাই দেখেছি। যাত্রা আরম্ভ হ'ত সন্ধ্যা রাতে ভাঙতো তারপর দিন বেলা সাতটায়।

বেশ কয়েত বছর পূর্বে এই লেখক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় বর্ধমান জেলা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাতে উল্লেখিত ছিল, বাংলায় সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেটিকে কেউ আমলই দেনতন, অজেয় সংবাদপত্রের আলোচনা হলেই সমাচার দর্পণই প্রথম প্রকাশের সম্মান পায়। আজও বলছি এটি সঠিক তথ্য নয়। বয়ড়া নিবাসী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র রায় 'বাঙালি গেজেট' প্রকাশ করেন ১৮১৮ সালের ১৪ মে বয়ড়া থেকেই, সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮ মে ওই একই সালের।

মতিলালা রায়, যাত্রার প্রবর্তক। তাঁর জন্ম পূর্বস্থলী থানার ভাতশালী গ্রামে। এটিও লোক সাহিত্যের একটি বিশেষ অবস্থান। আজও মতি স্মরণীয়, স্মরণীয় দাশরথি রায়। আজও যাত্রা জগতে

স্মরণীয় একজন পরিচালকের নাম উচ্চারিত হয়, সেই শশী হাজরার বাড়ি তাতাড় থানার সন্তোষপুর গ্রামের। পাঁচালি, তর্জা, যাত্রা, লোকসংস্কৃতি এবং লোক সাহিত্যের নানা দিকের অশেষ দান বর্ধমানের।

পূর্বের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বৈষ্ণব সাহিত্যের কবিদের নাম উল্লেখ করেছি, উল্লেখ করেছি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ভারতচন্দ্র রায়ের কথা। 'মঙ্গলকাব্যের' ও পাঁচালী কাব্যের অধিকাংশ লেখক বর্ধমানের।

উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বর্ধমান রেখে গেছে মহান ঐতিহ্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ১৫.৭.১৮২০ থেকে ১৮.৫.৮৬ পর্যন্ত। তাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত পূর্বস্থলীর নিকট চুপি গ্রামের মানুষ। অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। এ ছাড়া চারুপাঠ থেকে শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন, ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যারও বই আছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলায় প্রথম গ্রন্থ পদার্থবিদ্যা।

এখনও আমরা বিশেষ একটি কবিতার একটি লাইন আওড়াই—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" সেই কবিতার কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) কালনার নিকট বাঁকুলিয়া গ্রামের মানুষ। 'সংবাদ প্রভাকর' ও এডুকেশন গ্যাজেট অবলম্বন করে তাঁর সাহিত্য কর্ম শুরু। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'শুর সুন্দরী', 'কর্মদেবী' ইত্যাদি প্রথম ব্যক্তি (?) যিনি সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম রাজকৃষ্ণ রায়। তিনি ছিলেন মাহাত্তো রামচন্দ্রপুরের মানুষ। তিনি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, উপন্যাস ও থিয়েটারের নাটক লেখেন। 'পতিব্রতা', 'তরণী সেন বধ' 'দ্বাদশ গোপাল', 'বামনভিক্ষা', 'লায়লা মজনু' আগমনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রামচরণ মিত্র (১৮৪৭-১৯২৬) ছিলেন গোদা গ্রামের মানুষ। আইন পাশ করে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় নেমে পড়েন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইংরাজিতে, নাম Law of Joint Property এবং Partition in British India। রায়বাহাদুর রসময় মিত্র (১৮৫৯-১৯৩১) মঙ্গলকোট থানার চানক গ্রামের মানুষ। শিক্ষা জগতের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হিন্দু স্কুলের অন্যতম পরিচালক।

রেভাঃ লালবিহারী দে ছিলেন সোনাপলাশী গ্রামের মানুষ সুবর্ণ বণিক কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর সম্পাদিত বেঙ্গল মেগাজিন, লোকসাহিত্যের ও চাষী জীবন নিয়ে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। তবু নাম দুটি দিলাম। একটি হল, Folk Tales of Bengal এবং Govind Samanta or The History of Bengal Raiyat, তাঁর সংকলিত Recollection of Alexander Duff লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়, এঁর জন্ম ১৮২৪ মৃত্যু ১৮৯৪।

যোগেশচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) ইলসরা (মেমারি) থানার মানুষ তাঁর রচিত শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, কালাচাঁদ, মডেল ভগিনী ইত্যাদি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) মেমারি থানায় বড়ারগ্রামের মানুষ। মুর্শিদাবাদ জেলার নাসিপুর থেকে প্রকাশিত বিনোদিনী পত্রিকায় ভুবনমোহিনী ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল দ্রৌপদী নিগ্রহ, আর্যসঙ্গীত, সিন্ধুদূত।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাটিকুরির গ্রামের মানুষ। জন্ম মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে, এঁকে পাঁচুঠাকুর বা পঞ্চানন্দও বলা হত। আইন পাশ করে আইন ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'উৎকৃষ্ট মাধ্যম', 'ভারত উদ্ধার', 'কল্পতরু', 'ক্ষুদিরাম', 'হাতে হাতে ফল', 'জাতিভেদ', 'যাছনার আইন', 'পাঁচুঠাকুর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। সাহিত্যিকগণ পাঁচুঠাকুরের হুল ফোটানোর ভয়ে এড়িয়ে চলতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ওঁকে বলতেন Holleys Comet. বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র (মাজিদা গ্রাম) কর্মসূত্রে এলাহাবাদে বাস করতেন এবং সেখান থেকেই সমকালীন অর্থনীতি নিয়ে দুটি বই 'অপচয় ও উন্নতি' প্রকাশ করেন। আঝাপুর (মেমারি) গ্রামের দত্ত পরিবার রামবাগানে গিয়ে বাস করেন। সেই হিসেবে রমেশচন্দ্র দত্ত ও তরু দত্ত বর্ধমানের মানুষ। কিন্তু তা বোধহয় বলা যায় না, কেননা, রমেশচন্দ্র বা তরু দত্ত জন্মেছেন রামবাগানেই।

বর্ধমানের কবিকুলের মধ্যে আছেন ছন্দের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, বৈষ্ণবাদর্শের কবি কালিদাস রায়। এঁদের পরিচয় সবাই জানেন, এখনও বিস্মরণের ক্ষেত্রে যাননি।

কাটোয়ার সন্তান বসন্ত চট্টোপাধ্যায় সুকবি ছিলেন। ইনিই বোধহয় 'দীপালি' নামে একটি সিনেমা-সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এতে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কালিদাস নাগ লিখতেন। এই লেখকও 'দীপালি'র লেখক ছিলেন।

ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ মুখার্জি তাঁর মাতুলালয় অণ্ডালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই কয়লা 'কুঠি' নিয়ে উপন্যাস লেখেন। অঝাপুর নিবাসী কৃষ্ণকান্ত দে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য রচনা করতেন। অমরারগড়ের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন। বাঙ্গালার প্রামানিক ইতিহাস লেখেন কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কাটোয়া থানার দুর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় দুটি ছাত্রকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এঁরা হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মেমারী থানার আমোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সারা ভারতের অত্যন্ত পরিচিত ঐতিহাসিক। রাধাকমলও এই গ্রামেরই মানুষ। পূর্বস্থলী থানার চক ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে দুর্গাদাস লাহিড়ী চতুর্বেদ বাংলায় অনুবাদ

করেন। এবং পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা করেন। তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায় 'লাহিড়ী' পদবী কী বর্ধমানের?

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চুরপুনীবাসী। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক। ১৯৪৫-৪৯ পর্যন্ত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ড. স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারি কালাজ্বরের প্রতিষেধক 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' বের করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস পূর্বস্থলীর নিকট স্বরডাঙ্গা গ্রাম।

মহিলাদের মধ্যে নীরদমোহিনী বসু সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। বেরুগ্রাম (বর্ধমান) বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর স্বামী, পারিজাত, বামাবোধিনী, ছায়া ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ।

শৈলবালা ঘোষজায়া (মেমারী) প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে আসানসোলে ড. পরিমল ঘোষের বাড়িতে মারা যান।

রমাপদ চৌধুরী ঔপন্যাসিক বর্ধমানের মানুষ। সকলের উপরে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ড. সুকুমার সেন বর্ধমানকে গৌরবান্বিত করেন। ইনি গোগনের মানুষ। ড. কালীকিংকর সেন ছিলেন কবি। উখরায় তাঁর বাড়ি।

এতক্ষণ যাঁদের উল্লেখ করলাম তাঁদের জন্ম বর্ধমানে হলেও তাঁরা সারা বাংলারই সন্তান এবং কবি সাহিত্যিকরা যখন বর্ধমানে জন্মালেন, তখন সাহিত্যের আদর সম্মান পৃষ্ঠপোষকতা রাজসভা থেকে জনসভায় চলে এসেছে এবং তাঁদের জন্য একটি কেন্দ্রও স্থাপিত হয়ে গেছে কলকাতায়। কাজেই অধিকাংশ কবি সাহিত্যিককেই কলকাতায় ছুটতে হল। সারা বাংলার ঐতিহ্য গড়ে তুললেন। এবং প্রেরণা নিশ্চয়ই পেলো বর্ধমান জেলার পরবর্তী শিল্পী সাহিত্যিকরা এবং এটা ঠিক নয় যে আর কেউ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। একটা কথা ঠিক যাঁরা বর্ধমানের মহকুমায়, গ্রামে সাহিত্য করেন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কাগজের নিয়মিত লেখক হয়েও থেকে গেলেন অপরিচিতের দলে। এরও কারণ আছে। যখন জনসভায় এলো সাহিত্য, তখন আর এক জন মহারাজ বা নবাব পৃষ্ঠপোষক থাকলেন না, এলেন একদল ব্যবসায়ী, যাঁদের হাতে পড়তে হল সাহিত্যিকদের। এঁরা প্রকাশক, এবং প্রচারকও। তাঁরা দেখলেন মুনাফা। যে সব সৌভাগ্যবান সাহিত্যিক পণ্ডিতের নাম করে গেলাম তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপক। অতএব প্রকাশকরাও তাঁদের বই ছাপাতে লাগলেন। এর সঙ্গে আছে মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশ এবং মতামত সংগ্রহ করার ব্যবস্থা। একশ্রেণীর প্রকাশক আবার নির্দেশ দিয়ে কী ধরনের বই লিখতে হবে তাও বাৎলে দেন। বই প্রকাশিত হয়। কাজেই মফঃস্বলের লেখকরা যেহেতু কলকাতায় বসে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারেননি, তাঁরা বৃহত্তর বঙ্গ থেকে থাকলেন অপরিচিতের দলে।

তারপর এলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন যুগান্তকারী ঘটনা সব। মোড় নিলো সাহিত্য সংস্কৃতিও। তখন তাদেরও হল জোট বাঁধতে। প্রগতি-বিরোধী ফ্যাসীবাদ পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতাকে ধুয়ে মুছে দিতে উদ্যত হল, তখন শিল্পী সাহিত্যিকদেরও আসতে হল এগিয়ে, ১৯৩৬ সালে হল সারা ভারত প্রগতি লেখকদের সম্মেলন। সমস্ত জাতির যাঁরা জীবনের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁরা হলেন একত্রিত। বাংলায় হল প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ—এ দুটির শাখা তৈরি হয় বর্ধমান জেলার আসানসোলে। প্রগতি লেখক সংঘ হয় ১৯৪৫ সালে আর গণনাট্য সংঘ ১৯৪৭ সালে। আসানসোলে প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকরা এলেন। এসব ইতিহাস দীর্ঘ। এই সকলের মধ্যেই ঠিক কোন সালে বর্ধমানে Little Mag-এর জন্ম হয় জানি না। একদল তরুণ সাহিত্যিক কবি নিরলসভাবে Little Mag-কে অবলম্বন করে সাহিত্য করে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই তাদের অর্থ নেই। বিজ্ঞাপন বড়ো একটা পান না, তবু প্রাণের উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে দুঃখকে জয় করে। যেদিন সমাজে শ্রেণী বিভাজন রয়ে গেলো, সেদিন সাহিত্যিককেও বেছে নিতে হল কোন শ্রেণীর সে সেবা করবে—এই প্রশ্ন। পূর্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল মূল প্রশ্ন তাই তার বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীই ছিলেন সোচ্চার কিন্তু স্বাধীনতা আসার পরে রাষ্ট্রশক্তিকে যে শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, সেইদিন লেখক শিল্পীদেরও বেছে নিতে হল কোন পথে যাবেন তিনি। দ্বন্দ্বের মূলে দেখা দিল সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে।

এই নিয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও দেখা দিল। বড় বড় আন্দোলন সংগঠিত হল। অবশেষে সারা দেশে নেমে এল নির্যাতন বল্গাহীন, পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস—তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন, লেখক শিল্পীরা—গঠিত হল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মেলন, পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পীসংঘ। সারা পশ্চিমবাংলায়, তার শাখা, অসংখ্য সাহিত্যিক শিল্পী হচ্ছেন সংগঠিত। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ১৯৭৭ সালে গঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। এরা সংস্কৃতি বলে একটি দপ্তরই খুললেন। এদের মূল লক্ষ্য—সংস্কৃতির ঠিকানা। এরা জানেন, মফঃস্বল বা গরিব নাগরিকের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, তাঁরা বই প্রকাশ করতে পারেন না, তাই প্রসারিত করলেন সাহায্যের হাত। বইপ্রকাশে অর্থসাহায্য করতে শুরু করলেন। ঠিক আজকের সারা বাংলাব্যাপী হিসেব হয়তো হয়নি, কিন্তু হওয়া প্রয়োজন। আগের তুলনায়—বর্ধমান জেলায় শিল্পী সাহিত্যিকের সংখ্যা অনেক বেশি অনেক আশা অনেক প্রতিভার মুখ যাচ্ছে দেখা। সরকার, উনবিংশ শতাব্দীর স্মরণীয় বরণীয়দের নামে নানা পুরস্কারের প্রবর্তন করেছেন, আগে শুধু ছিল রবীন্দ্রপুরস্কার, এখন বিদ্যাসাগর পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, দীনবন্ধু পুরস্কার, এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত নাটক আকাডেমি পুরস্কার

দিয়ে থাকেন, আচার্য দীনেশ সেন স্মৃতিপুরস্কার। কলকাতা বাদ দিয়ে আজ বাইরের জেলার লেখক শিল্পীরা পুরস্কৃত হচ্ছেন। আজ গণতান্ত্রিক সাহিত্য সংগঠন জেলায় জেলায় কত হয়েছে, সে বিষয়ে লিখিত কোনও দলিল নেই সত্য। তবে কোনও গবেষকের এই কাজটি এখুনি নেওয়া উচিত।

আজ যেমন অতীতের ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নতুন কালের নতুন লেখক শিল্পীরা এসেছেন, তেমনই, আগামীদিনের লেখক শিল্পীরা এখনকার উত্তরাধিকার বহন করবেন।

সংস্কৃতি যেমন নিজেকে পালটায়, তেমনই সমাজকেও সংস্কৃত করে, বর্ধমানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটি সমাজ যা অতীত ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে এসেছে। এরা রুচিশীল। এই সমাজের সঙ্গে এসে মিশেছে অন্য সব জেলার সামাজিক মানুষ। বর্ধমান তাদেরও আপন করে নিয়েছে। এর উদাহরণ অপ্রতুল নয়।

আজ বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, বাইরের থেকে কত পণ্ডিত অধ্যাপক এসেছেন, কেউ কেউ বর্ধমানেরই বাসিন্দা হয়ে গেছেন, সামাজিক রুচিশীল মানুষ এঁরা, তেমনই মেডিক্যাল কলেজ, এনেছেন কত জেলার উৎকৃষ্ট চিকিৎসকদের, তাঁরা কেউ কেউ গেছেন থেকে, হয়েছেন বর্ধমানের মানুষ—মিশে গেছেন ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজজীবনে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। পবিত্র সরকার—লোকভাষা, লোক সংস্কৃতি, 'চিরায়ত' প্রকাশন, পৃঃ ৯

২। Herskoviti, Melville, J. 1966, Cultural Dynamics, New York, Alfred A Knopt, P. 4.

৩। পবিত্র সরকার, লোকভাষা, লোক সংস্কৃতি, পৃ. ২০

৪। ড. ক্ষুদিরাম দাস রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় মল্লিক ব্রাদার্স প্রস্তাবনা, পৃ. ৩

৫। ড. ক্ষুদিরাম দাস, রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, মল্লিক ব্রাদার্স প্রস্তাবনা, পৃ. ৩ ও ৪

৬। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪

৭। রামগতি ন্যায়রত্ন, বাংলাভাষা, পৃ. ৪৯-৫০ ও যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান, ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধনে চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস।

৯। ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (আনন্দ পাবলিশার্স) পৃ. ১২০-১২১

১০। ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (আনন্দ পাবলিশার্স) পৃ. ১১৬

১১। ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (আনন্দ পাবলিশার্স) পৃ. ৩০০-৩০২

১২। গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর।

দামোদরের বুকে স্নান দৃশ্য
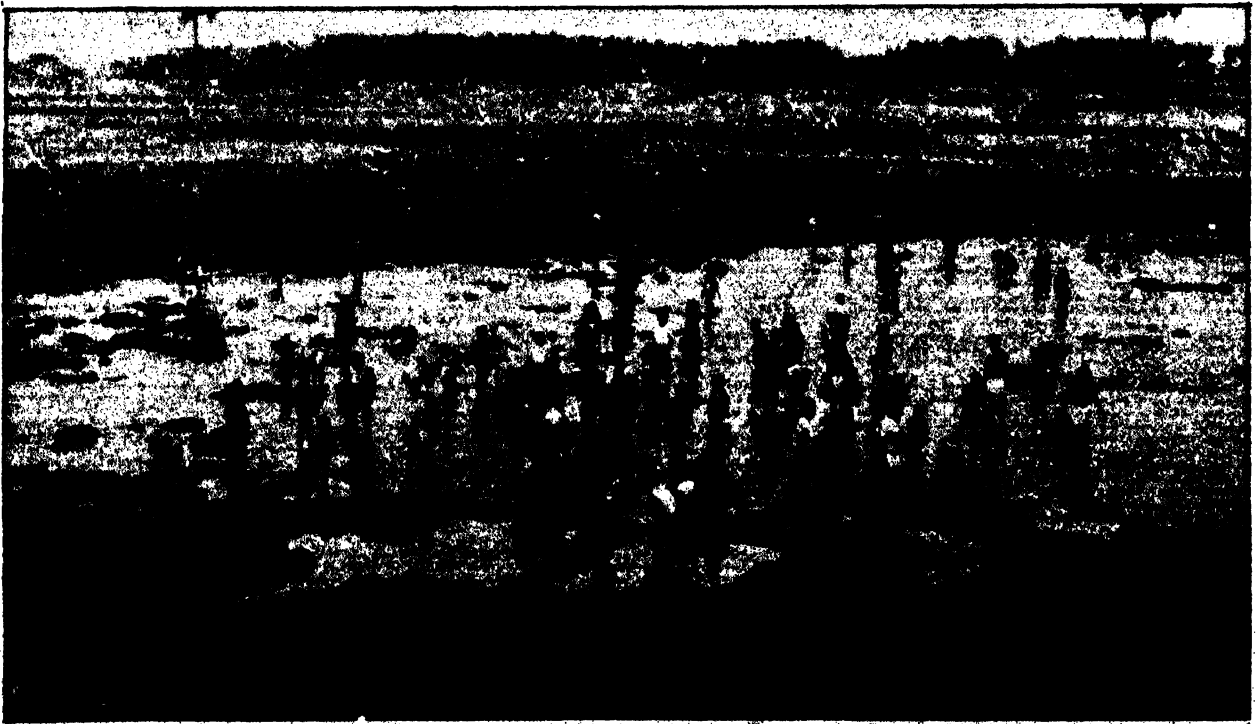
বর্ধমান জেলার সাহিত্যচর্চা

বারিদবরণ ঘোষ

'বর্ধমান জেলার সাহিত্য' বিষয়টির চৌহদ্দি সুবিস্তৃত এবং অবশ্যই কিছুটা বিতর্ক সৃষ্টিকারীও। এমনতর বিষয় নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনার অবকাশ আছে, পরিসর-নির্দিষ্ট প্রবন্ধের মধ্যে সুবিচার প্রতীক্ষিত হলেও প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং, সসঙ্কোচে এই প্রবন্ধ রচনা করতে হচ্ছে। সাহিত্যচর্চার আদি বা মধ্যযুগ নিয়ে ততখানি সঙ্কোচ নেই, কিন্তু সাম্প্রতিককাল নিয়ে হয়তো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ঘটে যেতে পারে। এত বড় জেলার সাহিত্যচর্চা নিয়ে অনেকখানি সংবাদ হয়তো জানা যায়, কিন্তু সবখানি যেমন জানা যায় না, তেমনই জ্ঞাত বিষয়ের সবখানিও হয়তো পরিবেষণ করা যাবে না। আমার অনবধানতাই এর জন্যে দায়ী থাকবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে অনুল্লেখের তালিকাবদ্ধ করিনি—এটুকু কৈফিয়ৎ তাই সূচনাতেই দিয়ে রাখতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান অন্যতম। নানা সময়ে এর সীমানার তরি-তফাৎ ঘটে গেছে। ফলে কোনও একজন লেখক বর্ধমান জেলারই নিজস্ব—এমন কথা বলায় ঝুঁকি আছে। এখন থেকে তিনশো বছর আগে যেটি বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা হয়তো পরে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী হয়ে গেছে। এটা একটা সমস্যা। তা ছাড়া, গৌরবান্বিতের গৌরবছটা সবাই পেতে চান।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী জন্মসূত্রে বর্ধমান জেলার দামিন্যার লোক (যাঁরা হুগলি জেলার লোক ভাবেন—তাঁরা সম্ভবত ঠিক ভাবেন না) কিন্তু জীবনাতিবাহিত করেছেন মেদিনীপুর জেলাতে। দুই জেলাই তাঁকে তাঁদের মানুষ বলে দাবি করবেন এবং এই দাবি সঙ্গতও। ফলে আমাকে এই প্রবন্ধে জন্ম এবং কর্ম (সাহিত্যচর্চা বিশেষত) জীবন—দুই সূত্রেই একজন লেখককে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। অন্য জেলার লোকেরা দাবি করলে—আমি না করতে পারি না।

এ ছাড়া 'সাহিত্য' বিষয়টি নিয়েও খুব একটা সমস্যা আছে। কোন বিষয়টি সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করে ঠাঁই করে নিয়েছে, কোনটির স্থান সাহিত্যের সীমানার বাইরে—এ নিয়ে কোনও ফতোয়া দেওয়া যায় না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে সাহিত্যের আঙিনায় আনলে সত্যনারায়ণের পাঁচালীকে আনা যাবে, কী যাবে না। এ বিতর্কে তাই আমি যেতে চাইনি। যা গৌরবের বস্তু হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে বা জনমনে স্থান করে নিয়েছে তাকে অবহেলা করা অনুচিত। এই নিরিখেই অনেক সাহিত্যসেবীকেই 'সাহিত্যিক' হিসেবে মাঝে মাঝে ভেবে নিতে হয়েছে।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ বিভাগ আছে—আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ। মধ্যযুগকে আবার আদি-মধ্য ও অন্ত্যমধ্য যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। আধুনিক যুগও আবার প্রাক্ রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ নামে চিহ্নিত। অধুনা যে সাহিত্যের চর্চা চলছে তাকে সাম্প্রতিক সাহিত্য বলাই সঙ্গত। এই শেষোক্ত পর্বটি সবচেয়ে বিতর্কিত। কারণ যা চলছে তার পরিণাম ঘোষণা অনুচিত। সুতরাং যা চলছে—তার চলিষ্ণু লক্ষণটিকেই ধরে রাখতে চেয়েছি। এ পথের পথিক অসংখ্য।

আদি যুগের সাহিত্য হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে—তার সঙ্গে বর্ধমানের যোগ সম্ভবত নেই। চর্যাগীতিকারেরা কেউ বর্ধমানের ছিলেন কিনা বলতে পরি না। আদি-মধ্য যুগের কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও বর্ধমানের কিনা বলা অসম্ভব, অন্তত বলার মতো প্রমাণ নেই, যদিও একাধিক 'চণ্ডীদাস' বর্ধমানে ছিলেন বলে জানা গেছে। বর্ধমানের আদি-সাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্য যুগ থেকেই সূচিত হয়েছে। এটাই স্থানীয় সাহিত্যের পরিচয়-লিপি। এই স্থানীয় সাহিত্য একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণের তৎকালীন দলিল হয়ে ওঠে। তবে 'স্থানিক' হয়েও সর্বজন বা বহুজনগ্রাহ্যতার কারণে তা একটি সর্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদামণ্ডিতও হতে পারে। কাশীরাম দাসকে তাঁর জন্মভূমির মধ্যে আর কিছুতেই আবদ্ধ করে রাখা যায় না। স্থানিক গুরুত্ব ক্রমশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকতায় পরিণত হয়। বিস্তার ও প্রাচীনত্বের বিচারে বর্ধমান জেলা যেমন গৌরবজনক স্থানের অধিকারী—সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব তেমনই অপরিসীম।

আমাদের দেশে সাহিত্যচর্চার শুরুতে সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ আবশ্যিক হয়ে থাকে। 'বর্ধমানের সংস্কৃতচর্চা' একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলেও তা যেহেতু একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবি রাখে, সে জন্যে এ বিষয়ের আলোচনায় আমি নিবৃত্ত থেকেছি। না হলে 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' থেকে শুরু করে ভবদেব ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি দাসসরকার, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও তস্য প্রপৌত্র ঘনশ্যাম দাস, পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর, নৃসিংহদাস তর্কপঞ্চানন, রঘুনাথ শিরোমণি, বুনো রামনাথ, রামরসায়ন-প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামী, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রমুখের সংস্কৃতচর্চার বিশদ বিবরণ দিতে হত। আমাদের আলোচনা বাংলা সাহিত্য নিয়ে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মুখ্যত চার প্রধান 'মঙ্গলকাব্য' (মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, অন্নদা), অনুবাদ কাব্য—রামায়ণ-মহাভারত, পদাবলী সাহিত্য, বৈষ্ণব-শাক্ত, চৈতন্য-জীবনী কাব্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে। এটা একটা সমাপতন কিনা জানি না, কিন্তু এই প্রতিটি শাখাতেই বর্ধমান জেলার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দান আছে। কেতুগ্রামের চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাল-তারিখযুক্ত মধ্যযুগীয় কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর কবি মালাধর বসু যে খোদ বর্ধমানেরই লোক ছিলেন সে বিষয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। তাঁর কাব্য রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকে কোনও হেঁয়ালি নেই—অঙ্কস্য বামগতির কোনও অঙ্কপাত নেই—

> তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
> চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যে'-র রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ। মালাধরের জন্মস্থান হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের মেমারি স্টেশনের কাছে কুলীন গ্রাম, যে গ্রামটি সম্পর্কে চৈতন্যদেব মন্তব্য করেছিলেন—

> কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
> শূকর চড়ায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥

আর মালাধরের বংশজকে তিনি বলেছিলেন—

> তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
> সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর॥

মালাধরই বর্ধমান জেলাকে সাহিত্যের প্রথম জয়মাল্যটি পরিয়ে দিয়েছিলেন পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে।

তাঁর সমসাময়িককালেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দুটি ধারা বিশেষভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল—মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবকাব্যের প্রবাহ। সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্ভবত বর্ধমান জেলার লোক ছিলেন (হুগলি জেলাও তাঁকে দাবি করেন)। তবে তাঁর কাব্যে বেহুলার মান্দাসের যাত্রাপথের যে বিবরণ আছে তার অধিকাংশই আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে। যেমন পুরনো দামোদরের খাত বেয়ে বেহুলার ভেলা ভেসে যাচ্ছে—বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকা-গাঙুরের তীরে তীরে। এদিক

থেকে বর্ধমান জেলা কবিকে দাবি করে বসলে তাকে অস্বীকার করা মুশকিল। এমনই মঙ্গলকাব্যের অপর এক কবি, যাঁর কাব্যের নাম জগতীমঙ্গল, রসিক মিশ্রের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমে সেনভূম পরগনায় কাঁকুটিনন্দনপুর গ্রামে। বাঁকুড়া জেলাও তাঁকে দাবি করেন, কারণ পরবর্তীকালে তিনি বাঁকুড়াতেই বসবাস করেন।

এমনতরই মুকুন্দ চক্রবর্তীকেও দাবি করেন মেদিনীপুর জেলা। এ বিষয়ে বর্ধমান জেলা একটু আপত্তি করেন। কবি জন্মসূত্রে বর্ধমানের অধিবাসী। ঘটনাচক্রে তাঁকে স্বদেশভূমি ছেড়ে মেদিনীপুর জেলার আড়রায় আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁর সাহিত্যচর্চা শুধু আড়রাতে আবদ্ধ ও সমাপ্ত হয়নি। কবি জন্মভূমি দাবিন্যা বা দামুন্যাতে বসেও তাঁর চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়মঙ্গলের সূচনাংশের অনেকখানিই রচনা করেছিলেন। কবিকঙ্কণ তাই বর্ধমান জেলার গৌরব। কবি নিজেই বলে গিয়েছিলেন—'দামুন্যায় করি কৃষি।' এখানে যাঁর তালুক ছিল সেই গোপীনাথ নন্দী বাস করতেন দামোদরের পূর্ব তীরে জামালপুর থানার অন্তর্গত সেলিমাবাদ শহরে। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য রচিত হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে দুই প্রধান কবি রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার মানুষ ছিলেন। অন্য জেলা কোনক্রমেই এঁদের উপর দাবি উচ্চারণ করতে পারে না। রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে কাইতির পাশে শ্রীরামপুরে—দামিন্যা থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। সেখানে তাঁর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি টোল ছিল। কাছেই পলাশনের বিল। এখানে থেকেই কবি ধর্মঠাকুরের আদেশ পেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য লেখেন। পরে তিনি এই জেলারই উচালন কাজিপাড়ায় বাস করতেন। বাল্যকালে পড়তে যেতেন চার কিলোমিটার দূরে শাকনাড়া (প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জন্মস্থান) গ্রামে। শোনা যায়, পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি এক হড়্ডিপ তনয়ার প্রতি আসক্ত হন। রূপরামের কাব্যের পুঁথি সমগ্র বর্ধমান বিভাগের নানা স্থানে মিলেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে শিক্ষিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কৈয়ড় পরগনায় কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণ তীরে—বর্ধমান শহর থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দক্ষিণে। তাঁর মাতুলালয় ছিল রায়না। ঘনরাম নিজে বর্ধমান মহারাজার বৃত্তিভোগী ছিলেন। আত্মপরিচয়ে তিনি লিখেছিলেন—

> জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়
> মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়।
> আশীর্বাদ করি তার বসিয়া বারামে
> কইয়ড় পরগনা বাটি কৃষ্ণপুর গ্রামে॥

মহারাজার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই তিনি সম্ভবত লিখেছিলেন—'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।'

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপর এক কবি নরসিংহ বসুর পৈতৃক নিবাস ছিল বসুধা গ্রামে। পানাগড় থেকে ইলামবাজার যাবার পথে অজয়নদীর উপর সেতুর প্রবেশমুখে। বসুধা থেকে তাঁর পিতামহ এসে বাস করেন বর্ধমান শহরের আট কিলোমিটার দক্ষিণে শাঁখারিতে—ঘনরাম বাসভূমি কৃষ্ণপুরের কাছে। কাব্যে নরসিংহ বসুও প্রথমে তাঁর পোষ্টা শাঁখারির জমিদার ও বর্ধমানের মহারাজার প্রশংসা করে গেছেন—

> অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
> জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

তিনি মুকুন্দের জন্মভূমি দামিন্যাতেও গিয়েছিলেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য আরম্ভ হয়।

কবি হৃদয়রাম সাউ তাঁর ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন ২ আশ্বিন ১১৪৬ সনে। এঁর পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে, বনপাশ স্টেশনের কাছে। সেটি ছিল অবশ্য তাঁর মামারবাড়ি। অনাথ হৃদয়রাম মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন। পরে মামাদের সঙ্গে ঝগড়া হলে চলে আসেন বীরভূমের নানুর থানার উচকবণ গ্রামে। নিজের গ্রাম বলতে তিনি খুরুলকেই মনে করতেন। তাঁর কাব্যে আছে—

> নিরঞ্জন চরণে সদাই অভিলাষ।
> ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস॥

ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি রামকান্ত রায় সম্পর্কে বর্ধমানরাজ পৃষ্ঠপোষিত সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করব। শুধু মনে রাখব ধর্মমঙ্গলের বল্লুকানদী এবং ঢেকুরগড়—দুই-ই বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত।

॥ ৩ ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল অনুবাদমূলক কাব্য। এই শাখায় উল্লেখযোগ্য অনুবাদগুলি রচিত হয়েছিল দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতকে অবলম্বন করে। সেরা দুই অনুবাদক ছিলেন যথাক্রমে কৃত্তিবাস ওঝা এবং কাশীরাম দাস। এর মধ্যে একা কাশীরাম দাসই বর্ধমান জেলাকে সাহিত্যের চির অমরাবতীতে স্থান করে দিয়ে গেছেন। তাঁর গ্রামের নাম সিঙ্গি, না, সিদ্ধি নিয়ে পণ্ডিতেরা বিবাদ করতে থাকুন। আমরা অবশ্য করে জানি বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকটস্থ সিঙ্গি গ্রামের কাশীরাম দাস মহাভারত পাঁচালী লিখে বাংলা সাহিত্যের সমুন্নতি ঘটিয়ে গেছেন। আসলে তাঁরা তিন ভাই-ই—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম এবং গদাধর দাস সাহিত্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। এঁদের মধ্যে গদাধর দাস লিখেছিলেন জগন্নাথ মঙ্গল বা জগৎমঙ্গল। গদাধরের আত্মপরিচয়ে অবশ্য অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঠাকুরের 'সেবাভূমি' সিদ্ধি (বা সিঙ্গির) গ্রামের উল্লেখ আছে। অন্যপক্ষে কাশীরাম যদি 'সিঙ্গির' লোক হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই বর্ধমানের দাবি অগ্রগণ্য হবে। কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে পুত্র) দ্বৈপায়ন দাসও মহাভারতের

অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। তবে মহভাপ চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের নারীপর্বের অনুবাদ করেছিলেন বর্ধমানেরই অপর এক কবি রামলোচন। রামায়ণ এবং দুর্গাপঞ্চরাত্রের অনুবাদক জগদ্রাম রায় এবং রামপ্রসাদ রায় সম্পর্কে ছিলেন পিতা ও পুত্র। এঁরা ছিলেন বর্ধমানের দামোদরের তীরবর্তী ভুলুই গ্রামের অধিবাসী। আর একটু পরবর্তীকালের সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাংলা লেখকদের মধ্যে গ্রন্থ সংখ্যায় যিনি অগ্রগণ্য ছিলেন—সেই রঘুনন্দন গোস্বামীর বাড়ি ছিল মানকর রেল স্টেশনের কাছে মাড়ো গ্রামে। তাঁর লেখা বিখ্যাত বই 'রামরসায়নে'র রচনাকাল ছিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি।

॥ ৪ ॥

একথা বোধকরি সানন্দে এবং তর্কাতীতভাবে বলা যায় যে, বৈষ্ণব কবিদের এক বৃহত্তর অংশের বসবাস ছিল বর্ধমান জেলাতেই। চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে কৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসুর কথা আগেই বলে এসেছি। চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে চৈতন্যের প্রথম জীবনীকার বৃন্দাবন দাস জন্মসূত্রে অবশ্যই বর্ধমানের মানুষ নন। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষাংশ—তাঁর গুরু নিত্যানন্দের তিরোধানের পর—কেটেছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দেনুড়ে (মন্তেশ্বরের কাছে)। কথিত আছে, তাঁর গুরু নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের কাছে মুখশুদ্ধি চাইলে, বৃন্দাবন পূর্বসঞ্চিত হরীতকী তাঁকে এনে দিলে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনকে এই সঞ্চয় বৃত্তির কারণে তিরস্কার করে দেনুড়েই থাকতে নির্দেশ দেন। দেনুড়েই বৃন্দাবনের নামে যে শ্রীপাট গড়ে ওঠে, তা অদ্যাপি বর্তমান আছে।

বৃন্দাবনকে বর্ধমানের কবি বলব কিনা, এ বিষয়ে দ্বিধা থাকতে পারে। কিন্তু চৈতন্যদেবের অন্যতম মুখ্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কারণ নেই। অবশ্য যে জীবনী লিখে তিনি বিখ্যাত, তা রচিত হয়েছিল বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে—সুদূর বৃন্দাবনে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাড়ি ছিল কাটোয়ার অনতিদূরে (কাটোয়া-বারহারোয়া রেলপথে) ঝামটপুরে। তাঁর জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার সূচনা হয়েছিল এই গ্রামেই। অগ্রজের সঙ্গে রাম ও কৃষ্ণের গুরুত্ব বিষয়ে কলহের কারণে মনোকষ্ট পেয়ে তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে ষড় গোস্বামীর সঙ্গী হয়ে তাঁর সুপরিচিত কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন।

জন্ম ও কাব্যসূত্রে আবশ্যিকভাবে বর্ধমানের কবি ছিলেন চৈতন্যের অপর দুই জীবনীকার জয়ানন্দ দাস এবং লোচন দাস। জয়ানন্দের বাড়ি ছিল মধ্য রাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে। ড. সুকুমার সেন অনুমান করেছেন—এটি সাতগেছে থানার অন্তর্গত বড়োয়া গ্রামের কাছেই ছিল। অবশ্য তাঁর কাব্যে—'বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে/আমাইপুরা তার নাম' বলে যে উল্লেখ আছে, সেই বর্ধমান আধুনিক বর্ধমান শহর অবশ্য নয়। সুবুদ্ধি মিশ্রের সন্তানের ডাকনাম ছিল 'গুয়ে'। চৈতন্যদেব মানুষের অমর্যাদা সহ্য করতে পারতেন না—তাই এই নিকৃষ্ট নামটির বদলে নামকরণ করেন জয়ানন্দ। জয়ানন্দের মা রোদনীর হাতে রান্না খেয়ে চৈতন্য একদা পরম পুলকিত হয়েছিলেন। জয়ানন্দ বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর চৈতন্য মঙ্গলের কারণে। এই কাব্যেই স্পষ্টত উল্লিখিত আছে চৈতন্যের পূর্বপুরুষ ওড়িশার যাজপুর থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং তাঁর কাব্যেই চৈতন্যের তিরোধানের সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখিত হয়েছিল।

চৈতন্য মঙ্গলের অপর কবি লোচন দাসের পিতৃকুল ও মাতৃকুল—উভয়েরই বসতি ছিল আধুনিক মঙ্গলকোটের কাছে কোগ্রামে (এই বংশেই জন্মেছিলেন আধুনিককালের কবি কালিদাস রায়)। তাঁর 'প্রেমভক্তিদাতা গুরু' নরহরিদাস সরকারের বাড়িও ছিল অনতিদূরে বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামে। নরহরি চৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বর্ধমান জেলাতেই জন্ম নিয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এক সমালোচিত তত্ত্ব 'গৌরনাগরবাদ'। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব কবিদের একটা বড় অংশ কাটোয়ার সন্নিকটস্থ এই শ্রীখণ্ড-কাঁদরা অঞ্চলেই বাস করেছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব মহাজনেরা বর্ধমানের গর্ব। নরহরি দাস ও তাঁর পুত্র রঘুনন্দন, 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' গোবিন্দ দাস কবিরাজ ও তাঁর পুত্র দিব্য সিংহ, কবিশেখর, বলরাম দাস প্রমুখ কবিরা প্রণম্য। পূর্বস্থলী-দোগাছিয়া (ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলপথে পূর্বস্থলী স্টেশনের কাছে) গ্রামের কবি মনোহর দাস এবং বলরাম দাস, কাঁদরা গ্রামের কবি চণ্ডীদাস ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস, শশিশেখর-চন্দ্রশেখর, পাটুলি গ্রামের বংশীবদন চট্ট, অম্বিকা-কালনার কৃষ্ণদাস-ঘনশ্যাম দাস, কাউগ্রামের পরমেশ্বরী দাস, পরাণ গ্রামের রায়শেখর, মালিহাটি গ্রামের হেমলতা ঠাকুরানির শিষ্য যদুনন্দন দাস, শ্রীখণ্ডের 'মহাকবি' দামোদর সেন, 'রসকল্পবল্লী'র কবি রামগোপাল দাস—প্রত্যেকে বাংলা সাহিত্যে বর্ধমানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

চৈতন্যদেবের আরও একটি সুপরিচিত জীবনীকাব্য—'গোবিন্দ দাসের কড়চা' সম্পর্কে কিছু লিখতে একটু সঙ্কোচবোধ করছি। এর কারণ, কাব্যটিকে অনেকে 'জাল' কাব্য বলে ঘোষণা করেছেন। এই দাবি নিয়ে তর্ক করার অবকাশ নেই। এই গোবিন্দ কর্মকার ছিলেন একদা ছুরি-কাঁচি খ্যাত কাঞ্চন নগরের অধিবাসী। আর একটি প্রথা-বহির্ভূত শ্রীপাট সরগ্রামের শ্রীপাঠ এবং কবি সারঙ্গ সম্পর্কে সম্প্রতি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সাংস্কৃতিক ইতিহাসকার ভব রায়।

এই প্রসঙ্গে বাঘনাপাড়ার গোস্বামী প্রমুখদের ভূমিকার কথাও স্মরণযোগ্য। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে, অম্বিকা-কালনা থেকে তিন ক্রোশ পশ্চিমে বাঘনাপাড়ার প্রতিষ্ঠা ষোড়শ শতকের শেষে। এখানের চৈতন্য দাসের নামে পদকল্পতরুতে ষোলোটি

বৈষ্ণবপদ পাওয়া গেছে। তাঁর পিতা বংশীবদন ও খুল্লতাত নিত্যানন্দ দাস দু'জনেই পদ রচনা করে খ্যাত। বংশীবদন চৈতন্য অনুচর ও চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রায় ২৫টি পদের রচয়িতা। চৈতন্য দাসের পুত্র রামচন্দ্র দাস পাষণ্ড দলন, অনঙ্গ-মনহরী সম্পুটিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বংশানুক্রমে এই পদ রচনার ইতিহাস, অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। রামচন্দ্র ও শচীনন্দন দুই ভাই ছিলেন। শচীনন্দনের তিন পুত্রই কবি এবং পদকর্তা—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং শ্রীকেশব। এঁরা বাসু-মাধব-গোবিন্দ—তিন ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের মতই গণনীয়। বংশী শিক্ষা প্রভৃতির রচয়িতা প্রেমদাস এবং বিবর্তবিলাস প্রভৃতির লেখক অকিঞ্চন দাসও বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণব কবি।

॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে শাক্তগীতিগুলি শাক্তপদাবলী নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। শাক্তকবিগণ বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার পাশাপাশি (পরবর্তী সময়ে রচিত হলেও) বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত স্থানের অধিকারী হয়ে আছেন। শাক্তসাহিত্যেও বর্ধমান অগ্রণী স্থানের অধিকারী। হালিশহরের রামপ্রসাদের মতোই খ্যাতি নিয়ে সাহিত্যে তথা সঙ্গীত জগতে বর্তমান আছেন অম্বিকা-কালনার সুপরিচিত শাক্তগীতিকার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর মাতুলালয় ছিল খানা স্টেশনের অনতিদূরে চান্না গ্রামে। তিনি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদের আশ্রিত। তিনি এই কবিকে সসম্মানে এনে তাঁর সভাকবি হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে মহতাব চাঁদ তাঁর পদাবলী ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এখনও বর্ধমানের কোটালহাটে কমলাকান্তের কালীবাড়ি দ্রষ্টব্য স্থান। 'যা ভালো করেছ শ্যামা আর ভালোতে কাজ নাই/এখন ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই'—গানটি শুনলে কমলাকান্তের প্রতি বহুজন শ্রদ্ধানত হয়ে পড়েন।

বর্ধমান-ব্যান্ডেল মেন লাইনে দেবীপুর রেল স্টেশনের অনতিদূরে আলিপুর গ্রাম। সেখানে বাস করতেন প্রায় চারশো শাক্তগীতির রচয়িতা নীলাম্বর চক্রবর্তী। নবাই ময়রার (১১৯৯-১২৫১) শাক্তগানে কালী ও কৃষ্ণের পার্থক্য দূরীভূত হয়েছিল। বর্ধমান রাজসাহিত্য প্রসঙ্গে আরও কিছু শাক্ত কবির কথা বলা যাবে। বাঁধমুড়া বা বাদনুড়া-নিবাসী দাশরথি রায় বা দাশু রায় (১৮০৬-১৮৫৭) শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার হিসেবে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হন। এছাড়া বর্ধমানের মহারাজা, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। গানের সংগ্রহ ছাড়া ৬৮টি পালা গানের রচয়িতা দাশরথি তাঁর রচনার সাহায্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যবোধ, সমাজচেতনা ও ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। ধবনী গ্রামজাত ও গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২) ছিলেন দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য। নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই কবি অবশ্য শেষ বয়সে বীরভূমে হেতমপুরের রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্তীর আশ্রয়ে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে যাত্রাপালাকার ও বর্ধমানের তাতশালার বাসিন্দা মতিলাল রায়ের (১৮৪২-১৯০৮) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক যাত্রাপালা রচনায় দক্ষ মতিলালের পালাগুলির মধ্যে সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, কর্ণবধ প্রভৃতি পালা স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে আরও বহু কবি-সাহিত্যিকের নাম আমরা করতে পারিনি—যাঁরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সূচনায় বর্ধমানের সাহিত্যচর্চাকে মর্যাদামণ্ডিত করেছিলেন। কালিদাস রায় একদা ঝোঁকের মাথায় বলেছিলেন—

॥ ৬ ॥

এভাবেই আমরা কখন আধুনিক যুগে প্রবেশ করে গেছি। স্বভাবতই আমাকে বর্ধমান জেলার প্রয়াত এবং জীবিত লেখকদের সাহিত্যচর্চার কথা উল্লেখ করতে হবে। প্রয়াত সব লেখকদের উল্লেখ করা যেমন সম্ভব তেমনই আরও অসম্ভব জীবিত লেখকদের সকলের উল্লেখ। একটা নির্বাচিত লেখক তালিকা আমাকে করে নিতে হয়েছে। এই কাজের দায়িত্ব যাঁরই উপরে পড়ুক—কারও পক্ষেই সম্ভব নয় সকলের উল্লেখ করা। যাঁদের উল্লেখ করতে পারছি না—তার অন্যতম কারণ—অনেকের কথা আমার জানা হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অবহেলার কোনও প্রশ্নই এখানে নেই। আগামী যুগ তাঁদের মূল্যায়ন অবশ্যই করবে। তাছাড়া একটি প্রবন্ধের পরিসরে সকলকে উল্লেখ করা যায় না। সেজন্যে আগেই মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

এই আধুনিক যুগের একটি বিশেষ অংশে বর্ধমান মহারাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্মরণযোগ্য। এ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন ড. আবদুস সামাদ (বর্ধমান রাজ সভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য)। রাজবংশের কীর্তিচাঁদই (১৭০২-৪০) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রপাত করেন। জাহ্নবীমঙ্গল-প্রণেতা প্রাণবল্লভ ঘোষ, ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী (এঁর কাব্যই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে) কীর্তিচাঁদের বৃত্তিভোগী ছিলেন। বর্ধমানরাজ চিত্র সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন চিত্র চম্পূকাব্য রচয়িতা বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তিলকচাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেন কাঁচশালী গ্রামের কবি ব্রজকিশোর রায়। তেজচাঁদ বাহাদুর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন যুবরাজ প্রতাপচাঁদের গুরু (যাঁর জীবন অবলম্বনে বঙ্কিম সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছিলেন সুপরিচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' উপন্যাস) কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ও রঘুনাথ রায়ের কাব্যজীবন পরিচালিত হয়। প্রতাপচাঁদ নিজে শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন (আর কারে ডাকবো মাগো বা তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মন এ জগতে)। আবার কালী মির্জা প্রত্যাশিত অনুদান না পেয়ে বর্ধমান ত্যাগ করে হুগলিতে চলে যান। রাজপরিবারের পরাণচাঁদ কাপুর নিজে রচনা করেছিলেন হরিহর মঙ্গল। মহতাবচাঁদ নিজে শাক্তপদ রচনা করেছিলেন। বর্ধমান রাজসভার সর্বপ্রধান

লেখক ছিলেন অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি। সভাগায়ক ছিলেন 'নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে ছারেখার' শীর্ষক সংগীতখ্যাত ধীরাজ। মহারাজ বিজয়চাঁদ নিজে লেখক ছিলেন। 'ইউরোপে ভ্রমণ', 'বিজয়গীতিকা' প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ। তাঁরই প্রবর্তনায় বর্ধমান শহরে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি বাংলায় চমৎকার বক্তৃতা দেন। চৈতন্যপুরনিবাসী অধিবাস, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা রণজিৎ রায়চৌধুরি, কশনিবাসী নিত্যগোপাল সামন্ত, হলধরপুর নিবাসী প্রখ্যাত যাত্রাপালাকার ভৈরবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক গৌণবাধে রাজাশ্রয় পেয়েছিলেন।

॥ ৭ ॥

ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে জাতীয় চেতনার একটা নবভাব বিকশিত হতে আরম্ভ করে। বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামের কবি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) 'পদ্মিনী কাব্যে'র 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' গানটির মধ্যেই প্রথম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্ফুটবাক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা যাঁদের রচনাবলীকে ঘিরে রচিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমানের বুড়ার গ্রামনিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) 'শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী' ছদ্মনামে রচিত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তাঁর কবিতাবলী একসময়ে বঙ্গদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ 'লৌহসার'-ও তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) বাড়ি ছিল পূর্বস্থলীর কাছে চুপী গ্রামে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনা করে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের একদা প্রকাশিত মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার সুখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর স্বচ্ছ বিজ্ঞানবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের জন্য। আর ব্যঙ্গপ্রবণতা ও সমাজবোধ কবি হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন কাটোয়ার গঙ্গাটিকুরির (জন্ম হয়েছিল মাতুলালয় বর্ধমানের পাণ্ডুগ্রামে) কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ওরফে পাঁচু ঠাকুর। তাঁর 'ভারত উদ্ধার' ব্যঙ্গকাব্য অথবা 'কল্পতরু' উপন্যাস তাঁকে সুপরিচিত করে তুলেছিল। দীর্ঘকাল এই ব্যবহারজীবী কবি বর্ধমানের ওকড়শা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ওকালতিও করেছিলেন বর্ধমানে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন 'হেলির ধূমকেতু'। ১৩২০ সালে বর্ধমানে অষ্টমবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর তাঁর গঙ্গাটিকুরির বাড়িতে এর অধিবেশন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বর্ধমানে তৃতীয়বার এর অধিবেশন বসে খোদ বর্ধমান শহরেই ১৩৮০ সালে (৩৭তম অধিবেশন) আশাপূর্ণা দেবীর মূল সভাপতিত্বে।

ইতিহাস বা ইতিহাসাশ্রিত গ্রন্থ রচনা করে বর্ধমানের যে সব মনীষীখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে 'মধ্যযুগের বাংলার' সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস রচয়িতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। দুঃখের বিষয় এই ঐতিহাসিক কোনও বাংলা চরিতাভিধানে স্থান পাননি। আর এক ঐতিহাসিক জন্মসূত্রে নদীয়ার অধিবাসী হলেও কর্মসূত্রে কাটোয়া মহকুমাবাসী দুর্গাদাস লাহিড়ি (১৮৫৩-১৯৩২) সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনার প্রয়াসের দ্বারা। এ ছাড়া কানিংহামের বিখ্যাত 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাসে'র অনুবাদক হিসেবেও তিনি সুখ্যাত। সাতখণ্ডে ভারত ইতিহাসের নানা পর্যায়, স্বাধীনতার ইতিহাস, রানী ভবানী, বাঙালির গান প্রভৃতি গ্রন্থের কারণেও তিনি বিখ্যাত হয়ে পড়েন।

এমনই খ্যাতিমান ছিলেন বর্ধমানের ইলসবা গ্রাম-জাত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশ ও সুলভমূল্যে তার প্রচার ছাড়া মডেল ভগিনী, বাঙালি চরিত, কালাচাঁদ প্রভৃতি রচনার দ্বারা দেশের সাহিত্যবোধকে তিনি উদ্দীপিত করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁরই জ্ঞাতিভ্রাতা। বর্ধমানের আর এক প্রখ্যাত সাংবাদিক, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটি'র সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার বহড়ু গ্রামে (?—১৮৩১)। তিনিই প্রথম সচিত্র বাংলা পুস্তক 'অন্নদামঙ্গল'-এ কাঠের ব্লক ব্যবহার করেন। বাংলা পত্র-পত্রিকা সাহিত্য প্রচারের যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধে তার সবিস্তার উল্লেখ করিনি। এ বিষয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন ড. কবিতা মুখোপাধ্যায় (বর্ধমানের সাময়িকপত্র : মননের দর্পণে)। তাঁর বই ও শ্রীসমীরণ চৌধুরী লিখিত ও কলেজ স্ট্রিট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানতে পেরেছি কালনা থেকে প্রকাশিত 'পল্লীবাসী' পত্রিকাটি শতবর্ষ পার হয়ে আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

বিশিষ্ট নাট্যকার ও উপন্যাস লেখক রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) ছিলেন বর্ধমানের রামচন্দ্রপুরের মানুষ। 'হরধনুভঙ্গ' নাটকে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। মনে রাখার মতো সংবাদ এই যে বর্ধমানের এই লেখকটিই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ফুল-টাইমার—সাহিত্যকে তিনি প্রথম পেশারূপে গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তকে (১৮৪৮-১৯০৯) আমরা বর্ধমানের মানুষ বলে ধরব কিনা সংশয় হচ্ছে। তবে তাঁর সাহিত্যজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছিল এই বর্ধমানেই। স্বামী প্রত্যাগানন্দ সরস্বতীর (১৮৮০-১৯৭৩) পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমানের চন্দুলিগ্রামে। অধ্যক্ষ অরবিন্দের সহকর্মী এই অধ্যাপক কিছুদিন 'সারভেন্ট' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। একাধিক ইংরেজি বই লেখা ছাড়া তিনি বাংলায় 'বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান', 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি বই লেখেন।

॥ ৮ ॥

এবারে আমরা আমাদের কালের আরও একটু বেশি সংলগ্ন হয়ে পেয়েছি চুরুলিয়ার বিদ্রোহী কবি নজরুলকে (১৮৯৮-১৯৭৬)। তাঁকে নিয়ে বেশি কথা লেখার প্রয়োজন নেই। শিয়ারসোল রাজস্কুলের এই ছাত্রই কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) ছিলেন বীরভূমের মানুষ পিতৃভূমিসূত্রে। কিন্তু তিন বছর বয়সে তিনি বর্ধমানে মামারবাড়ি থেকেই (মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়) মানুষ হয়েছিলেন। বাল্যকালে নজরুল লিখতেন গদ্য, শৈলজানন্দ পদ্য। পরে সব পরিবর্তিত হয়ে গেল। কয়লাকুঠিতে চাকরি নেওয়ার ফলে বর্ধমানের কয়লাখনির আদত জায়গা রাণীগঞ্জ তাঁর সাহিত্যে স্থান পেল। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে কয়লাশ্রমিকেরা তাঁদের প্রাপ্য ঠাঁইটুকু পেলেন।

তাঁর চেয়ে একটু প্রবীণ ছিলেন দন্তালিকা, আনন্তরী প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ধমান শহরে তাঁর নিবাস ছিল। কালনা রোডের 'বিশ্বেশ্বরী যোগাশ্রম' এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। কবি বিশালাক্ষ বসু, বর্ধমান সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রায়াল-নিবাসী নাট্যরসিক ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্র, বর্ধমান রাজসভার কবি সিদ্ধেশ্বর সিংহ, ন-পাড়ার 'ফুলজানি' উপন্যাসের লেখক ও রবীন্দ্র সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮), কৃষকজীবনের সত্যচিত্রকার গোবিন্দ সামন্ত ও ফোক টেলস্ অফ বেঙ্গল-এর লেখক সোনাপলাশী গ্রামের লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪), গল্প-উপন্যাসে একদা খ্যাতিমান কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দামিন্যার লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৮-১৯১৫) প্রমুখ সাহিত্যিকেরা বর্ধমানের সাহিত্যাকাশের চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন।

একক্যলে 'নিরক্ষর' নামক উপন্যাস লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেই চরণদাস ঘোষের (১৮৯৫-১৯৬৬) বাড়ি ছিল বাইতি পাড়ায়। 'দীপালি'-পত্রিকাখ্যাত ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির সুপরিচিত অনুলেখক কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) ছিলেন কাটোয়ার মানুষ। কড়ুই-এর কবি কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) ও কোগ্রামের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) শুধুমাত্র আধুনিক যুগের দুই বিখ্যাত প্রকৃতিপ্রেমিক ও ভক্তিবাদী কবি নন, তাঁরা বর্ধমানকে পরিচিত করে গেছেন তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা। অনেকেই জানেন না, রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'দুঃখবাদী' কবি এঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৮৭-১৯৫৪) জন্ম হয়েছিল মাতুলালয় বর্ধমানের পাতিলপাড়ায়। এই পাতিলপাড়াতেই জন্মেছিলেন ব্রিটিশযুগে বাজেয়াপ্ত আলোড়নকারী 'মন্দিরের চাবি' কাব্য-খ্যাত কবি, বর্ধমান সম্মিলনীর সভাপতি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৮৬)। অবশ্য পরে তিনি উখড়া ছেড়ে কলকাতায় আসেন। কিন্তু বর্ধমানই তাঁর স্বপ্নভূমি ছিল। কবিতায় তিনি একদা লিখেছিলেন—

> বর্ধমান বন্দনায় আমি এক ক্ষুদ্রমেধা কবি
> তবু অশ্বমেধে ব্রতী,—যথাশক্তি আঁকি তার ছবি
> যথাভক্তি করি ধ্যান, সেই মোর রাঙামাটি মা-টি
> যে মোরে করেছে ক্রোড়ে পালিয়াছে মলিনতা ঘাঁটি
> অলাবাল্য-যৌবন-জরা।

এই প্রসঙ্গে 'রসিকরঞ্জন' কাব্যপ্রণেতা মাজিদাগ্রামের রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য ব্যতীত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, নাট্যকার অহিভূষণ ভট্টাচার্য (বাড়ি কোকসিমলা), ধনকৃষ্ণ সেনকে আমরা স্মরণ করতে পারি। শান্তিনিকেতন-নিবাসী কবি কানাই সামন্তকে বর্ধমান-জাত কবি হিসেবে উৎসাহভরে ধরা বোধহয় উচিত হবে না।

॥ ৯ ॥

সাহিত্য-সাধনায় বর্ধমানের মহিলারা কোনকালেই পিছিয়ে ছিলেন না। সাহিত্যপ্রিয় ব্যবহারজীবী দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মাতা সুরথকুমারী দেবী; বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর পত্নী তথা, বিদ্যাসাগর-বন্ধু বর্ধমান নিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্রের কন্যা নীরদমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯৫৪) অল্প বয়সেই 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় কবিতা লিখেছিলেন। 'পারিজাত', 'ছায়া' ও 'প্রবাহ' নামে তিনটি গ্রন্থে তাঁর কাব্যাবলী সঙ্কলিত আছে। এই বর্ধমান শহরেরই কন্যা এবং বর্ধমান জেলার মেমারির বধূ শৈলবালা ঘোষজায়া ছিলেন প্রখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক। বাল্যকালে তিনি বর্ধমানরাজ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন। পারিবারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও লুকিয়ে রাত জেগে তিনি লিখতেন। 'শেখ আন্দু' উপন্যাস প্রবাসীতে প্রকাশিত হলে আলোড়ন উপস্থিত হয়। বর্ধমানেরই কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ সম্পর্কে গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে 'সরস্বতী' উপাধি পান। পরে তিনি 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধিতেও ভূষিত হন। বহু উপন্যাস-গল্প-আত্মজীবনীর রচয়িতা শৈলবালা বর্ধমানের গৌরবস্বরূপ।

বহু মুসলমান সাহিত্যসেবীকেও জন্ম দিয়েছে বর্ধমান। গোলাম আহম্মদ নিজেই বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস লিখে তিনি মুসলমান সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করে গেছেন। 'জেবন্নেসা' গ্রন্থের লেখক আবদুল লতিব ছিলেন জামতাড়া-নিবাসী। 'কাঁচ ও মণি' এবং 'রবীন্দ্রপ্রতিভা' রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন একরামউদ্দিন। নজরুলের কথা আগেই বলেছি। 'ফেরারী' এবং 'মাটির সুরে'র কবি আবদুল গনি খান আরবি-উর্দু-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে বিচিত্র ধরনের কবিতা লিখেছেন। প্রাচীন ধারার কাব্যগ্রন্থ 'কেয়া ও দেয়া' লিখে সুখ্যাত হয়েছিলেন আনোয়ার হোসেন। কালনা থানার বোহার গ্রামের মুন্সি মোহাম্মদ আবদুল্লা সাহেব তাঁর বিশাল গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করে গেছেন। অধুনা রানিগঞ্জের বাসিন্দা কবি আবদুস সামাদ (বোতামটে নীল প্রজাপতি—কাব্যগ্রন্থ) সুপরিচিত হয়েছেন বর্ধমান রাজসভাশ্রিত সাহিত্যিকদের নিয়ে

গবেষণা গ্রন্থ লিখে। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রমুখ কবি।

॥ ১০ ॥

বর্ধমানের ইতিহাস রচনায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও করছেন তাঁদের মধ্যে—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী বলাই দেবশর্মা (১৯২৩-১৯৬২; জন্ম চণ্ডীপুর, বর্ধমান) 'শক্তি' ও 'আর্য' পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বাধীন বাংলা, বৈশাখী বাংলা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, স্বদেশীর ত্রয়ী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। অনুকূলচন্দ্র সেন, নারায়ণ চৌধুরি প্রমুখ ও সাম্প্রতিককালে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, সুধীরচন্দ্র দাঁ, শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু (সং) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। বর্ধমানের সাহিত্যচর্চাকে একেবারে একাই সুমুন্নতি দান করে গেছেন গোতানের কৃতী সন্তান ড. সুকুমার সেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডে তিনি অগোণে বর্ধমানের সাহিত্যচর্চার ইতিহাসের ভূরি পরিমাণ উপকরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বর্তমান সময়ে বর্ধমান জেলায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন (এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সদ্য প্রয়াত হয়েছেন) তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিশিষ্ট অঞ্চলে বাস করছেন—বর্ধমান শহর ও তার আশপাশ, কালনা-কাটোয়া অঞ্চল এবং দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চল।

বর্ধমান শহর ও সন্নিহিত অঞ্চলে লেখালেখি করে পরিচিত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরির নাম অনেকেই উল্লেখ করেন। জন্মসূত্রে অবশ্যই তিনি বর্ধমানের লোক, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎকারে জেনেছি তিনি খড়্গপুরকেই তাঁর সাহিত্যভূমি বলে মনে করেন। তবুও 'বনপলাশীর পদাবলী'র এই লেখককে বর্ধমানের সাহিত্যিক হিসেবে দাবি উচ্চারিত হয়ে চলেছে। কবি প্রয়াত ভোলানাথ মোহান্ত গল্প লেখক রামেন্দু দত্ত; পত্ররাগ, ঝরণাতলার নির্জনে প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, ফুলদানি ও শেষ হাস্নুহানা, দৃশ্যান্তর, মধ্যদিনের গান প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ, কামমোহিতম্, অন্ধকারের রঙ প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক চিত্ত ভট্টাচার্য; বিবিজ্ঞান ও অন্য কবিতা, বালক জানে না প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবি প্রয়াত সুব্রত চক্রবর্তী; একদা বর্ধমানের অধিবাসী ও মাটির বেহালা, অন্ধকার উদ্যানে যে নদী, এরই নাম অন্য বাংলাদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক তরুণ সান্যাল; কাব্য সঙ্কলন গত সূর্যের আলো এবং আমার নিজস্ব কোনও দুঃখ নাই গ্রন্থের লেখক অনন্ত দাস; সময় অসময়ের কোলাহলের লেখক সঞ্জীব সেন; নগ্ন নক্ষত্রের নীচে, অন্য আকাশ প্রভৃতি কথাসাহিত্যের লেখক প্রফুল্ল অধিকারী; আমাদের এইসব দিন ও মায়াকোভস্কির কবিতা বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট কবি কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়; সমুদ্র মন-এর লেখিকা নীলা কর, আবার নতুন করে—এর কবি পরিমল ঘোষ, শুক্লা চতুর্দশীর কবি রতনলাল দত্ত; তবু বিহঙ্গ, কেউ ফেরে নাই প্রভৃতি বহু সুখ্যাত উপন্যাসের লেখক শক্তিপদ রাজগুরু; মৃন্ময়, অরণ্য কুহেলির উপন্যাসিক কালীপদ ঘটক; ছন্দহারা উপন্যাসের লেখক 'চার্বাক' বিনয় ঘোষ; নগ্নতাপসের লেখক শেখর সেনগুপ্ত; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা উপন্যাস এবং বর্ধমানের ইতিহাসের লেখক সুধীরচন্দ্র দাঁ; উপন্যাস 'উত্তরণ', গবেষণা গ্রন্থ ভাদু ও টুসু প্রভৃতির লেখক লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ রামশঙ্কর চৌধুরি, শিবেন মুখোপাধ্যায়, অভিযান গোষ্ঠীর একগুচ্ছ লেখক সমীরণ চৌধুরি, বিদ্যানন্দ চৌধুরি, প্রবীর সাহানা, কবিতা মুখোপাধ্যায়, নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান লেখক—উপন্যাস-গল্প-কবিতা-শিল্পচর্চা-প্রবন্ধ—প্রভৃতিতে বর্ধমানের সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নবীনদের মধ্যে রয়েছেন একগুচ্ছ কবি—শ্যামলবরণ সাহা, অরবিন্দ সরকার, রাজকুমার রায়চৌধুরি, কুমুদবন্ধু নাথ, রমেশ তালুকদার, ভগীরথ দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন চক্রবর্তী, সন্দীপ নন্দী প্রমুখ। এঁদের অনেকেরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য, ত্রিদিবেন্দু সেন, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, ঝর্ণা বর্মণ, শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত, মিহির চৌধুরি, কামিল্যা, ভব রায়, বৈদ্যনাথ সিংহরায়, শম্ভু বাগ, কালীপদ সিংহ, কমলকৃষ্ণ ঘোষ, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ রায়, মৃণাল ভদ্র, রমা কুণ্ডু, রমাকান্ত চক্রবর্তী, পাঁচুগোপাল রায়, গোপেশচন্দ্র দত্ত, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদুল হক, সুমিতা চক্রবর্তী, চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীকান্ত কোঙার প্রমুখ লেখক তাঁদের বহুজ্ঞানাশ্রয়ী সাহিত্যচর্চা দ্বারা বর্ধমানকে সমৃদ্ধ করেছেন ও অনেকে এখনও করে চলেছেন।

কাটোয়া-কালনা অঞ্চলে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন ও করে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালনা শহরের বাসিন্দা দূর থেকে কাছে, প্রতিলিপি, নিশিবিহঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাস, কাছের পৃথিবী, গল্প সংকলনের লেখক মানবেন্দ্র পাল, কবি জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রয়াত নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ভাষা ও ব্যাকরণবিদ্ সুভাষ ভট্টাচার্য, কালনার ইতিবৃত্তের লেখক দীপককুমার দাস, জগদীশচন্দ্র রায়, বিনয় মুখোপাধ্যায়, তরুণ সেন, সুশান্ত গুঁই, তুষার দাশ, বিশ্বনাথ হালদার, দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ।

বর্ধমানের সাহিত্যচর্চায় সবিশেষ সক্রিয় আছে দুর্গাপুর-রানিগঞ্জ-আসানসোল-বার্ণপুর-চিত্তরঞ্জন অঞ্চলের নানা শ্রেণীর লেখকবৃন্দ। এঁদের সাহিত্যচর্চা নিয়ে সম্প্রতি ড. ছন্দা দে একটি চমৎকার বই লিখেছেন 'ছিন্নমূলের স্থায়ী বাসস্থান শিল্পাঞ্চল'। এটিতে এবং এর একটি সংযোজনায় এই অঞ্চলের লেখকদের সাহিত্যচর্চার মনোরম বিবরণ আছে, কৌতূহলীরা তা দেখে নিতে পারেন। এই প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণে যেতে পারছি না। তবুও যাঁদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তাঁদের কথা বলছি। অর্ধেন্দু চৌধুরি; বর্ধমান রাজসভা সাহিত্য, বেয়নটে নীল প্রজাপতি, বামনা-খেমনার লেখক আবদুস সামাদ; কবিকণ্ঠ-সম্পাদক স্বয়ং কবি অসীমকৃষ্ণ দত্ত; কবি অহনা বিশ্বাস; সাইলক নাটক ও অজস্র ছোট গল্পের প্রতিবাদী লেখক উজ্জ্বল ঘোষ; অরণ্য কুহেলী, বার বন তেরো পাহাড়,

কৃষ্ণাবারের লেখক কালীপদ ঘটক; হনুমান-এর সুখ্যাত লেখিকা জয়া মিত্র; দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়; কেউ কেউ কোনদিন উপন্যাস ও আয়নায় নিজের মুখের কবি বিভা দে; রূপসীর লেখক নির্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; দুই লেখিকার গল্প সংকলনের অন্যতম লেখিকা নিয়তি রায়চৌধুরি; উত্তরাধিকারের কবি বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়; ছন্দময়, খনির খামার কাব্যগ্রন্থ ও মাটির কাছাকাছি গল্পগ্রন্থের লেখক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; দুর্গাপুরের ইতিহাসের লেখক কবি মধু চট্টোপাধ্যায়; উত্তরখাণ্ডব উপন্যাস রচয়িতা মনোজ চক্রবর্তী; নীলকণ্ঠের কান্না, সন্ধ্যার জানালার সুপরিচিত কবি মতি মুখোপাধ্যায়; বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ, কালের কৌতূহল প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রামদুলাল বসু; নলদময়ন্তী উপন্যাসের লেখক শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়; আসানসোল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকার শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়; মুমুর গল্প, নেফের তিতির মৃত্যু ও দুই লেখিকার গল্পের অন্যতম লেখিকা রেবা ঘোষ; রেল কলোনীর মা উপন্যাসের লেখক রামশঙ্কর চৌধুরি; পরাজিত নায়ক, কালো মাটির মানুষ ও রাঙামাটির গল্প এবং জনক-জননীর লেখক কৃষ্ণপ্রস্তর-সম্পাদক শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়; অবিনাশী শব্দমালার প্রখ্যাত কবি সুধাংশু সেন, দ্রাক্ষাদাহ উপন্যাস এবং বহু ছোটগল্পের লেখক সমরেশ দাশগুপ্ত; প্রমুখ কবিগণ; স্বর্ণকুটের লেখক সুনীলেন্দু প্রকাশ রায়; রামকিঙ্কর প্রখ্যাত আলোচক প্রকাশ কর্মকার; জেলখানার দিনগুলির লেখক দীনেশ চট্টোপাধ্যায় ওরফে অনীশ চট্টোপাধ্যায়; অনন্ত মধ্যাহ্নে ফিরি কাব্যগ্রন্থের লেখক বাদল ভট্টাচার্য; আঞ্চলিক ভাষার সুখ্যাত কবি অরুণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মণ্ডল, রুদ্রপতি, কৃষ্ণেন্দু বণিক, মৃণাল বণিক, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দত্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক কবিরা নিয়ত কাব্যচর্চার দ্বারা এ অঞ্চলের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্প্রতি 'কুশ'-এর লেখক মানব চক্রবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন সমীগেন্দ্র লাহিড়ি; রবীন্দ্র গুহ, প্রফুল্ল সিংহ, ত্রিপুরা বসু, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম পাণ্ডা, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বাংলা গল্প একাদেমি (১৯৯২) ইউ এন ও-এর স্বীকৃতি পেয়ে বর্ধমানের সাহিত্যচর্চাকে বিশ্বমুখীন করে তুলেছে।

॥ ১১ ॥

আমি আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে নিই যাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না—তাঁদের কাছে। এমনকি যাঁদের উল্লেখ করেছি, তাঁদের সাহিত্য কৃতির সম্যক্ আলোচনা করার মতো পরিসরও পাইনি। আচ্ছা আমরা কি বীরভূমের প্রখ্যাত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনক্রমে বর্ধমানের সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? অনেকেই আপত্তি করবেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না একদা তিনি ব্যবসায়ের সূত্রে বর্ধমানের কয়লা খনি অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে এখানের বাসিন্দা হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর 'পঞ্চপুত্তলী' উপন্যাসে বর্ধমানের গোলাপবাগের উল্লেখ করেছেন। নায়িকা টিয়া— "কাটোয়া থেকে এসেছিল বর্ধমান। বর্ধমানের গোলাপবাগ তার মনোহরণ করেছিল। মহারাজার গেস্ট হাউসের সামনে সাদা মেঘের মত মার্বেল-গড়া কি অপরূপ নারীমূর্তি।...গ্রীষ্মের সময় সে রোজ যেত গোলাপবাগে। এ সময়টার রাজবাড়ির সকলেই চলে যেতেন পাহাড়ে, দার্জিলিং ঠান্ডার দেশে। এ সময়ে গোলাপবাগে বেড়াতে কোনও বাধা হয়নি। গাছে গাছে নতুন পাতায় কচি সবুজের বাহারে চোখে একটা নেশা লাগত। প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গোলাপবাগের ঘন সারিবন্দী গাছের তলায় তলায় নিরবচ্ছিন্ন একটি ছায়ার রাজ্য থম থম করত। বাতাস শুধু খেলা করে বেড়াতো শুকনো পাতা নিয়ে দুরন্ত ছেলের মত। ওদিকে গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে এক কোণে বসে বসে বাঘগুলো ঝিমুত, হাঁপাত। ভাল্লুকে থাবা ঘষত। বাঁদরগুলো ঢুলত। পাখিগুলো চোখ বুঁজে এক পা তুলে বসে থাকত দাঁড়ের উপর।"

বর্ধমানের সাহিত্য গোলাপবাগের গাছের ওই কচিপাতার সবুজিমা এবং ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্যের অধিকারী।

বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি ও গতি

রফিকুল ইসলাম

আঞ্চলিক ছড়ায় মেলে,
'বান গান ধান,
তিন নিয়ে বর্ধমান'।

অথবা

'যদি দেখো কথায় টান,
তবে জানবে বর্ধমান'।

এ সব ছড়া থেকে বর্ধমানের লৌকিক ও সামাজিক জীবনধারার কিছু প্রতিফলন পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি কোনও নির্দিষ্ট বা বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাই 'বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি' কথাটা সঠিক কিনা তা চিন্তাভাবনার বিষয়। তবুও আঞ্চলিক সীমার মধ্যে অতি সহজ-সরল সাধারণ মানুষের জীবনধারার গতি-প্রকৃতিতে অনিবার্য কারণেই লৌকিক সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টি, বিবর্তন, আবার কখনও অবলুপ্তির ঘটনা ঘটেই চলেছে। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই এ রকম লক্ষ করা যায়। এমন হওয়ার কারণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত হল, এগুলি ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়, সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। উচ্চতর সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে লোক-সাহিত্য- সংস্কৃতির পার্থক্য এখানেই।

আঞ্চলিক সীমারেখায় বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার আগে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে দু-চার কথা

বলা প্রয়োজন। সংস্কৃতি বা Culture সম্পর্কে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি ডিক্সনারি-তে মন্তব্য করা হয়েছে, 'Culture is the intellectual side of civilization'. তাহলে লোকসংস্কৃতি বা Folk-Culture অতি সাধারণ জনগণের সৃষ্ট পরিশীলিত ঐতিহ্য বলেই মনে করা যেতে পারে।

সকল দেশেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির দুটি ধারা দেখা যায়। একটি হল, শিক্ষাগত ধারা, অপরটি লৌকিক ধারা—যা সাধারণ লোকসমাজে মুখে মুখে রচিত, প্রচারিত ও প্রবাহিত হয়। লৌকিক ধারাটিকে বলা হয়—Folklore. লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Folk-literature is the simple literature transmitted orally'. [*Journal of American Folklore.*]

উচ্চতর সাহিত্যের বহু উপকরণই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ। এ-প্রসঙ্গে বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়, 'Folklore materials being absorbed by poets and artists'. [*A. K. Krappe*].

ব্যাপক প্রচারিত লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে ধরা না গেলেও কোনও বিশেষ অঞ্চলে যে সব লোক-ঐতিহ্য নজরে পড়ে সেগুলির কথা চিন্তা করেই বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি ও গতি কীরূপ তা আলোচনা করতে বাধা আছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই।

সময়ের গতিতে বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে। সে সম্পর্কে আলোচনা না করে এ-জেলার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে বসবাসকারী জনজীবনের লোকসংস্কৃতিই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

সুদীর্ঘ কাল ধরে বর্ধমান কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলেই পরিচিত। বর্ধমানের কৃষক সমগ্র বঙ্গভূমিতে সেকালে এবং একালে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন। যদিও এ-জেলায় বর্তমানে বেশ কিছু নগর-অঞ্চল গড়ে উঠেছে, তবুও বৃহত্তর জনসমাজকে যাঁরা ধরে আছেন, তাঁরা বর্ধমানের কৃষক। আর এই কৃষকের জীবনকে ঘিরে স্মরণাতীত কাল থেকে লোকসংস্কৃতির দীপ্তিময় ধারাটি অতি স্বাভাবিকভাবেই বয়ে চলেছে। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ডক্টর ভেরিয়র এলউইনের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'gifted individuals do arise in the peasant communities.'

পৃথিবীর সকল দেশেই লোকসংস্কৃতির প্রায় মূল উপাদানগুলি হল লোকসংগীত, লোকগীতিকা, ছড়া, লোককাহিনী, প্রবাদ, প্রবচন, হেঁয়ালি, লোকবিশ্বাস, লোকগাথা, লোকনৃত্য, লোকশিল্প ইত্যাদি। এগুলি আবার বহু ধরনের উপধারায় বিভক্ত। যেমন, লোকসংগীতে বিষয়ের রকমফের যেমন আছে, তেমনই সুরেরও পার্থক্য আছে। সামাজিক আচার-আচরণের বা লোকাচারের ভিন্নতা অনুযায়ী লোকসংগীতের রূপের বদল হয়, তৃপ্তি বা স্বাদেও পরিবর্তন আনে। এই কারণেই সাধারণ লোকজীবনের কর্ম ও বিনোদনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতি বা Folk-Culture অন্যত্র যেমন গড়ে ওঠে, বর্ধমান জেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বহু জাতি, উপজাতি এবং নানান ধর্মের ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাসে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বর্ধমান। এখানের মাটি ও আবহাওয়া বাইরের মানুষকে শুধু আকর্ষণ করেনি, অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কিছুটা সহজসাধ্য শ্রমে জীবনযাত্রার পথকেও সুগম করেছে। এখানের অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। সে-কৃষির প্রধান অংশে আছে ব্যাপক ধানচাষ—যে ধান থেকে চাল, চিঁড়ে, মুড়ি ইত্যাদিতে এখানের অধিকাংশ মানুষের জীবন চলে যেন 'ধানসিঁড়ি বেয়ে'। এই কৃষিকাজের সঙ্গে যাঁরা বংশানুক্রমে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। বড়, মাঝারি ও কম জমির মালিক যেমন আছেন, তেমনই ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যাও অনেক। ফসল উৎপাদনের সঙ্গে যাঁদের জীবন সম্পৃক্ত তাঁরাই বর্ধমানের লোকসংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক। এঁদের কর্মব্যস্ততার মাঝে এবং অভাব-অনটন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কত যে লোকসংস্কৃতির উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে, তার সঠিক হিসাব দেওয়া শক্ত। বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির উপকরণ প্রায় শতাধিক। সেগুলির ভেতর মাত্র কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে থাকছে।

বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য নিয়ে যে লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বলতম ধারাটি আজও প্রবহমান তা হল, সত্যপীরের গান। সাধারণ জনসমাজে ধর্মের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে মানুষে মানুষে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সত্যপীরের গানের অবদান অনস্বীকার্য। হিন্দুর নারায়ণ আর মুসলমানের পীর যেন এক হয়ে আসল সত্য প্রকাশিত হয়েছে এ-গানে। সেকালের ফয়জুল্লার সত্যপীরের গানে মেলে,

> 'হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
> দুই কুলেতে পূজা লই দুই কুলে জাহির'॥

সত্যপীরের গান পালা ধরে হয়। একজন মূল গায়েনের সঙ্গে তিন-চারজন দোয়ার থাকেন। বাজনার মধ্যে থাকে খোল ও জুড়ি। বর্তমানে কোথাও-কেমন হারমোনিয়মের প্রয়োগও নজরে পড়ে। শিল্পীরা ঘাগরা-টাইপের পোশাক পরে আসরে নামেন। মূল গায়েনের হাতে থাকে চামর। গানের মাঝে মাঝে সংলাপ থাকায় লোকনাট্যের রূপটিও দেখা যায়। গায়ক ও বাদকের হালকা চালে নৃত্যও থাকে এ-গানে। কাহিনীর গতির সঙ্গে গানের সুর চলে। দোয়াররা ধুয়া গেয়ে চলেন। গানের শুরুতে বন্দনা-গান। তারপর মূল কাহিনী চলে গানে গানে। অনেকটা কীর্তন-স্টাইলে। গানের মাঝে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কেউ উপঢৌকন বা ফেরি দিলে মূল গায়েন পাত্রবিশেষে আশীর্বাদ করেন। আবার কোনও শ্রোতা পয়সা

দিয়ে অন্য কারও নামে কুৎসা গাইতে বললে গানে গানে তাও হয়। তবে বিপক্ষ ব্যক্তি পয়সা দিলেই কুৎসা বন্ধ হয়। এভাবে দলের অতিরিক্ত রোজগারও কিছু হয়।

সত্যপীরের বন্দনাগানে ঠাকুর বা পীরের কথাই থাকে। পালাগানের মাঝে ধুয়ার কথা ও সুরের পরিবর্তন করতে হয়। এখানের এ রকম একটি গানের উদাহরণ,

'আমার দয়াল সাগরের পীর জানে কতো ছলা গো।
সত্যপীরের বর্ণনা ভাই ডালিমের ফুল গো'॥

বর্ধমান জেলায় সত্যপীরের গানের দলের প্রাচুর্য থাকলেও প্রায় একই ধরনের মানিকপীরের গান আজ আর নেই, তবে অতীতে এখানে মানিকপীরের গানের প্রচলন ছিল। খ্রিস্টানদের Manichee-র সঙ্গে মানিকপীরের উল্লেখ থাকে। যেমন ধুয়ায় গাওয়া হয়,

'মুসকিল আসান করো দয়াল মানিকপীর।'

লোকসংগীতের একটি ধারা—বাউলগান। অনেকে বাউলের গানকে লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে চান না। কারণ লোকসংগীত কোনও ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বা আচার শেখায় না। কিন্তু লোকসংগীতের কথায় ও সুরে যে আবেদন থাকে তা সার্বজনীন। সাম্প্রদায়িকতার গন্ডিকে অগ্রাহ্য করে মানুষে মানুষে মিলনের সুরই হল বাউলের মূল সুর। এই কারণেই তত্ত্বমূলক হয়েও বাউলগান লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের লোকসংগীত সংগ্রহে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণ ঝগড়া বাধেনি।' *[আশীর্বাদ, 'হারামণি' মুহঃ মনসুরউদ্দীন]*

বাউলতত্ত্ব ও বাংলার বাউলদের আলোচনায় অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও তাঁর 'হারামণি' (৭ম) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'নিরন্তর তাঁহারা মানুষে মানুষে মিল খুঁজিতেছেন। জলে যেমন জল মিশে, তেমনি মনে মন মিশাতে চাহেন তাঁহারা। লোকসঙ্গীত সাধনার ইহা বড় কথা। এই সাধনায় সাম্প্রদায়িকতা নাই।'

অধুনা লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ও সুপণ্ডিত সুধী প্রধান তাঁর 'কস্মৈ দেবায় হবিষা' (১৯৯৩) গ্রন্থে 'রামমোহন রায় ও লালন শাহ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'প্রাচীন ভারতীয় তন্ত্রের প্রগতিশীল ধারার উপর ভিত্তি করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষ যৌথ চেষ্টায় সৃষ্টি করেছেন বাউলধর্ম। অসাম্প্রদায়িকতা, পরমতসহিষ্ণুতা, গ্রহণশীলতা এবং উদার মানবিকতায় উজ্জ্বল বাউলধর্ম বাংলার গ্রামে যে ঐক্য ও শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে তা এ দেশের বিভেদ দূর করার ক্ষেত্রে রামমোহন-চিন্তাভাবনারই সম্প্রসারক।'

বাংলার বাউলের বড় ক্ষেত্র বীরভূম জেলা। বীরভূমের দক্ষিণ পাশেই বর্ধমান জেলা। লোকসংস্কৃতির প্রকৃতি ও গতি অনুযায়ী বর্ধমানের বাউলগানও সুদীর্ঘ অতীতের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। নামীদামি, পেশাদার, সাধক, আখড়াবাসী, গৃহী ইত্যাদি সব রকম বাউলদেরই বর্ধমান জেলায় দেখা যায়। দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলের রায়না, জামালপুর, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি ব্লকে যেমন আছে, তেমনই কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও বাউলদের গান শোনা যায়। বর্ধমান জেলার বাউলগানের একটি বিশেষত্ব হল, বাংলার বহু লোকসংগীতের সুরকে অনেক ক্ষেত্রে পাল্চ করা বা মিশিয়ে ফেলার ঝোঁক বর্তমানে লক্ষ করা যাচ্ছে। ভালমন্দের দিকটি আলোচনা না করে বরং বলা যায়, সামাজিক বিবর্তন ও আধুনিক আসর-মাতানো গানের প্রভাব এর একটি বড়ো কারণ। এ-গানের বিষয়বস্তুতে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে যে আন্দোলন চলছে তারও ছাপ পড়ছে। এতে কেউ কেউ বলতে চাইছেন, বাউলগানের ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সর্বদেশে লোকসংস্কৃতির ধারা মানুষ ও সমাজের গতিধারার সঙ্গে তাল রেখেই এগিয়ে যায়, পরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু মূল কাঠামোটি ঠিক থাকে। আর এই পরিবর্তন ঘটে বলেই লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যে একটি ধারা থেকে বিভিন্ন উপধারাকে আমরা পাই।

বাউলদের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ফকিরিতত্ত্বের সুফিবাদ মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে বাংলা লোকসংগীতে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির বেড়াকে ভেঙে দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতার গন্ডি ছাড়িয়ে যে লোকসংস্কৃতির ধারা মানুষের ভিতরেই 'মনের মানুষ', 'রসের মানুষ' ইত্যাদির সন্ধানে সুদীর্ঘ কাল অব্যাহত গতিতে চলে আসছে, সেটি হল বাউল-ফকিরের গান। এ জেলার বাউল-ফকিরের গানে হেঁয়ালি, রূপক ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। চর্যাপদের ছোপ এবং বৈষ্ণব সহজিয়া ভাব এ সব গানে ছড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, এ সব গান সাধারণ লোকেও গেয়ে থাকেন। লোকসংগীতের সার্বজনীনতার এটাও অবদান।

ফকিরি গানকে মুর্শিদিগানও বলা হয়ে থাকে। গুরু বা মুর্শিদের কাছে ফকিরদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সুফিমতবাদ ফকিরদের অধ্যাত্ম-চিন্তার মূল উৎস হলেও ভারতবর্ষে বিশেষ করে বঙ্গভূমির প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে কোন অজান্তে মিশে গিয়ে সুফিফকিরের এবং বাউলের গানের বিষয়বস্তু যেন অভিন্ন হয়ে গেছে। তাই ফকির-লালন আর বাউল-লালনকে পৃথক করে চেনা শক্ত। তবে বর্ধমানের বাউলের আখড়া-আশ্রম এবং ফকিরের দরগাহ-আখড়া এক নয়। যদিও এ সব আখড়ায় উভয় গোষ্ঠীর গতায়াত ও ভাববিনিময় লক্ষ করলে যে কেউ মনে করতে পারেন, এঁরা প্রায় সমগোত্রীয়।

এ-জেলার প্রায় সব ব্লকে, এমন কী বর্ধমান শহরের আনাচে-কানাচেও বহু স্থানে ফকিরিগানের রমরমা আসর বসে বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে বা দিনে। এ-জেলার দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলেও ফকিরি গানের বেশ প্রচলন এখনও নজরে পড়ে। তবে বর্তমানে ফকিরি গানের গায়ক থাকলেও

শিষ্য-প্রশিষ্য ধারায় ফকিরের সংখ্যা কমেছে। ফলে ফকিরিগানেও আধুনিকতার ছোপ পড়তে শুরু হয়ে গেছে।

সম্প্রতি এ-জেলায় যে লোকশিল্পীরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক ফকিরের কণ্ঠ থেকে যে গান শোনা গেল, তারই অংশবিশেষ,

'মুস্কিল আসান করো দয়াল মানিকপীর।।
হিন্দু যদি ফুল হয় তো, মুসলমান হয় ফল,
আর, হিন্দু যদি মেঘ হয় গো, মুসলমান তার জল।'....ইত্যাদি।

শত বা অর্ধশত বৎসর পূর্বে যে সব ফকির বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গান রচনা করেছিলেন, সে গান আজও নির্ভেজাল ফকিরিগান। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের ফকির প্রয়াত কাদের সাঁই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে যে সব গান রচনা করেছিলেন সংগৃহীত সে গানের একটির কিছু অংশ,

'সংসার এসে
কেন রইলি বসে
কাটল না তোর দিশে
ওরে খ্যাপা মন।
* * * *
সংসারের যে সার তারে নাহি চিনি,
অসারকে জেনে সার বসে আছি আমি,
এখন কোন কূলে যাবি মন
তাই বলি শোন।
কুলের মুখে দিয়ে ছাই,
চল না মন সাধ বাজারে যাই,
আর কি তোর আছে রে ভয়
ভয়ের নাই কারণ।
কাদের সাঁই বসে ভাবে,
সেদিন আমার কবে হবে,
গুরু আমায় চেতন দেবে
লাথি মেরে কখন।'

প্রায় শতবর্ষ আগে এ জেলার দক্ষিণ প্রান্তের সাধক মজেহার ফকির বহু গান রচনা করেছিলেন। সে সব গানের সংগ্রহ থেকে একটি নমুনা,

'মন আপন আপন বল কারে।
এসে এই সংসারে
পড়লি মায়ার ফেরে,
রেখো ছ'জন-চোরে খুব হুঁশিয়ারে।।
অতি যত্নের পাখি, খাওয়াই দুগ্ধ ছানা,
পালাই পালাই করে ঘরেতে টেকেনা,
এমনি তার পোষ মানা ডাকিলে সেজনা
একদণ্ড থাকেনা হৃদয় পিঞ্জরে।।

কেহ বলে, অনেক জায়গা-জমি মোর,
কেবলমাত্র দেখি চোদ্দ পোয়া গোর,
তাতেই এত জোর, কী মাশ্চর্য তোর,
অতি দর্পে রাবণ ম'ল লঙ্কাপুরে।।

কেহ বলে, অনেক ধন-রত্ন আমার
যাহা দেবে সঙ্গে তাহাই তো তোমার,
শা সেকেন্দার রোমের বাদশা মুলুকের সর্দার
অভাব কিরে তার, সে একলা গেল গোরে।।

মজেহার আলি নদীর তীরে এসে,
পারে যাবো ব'লে আছি তাই গো ব'সে,
সঙ্গে নাইকো পুঁজি,
এবার ঠ'কে গেলাম বুঝি,
ওপারেতে মাঝি, আছি এন্তেজারে।।'

এ-গানের শেষাংশের ইঙ্গিতটি রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যের কথা স্মরণ করায়,

'ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।'

বর্ধমানের বাউল-ফকিরের গানের ভাষা ও ভাবে লক্ষ করা যায়, এ-গান লোকসংগীতের সম্পদই শুধু নয়, সাহিত্যগুণেও সমৃদ্ধ।

বিয়ের গান লোক-ঐতিহ্যে সুদীর্ঘ কালের এক উজ্জ্বলতম ধারা। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বিবাহের লোকাচারে বিবাহ-সংগীতের প্রচলন আজও চলে আসছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিক অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন লোকাচার সম্পন্ন করতে বিশেষ ধরনের গান গাওয়া হয়। সাধারণত এ-গান মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদিবাসী সমাজে নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচগান করে থাকে। এ নাচগান শুধু বর্ধমানেই নয়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যেখানেই বসবাস সেখানেই হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলায় মুসলমান সমাজে মহিলাদের মধ্যে বিয়ের গানের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। বর্ধমানে মুসলিম-বিবাহে যে-সকল লোকাচার দেখা যায়, সেগুলির অধিকাংশই হিন্দু-লোকাচারের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। বিবাহে মঙ্গলগীতের উল্লেখ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও আমরা পাই। বিয়ের গানের মুখ্য উদ্দেশ্য মঙ্গল বা কল্যাণ কামনা। প্রখ্যাত লোকশ্রুতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এ-সম্পর্কে বলেছেন, 'দ্রাবিড় ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ এবং ইহা হইতেই বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোক-সংগীতের রাগকেই প্রাচীন বাংলায় মঙ্গলরাগ বলা হইত।' *[বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস]*

পান, সুপারি, সিঁদুর, ঢেঁকি ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহে মঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

এ জেলায় বহু প্রাচীন ও আধুনিক কালে রচিত বিয়ের গানের সন্ধান মেলে। সংগৃহীত একটি মুসলমান-বিয়ের গান,

'চোখ মুজি মুজি চোখে ছাই,
ঢেঁকি মজলানো দেখে যাই,
গালভরা পান পাই,
তাইতো ঢেঁকি মুজলে যাই.
মাথা ভরা তেল পাই,
সিঁথি ভরে সিঁদুর পাই,
তাইতো ঢেঁকি মুজলে যাই।...'

অন্দর-মহলে মুসলমান বিয়ের গানে সাধারণত বাদ্যযন্ত্র হিসাবে কেবলমাত্র ঢুলকি ব্যবহার করতেই দেখা যায়। এ-গানে কখনও ফুটে ওঠে বেদনার সুর, আবার ঠাট্টা-মস্করার ইঙ্গিতও মেলে। এ-জেলায় সংগৃহীত সে রকমই একটি গানের অংশ,

'জামাই যেন মোর যমের মুখ,
বেটীর কান্নায় ভেসে যায় বুক।'...

মস্করা করে যে-গান গাওয়া হয়, সেরকম এক ডুয়েট গানের নমুনা,

'— তার-ই-তসন্ মেয়ে আমার
জামাই কেন মোর কালো গো।
— হোক না মা তোর কালো জামাই
আঁধার ঘরে ভালো গো।
— তার-ই-তসন্ মেয়ে আমার
জামাই কেন মোর দেঁতড়ো গো।
— হোক না মা তোর দেঁতড়ো জামাই
কচু ছেলবার ভালো গো।'...ইত্যাদি।

উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে বর্তমানে বিয়ের আসরে কোথাও-কেমন গানের আসর বসে। বাসরঘরে গানগাওয়ার রেওয়াজ আজও আছে। তবে এ সব গানে সাধারণত লোকসংগীতের তেমন ছাপ থাকে না! কিন্তু অতীতে এ-জেলায় বিয়ের সময় হিন্দু মেয়েরা যে-গান নিজেরা রচনা করে গাইতেন তা লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত। জামালপুর ব্লকে সংগৃহীত একটি হিন্দু-বিয়ের গানে সেকালের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে,

'এলাম সই তোদের বাড়ী মালা দিতে
মালা দিতে লো সজনী বর দেখিতে।
রসের মলিনী আমি,
রসের খেলা কতই জানি
প্রেমবিরহে বিরহিনী
পারি লো সব ভুলাতে।
এমালা পরলে গলে
থাকবে লো তোর পতি ভুলে
রাঁড়ের গলায় লাথি মেরে
থাকবে লো তোর সাথেতে।'

ভাদু-উৎসব বর্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এ-জেলায় ভাদুগানের উৎসব সাধারণত সামাজিক মর্যাদায় নিম্নস্তরের হিন্দু কুমারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদিবাসীদের 'করম্' উৎসবের হিন্দু সংস্করণ হল ভাদু উৎসব। কিংবদন্তি আছে, মানভূমের রাজার সুন্দরী কন্যা ভদ্রেশ্বরীর বিয়ে হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু হয়। রাজকন্যার অকালমৃত্যুতে রাজা ভাদ্রমাসে উৎসব করার আদেশ দেওয়ায় কুমারী মেয়েরা গানের এ উৎসব শুরু করে। পরবর্তী কালে বর্ধমান ও তার আশপাশের অঞ্চলে ভাদু-উৎসব ছড়িয়ে পড়ে। একমাস ধরে কুমারী মেয়েদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এই ভাদুগানে। মূলত এ-উৎসব শ্রমজীবী মানুষের উৎসব। বর্ষার শেষে ভাদ্রমাসে ভাদুউৎসবের মধ্য দিয়ে কৃষকের সংসারে কিছুটা আনন্দের জোয়ার বয়। বর্ধমান জেলায় পুরুষেরাও দলবদ্ধভাবে ভাদুগান গায়। তবে দলের সামনে একটি কুমারী মেয়ের হাতে থাকে ভাদুর ছোট মূর্তি। সেটিকে হাতে করে অথবা সামনে বসিয়ে রেখে মেয়েটি নাচে, আর পুরুষেরা মৃদঙ্গ, মাদল, জুড়ি, (বর্তমানে হারমোনিয়মও) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রসহযোগে গান গাইতে গাইতে গ্রাম পরিভ্রমণ করে। পাড়ার লোকে গান শুনে আনন্দ পায় ও টাকা-পয়সা, চাল-ডাল দেয়।

বর্তমানে এ-জেলার ভাদুগানে আধুনিক ছোপ লেগেছে। নিরক্ষর মানুষের সাক্ষরতার প্রয়োজন আছে—এই বোধ এ-জেলার সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এসেছে এবং কৃষকের জমি গেলে সে শহরে যায় শ্রমিকের কাজ করতে। এ রকমই ছাপ পড়েছে এ অঞ্চলের একটি ভাদুগানে।

'আমার ভাদুর রূপের ছটা গো
লেখাপড়া জানে না,
সাক্ষরতার কেন্দ্রে দিব
শিখবে কত, ঠ'কবে না।
দুর্গাপুরে যাবে ভাদু
ইস্টিলে কাজ করবে গো
আনবে টাকা পয়সা ভাদু
অভাব মোদের থাকবে না।'...ইত্যাদি।

ভাদু উৎসবের মতো টুসু বা তুষু উৎসব বর্ধমান জেলায় বিশেষ বিশেষ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাউড়ি, কোঁড়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভেতর এ-উৎসবের প্রাচুর্য। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত মেয়েরা এ-ব্রত পালন করে। গোবরের সঙ্গে তুষ মিশিয়ে প্রতিদিন নাড়ু তৈরি করে অথবা ছোট মূর্তি করে দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে পুজো করে। তারপর মালসার মধ্যে রাখে। মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ুভর্তি মালসাগুলি বা তুষ-গোবর দিয়ে তৈরি পুতুলফুলে সাজিয়ে মাথায় করে গান গাইতে গাইতে পুকুর বা নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। কখনও পুতুলের সঙ্গে বাঁশের তৈরি ধুচুনি বা ডালার মধ্যে বিজোড় প্রদীপও থাকে। ভাদুগানের মতো তুষুগানেও কুমারী মেয়েদের কামনা-বাসনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ভাদু,

তুষু এবং করম্‌—এই তিনটি উৎসবের আঙ্গিকে কিছু পার্থক্য থাকলেও এ-উৎসবগুলির একই উৎসমূল বলে মনে করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, এ-জেলায় পাড়ায় পাড়ায় ভাদু ও তুষুগানের মৃদু লড়াই বা প্রতিযোগিতা উপভোগ করার মতো।

আর-একটি লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির মৌলিক উপাদন হল, এ-জেলার ময়ূরপঙ্খী গান। সাধারণত মকর সংক্রান্তিতে নদীর ধারে এ-উৎসব হয়। অন্য কোনও বিশেষ তিথিতেও এ-গান হয়ে থাকে। বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে বা তিথিতে যে সব লোকগান হয়, সেগুলিকে ইংরেজিতে Calendric Song বলে। এ ধরনের অনেক লোক-সংগীত এ-জেলায় বিভিন্ন রূপে আজও পাওয়া যায়। দামোদর নদের তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলে একসময় ময়ূরপঙ্খী গানের লড়াই হত খুব বেশি। বর্তমানে জামালপুর, রায়না প্রভৃতি ব্লকে কিছু কিছু গ্রামে এ-গানের উৎসবের সন্ধান মিলেছে।

গরুর গাড়ির ওপর বাঁশ-বাখারি দিয়ে কাঠামো করে রঙিন কাগজে সাজিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকো তৈরি করা হয়। ধীর গতিতে চলন্ত গাড়ির ওপর সাজানো ময়ূরপঙ্খীর মাঝখানে থাকে গায়ক-বাদকের দল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল এবং কাঁসি। এ-গানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, গানের যে কোনও কলি গাইবার আগে 'আরে ঐ' বলে একটি টানা শুরু লাগানো হয়। দুটি দলের মধ্যে গানের লড়াই চলে। একদল কৃষ্ণের ভূমিকা নিলে অন্য দল রাধার বা বৃন্দার। শুরুতে থাকে বন্দনা-গান। এ-জেলায় সংগৃহীত সে রকম একটি গান,

'একবার এসো জগৎজননী,
মকর-চানে বেরিয়েছে মা, রক্ষা করো তুমি।
আরে ঐ, মকর-চানে মাগো যেন ঘটে নাকো জ্বালা,
আবার, মনের আনন্দে- হেসেখেলে করি যেন খেলা।'

প্রায় সারাদিন ধরে গানে গানে দু-দলের মধ্যে চাপান-উতোর চলে। এ রকম গানের উদাহরণ,

কৃষ্ণ-উক্তি ॥ গোপী, শোন আমার বর্ণনা,
গানের জবাব করবো আমি শুনবে দশজনা।
আরে ঐ, দেহতরী হয় কাণ্ডারি শোন বর্ণনা,
আবার, চোদ্দ পোয়া মাপে আছে তরী বল না।....ইত্যাদি

গোপী-উক্তি ॥ মাঝি, পারবে কি পার করিতে,
প'ড়েছে বান ভীষণ তুফান কু-বাতাস তা'তে।
আরে ঐ, রাধার পানে চেয়ে আছো আড়নয়নেতে,
আবার, নায়ের কাছে ঢেউ রে, পাছে পড় জলেতে।....

এ-গানের সঙ্গে কবিগানের লড়াইয়ের কিছু মিল পাওয়া যায়। ময়ূরপঙ্খী গানের মতো এ-জেলার মেমারী, মন্তেশ্বর ইত্যাদি অঞ্চলে আর-এক ধরনের গানের লড়াই হয়, তার নাম 'বাদাই' বা 'বাধাই' গান। এ গানে চাপান-উতোর যেমন আছে, তেমনই পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া বা মনোমালিন্যের জের ধরে খেউড় বা অশ্লীল গানেরও প্রয়োগ নজরে পড়ে।

বর্ধমান জেলায় কবিগানের লড়াই মাঝেমধ্যে হয়। কবিগানের একটি রূপ হল, তরজাগান। রায়না, জামালপুর, মন্তেশ্বর, কালনা, কাটোয়া, কেতুগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে পেশাদার কবিওয়ালা এখনও কিছু আছেন। কবিগান মূলত নাগরিক সংস্কৃতি। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে এসে এটির ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে। অষ্টাদশ শতকের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরে প্রায় শতবর্ষ বঙ্গসাহিত্যের এক রকম আঁধারি যুগ। নতুন যুগের শুরুতে বাংলার কবিওয়ালারাই সাহিত্যের আসরে জোনাকির আলো দেখিয়েছিলেন। এই ধারা অনেকখানি স্তিমিত হলেও আজও আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতচন্দ্র ১৭৩৯ থেকে ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানে ছিলেন। মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বহু কবির আবির্ভাব ঘটেছে এই বর্ধমানে। কিন্তু কবিওয়ালার সংখ্যা এ-জেলায় কম। কবিগানে গায়ক আসরে ঢোল, কাঁসি সম্বল করে দ্রুত লয়ে কখনও ছন্দে, কখনও গানে তথ্য পরিবেশন ও চাপান-উতোর চালিয়ে যান। ক্ষেত্রবিশেষে শালীনতার সীমাও লঙ্ঘিত হয়। কিন্তু শ্রোতাকে ধরে রাখতে আসরে ছন্দের তালে তালে মৃদু শরীর-সঞ্চালন করতেও কবিওয়ালদের দেখা যায়। এ-গানের লিখিত রূপ থাকে না। তাৎক্ষণিক পারদর্শীতাই কবিওয়ালার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এ-জেলার কবিগানের সংগ্রহ রাখতে পারলে লোকসাহিত্যের একটি সম্পদকে রক্ষা করা যেত।

এ-জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের দীর্ঘদিনের পেশাদার কবিওয়ালা কানাইলাল মান্নার কাছে সংগৃহীত গানের নমুনা,

বন্দনা-গান,

'কে জানে হে হরি, তোমার তত্ত্ব নিরূপণ,
তুমি, নিজের গায়ের ময়লা তুলে করলে প্রকৃতি সৃজন।

* * * *

কানাইলাল ভেবে বলে,
দিন কেটে যায় গোলেমালে,
দেখো তুমি নিদানকালে,
দিও দু'খানি চরণ।'

বিপক্ষ কবিওয়ালাকে আক্রমণের রূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়,

'এবার বগা পড়েছে কলে,
আমি পেতেছি ফাঁদ গাছের তলে।
ব্যাঙছানার টোপ খেতে গিয়ে ফাঁস পড়েছে বগার গলে।

* * * *

বগার কাঁদবে যত মাসিপিসি,
যত ভালবাসে পড়শি,
তখন কানাই মান্না হবে খুশি,
বগার বুক ভাসবে নয়নজলে।'

লেটো বা নেটো বর্ধমান জেলার লোকসংস্কৃতিকে সুদীর্ঘ কাল ধরে সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। এই নাচের দল এ-জেলায় আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। মন্তেশ্বর, মেমারী, খণ্ডঘোষ প্রভৃতি অঞ্চলে এ-সংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ধারাটি কিছুটা আলকাপ, আবার অনেকখানি অংশ যাত্রাগানের রূপ নিয়ে ধুঁকছে। অথচ নাচের দল বা লেটো একসময় এ-জেলার ছিল গতিশীল লোক-ঐতিহ্য। এ-সম্পর্কে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও বহু- ভাষায় সুপণ্ডিত আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' গ্রন্থে বলেছেন, "খ্রীষ্টপূর্ব কাল থেকে আমাদের দেশে যে ধরনের নাট্যকর্ম পণ্ডিতদের অগোচরে একটানা চলে এসেছে বলা যায় তার জের এখন পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান ও হুগলি জেলা দামোদর উপত্যকায় ও কাছাকাছি অঞ্চলে মুসলমান গুনীদের মধ্যেই সেদিন পর্যন্ত চলে এসেছে। এ হল 'নেটো' অর্থাৎ নাট্যবৃত্তি, নাট্যকর্ম। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নেটো সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। তারপর হিন্দু গুনীজনদের নজরে পড়ে যায় কীর্তনগানে, পাঁচালিতে, কথকতায়, যাত্রায়। তাই এই সুপ্রাচীন ধারাটি মুসলমানদের মধ্যেই তলানিরূপে রয়ে যায়। তবে নেটোর রসাস্বাদ হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে করত।"

লেটোর কাহিনী কখনও লোককথা, কখনও সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। এর লিখিত কোনও সংলাপ থাকে না। গল্পের মূল ঘটনা জানা থাকলেই হল। আসরে নেমে পাত্রপাত্রী নিজের ধারণা বা আইডিয়ামতো সংলাপ বলে যাবেন। লেটোগানের মূল আকর্ষণ—নাচ, গান এবং সঙ্। গানের কথা ও সুর অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। কথা ও সঙের সংলাপে অশ্লীলতার ছাপ থাকায় এর অবলুপ্তির গতি তরান্বিত হয়েছে। একই আসরে দুই বা তার বেশি দলের পালাক্রমে প্রতিযোগিতা হয়। আগে থেকে আসরে টাঙানো মেডেল, টাকা ইত্যাদি বিজয়ী দল পায়, আর যে দল হারে তাদের পাওনা জুতো-ঝাঁটা ইত্যাদি। লেটোয় যে সম্পদটি প্রধান, তা হল, অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর সংগীতকারের রচিত গান। তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এ-জেলার দক্ষিণ-দামোদর অঞ্চলের পুরনো দিনের বিখ্যাত লেটোওয়ালা রহিম সঙ্দারের গানের অংশবিশেষ,

'পীরিতি বড়ো দায় গো
পীরিতি করে চলে গেছে কালা,
গলাতে বেলফুলের মালা,
মোহনচূড়া বামে হেলা,
গোপীর মন ভোলায় গো।'....

অন্য ধরনের আর-একটি গানের অংশ,

'বিরস রমণী তুমি
মিছে কেন আঁখি ঠারো,
আমি না মজিলে পরে
তুমি কি মজাতে পারো,
মাকড়সার জাল পেতে তুমি
আকাশের চাঁদ ধরতে পারো।'....

বাহ্যিক অশ্লীল বলে মনে হলেও লোকসংগীতের আর-একটি ধারা হল, ব্যাংলা ঝুমুরগান। বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলে আদিবাসী সমাজের লোকসংগীতের একটি ধারা, ঝুমুরগান। দোভাষী (সাঁওতালি ও বাংলা) সাঁওতালদের মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত বাংলা ঝুমুরগানের প্রচলন। সেখানে থেকেই বাংলা ঝুমুরগান এ জেলায় এসেছে বলেই ধারণা হয়। এ-সম্পর্কে লোকপ্রতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বাঙ্গালী অল্পদিনের মধ্যেই সাঁওতালি ঝুমুরগুলিকে নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করিয়া তুলিল। বাংলা লোক-সংগীতের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ইহাদের সংক্ষিপ্ততা দূর করিয়া, পদান্তে মিত্রাক্ষর যোজনা করিয়া, ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম যোগ করিয়া, অথচ ইহাদের মৌলিক সুরটুকু যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলে বাঙ্গালী নূতন ঝুমুরসংগীত রচনা করিল, তাহা স্বভাবতঃই বাংলার আঞ্চলিক লোক-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হইল।' *[বাংলার লোকসাহিত্য—১ম খণ্ড]*

ঝুমুরগান বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে শিল্পাঞ্চলকে ঘিরে এখনও তার ক্ষীণ অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত ঝুমুরের দল অর্ধশত বৎসর পূর্বেও বর্ধমান শহর ও এ-জেলার পল্লীতে পল্লীতে গান করত। তারই প্রভাবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলেও কিছু কিছু ঝুমুরের দল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এ দলে যে মেয়েরা গান করত তাদের অনেকেই এ-জেলার পশ্চিম প্রান্তের শিল্পী। সেকালের দক্ষিণ দামোদরের ঝুমুরগানের নমুনার একটু অংশ,

'বঁধু যদি আসিবে গো কেন কাঁদালে,
কেন কাঁদালে গো আমায়, কেন ভুলালে।'

ধারণা হয়, ঝুমুরগানের প্রচলন প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ, এর অশ্লীলতা। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের অর্থাৎ বৈষ্ণব ধারার অনুপ্রবেশ ঘটায় ঝুমুরগান বাংলার লোকসংস্কৃতিতে সাহিত্য-মূল্যের দিক থেকে অবশ্যই সমৃদ্ধ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলে চুরুলিয়ার সন্তান। কিশোর বয়সে তিনি লেটোর দলে পালা, গান রচনা ও অভিনয় করতেন। সেই সময়ে তাঁর ওই অঞ্চলে ছিল ঝুমুরগানের রমরমা। তখন এবং পরবর্তী জীবনে রচিত নজরুলের বহু সংগীতে ঝুমুরের প্রভাব লক্ষ করা যায়। লেটোয় যে ধরনের

ঝুমুরের গান মেলে সে রকমই নজরুলের একটি গানের অংশবিশেষ,

পু।। ঝুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে
বাজে বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে।
স্ত্রী।। হাতে তল্‌তা বাঁশের বাঁশী মুখে জংলা হাসি
কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে।
পু।। তার ফিঙের মত এলো খোঁপায় ঝিঙেরি ফুল,
স্ত্রী।। যেন কালো ভমরার গা কালার ঝামর চুল।'...

এ ছাড়া 'এই রাঙা মাটির পথে লো', 'আরশীতে তোর', 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এল গো', 'তুমি পীরিতি কি কর হে শ্যাম' ইত্যাদি নজরুলের বহু গান ঝুমুরের সুরে ও আঙ্গিকে রচিত। বর্তমানে ঝুমুরের সুর আধুনিক গানেও প্রয়োগ করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

কৃষ্ণযাত্রা বা কেষ্টযাত্রা যদিও কৃষ্ণলীলার নাট্যরূপ, তবুও এ-পালাগান লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেও এ-জেলার যত্রতত্র কৃষ্ণযাত্রার দল ছিল। এখনও কিছু অঞ্চলে ছিটেফোঁটার মতো এ দলের সন্ধান মেলে।

ছোট আসর করে কৃষ্ণযাত্রার পালাগান হয়। সংলাপ কম, সংগীতেরই প্রাধান্য। গান গাইতে কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা প্রভৃতি সকল চরিত্রই আসরে নাচে। গানের সুর মূলত কীর্তন-অঙ্গের হলেও অন্যান্য লোকসংগীতের সুর কৃষ্ণযাত্রায় প্রবেশ করে স্বাদে মাধুর্য এনে দেয়। বৈষ্ণব-ভক্তিরস অপেক্ষা লোকনাট্যরসের আস্বাদনই কৃষ্ণযাত্রায় অধিক পাওয়া যায়। সাধারণত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই কৃষ্ণযাত্রার দল গঠনের প্রবণতা নজরে পড়ে। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও কৃষ্ণযাত্রার দল গঠনের বড় প্রমাণ, এ-জেলার দুর্গাপুরের সন্নিকটে ধবনী গ্রামের প্রখ্যাত লোককবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১২৪৮-১৩১৮ বঙ্গাব্দ)। কণ্ঠমশাইয়ের কৃষ্ণযাত্রা একসময়ে সমগ্র বঙ্গভূমিতে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। শাক্ত, বৈষ্ণব—সব মতেই তিনি গান বেঁধে আসরে পরিবেশন করতেন। তাৎক্ষণিক কোনও ঘটনাকে নিয়েও পালাগানের মাঝে তিনি গান গাইতেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তাঁর স্নেহধন্য গদাধর তাঁতি দল ছেড়ে নতুন দল করেন এবং মগরা অঞ্চলে পাশাপাশি পাড়ায় দুটি দলের গান চলাকালীন নীলকণ্ঠ তাঁর শিষ্য গদাধরকে লক্ষ করে যে-গান গেয়েছিলেন, সংগৃহীত সে গানটি এখানে দেওয়া হল,

'ভবে তাঁতি হয়েছে বড়ো বুদ্ধিমান,
খামআলুর পাতা দেখে বলে, এটা ছাঁচি পান।
একদিন তাঁতি হাটে সুতো কিনতে যায়,
তালগাছে বাবুইয়ের বাসায় কলরব শুনতে পায়,
বলে, এখানে কী হয়েছে,
বুঝিবা হাট বসেছে,
কিম্বা হবে বাজার বর্ধমান।।
গদা নামে ছিল এক তাঁতির নন্দন,
অনেক স্নেহের বশে পেলেছিনু তখন,
এখন, গদার হাতে গদাঘাতে যায় বুঝি নীলকণ্ঠের মান'।

এ ধরনের গান কৃষ্ণযাত্রায় কবিগান, তরজার প্রভাবকেই স্মরণ করায়। এ-জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে মুসলমান খানদানী বংশের এক মুসলমান লোকশিল্পীর কৃষ্ণযাত্রার দল ছিল। সে দল দীর্ঘদিন ধরে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গান করে বেড়াত। এ-অঞ্চলে এখনও কৃষ্ণযাত্রা হয়। এ-যাত্রাপালার একটি বৈশিষ্ট্য হল, পালা চলাকালীন শ্রোতাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা। নাটকের মাঝে অথবা শেষের দিকে এক অভিনেতা নাটকের গতির সঙ্গে তাল রেখে বলে ওঠে, 'যাও, নগরে নগরে ভিক্ষে করে নিয়ে এসো।' এ কথা বলার পরেই দুজন বালক অভিনেতা একখানা কাপড় টান করে মেলে ধরে বাজনার তালে তালে গান গাইতে গাইতে নৃত্যের ছন্দে একবার এগোয়, একবার পেছোয়। শ্রোতারা কাপড়ে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। পরিভ্রমণ শেষে পুনরায় আসরে ফিরে এসে নাটকের বাকি অংশ সমাপ্ত করে। সংগৃহীত এ-রকম একটি কৃষ্ণযাত্রার গানের অংশ,

'ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী,
হবো মোরা মথুরাবাসী,
কৃষ্ণ বিনে মন উদাসীন,
ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী।'....

পাঁচালি গান বর্ধমান জেলায় এখনও বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। পাঁচালির অনেক রকমফের আছে। যেমন রং পাঁচালি, দুমুখো পাঁচালি ইত্যাদি। আলকাপ, লেটো, গম্ভীরা, বোলানগান প্রভৃতির ছোপ আছে পাঁচালি গানে। কৌতুক, ছড়া ও সংগীত—এ-গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ-গানের বিষয়বস্তুতে সমসাময়িক ঘটনাও স্থান পায়।

ইমাম হাসান ও হোসেনের কাহিনী বা কারবালা যুদ্ধের কাহিনীকে বিষয় করে জারিগান উভয় বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়েছে। জারি অর্থে প্রচার। এ গান বর্ধমান জেলায় মহরমের সময়েই হয়ে থাকে। একজন মূল গায়েন বিশেষ সুরে কাহিনী বলে যায়, তার সঙ্গে দশ-পনেরো জন দোয়ার পায়ে ঘুঙুর, হাতে রঙিন গামছা, মাথায় রঙিন ফেট্টি বেঁধে ধুয়া গেয়ে যায়। মূল গায়েনকে ঘিরে প্রায় বৃত্তাকারে জারিগান গাইতে গাইতে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। এ-গান করুণ রসাত্মক। বীরত্বের বর্ণনাও থাকে। এ-অঞ্চলে প্রচলিত জারিগানের সামান্যতম অংশ,

'পানি পানি বলে হোসেন কাতরায় পিয়াসে।
হোসেনের লাগি কাঁদে আসমান জমিন রে,
বুকের কলিজা ফাটে হোসেনের লাগি রে।'....

ধারণা করা যেতে পারে, মহরমে যত দিন ঢাল, তাজিয়া, ঘোড়ানাচ ইত্যাদি থাকবে তত দিন জারিগানও এ জেলায় থেকে যাবে।

পটের গান বঙ্গলোকসংস্কৃতির দীর্ঘকালের একটি ধারা। পট দেখিয়ে ঘরে ঘরে গান করে পটুয়ারা জীবিকা অর্জন করে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে এদের বেশি দেখা যায়। হিন্দু দেবদেবীর পট এঁকে সেগুলি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে গানে কাহিনীর বর্ণনা চলে। এদের সামাজিক অবস্থান বেশ বিচিত্র। এরা হিন্দু দেবদেবীর পট আঁকে, হিন্দু আচার পালন করে, হিন্দু নামও গ্রহণ করে। আবার মুসলমান সমাজের নিয়ম অনুযায়ী এদের বিয়ে হয়, আচারও অনেক পালন করে। ফলে হিন্দু সমাজে এদের স্থান নেই, আবার মুসলমান সমাজও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি। বর্ধমান জেলায় এরা মাল সম্প্রদায় বলেও পরিচিত। এরা কখনও সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়, জড়িবুটি ওষুধ দেয়, মনসার গান গায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বর্ধমানের পটুয়ারা তাদের নিজেদের মিশ্রিত সামাজিক গণ্ডির মধ্যে থেকে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ পটের গানের লোকসংস্কৃতির ধারাটিকে আজও ধরে রেখেছে।

পটুয়াদের গানের প্রসঙ্গে ঝাঁপানের কথা ওঠে। বর্ধমানে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিভিন্ন গ্রামে মনসা পুজো ও ঝাঁপান হয়। ঝাঁপান উপলক্ষে যেমন মেলা হয়, তেমনই বেদেরা সাপ নিয়ে মাচানের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখায় ও গান গায়। কখনও বা গানের লড়াই চলে। সাপের জন্ম-কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান ইত্যাদি নিয়ে কিছুটা করুণ সুরের গান এ-অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

বর্ধমান জেলার গাজন একটি জমকালো লোক-উৎসব। তবে শিবের ও ধর্মের গাজনই প্রধান। বলরাম বা বাসুদেবের গাজনও এ-জেলায় হয়। গাজন উৎসবে অনেক সন্ন্যাসীও হয়, মেলা বসে। এইসঙ্গে যে সব গান হয় তা সাধারণত মঙ্গলগানের পর্যায়েই পড়ে। গাজন উপলক্ষে পালাগানের আসরও বসে।

বর্ধমানে হিন্দু বালকদের মধ্যে 'ঘেঁটু' নামে একটি লৌকিক পুজোর প্রচলন আছে ফাল্গুন মাসে। সন্ধ্যার সময় ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে ঘেঁটুফুলে সাজানো ডালার মধ্যে প্রদীপ জ্বেলে ছড়া বা গান করতে করতে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ফেরে। চাল-ডাল, পয়সা পায়। বাড়ির নাচদুয়ারে এসে সুর করে বলে, 'ঘেঁটু যায়, ঘেঁটু যায় গেরস্তের বাড়ি'। তারপর টেনে টেনে সুর করে গেয়ে যায়।

যে দেবে মুঠো মুঠো।
তার হাত হবে ঠুঁঠো।
যে দেবে থালা থালা,
তার হবে বড়ো গোলা।'...ইত্যাদি।

ভাঁজোগান ভাদ্রমাসে বয়স্ক কৃষক মেয়েদের ব্রতসংগীত। বর্ধমান জেলায় এ-গান বর্তমানে কমই আছে। এ-গানের প্রচলন বীরভূম জেলাতেই বেশি।

দলবদ্ধভাবে ছাদপেটানোর তালে তালে শ্রমিকরা যে-গান গায় তাকেই ছাদপেটানোর গান বলে। দামোদর নদে যখন জল কমে যায় তখন বিশেষ বিশেষ জায়গায় নদীর ওপর অস্থায়ী কাঠের পুল তৈরি করতে খুঁটি পোঁতার সময় এ-ধরনের গান আজও এ-জেলায় শোনা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত শ্রমে এ-গানে অশ্লীলতার ছাপ আসে বেশ স্পষ্ট। শ্রমে কিছু ক্লান্তি দূর হলেও যৌথ-শ্রমকে কাজে লাগানোই ছাদপেটানো গানের মূল উদ্দেশ্য।

হাবু বা হাপুগান বর্ধমানের উত্তরাংশে এখনও রয়েছে। দুটি বালক নিজ নিজ বগলে বাঁ-হাত দিয়ে, ডান-হাত নেড়ে গানে গানে পরস্পরে ঝগড়ার অভিনয় করে। একেই বলা হয় হাপু। ছড়া বা গানের প্রতিকলির শেষে মুখে 'হাপু' শব্দ করে, আর বগল বাজায়। যদিও কিছু অশ্লীলতা থাকে তবুও অঙ্গভঙ্গি থাকায় এ-গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

বোলান গান বর্ধমানের উত্তরাংশে কাটোয়ায় আজও শোনা যায়। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এ-গানের প্রচলন বেশি। হয়তো সেখান থেকেই বর্ধমানের লোকসংস্কৃতিতে এ-গানের প্রবেশলাভ ঘটতে পারে। গানের বিষয়বস্তু শিব ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী। ঠাকুর-দেবতা, পীর-পৌরীর

বন্দনা দিয়ে বোলান শুরু হয়। লোকসংগীতের অন্যান্য কিছু উপধারার সঙ্গে এ-গানের মিল রয়েছে।

'টহলের গান' নামে একধরনের টানা সুরের লোকসংগীত বর্ধমানে এককালে খুবই শোনা যেত। বসন্ত, কলেরা ও অন্যান্য মহামারী দেখা দিলে আতঙ্কিত মানুষের মনের ভয় দূর করতে গভীর নিশিথে দলবদ্ধ হয়ে কিছু লোক টানা টানা সুরে এ-গান গাইতে গাইতে গ্রাম পরিভ্রমণ করে। যখন টহলের গান চলে তখন সংস্কার অনুযায়ী বাড়ি থেকে কেউ বাইরে উঁকি দেয় না। দিনের বেলায় গায়করা বাড়ি বাড়ি এসে চাল, পয়সা নিয়ে যায়। এ-গানের বিষয়বস্তুতে হিন্দুর দেবতা ও মুসলমানের পীর-পয়গম্বরের বন্দনাই থাকে। কখনও বা মুসলমান টহলদাররা হিন্দু পল্লীতেও এ-গান গায়।

এ ছাড়া আরও কিছু কিছু লোকসংগীত স্থানীয়ভাবে এ-জেলায় ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে বাউরিদের বিয়ের গান, জাতগান, বৈশাখী প্রভৃতি মেয়েলি ব্রতের গান, শোক-সংগীত, ধানভানার গান, পালকির গান, মৎস্যজীবীদের গান ইত্যাদি।

ছড়া বা হেঁয়ালি এবং ধাঁধা বর্ধমান জেলায় প্রায় সর্বত্র মেলে। মেয়েলিছড়া যেমন আছে, তেমনই নাপিতের ছড়াও (বিয়ের সময়) রয়েছে। এগুলির সাহিত্যমূল্য প্রচুর। ছড়া কাটাকাটি ও হেঁয়ালিতে চাপান-উতোর লোকসংস্কৃতির মৌলিক ধারারই উদাহরণ।

বর্ধমান জেলায় সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য নিয়ে লোকসংস্কৃতির যে বলিষ্ঠতম ধারাটি আজও প্রবহমান তা হল, লোককাহিনী বা লোককথা। ঠাকুরমা, দিদিমা বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে সন্ধ্যার পরে রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, জীব-জন্তু ইত্যাদির গল্প শোনার স্মৃতি সারা জীবনেও মানুষ ভুলতে পারে না। মুখে মুখে প্রচারিত লোকগল্প সংগ্রহের প্রচেষ্টাও এ-জেলায় কম নয়। বাংলা লোকগল্পের সংগ্রাহক রেভাঃ লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) ছিলেন বর্ধমানের সন্তান। তাঁর 'Folk-Tales of Bengal (১৮৮১) বিশ্ব লোকসাহিত্যে এক সুপরিচিত গ্রন্থ। উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা'র লোকগল্পগুলি যে বর্ধমান জেলার নিম্ন-দামোদর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত সে সম্পর্কে আচার্য সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "হুগলী ও বর্ধমান জেলার নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চল বাংলা লৌকিক গল্পের খনি বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা প্রচলিত গল্পের প্রথম সংকলন পাদ্রী উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত ইতিহাসমালা (১৮১২) গ্রন্থটিতে এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত খুব চমৎকার কয়েকটি গল্প আছে।"

[ভূমিকা, নিম্ন-দামোদরের লোক-গল্প (১৯৮৬)—ডঃ রফিকুল ইসলাম]।

সামাজিক বিবর্তনে বাংলার লৌকিককাহিনীগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ সমাজজীবনে এগুলির প্রভাব যে অনেক সে কথা পণ্ডিতরা বহুবার বলেছেন। তাই বর্ধমানের ঐতিহ্যময় লোকগল্পের কথা আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার।

এ ছাড়া এ-জেলায় ছড়িয়ে আছে বহু কিংবদন্তি ও দেবতা-পীরের অলৌকিক কাহিনী। সেগুলিও অবলুপ্তির পথে।

লোকনৃত্য বা লৌকিক-নাচের প্রসঙ্গে এ-জেলায় কাটোয়ার রায়বেঁশে নৃত্যের কথা প্রথমেই স্মরণে আসে। ঢোল ও কাঁসির বাজনার তালে তালে দলবদ্ধভাবে এ-নৃত্যের খেলা হয়। কাঁধে, কখনও হাতে ভর দিয়ে একজনের ওপর অন্যজন দাঁড়ায়। এভাবে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। আবার শিল্পীরা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে।

আর-একটি লোকনৃত্য হল, রণপা। বর্ধমানে এ-নৃত্য কাটোয়াতে দেখা যায়। অন্যত্রও কিছু আছে। বাঁশের খুঁটোয় পায়ে ভর দিয়ে দলবদ্ধভাবে বৃত্তাকারে, কখনও সারিবদ্ধ হয়ে শিল্পীরা এ-নৃত্য করে। রায়বেঁশে এবং রণপা—দুটি লোক-নৃত্যের সঙ্গে সেকালের ডাকাতির কৌশলসূত্র জড়িয়ে আছে। রায়বেঁশে উঁচু বাড়ির উপরে ওঠার, আর রণপা হল, দ্রুত পদক্ষেপে চলে যাওয়ার কৌশল।

বাঘ-নাচ বা ব্যাঘ্র-নৃত্য প্রায় অবলুপ্ত। এ জেলায় সদর ব্লকের নবস্তা অঞ্চলে এখনও এ নাচ হয়। বাঘের মুখোশ এবং বাঘছাপ পোশাক পরে নৃত্য,—নাচের লড়াইও বলা যায়।

কাঠিনাচ হয় দলবদ্ধভাবে। দু-হাতে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে বাচনার তালে বিচিত্র ছন্দে শিল্পীরা কাঠিতে কাঠিতে আঘাত করে। এ নৃত্য ব্রতচারীর এক সংস্করণ বলা যেতে পারে। কাঠিনাচ বর্ধমানের প্রায় সব ব্লকেই দেখা যায়।

এ জেলার বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে আছে আদিবাসী লোকসংস্কৃতি। বর্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আদিবাসী জনবসতি এলাকায় আদিবাসীদের নাচ ও গান বহু রকমের মেলে। ছন্দ ও তাল অনুযায়ী গান হয়। আদিবাসী গানের ভাষা ও সুরে চমৎকার দোলন লক্ষ করা যায়, যা নৃত্যে পূর্ণতা আনে। জেলার প্রায় সর্বত্রই এ সংস্কৃতি কম-বেশি ছড়িয়ে আছে। বর্ধমানে আদিবাসী লোকসংস্কৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, বিয়ের গান, করম্ উৎসবের নাচগান, বাহা, লাগড়ে, দাশাই, সোহ্রাই, ঝিঁটা, দং, ঝুং, নাটুয়ানাচ ইত্যাদি।

এ জেলার বিভিন্ন লোকসংগীত ও লোকনৃত্যে যে সব বাদ্যযন্ত্র নাচগানের রকম অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার মধ্যে ঢাক, ঢোল, ঢোলক, মাদল, মৃদঙ্গ বা খোল, নাকড়া, দগড়, কাঁসি, একতারা, দোতারা, আনন্দলহরী, আড়বাঁশি, পাতারবাঁশি, সানাই, তবলা, জুড়ি বা মন্দিরা ইত্যাদিই প্রধান।

লোকসংস্কৃতির আর-একটি দিক হল, লোকশিল্প। মাটি, কাঠ, বাঁশ, কড়ি, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদির লোকশিল্প আজও বর্ধমানের অনেক স্থানেই ছড়িয়ে আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতার কাজে এখানের লোকশিল্পীদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে

দেখা গেছে। এটি লোকশিল্পীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে লোকসংস্কৃতির চর্চা, রক্ষা ও উন্নতিকল্পে বিভিন্ন দিক থেকে প্রচেষ্টা চলছে। জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান ও কর্মশালা হতেও দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি বর্ধমান জেলায় কবিওয়ালা, মহিলা লোকশিল্পী এবং অন্যান্য লোকশিল্পীদের একত্রিত করে পৃথক পৃথক কর্মশালা ও অনুষ্ঠান হয়েছে কালনা, গুসকরা, বর্ধমান শহর প্রভৃতি স্থানে। এ ছাড়া বর্ধমানের 'সংস্কৃতি' হলে এ জেলার লোকশিল্পীদের সমবেত করে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও লোকসংস্কৃতিকে ধরে রাখা ও উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনাচক্রও হয়ে গেল। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিল্পীদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গেছে, অন্য দিকে জনসাধারণের পক্ষ থেকেও ভাল সাড়া মিলেছে। এ অনুষ্ঠানগুলি থেকে লোকশিল্পীদের মনেও আত্মপ্রত্যয় জেগেছে। তাঁরা যে অবহেলিত নন—এ বোধ তাঁদের অনুভূতির মধ্যে আসতে শুরু হয়েছে। তাঁরাও বৃহত্তর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মর্যাদার আসন পেতে পারেন—এই ধারণা জন্মেছে এবং নিজেদের মধ্যে দীর্ঘকালের সঞ্চিত হতাশা দূর করে মনের দৃঢ়তাকে বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করছে।

দলবদ্ধতা লোকসংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সবাইকে নিয়ে আমোদ-আনন্দের ভেতর দিয়ে সমাজ ও জীবনকে সুন্দররূপে উপলব্ধি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। প্রধানত পল্লীর বুকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করে লোকশিল্পীরা এগুলির আঙ্গিকে বা প্রকৃতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন বা হেরফের ঘটালেও এ সংস্কৃতির ধারাকে নিজেদের জীবন ও চলার তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখনও গতিশীল করে রেখেছেন। স্মরণাতীত কাল থেকে লোকসংস্কৃতিই মানুষে মানুষে মিলনের সেতু বেঁধেছে, অমৃতের স্বাদ জুগিয়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একসময় 'পল্লীপ্রকৃতি' আলোচনায় বলেছিলেন, "মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হল এই মিলন থেকে—তার ধর্মনীতি, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীরভাবে আত্মপরিচয় পেল, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।"

লোকসংস্কৃতির মধ্যে আমাদের দেশের ও সমাজের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। সেই কারণে এগুলির যথাযথ অনুশীলন ও গবেষণার অবশ্যই প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগতভাবে লোকসংস্কৃতি নিয়ে এ জেলায় অনেকেই গবেষণা করছেন। শুধুমাত্র উপকরণ সংগ্রহও কেউ কেউ করছেন। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ আরও কিছু বাড়ালে ভাল হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধেই এ সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখা দরকার। আর এ জন্য দায় ও দায়িত্ব শুধুমাত্র শিল্পীদেরই নয়, এ কর্তব্য আমাদের সবার।

রণ-পা লোকনৃত্য

বর্ধমান জেলায় নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচর্চা

মৃদুল সেন

বর্ধমান জেলার নাট্য আন্দোলনের অতীত অধ্যায়ের এক শালপ্রাংশু—অভিনেতা, পরিচালক আব্দুল করিম সাহেবের সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল। অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ মানুষটির কণ্ঠস্বরে একের পর এক নাটকের দৃশ্যাবলী যখন অনর্গল উচ্চারিত হতে লাগল আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। আজও নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আমাকে বিমুগ্ধ করেছে।

তাঁর কাছেই শুনছিলাম গিরিশ-অমৃত- দ্বিজেন্দ্রলালের যুগের নাটকের একের পর এক অধ্যায়। বর্ধমান জেলায় কীভাবে সেই নাটক অভিনীত হত। ভাবতে অবাক লাগে বর্ধমান শহরে তিরিশের দশকেও দুটি মঞ্চ ছিল। শহরের এক প্রান্তে বোরহাট অঞ্চলে বিজয় থিয়েটার আর অন্যপ্রান্তে ব্রজেনবাবুর থিয়েটার! আজ সবই অস্তিত্বহীন। সে যুগটি ছিল যাত্রা পালার যুগ। গ্রামবাংলার মফঃস্বল শহরে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের রেওয়াজ খুবই সীমিত। সেই তিরিশের দশকে বর্ধমান শহরের বুকে দু-দুটো নাট্যশালা নিশ্চয়ই বিস্ময়ের উদ্রেক করে—যা আমারও এর পূর্বে অজানা ছিল। করিম সাহেবের কাছে জানলাম প্রখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী ব্রজেন দে-র মঞ্চে বেশ কয়েকবার অভিনয় করেছেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম ৩০-এর দশকে কী কী নাটক অভিনীত হয়েছে এসব মঞ্চে। গড় গড় করে বলে গেলেন

'বলিদান', 'নীলদর্পণ', 'সাজাহান', চন্দ্রগুপ্ত' 'মেবার পতন' আরও কত কি। সে সময়কার অভিনেতাদের কথা উঠতেই অনেক কটি নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে বসলেন—যেমন প্রমদীলাল ধন, কমল মিত্র, জগবন্ধু মিত্র, প্রণবেশ্বর সরকার, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকের। চলচ্চিত্রের কল্যাণে কমল মিত্র পরিচিত থাকলেও অন্যেরা কালের অতীতে বিস্মৃত। বর্ধমান জেলার বর্তমান নাট্য প্রজন্মের কাছে তাঁরা অজ্ঞাত। শুধু শহরভিত্তিক ছিল না এইসব নাটকের পরিবেশন। গ্রামে গঞ্জেও অভিনীত হত। থিয়েটারের দল গড়ে উঠেছিল বেগুট, বলগনা, হাটগোবিন্দপুর, কুড়মুন, মানকর, রায়না, মির্জাপুর প্রভৃতি এলাকাতেও। প্রখ্যাত অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থাতে বেশ কিছুদিন তাঁরই পরিচালনায় বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন।

আরও কয়েকজন প্রবীণ পরিচালক ও নাট্য ব্যক্তিত্বের নাটক অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। অভিনেতা পরিচালক হিসাবে ভবানী মেহেরা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক নাটকে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। দ্বিতীয়তও যাঁর নাম বাদ দিয়ে বর্ধমান শহর তথা জেলার নাট্য আন্দোলনের কথা ভাবা যায় না—তিনি হলেন ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়। ডাঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায়কে কেবল নাট্যকার পরিচালক, অভিনেতা হিসাবে চিহ্নিত করলে হবে না—বলা চলে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে যে কয়েকজন পরিচালক বর্ধমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ডাঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আর বলা চলে বাংলা নাটকের সেই সনাতনী নাট্যধারাকে সম্পূর্ণ ভেঙে বাংলা নাটককে নবযুগে উত্তরণের পথিকৃৎ হলেন রবীন্দ্রনাথ। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেশ কিছু চিকিৎসক ও নাট্যকর্মী এই নবতম নাট্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ডাঃ শিশির পাঁজা, ডাঃ নবঘন মৈত্র—পরবর্তীকালে ডাঃ আশিস মুখোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ-সহ আরও অনেকে মিলে গড়ে তোলেন 'রবীন্দ্র পরিষদ' এবং মূলত ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গ্রুপ থিয়েটারগুলির বর্তমান তীর্থক্ষেত্র 'রবীন্দ্রভবন' গড়ে উঠেছে।

৪০-এর দশকে গণআন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে ঝড় উঠেছিল, বর্ধমান জেলাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। আর তারই ফসল জেলায় বর্তমানে গণ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্ব মেহেবুব জাহেদি, হেমন্ত রায় প্রমুখ। আসানসোল এলাকাতে প্রয়াত বিজয়পালের নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত—অশীতিপর বৃদ্ধ রামশঙ্কর চৌধুরী তারই উত্তরসূরী। রামশঙ্কর দা এখনও আমাদের রাজ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক। আসানসোলে সেকালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়মিত এক নাট্যচর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে বিশেষত শিয়ারশোল এলাকাতে নাট্যচর্চা দীর্ঘদিনের ও বর্তমানেও তা অব্যাহত।

৬০-এর দশকে, বিশেষত ৬৬-র গণআন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও এক নতুন পথ ও বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল।

৬৭-৭০-এর গণনাট্য আন্দোলনের নব ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ধমান শহরে 'অন্বেষা' নাট্যগোষ্ঠী তাদের পথ পরিক্রমা শুরু করে। এদের নিবেদিত নাটক সে সময়ে সারা জেলায় সাড়া তুলেছিল। 'রক্তে রোঁয়া ধান', 'দুই মহল', 'হারাণের নাত জামাই', 'অন্য নাটক' প্রভৃতি প্রথাগত নাটকের বিরুদ্ধে জেহাদ বলা চলে। সংগ্রামী মানুষের কাছে এসব নাটকের মূল্য ছিল সে সময়ে অসাধারণ। সুদূর গ্রামাঞ্চলে এমনকি হ্যারিকেন, পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে এ সব নাটক হাজারে হাজারে দর্শককে টেনেছে।

৭০-এর দশকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এলেও এই সময়কালে অনেক প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে—যারা ভাল নাটক, জীবনের নাটক তথা সংগ্রামের নাটক মঞ্চস্থ করে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দুর্গাপুর অঞ্চলে ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করে যে শিল্প নগরী বিকাশলাভ করে তারই ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যের ও ভিন্ রাজ্যের মানুষের সমাগম ঘটে। আর তারই মধ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক নতুন ধারা সংযোজিত হয় ৬০-এর দশক থেকে। 'স্বগতঃ' সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেখানে নবীন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকারদের সমাবেশ ঘটতে থাকে—যাঁরা দুর্গাপুরের জনজীবনে এক নতুন সংস্কৃতির স্বাদ নিয়ে আসেন। এদেরই প্রভাবে পরবর্তীকালে সমগ্র দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও তার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে অনেক কটি নাট্যগোষ্ঠী—যাঁরা আজও নাটক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এদের মধ্যে 'স্মারক', 'অনামী', 'তূর্য', 'সংহতি', 'দিশারী', 'সাংস্কৃতিক পরিষদ',

'ঝড়ুয়া', 'কল্লোল', 'অয়ন', 'দুর্গাপুর সাংস্কৃতিক পরিষদ', 'পটদীপ' ইত্যাদি অন্যতম। 'স্মারকের' নাটক কয়েকবার রাজ্য নাট্য আকাদেমির প্রতিযোগিতায় পুরস্কারে ভূষিত। এর পরিচালক ও নাট্যকার গোপাল দাস এই দলের প্রাণপুরুষ। তার দুটি নাট্যগ্রন্থ 'অবশ্যম্ভাবী ও অন্য দুটি' এবং 'নাট্য সংকলন' উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়া 'সংহতি'র—পরিচালক রজত রায়চৌধুরী এই অঙ্গনে যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দুটি শাখা 'তূর্য' ও 'দুন্দুভি' নিয়মিত নাটক ও নানান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত।

চিত্তরঞ্জন এলাকায় 'অযান্ত্রিক' একটি অতি পরিচিত নাম। শুধু চিত্তরঞ্জন এলাকায় কেন এই দলের পরিচিতি প্রায় সারা রাজ্য জুড়ে। নাট্যকার-পরিচালক সুনীল ভট্টাচার্য গ্রুপ থিয়েটার জগতে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এদের পরিবেশিত 'রবি মীনে', 'দেবাংশী', 'বিবসনা বৃহন্নলা', 'বাঘবন্দী' ও আরও বেশ কিছু নাটক রাজ্য ও রাজ্যের বাইরেও অভিনীত হয়েছে। নানান নাট্য প্রতিযোগিতায় এই দল পুরস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জনে রয়েছে 'নাট্যরূপা', 'চিত্তরঞ্জন নাট্যসংস্থা', 'প্রান্তিক' ও অন্যান্য কিছু নাট্যগোষ্ঠী।

বার্ণপুর এলাকায় 'দিশারী', 'মুক্তধারা', 'রূপায়ণ', 'যাযাবর', 'গণ সংস্কৃতি সংঘ' নিয়মিত নাটকের চর্চা করে থাকেন। এর মধ্যে 'দিশারী', 'রূপায়ণ' প্রতিনিয়ত নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। দিশারীর 'দানব', 'ময়না তদন্ত', 'ইতিহাসের মানুষ', 'তমসার মাঝে' ও মুক্তধারার 'ওথেলো', 'মুক্তধারা', 'রথের রশি', 'বাকি ইতিহাস' উল্লেখের দাবি রাখে।

আসানসোল অঞ্চলে সেনর‍্যালে কালচারাল ইউনিট একটি অতি পরিচিত নাম। গণআন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে এই সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। 'ভিয়েতনাম', 'আমরা কবরে যাব না', 'ঘুম নেই'—এককালে এই শিল্পাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এ ছাড়া 'আসানসোল শিল্পী চক্র', 'উদয়ন', 'সতীর্থ', 'বলাকা', খাসকেন্দায় 'নক্ষত্র', 'রূপনারায়ণপুর রিক্রিয়েশান ক্লাব' কুলটির 'মিতাল নাট্য গোষ্ঠী', 'ঘরোয়া', 'সীমান্ত', 'বলাকা', 'টি আর সি', 'অরণি', 'শৈলুষ' ইত্যাদি নাট্যসংস্থা আছে। সতীর্থের 'নো-পাসারণ', 'অরাজনৈতিক', 'গজব কিসিমকা গাড়ি', নক্ষত্রের 'ধর্ষিতা' উল্লেখের দাবি রাখে।

জামুরিয়া অঞ্চলে 'চেনামুখ' একটি অতি পরিচিত নাম। এর পরিচালক পিন্টু কবি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। এদের অভিনীত নাটক 'ভাসান', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'রথের রশি' যে কোনও গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে গর্বের বিষয়। হীরাপুর এলাকায় বহুরূপীর 'ভিক্ষুক', 'ছেঁড়া তমসুক' যথেষ্ট ভাল প্রযোজনা।

রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল, বল্লভপুর, রতিবাটি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নাটকের গ্রুপ আছে। 'শিয়ারশোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন', 'অভিযান', 'বোহেমিয়ান থিয়েটার' রতিবাটির 'মিলন সংঘ', 'মিতালী সাংস্কৃতিক চক্র' প্রভৃতি সংস্থাগুলির মধ্যে মৃন্ময় কাঞ্জিলাল, রাম সুভাষ হাজরা, ফাল্গুনী চ্যাটার্জি, সোমনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ নিজেরা নাটক লেখেন ও পরিচালনা করে থাকেন। মানকর এলাকাতে বেশ কিছু ভাল নাট্যসংস্থা আছে যারা নিয়মিত নাটক করে থাকে।

কাঁকসা অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি ভাল নাট্যসংস্থা আছে। তাদের মধ্যে বি ডি এ পানাগড়, সুকান্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা, বৈশালী থিয়েটার ইউনিট, জঙ্গল মহল সাংস্কৃতিক পরিষদ, দিশারী কালচারাল ইউনিট অন্যতম। এলাকার তরুণ আশিস ভট্টাচার্যের নাট্যকার হিসাবে পরিচিতি আছে।

দক্ষিণ রায়না মঙ্গল কাব্যের এলাকা। দামুন্যার কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং কাইতি শ্রীরামপুরের রূপরাম চক্রবর্তী যথাক্রমে চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করে আজও মানুষের স্মৃতিতে অম্লান। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সম্মিলিতভাবে সংস্কৃতি চর্চা করে থাকেন এখানে। 'কথকতার' স্থান হলেও নাটক নিয়ে এরা বেশ কিছু চর্চা করে থাকেন। নট হিসাবে চিত্ত গোঁসাই এককালে যথেষ্ট সমাদৃত ছিলেন। এলাকায় প্রথম নাটক লেখেন ফকির ভট্টাচার্য। বর্তমানে যাঁরা নাটক লিখছেন ও অভিনয় করাচ্ছেন তাদের মধ্যে বাদল দে, জামাল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, শেখ মোসলেম, অশোক মহান্ত প্রমুখের নাম বলা যেতে পারে। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে পহলানপুর নাট্য সংঘ, সূর্য সারথি, সন্তোষ-যুগল সাংস্কৃতিক সংস্থা-সহ বেশ কিছু সংস্থা বর্তমান। সন্তোষ-যুগলের কর্ণধার শক্তি ঘোষ বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। কালনা মহকুমাতে বদিপুর এলাকায় বেশ কিছু নাট্যসংস্থা আছে যেখানে নিয়মিত নাটক নিয়ে চর্চা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া জেলায় যাঁরা নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত তাঁদের মধ্যে আছেন—মধু চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল ভট্টাচার্য, গোপাল দাশ, অলোক সামন্ত, মানিক মণ্ডল, মৃদুল সেন, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল দাশগুপ্ত প্রমুখ। জেলার আর একজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ না করলে এই প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার শম্ভু বাগ। তিনি শুধু নাট্যকার নন, অভিনেতা-পরিচালকও বটে। তাঁরই নেতৃত্বে বর্ধমান শহরে 'মুক্তমঞ্চ' গড়ার কাজ চলছে। নাট্যকার হিসেবে এত প্রসিদ্ধি খুব কম নাট্যকারের ভাগ্যে জুটেছে।

পরিচালনার ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের সুনীল ভট্টাচার্য, রাণীগঞ্জের নীলাঞ্জন ঘটক, রণজিত চক্রবর্তী, দুর্গাপুরের গোপাল দাস, সলিল দাশগুপ্ত, কাটোয়ার মানিক মণ্ডল, কাটোয়া সংগ্রামী শাখার অনাদি চক্রবর্তী, মেমারী এলাকার ললিত দাস, কালনা বদিপুর এলাকার বনজ রায়, বর্ধমান শহরের ময়ূখের নারায়ণ ঘোষ, দশরূপকের দেবেশ ঠাকুর, প্রমা'র মৃদুল সেন, মৌলিকের প্রয়াত মঙ্গল চৌধুরী ও বর্তমানে ললিত কোণার, নটরাজ গোষ্ঠীর অজিত ঘোষ, অনীকের দিলীপ বিশ্বাস, সাগ্নিকের নিমাই দে, নটতীর্থের অরূপ ব্যানার্জি ও আজকের থিয়েটারের জয়ন্ত ঘোষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ ছাড়া বর্তমানে যেসব গোষ্ঠী নিয়মিত অভিনয় করছেন তাদের

মধ্যে অঙ্গীকার, ইয়ুথ কালচারাল সেন্টার, নটযোদ্ধা, নাট্যভূমি, অরিত্র, রঙ্গম, সেভেনস্টার, চুয়ান, সুকান্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রয়াত মঙ্গল চৌধুরী দীর্ঘকাল নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে জেলার বাইরেও তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় 'বর্ধমান ড্রামা কলেজ'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ পুরুষ ছিলেন। সুনীল ভট্টাচার্য এবং গোপাল দাস বর্তমানে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে পরিচালক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বহু পুরস্কারে ভূষিত। 'শিশুরঙ্গম' শিশুদের জন্য তৈরি হলেও সেই শিশু শিল্পীরা বড় হয়ে পরে রঙ্গমের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য আন্দোলনে জেলায় একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। পরিচালক ও নাট্যকার হিসাবেও তিনি সুপরিচিত।

বর্ধমান শহরে ষাটের দশকে যাঁরা অভিনেত্রী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী গোপা চৌধুরী, বেলা দত্ত, দীপ্তি শীলের নাম অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। শ্রীমতী গোপা চৌধুরী এখনও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বর্তমানেও নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন। এই সময়কালে শহরে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনয়ে আসেন স্বপ্না রায়, গৌরী ব্যানার্জি, সোমা চক্রবর্তী প্রমুখ। বর্তমানে অবশ্য অনেক মহিলা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্না।

সারা জেলাব্যাপী ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রায় ১৪টি শাখা আছে যেখানে নাট্যচর্চা চলছে এবং ভাল নাটক পরিবেশিত হচ্ছে। দুর্গাপুরের শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেশ কয়েকটি ভাল নাটক লিখেছেন—যা অনেক স্থানে অভিনীত হয়ে থাকে। বর্ধমান শহরে গণনাট্য সংঘের শাখা 'বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' বেশ কয়েকটি ভাল নাটক পরিবেশন করেছেন—রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'বদরক্ত' সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালনায় অনেক 'পথনাটিকা' পরিবেশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'মেরা ভারত মহান', 'হাওলার ডায়েরী', 'বাপুজী অতঃ কিম' উল্লেখের দাবি রাখে।

বর্ধমান জেলা একটি বৃহৎ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা। একদিকে শিল্পাঞ্চল, অন্যদিকে বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল। ফলে এখানে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু মিশ্রণ ঘটেছে। বর্ধমান জেলায় শ্রমিক কৃষক-মৈত্রীর মধ্য দিয়ে যে গণ আন্দোলনের অগ্রগতি—তারই পাশাপাশি বর্তমানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটছে। কিন্তু এ কাজ শ্রমসাধ্য। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত গণ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ না হলে সাংস্কৃতিক কর্মীরা এ কাজ করতে পারবেন না। নাটক যেহেতু সমাজের দর্পণ সে ক্ষেত্রে গ্রামবাংলার দর্পণেই জেলার শিল্পাঞ্চল তথা শহর সংস্কৃতিকে দেখতে হবে। ইদানীংকালে জেলার বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারগুলির নাটকে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে এটা আশার কথা।

সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহ

বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন

রমাকান্ত চক্রবর্তী

বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। এই জেলার সংখ্যাতীত দেশব্রতী বার বার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, এবং তার জন্য নিগ্রহ, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। এই সমীক্ষায় সমস্ত জ্ঞাত তথ্য দেওয়া যাবে না; এ জেলার সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নামধাম পরিচয় উল্লেখ করা যাবে না। তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে, বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন-বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা রচনা করি।

ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে কখন শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ আছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য সম্বন্ধেও বিবিধ মত রয়েছে। এখানে এ সব বিষয় আলোচনা করার সুযোগ নেই। কিন্তু এ তথ্য এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদ বর্ধমানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বর্ধমান শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দামোদর নদের তীরে ১৭৬০-এ ২৯ ডিসেম্বর যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণে বর্ধমানের পাঁচশত সেনা নিহত হয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন একহাজার স্থানীয় যোদ্ধা। ইংরেজ-বাহিনীর মাত্র এগার জন সৈন্য নিহত হয়। পলাশির যুদ্ধের পরে এটিই ছিল তৎকালীন বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক

মেক্লেইন্ লিখেছেন যে, যদি বর্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা, মারাঠাগণ এবং মুগল সম্রাট ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করতেন, তবে বাংলার নবাবের (মীরজাফর খান-এর) এবং ইংরেজদের সেখানে টিকে থাকাই সম্ভব হত না। [John R. McLane, Land And Local Kingship in Eighteenth Century Bengal, Cambridge, 1993, P. 181] অথচ, রাজা তিলকচাঁদের সংগ্রামকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা যাবে কি? তিনি তো প্রধানত নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। এই যুদ্ধে সমগ্র দেশের স্বার্থ কখনওই পরিস্ফুট হয়নি। আধুনিক অর্থে দেশপ্রেম, দেশাভিমান তখন স্পষ্ট ছিল না।

এই ভীষণ ঘটনার পর থেকে জমিদারি-ব্যবস্থা তুলে দেওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কালে বর্ধমানের রাজা-মহারাজারা আর কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হননি। ইংরেজরা, এবং তাঁদের দেশি দালালরা ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে দফায় দফায় সতের লক্ষ কুড়ি হাজার চারশত তেষট্টি টাকা, এগারো আনা, নয় পাই আদায় করে। তাঁদের মধ্যে বন্য-প্রেমিকরূপে বর্ণিত ধুরন্ধর ওয়ারেন হেস্টিংস পেয়েছিলেন পনের হাজার টাকা, জর্জ ভ্যান্সিটার্ট পেয়েছিলেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, এবং কাশীপ্রসাদ বসু পেয়েছিলেন লক্ষাধিক টাকা। এই নির্মম শোষণের ফলে বর্ধমানের রাজার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে।

ইংরেজরা বর্ধমানকে কামধেনু ভাবত। এমন সোনার দেশ ভারতে তখন আর একটিও ছিল না, লিখেছেন ওয়ালটার হ্যামিলটন [Description of Hindostan, I, Delhi reprint, 1970, P. 29]। ১৮১৪-তে বর্ধমান থেকে সংগ্রহ করা রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৩২৪৬৬৩ টাকা। কৃষির উৎপাদনে বর্ধমান সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থানে ছিল; তার নীচে ছিল তাঞ্জোর। অথচ, ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার পরে বর্ধমানের রায়তদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তার আগে, ১৭৯০-তে, একটি সমকালীন হিসাব অনুসারে, দরিদ্র রায়তদের ভাতে মারার জন্য বর্ধমানের রাজা-জমিদাররা তাঁদের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার দেওয়ানি মামলা করেছিলেন।

অথচ, ক্রমবর্ধমান জমিদারি-উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বর্ধমান জেলায় কৃষক-বিদ্রোহ হয়নি। এই উৎপীড়নের ও শোষণের মর্মন্তুদ বিবরণ আছে বর্ধমান জেলার সুসন্তান রেভারেন্ড লালবিহারী দে বিরচিত Bengal Peasant Life নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। উৎপীড়িত বর্ধমানের কৃষক কেন শান্ত হয়ে থাকলেন? কেন তাঁরা বিদ্রোহ করলেন না? এ প্রশ্নের একটা আনুমানিক উত্তর দেওয়া যায়। H. H. Risley-রচিত The Tribes And Castes of Bengal নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দুই খণ্ডে বর্ধমান জেলার জনগণনার ও জনবিন্যাসের যে বিবরণ আছে প্রসঙ্গক্রমানুসারে, তাতে একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিময়, ঐতিহ্যসম্মত গ্রামীণ সমাজের ও কৃষ্টির রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে কেউ কারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না, কেউ কিছু ভেঙে দিতে চায় না, কেউ কোনও পরিবর্তন চায় না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আগুরি, সদ্গোপ প্রভৃতি জাতিভুক্ত নানা শ্রেণীর জমিদার-পাটনিদার-জোতদারদের ভূমির উপরে যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, এবং যে নিয়ন্ত্রণের উপরে সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল, রক্ষণশীলতাই ছিল তার প্রাণবস্তু। ১৮৫৫-এর সাঁওতাল-বিদ্রোহের প্রভাব বর্ধমানে পড়ল না, কারণ ১৮৭১ এবং ১৮৮১-তে কৃত জনগণনা অনুসারে এই জেলায় 'বাসিন্দা'-সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যেহেতু বর্ধমানে তেমন কিছু নীলচাষও হত না, তাই ১৮৫৯-এর নীল বিদ্রোহের প্রভাবও সেখানে দেখা গেল না। ১৮৫৭ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে সাংঘাতিক 'বর্ধমান জ্বর' [এক ধরনের ম্যালেরিয়া] এ জেলার প্রায় কুড়ি লক্ষ নরনারী শিশুকে উৎসাদিত করে। বহু গ্রাম জনহীন হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায় কে আর অত্যাচারেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিংবা সংগ্রাম করতে পারত?

প্রসঙ্গত আরও কতগুলো তথ্য উল্লেখ্য এবং বিচার্য। বর্ধমান জেলা ছিল প্রধানত 'গ্রাম-বাংলা'। ভারতচন্দ্র-বর্ণিত বর্ধমান নগর, তাঁর কবিত্বময় বর্ণনায় বড় মনে হলেও, ঢাকার এবং মুর্শিদাবাদের সঙ্গে তুলনায় তেমন কিছু বড় শহর ছিল না। কিছু দূরে দানবাকৃতিসম্পন্ন কলকাতার আবির্ভাবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মধ্যযুগীয় শহরের মতো বর্ধমান শহরও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। অনুপার্জিত আয়ের বেশ কিছু অংশ ব্যয় করে রাজারা, শহরটিকে বড় বড় দীঘি কেটে, সুন্দর সুন্দর বাগান করে, মন্দির বানিয়ে, এবং প্রাসাদের বিস্তার ঘটিয়ে সাজিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও বর্ধমান প্রকৃত অর্থে বড় শহর ছিল না। ভোলানাথ চন্দ্রের উপভোগ্য বিবরণে দেখি, [Bholanath Chunder, Travels of a Hindoo, Vol. I, London, 1869, pp. 161-201], ১৮৬০-এ মানকর ছিল গুরুত্বহীন; পানাগড় ছিল অনুন্নত; রাণীগঞ্জ, কয়লার খনি থাকলেও, ছিল 'শিশু-শহর', বরাকর ছিল গ্রাম। ১৮৭২-এর আগে থেকেই বর্ধমান শহরের জনসংখ্যা কমে যেতে থাকে। বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা—এই তিনটি শহর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মধ্যকালীন। তাদের বিশেষ কোনও 'আধুনিক' রূপ অথবা গঠন ছিল না। যে 'আধুনিক' নগরায়ন ছিল ব্রিটিশ-শাসন-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, তা বর্ধমান জেলায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

বর্ধমান জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করলেও ইংরেজ সরকার সে জেলায় শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করেনি। বর্ধমানে কাপ্তান চার্লস স্টুয়ার্ট ও রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়

শিক্ষার প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করেন, তা অবশ্যই স্মরণীয়। কিন্তু, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এত বড় জেলায় ছিল মাত্র সাতাশটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, এবং বর্ধমান শহরে একটি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ। সে কলেজেও বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বর্ধমান জেলায় তখন মাত্র দশ শতাংশ ব্যক্তি সাক্ষর ছিলেন।] [দ্রষ্টব্য: নগেন্দ্রনাথ বসু, বর্ধমানের ইতিহাস, প্রাচীন ও আধুনিক। [বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৯১৪-তে প্রকাশিত, পৃ. ১৩] সমগ্র উনিশ শতকে কেবলমাত্র রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া বর্ধমান শহর থেকে একটিও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়নি। বর্ধমানের রাজসভায় সাহিত্যিক কৃষ্টি মূলত ছিল প্রাগাধুনিক। বর্ধমানের মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান ছিল কলকাতার বটতলায় ছাপা মাত্র চারটি বই। [দ্রষ্টব্য: আবদুল গফুর সিদ্দিকি, 'মুসলমান ও বাঙ্গালা সাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯১৬, ১, পৃ. ৯৫-১২১; আবদুস সামাদ, 'বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা, ১৯৯১]।

এই অবস্থায় বর্ধমানের রাজনৈতিক কৃষ্টি যে কিরূপ হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৫৭-তে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয়গণ পরাজিত হলেন। তখন বর্ধমানের মহারাজা, এবং তাঁর সঙ্গে আড়াই হাজার শিক্ষিত বাঙালি বড়লাট ক্যানিং-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালেন। [দ্রষ্টব্য, Ramakanta Chakrabarty, ed, The Mutinies and the People, Calcutta, reprint, 1969, PP. 115-117] ১৮৫৭-তে লন্ডনের Times পত্রিকায় এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল যে, বর্ধমানের মহারাজা বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকারকে পাঁচ লক্ষ পাউন্ড অর্থ দান করেন। সরকারের তরফ থেকে তাঁকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ]

১৮৬৫-তে বর্ধমান শহরে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেখানে এই সংগঠনকে কেন্দ্র করে আধুনিক অর্থে রাজনীতির সূত্রপাত হয়। [দ্রষ্টব্য, 'বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা', বর্ধমান, ১৯৬৫; এখানে প্রকাশিত তারককুমার মিত্র-রচিত 'বর্ধমান পৌরসভার ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য] প্রথমে ছয়জন সাহেব, এবং নয়জন সরকার-মনোনীত ভারতীয় এই নাগরিক সংগঠন পরিচালনা করেছেন। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত কেবলমাত্র মনোনীত সাহেবই বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হতে পারতেন। এরই মধ্যে ১৮৭৩-এ এই সংগঠনে নির্বাচিত সদস্যদের প্রেরণ করার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৮৪-তে রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত সভাপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ নির্বাচনের ফলে বর্ধমান শহরে নাগরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সাহেবসুবার আধিপত্য আর থাকল না। কিন্তু পৌর নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট দানের অধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। নলিনাক্ষ বসুর প্রশাসনকালে লাকুড্ডিতে বিশাল পৌর-জলাধার নির্মিত হয়। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

সভা-সমিতি গঠনের মাধ্যমে উদারপন্থী রাজনীতির যে ধারা উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই প্রচলিত ছিল, বহুকাল পর্যন্ত বর্ধমানে তার প্রভাব দেখা যায়নি। ১৮৭৬-এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বন্ধুগণ Indian Association প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিখ্যাত সংগঠনের প্রভাবে বর্ধমান জেলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল। বর্ধমান শহরে, কালনা শহরে এবং পূর্বস্থলীতে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন নলিনাক্ষ বসু, জগদ্বন্ধু মিত্র এবং মৌলবী মুহম্মদ ইয়াসিন। এ তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মৌলবী মুহম্মদ ইয়াসিন এবং আবুল কাশেম তখন বর্ধমান শহরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কখনওই আলিগড়ের 'বিচ্ছিন্নতার' তত্ত্ব প্রচার করেননি। বাঙালি-মুসলমান তাত্ত্বিক আমীর আলির ইসলামের পুনরুত্থান বিষয়ক তত্ত্বের দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হননি। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গেই তাঁরা সংযোগ রেখেছেন। অথচ, বর্ধমানে ১৮৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কংগ্রেসের সংগঠন এবং জন-সংযোগ-ব্যবস্থা তখন দুর্বল ছিল। ১৮৯৯-তে, এবং ১৯০৪-এ বর্ধমান শহরে Indian National Conference-এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি।

বর্ধমানে জাতীয়তাবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে একটি সুপ্রশস্ত, অথচ দুর্লক্ষ্য ভিত্তি ছিল, তা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বিস্ময়কর হয়ে উঠল। বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করলেও বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। গ্রামে-গ্রামে সংগঠিতভাবে বঙ্গভঙ্গ অগ্রাহ্য করা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলন কালনা শহরে সুতীব্র হয়ে ওঠে; তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং উপেন্দ্রনাথ সেন। আবুল কাশেম তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মেমারিতে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন। বর্ধমানে বহু জায়গায় রাখীবন্ধন-উৎসব পালিত হয়। বিলাতি কাপড় পোড়াবার অভিযোগে পুলিশ বাথনাপাড়ার পাঁচটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বর্ধমান জেলায় এটাই ছিল প্রথম 'রাজনৈতিক অপরাধ'। বৈষ্ণব এবং সাংবাদিক শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পল্লীবাসী'- পত্রিকায় এই পাঁচ কিশোরের বীরত্বের প্রশংসা করলেন। মানকরের বাজারেও বিলাতি কাপড় পুড়িয়েছিলেন রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত; তাঁকেও শাস্তি পেতে হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাটোয়াতে, শিয়ারকোণে, বৈদ্যপুরে, অকালপোষে, দেয়ারাতে, ধাত্রীগ্রামে, জনুখালে। গ্রামে গ্রামে জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে গেল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার সম্প্রসারণ হল। কালনা শহরে

প্রতিষ্ঠিত হল স্বদেশী ভাণ্ডার। স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হল অনুখালে, ঢোলারহাটে, রাইগ্রামে, কৈ-গ্রামে এবং বাখনাপাড়াতে। সে সময় থেকেই বর্ধমান জেলায় স্বাধীনতা-আন্দোলনে কালনা মহকুমার বিশিষ্ট স্থান। [দ্রষ্টব্য: Ramakanta Chakrabarty, 'Freedom Movement in Burdwan, 1800-1939, A Survey' in Bhaskar Chattopadhyay and Ramakanta Chakrabarty, Freedom Movement in Burdwan, Burdwan District Congress Centenary Celebration Committee, 1985, PP. 12-14]

বর্ধমান জেলায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ক্রমশ সুসংগঠিত। সেখানে বিলাতি-বর্জন অথবা 'বয়কট'—আন্দোলনের ফলে বিলাতি কাপড়ের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই কাপড়ের মূল্য হ্রাস হল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে এটাই দেখা গেল যে, বঙ্গের অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের মতো বর্ধমান জেলার অধিবাসীগণ রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই আন্দোলনে বর্ধমান জেলার কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর তথা দেশপ্রেমিকের ভূমিকা ছিল বিশিষ্ট। তাঁরা হলেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, রাখালচন্দ্র দেব, বলাই দেবশর্মা এবং স্বামী কমলানন্দ। বর্ধমান জেলায় তাঁরাই বিখ্যাত Dawn Society-র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন। বর্ধমানে তাঁরাই ছিলেন 'নূতন যৌবনের দূত'। প্রসঙ্গত অকালপোষ গ্রামের অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। উচ্চশিক্ষিত অরবিন্দপ্রকাশ সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে নামমাত্র বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেন। শেষপর্যন্ত সর্বজন পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দুঃস্থ ব্যক্তির কন্যার বিবাহের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করেছেন। তাঁর দেশপ্রীতির ও মানবসেবার নিদর্শন অদ্যাবধি অনন্য। কালনার কর্মীবৃন্দ সেখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উপলতি গ্রামেও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্মপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল।

বর্ধমানেও চরমপন্থা ও বিপ্লববাদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নিস্তরঙ্গ বর্ধমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এটা ছিল এক বিরাট তরঙ্গ। বর্ধমান ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী বসু, পুলিনবিহারী দাস, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবীদের মাতৃভূমি। ১৯০৬-তে বরিশালে ও বর্ধমানে ভয়াবহ বন্যা হয়। সে সময়ে 'বর্ধমান সম্মিলনী'-র মাধ্যমে বর্ধমানে ব্যাপকভাবে ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়। সম্ভবত এই অস্থির কালে বিপ্লবীগণ বর্ধমানে এসে তরুণদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসুর, অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষের এবং শরৎচন্দ্র বসুর সম্পর্ক ছিল। শরৎচন্দ্র বসু এই জন্য পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। এমনও দাবি করা হয়েছে যে, অরবিন্দপ্রকাশের সঙ্গে গদর দলের সংযোগ ছিল। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী এবং সমাজসেবক। [দ্রষ্টব্য, 'বর্ধমান পরিচিতি', ১৯৫৪-তে পশ্চিমবঙ্গ-কংগ্রেসের বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনকালে প্রকাশিত, পৃ. ৪২, ৪৪]

বাখনাপাড়ায় এবং চণ্ডীপুর গ্রামে যুগান্তর দলের সংগঠন ছিল। বর্ধমানে এই বিখ্যাত দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'মহামায়া সমিতি'-র স্রষ্টা পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায়, জয়দেব রায়, অজিতশরণ বসু এবং কালীকেশব ঘোষ। ১৯০৬-তে রেলওয়ে ধর্মঘটে বর্ধমান জেলায় রেলওয়ে কর্মচারিগণ যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বর্ধমানের বিপ্লববাদী তরুণ বাসুদেব ভট্টাচার্যের কীর্তি আলোচ্য। তাঁর সম্বন্ধে তথ্য আছে J. C. Ker-রচিত Political Trouble in India : A Confidential Report—গ্রন্থে (Delhi ed. 1973, P. 399)। ১৮৮৫-তে চাকদীঘি গ্রামে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। 'বয়কট'-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'-পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে কোনও এক সময়ে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লি ওয়ার্নারকে মারধর করেন। তাঁকে যে কেন বাসুদেব মারধর করেছিলেন, তা জানা যায় না। ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় গিয়ে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। বর্ধমানে আরও একজন বিপ্লবী ছিলেন যুগান্তর দলের কর্মী সুরেশচন্দ্র মজুমদার (জন্মকাল, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ)। বিখাহাটি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯১৩-তে বর্ধমানে বন্যা হয়। সে সময়ে বন্যাত্রাণের কাজে নিযুক্ত থেকে বিখ্যাত বিপ্লবী শহিদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন—জনাকীর্ণ বর্ধমান স্টেশনে অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি এবং অনুশীলন দলের নেতা মাখনলাল সেনের সঙ্গে বিপ্লবীদের একতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করেছেন। [প্রাগুক্ত Political Trouble In India, P. 427; প্রাগুক্ত 'বর্ধমান পরিচিতি', পৃ. ৪৫; ফকিরচন্দ্র রায়, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়,' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩০-৩১, ১৩১-৩২] বর্ধমান জেলায় যুগান্তর দলেরই কিছু প্রভাব ছিল। সিয়ারাসোল গ্রামে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির অনুগামী নিবারণ ঘটক এবং তাঁর আত্মীয়া দুকড়িবালা দেবী যুগান্তর দলের একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র গড়েছিলেন। যুগান্তর দলের শাখা রূপে বর্ধমান শহরে আত্মোন্নতি সমিতি গঠিত হয়।

সম্ভবত ১৯১৩-তে বারাণসীর বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বর্ধমানে এসে অনুশীলন সমিতির একটি

শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং মানকরের রাধাকান্ত দীক্ষিত। কিন্তু কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের অভাবে বর্ধমান জেলায় অনুশীলন দল প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি। বর্ধমানে বিভিন্ন বিপ্লববাদী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অজ্ঞাত। পূর্বে উক্ত অজিতশরণ বসু বারীন্দ্রকুমার ঘোষের অনুগামী ছিলেন। সাংবাদিক বলাই দেবশর্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাছে সাংবাদিকতা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলার বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং জিতেন্দ্রনাথ মিত্র ঋষি অরবিন্দের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু বৎসর ধরে National Council of Education-এর সংযোগ ছিল ত্রিশের দশকে বিজয়কুমার ভট্টাচার্য বর্ধমানে কংগ্রেসের সংগঠন সম্প্রসারিত করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে উত্তরবঙ্গের যুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে এবং যতীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'গণমঙ্গল সমিতি'-র সঙ্গে বিজয়কুমারের সংযোগ ছিল অনুশীলন দলের কর্মী শহীদ নলিনী বাগচির বন্ধু ছিলেন তিনি। [এসব তথ্য আছে ফকিরচন্দ্র রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে, পৃ. ১৩২, ১৩৩, কালিপদ বাগচী, 'বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন রায়' (কলিকাতা, ১৯৬৫), পৃ. ৬৫; Arun Chandra Guha, First Spark of Revolution, Orient Longman 1971, PP. 51, 84-85; ফকিরচন্দ্র রায়, পৃ. ১৩৪] জাতীয়তাবাদসহ হিন্দু-পুনরুত্থানের তত্ত্বও বর্ধমানে প্রচার করা হয়। এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কমলানন্দ পরিব্রাজক, ভামিনীরঞ্জন সেন, প্রফুল্লকুমার পাঁজা এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। লক্ষণীয়, কমলানন্দ পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সংহতির ওপরে জোর দিয়েছিলেন। উল্লিখিত তথ্যসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বর্ধমান জেলার স্বদেশপ্রেমিক সাহসী তরুণদের কোনও বিপ্লববাদী দল সংগঠিত করতে পারেনি, ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেনি। যথার্থ সংগঠন এবং পরিচালনা থাকলে বর্ধমান জেলা নিঃসন্দেহে বিপ্লববাদী সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হত।

এ তথ্যও উল্লেখ্য যে, বর্ধমান জেলায় মুসলমানগণ প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতাকে এড়িয়ে চলেছেন। এখানে মুসলিম লীগের প্রভাব কখনও বেশি ছিল না। মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা আবুল কাশেম এবং মুহম্মদ ইয়াসিন সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বর্ধমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। কংগ্রেস নেতা মুহম্মদ ইয়াসিন ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনেরও নেতা। বর্ধমানের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অন্য নেতাগণ ছিলেন আবুল হায়াত্, মোল্লা জাহেদ আলী, আবদুল কাদের এবং কচি মিয়াঁ। তাঁদের সঙ্গে বিপ্লববাদী বলাই দেবশর্মার বন্ধুত্ব ছিল। [দ্রষ্টব্য, ফকিরচন্দ্র রায়, পৃ. ১০৫, ১০৭, ২৩০-৩১]

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচলিত ধারা এবং চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাঁর দ্বারা পরিচালিত 'রাওলাট্-সত্যাগ্রহ' (এপ্রিল, ১৯১৯) ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯২০-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার কারণ ছিল অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে বর্বরোচিত গণহত্যা এবং তুরস্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মারাত্মক ভূমিকা। ভারতীয়দের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ১৯১৮-তে যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়, তা ভারতের নেতৃবৃন্দ গ্রাহ্য করেননি। সমগ্র ভারতেই তখন শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল।

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বর্ধমান জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং অমরনাথ দত্ত। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ ইয়াসিন, সম্পাদক ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। বর্ধমানের মহারাজা এবং জমিদার শ্রেণী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এই আন্দোলনে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিনিধিদেরই খর্বিত এবং ক্ষমতাহীন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে। মধ্যস্থানীয় সম্পন্ন কৃষকগণ এবং শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সর্বদা শত হস্ত দূরে থেকেছেন। অতএব, বর্ধমানে এই ধরনের ব্যাপক গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাফল্য সন্দেহাতীত ছিল না। ১৯২১-এ কালনাতে, কাটোয়াতে এবং আসানসোলে কংগ্রেস-সমিতি গঠিত হয়। অহিংস অসহযোগের রাজনৈতিক তত্ত্ব, অথবা উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার সময় ছিল না তাই এই আন্দোলন কালনাতে এবং কাটোয়াতে কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হলেও, অন্যত্র ফলপ্রসূ হয়েছিল কিনা, সন্দেহ। বর্ধমান জেলায় এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাক্তার বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আসানসোলে সরস্বতী কর্মমন্দিরের সভ্যগণ। ১৯২২-এ বর্ধমান শহরে এবং বৈকুণ্ঠপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অথচ, কোনই সন্দেহ নেই, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বর্ধমান জেলার অগণিত মানুষের মনে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে, অসাম্প্রদায়িক দেশাত্মবোধের প্রয়োজন সম্বন্ধে নতুন ভাবনার সঞ্চার করে, আনে নতুন অনুপ্রেরণা। তার আগে বিপ্লববাদীগণ এবং হিন্দু পুনরুত্থানের তাত্ত্বিকগণ এই ধরনের নতুন ভাবনা, নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারেননি। এই কথার প্রমাণ, ১৯৩০-এ আইন অমান্য

আন্দোলনে বর্ধমান জেলার সংখ্যাতীত দেশপ্রেমিকের অংশগ্রহণ, কারাবরণ এবং নিগ্রহবরণ। যতদূর জানা যায়, ১৯২৫ থেকেই বর্ধমানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তী বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য কর্মীগণ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাটোয়ার অন্নদা সাহা, হরেরাম মণ্ডল; কালনার গোপেন কুণ্ডু; রানীগঞ্জের ভীমাচরণ রায়; বরাকরের কালুরাম মাড়োয়ারি। [ফকিরচন্দ্র রায়, পৃ. ৩০-৩৫] অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীগণ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারা প্রচার করেছিলেন।

১৯৩০-এ সমগ্র বর্ধমান জেলায় আইন-অমান্য আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হয়। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে যাঁরা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের সাম্যবাদী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং শহিদ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বানোয়ারি লাল ভালোটিয়া, কমিউনিস্ট কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায়; মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়; পরবর্তীকালের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি, হরেকৃষ্ণ কোনার এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়; বর্ধমান শহরের ডাক্তার অখণ্ড গুপ্ত; ভামিনীরঞ্জন সেন; পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা এবং বুদ্ধিজীবী সৈয়দ শাহেদুল্লাহ; মুহম্মদ ইয়াসিন, আবদুস সাত্তার এবং দাশরথী তা। [দ্রষ্টব্য, ফকিরচন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত; 'বর্ধমান পরিচিতি', প্রাগুক্ত; বলাই দেবশর্মা, বর্ধমানের ইতিহাস, ১৯৫৮; বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত; সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৫; সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ', বর্ধমান ১৯৯১; এবং Ramakanta Chakrabarty, প্রাগুক্ত, PP,20-23], বর্ধমান শহরে ছাত্র এবং যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন ফকিরচন্দ্র রায়, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরি এবং শৈলেন্দ্রনাথ রায়। কংগ্রেসের সংগঠন প্রধানত বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মহিষাদলে আইন অমান্য করতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুরমা মুখোপাধ্যায় কাটোয়াতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। সমগ্র বর্ধমানে মহিলাগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে কালনাতেও এই আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। সমগ্র বর্ধমান জেলাতে বহু যুবক তাতে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে সাম্যবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হন। এমন বলা যায় যে, এই আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় সাম্যবাদ প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। আইন অমান্য করার অভিযোগে বর্ধমান জেলায় অন্তত এক হাজার দেশব্রতীকে গ্রেফতার করা হয়। মহিলাদের নেত্রী ছিলেন ডাক্তার গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সুরমা মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চৌধুরীর সহধর্মিণী, রেনুদিদি (শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর স্ত্রী), এবং মৈমনসিংহের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীমণি সিংহের ভগ্নী শ্রীমতী নির্মলা সান্যাল। এই আন্দোলন পূর্বের সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে ব্যাপক হয়েছিল। তার ফলে বর্ধমান জেলায় তৃণমূলস্তরে যেমন রাজনৈতিক চেতনা সম্প্রসারিত হল, তেমনই জনপ্রিয়তা অর্জন করল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রবহমান জমিদারি-জোতদারি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা গেল যে, পূর্বে বর্ধমান জেলায় জমিদার-জোতদারদের রাজভক্তি ছিল প্রশ্নাতীত; এখন অনেক জমিদার-জোতদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার ফলে কংগ্রেস কখনওই শ্রেণী-সংগ্রামের কথা প্রচার করেনি। ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে, আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৩২-এ বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের পুনর্গঠন করা হয়। কংগ্রেসের সংগঠনে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রয়োজনীয় ছিল।

বর্ধমান শহরে যুব সংগঠনের সূত্রপাত করেছিলেন দুর্লভকিশোর মিত্র; তিনি কচিবাবু নামে সুপরিচিত ছিলেন। [এ বিষয়ে ফকিরচন্দ্র রায়-রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে বহু তথ্য আছে। পৃ. ৪৫-৪৭] যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রচারে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও প্রথমে উল্লেখ্য। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিল 'শক্তি' (১৯৩০-এর পরে বোধহয় মুদ্রিত হয়নি); ভোলানাথ ভঞ্জ-সম্পাদিত 'বর্ধমান' (১৯২১; সাপ্তাহিক); বংশগোপাল চৌধুরী সম্পাদিত 'দেশপ্রিয়' (১৯৩৪); ভুজঙ্গভূষণ সেন সম্পাদিত 'শান্তিজল' (১৯৩৪?); দাশরথী তা সম্পাদিত 'দামোদর' (১৯৩৬, পাক্ষিক); এবং ভবভূতি সোম সম্পাদিত 'পল্লীকথা' (১৯৪০, সাপ্তাহিক), [দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত 'বর্ধমান পৌরসভার ইতিবৃত্ত', পৃ. ৩৯-৪২]

কচিবাবু বলাই দেবশর্মা সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'শক্তি'-র মুদ্রণের ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা ছিলেন অম্বিকা নাগ, বিনয় বসু, অন্নদা চক্রবর্তী, পরবর্তীকালে ভারতবিখ্যাত ছায়াছবি-নির্দেশক দেবকীকুমার বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম রহমান ওরফে কচি মিয়াঁ। খাদি-কর্মী মন্মথনাথ সেন পরিচালিত অন্য একটি যুব-সংগঠনও বর্ধমান শহরে ছিল। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, যাদবেন্দ্র নাথ পাঁজা, রাধাকান্ত দীক্ষিত, মুহম্মদ ইয়াসিন এবং আশুতোষ চৌধুরী। কচিবাবুর সংগঠনের সভ্যগণ সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন। মন্মথনাথ সেনের সংগঠন ছিল গান্ধীবাদী, দুটি সংগঠনই গ্রামাঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করার জন্য, পাঠশালা করার জন্য, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করে।

১৯২৫-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলনে বর্ধমানের প্রতিনিধি ছিলেন ফকিরচন্দ্র রায় এবং সুধীন্দ্রনাথ সরকার। বর্ধমানে ছাত্র-যুব সংগঠন, এবং বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত ফকিরচন্দ্র রায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্যই

বিষমিত হয়। অসামান্য এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবনী পূর্ণাঙ্গভাবে রচনা করা উচিত। ১৯২৫-এ ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী শহিদ হয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে বর্ধমান শহরে যুবকগণ একটি সভার অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার সভাপতি হয়েছিলেন মৌলবী মুহম্মদ ইয়াসিন। লক্ষণীয়, বর্ধমানের দেশপ্রেমিক যুবকগণ গান্ধীপন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেও ১৯২৮-এ গঠন করেছিলেন 'গুপ্ত সমিতি'। তার সভ্য ছিলেন খাদি-কর্মী মন্মথনাথ সেন, ফকিরচন্দ্র রায়, নিবারণ ঘটক, দুকড়িবালা দেবী, পরবর্তীকালে খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায় এবং হেলারাম চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বসুও এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এমন মনে হয় যে, বর্ধমানের 'গুপ্ত সমিতি', অনুশীলন সমিতির মতো, কিংবা শ্রীসঙ্ঘের মতো, শক্তিশালী হয়ে উঠতে চেষ্টা করে। 'গুপ্ত সমিতি' থাকার জন্যই বর্ধমান শহরে অনুশীলন সমিতির কিংবা শ্রীসঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।

বর্ধমানের ছাত্রদের সঙ্গে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'গুপ্ত-সমিতি'-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রধানত যুগান্তর দলের। বিশেষভাবে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বারবার বর্ধমানে এসে সমাজবাদের ও প্রগতির বার্তা প্রচার তাৎপর্যবহ ছিল। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির পরামর্শে রাইফেল সংগ্রহ করার, অর্থ লুণ্ঠন করার, ডিনামাইট দিয়ে রেললাইন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও, এক সময়ে বর্ধমান জেলার অনেক তরুণ একই সঙ্গে এই ধরনের কর্মে এবং সমাজবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী 'বীরভূম ষড়যন্ত্র'-মূলক ঘটনায় সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার জন্য তাঁকে পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। হরেকৃষ্ণ কোনারকে 'স্বদেশী ডাকাত' ভেবে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ তথ্যও উল্লেখ্য যে, 'গুপ্ত সমিতি' গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকসেবা করেছে, মানুষের চেতনা উদ্দীপিত করেছে। বিশের এবং ত্রিশের দুই দশকে বর্ধমানের তরুণদের মধ্যে বিপ্লববাদ, সাম্যবাদ, গান্ধীবাদ এবং জনসেবার আদর্শ সমানভাবে প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ্য।

বর্ধমান জেলায় সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথকে যদি আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবের ও সাম্যবাদের 'অবধূত' বলা যায়, তবে বোধহয় ভুল হয় না। ১৯২১-এ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। মহামতি লেনিনও তাঁকে জানতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বারবার বর্ধমানে এসে কাজ করেছেন। তিনি নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলনের স্রষ্টা ছিলেন। বর্ধমানে এসে টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় তিনি বিশ্বের যুব আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯২৮-এ ২৭ ডিসেম্বরে কলকাতায় সমাজবাদী যুব-কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই সম্মেলনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা হয়। সাম্যবাদী আন্দোলনেই যে প্রকৃত গণমুক্তির পথ আছে, তাও ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্ধমানের 'গুপ্ত সমিতি' এই সম্মেলনে প্রচারিত আদর্শদ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়। ১৯৩১-এ বর্ধমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হল বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মেলন, সমাজবাদী যুব-সম্মেলন, এবং ছাত্র-সম্মেলন। যুব-সম্মেলনের ও ছাত্র-সম্মেলনের সংগঠকগণ ছিলেন প্রণবেশ্বর সরকার, আমোদবিহারী বসু, বামাপতি ভট্টাচার্য, ফকিরচন্দ্র রায় এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়। যুব-সম্মেলনের সূচনা করেন মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাপ। বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, আবদুস সাত্তার এবং দাশরথী তা তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাতে রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৯৩১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান জেলা-কৃষক সমিতি, তার সভাপতি ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী। জাতীয়তাবাদী চেতনার যেমন সম্প্রসারণ হয়, তেমনই সম্প্রসারণ হয় সাম্যবাদের, সমাজবাদের। যে বর্ধমান জেলা বহুকাল ধরে নিদ্রিত ছিল, সে বর্ধমান যেন জেগে উঠল। ১৯৩৩-এ মে মাসে হাটগোবিন্দপুরে বর্ধমান-জেলা-কৃষক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। লক্ষণীয়, তাতে তৎকালীন বর্ধমান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। বহু বিষয় সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ থাকলেও মহাত্মা গান্ধী এবং সাম্যবাদীগণ বুঝেছিলেন যে গ্রামের মানুষদের, কৃষকদের না জাগালে দেশ জাগবে না। এই অর্থে বর্ধমানে সাম্যবাদী কৃষক-সংগঠন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে অর্থবহ এবং সম্প্রসারিত করে তুলেছিল। লক্ষণীয়, বর্ধমানের সাম্যবাদী কর্মীদের এইরূপ প্রচেষ্টা জেলা কংগ্রেসের নেতা বিজয়কুমার ভট্টাচার্য সমর্থন করেছিলেন। বস্তির শিশুদের জন্য তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাতে প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাম্যবাদী কর্মী হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, এবং সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকতা করেছেন। এ সময়ে ফকিরচন্দ্র রায় রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস'-এর তত্ত্ব থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তাঁকে গ্রেফতার করা হলে, এবং বিশেষভাবে সাম্যবাদের প্রসারে, বর্ধমান জেলায় ব্যক্তি-ভিত্তিক বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস' গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যাঁরা একসময়ে সেই মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯৩৫-এ ৫ অক্টোবর-এ কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান-জেলা-শাখা প্রতিষ্ঠিত হল। তার আগে সেখানে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান প্রলেটারিয়ান, রেভলিউশনারি পার্টি', [দ্রষ্টব্য, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, 'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ', বর্ধমান, ১৯৯১, পৃ. ৩৩-৩৪] তার সভ্যগণ ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায়, শাহেদুল্লাহ্, অশ্বিণী মণ্ডল, ধীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শাহেদুল্লাহ্ সম্পাদক হলেন। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা তীব্র করে তোলার জন্য দেশব্রতী সাম্যবাদী কর্মীগণ নিরলসভাবে যে কাজ করেছিলেন, তার তাৎপর্য দামোদর খাল-করের বিরুদ্ধে সংগঠিত পরিব্যাপ্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে দামোদর খাল কাটা হয়; তার ব্যবহার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। এই খাল কাটার জন্য এক কোটির বেশি টাকা খরচ হয়। ১৯৩৫-এ ১৮ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সেচমন্ত্রী খবাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রস্তাব করলেন যে, যে সকল কৃষকের জমির মধ্য দিয়ে খাল প্রবাহিত হচ্ছিল, তাঁদের বাৎসরিক পাঁচ টাকা আট আনা হারে কর দিতে হবে। সে বৎসরে অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে ৩টি আইন হয়ে গেল। এই করের বিরুদ্ধে বর্ধমানের উকিলদের সংগঠন, 'বার অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ করল। খাল কাটার জন্য অনেক কৃষকের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হচ্ছিল। উকিলদের তৎপরতায় গঠিত হয়েছিল বর্ধমান জেলা রায়ত 'অ্যাসোসিয়েশন'। তার প্রধান একজন সমর্থক ছিলেন কংগ্রেসের নেতা আবদুস সাত্তার। তিনি তখন জেলা-কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। প্রধানত জেলা-কংগ্রেসের তৎপরতায় বিভিন্ন জায়গায় খাল-করের বিরুদ্ধে জনসভার অনুষ্ঠান করা হয়। জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান শহরে (ডিসেম্বর ২০, ১৯৩৫; ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৩৭; ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৩৭; ১ মার্চ, ১৯৩৭), সদিয়াতে, ভাতারে এবং কলকাতার এলবার্ট হল-এ। মুজফফর আহমদ-এর সভাপতিত্বে বর্ধমান-জেলা-কৃষক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৭-এর মে মাসে। তার প্রধান সংগঠক ছিলেন হেলারাম চট্টোপাধ্যায় এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়। নীহরেন্দু দত্ত মজুমদার বর্ধমানে এসে কিষাণ সম্মেলন করেন (১৩ জুন, ১৯৩৭)। অনেক জমিদার এবং জোতদারও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন; উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন 'এম এল এ' স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়। তিনি ছিলেন চাকদীঘির জমিদার। কংগ্রেস-পরিচালিত 'ক্যানাল-কর-প্রতিকার-সমিতি' (১৯৩৭-এ ৩১ জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত) বিভিন্ন গ্রামে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করে। তাতে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। আবদুল্লাহ রসুল, হেলারাম চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাম্যবাদী নেতাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য: Buddhadeva Bhattacharya, ed. Satyagrahas in Bengal, 1918-1939, Calcutta 1977, PP. 237ff] [সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪-৬৬, ৩৫৬-৩৬৫]। ১৯৩৯-এ ১৫ ফেব্রুয়ারি আউসগ্রামে ননিবালা সামন্তের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়, তাতে বহু মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলনের জন্য সরকার করের পরিমাণ বাৎসরিক দু-টাকা নয় আনাতে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়। দামোদর-ক্যানাল-কর আন্দোলন, অতএব, কিছু সাফল্য যে অর্জন করেছিল, তা অবশ্যই বলা যায়।

পরবর্তী বড় আন্দোলন ছিল ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়'-আন্দোলন। তার প্রভাব বর্ধমান জেলাতেও পড়েছিল। এই আন্দোলনের আগেই প্রধানত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে আসন্ন আন্দোলনের বার্তা প্রচার করেছিলেন। আন্দোলনের সূত্রপাতে পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ রায়, অজিতকুমার রায়, অলোক সরকার, ভারতচন্দ্র গাঙ্গুলি, অসীম ঘোষ, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কর্মীদের গ্রেফতার করেছিল। নেতাদের গ্রেফতার করার জন্য বর্ধমান জেলায় এ সময়ে কোনও সুসংগঠিত আন্দোলন হয়নি। এমন দাবি করা হয়েছে যে, দক্ষিণ বর্ধমানে এ সময়ে 'স্বাধীন সরকার' গঠন করা হয়। কিন্তু তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৯৪৩-এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে প্রধানত কমিউনিস্ট কর্মীগণ ত্রাণ সংগঠিত করেছিলেন। তাতে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শহিদ শিবশঙ্কর চৌধুরী, প্রণবেশ্বর সরকার, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, মুসা মিঞা, নৃপেন ভট্টাচার্য প্রমুখ দেশব্রতী কর্মীগণ। গ্রামে গ্রামে 'ফুড কমিটি' গঠন করা হয়। [সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১৩২]। দুর্ভিক্ষে এবং বন্যায় সাম্যবাদী কর্মীদের অক্লান্ত সেবাব্রত তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৬-এ জুলাই মাসে বর্ধমানে বন্দিমুক্তি আন্দোলনেও তাঁদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ, প্রধানত তাত্ত্বিক কারণে তাঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল, তা থেকে কতগুলো সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। দেখা গেল যে, কলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত না হলেও, 'বাঙালি রেনেসাঁস'-এর কোনও প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ সেখানে সামান্যভাবে হয়েছে; ফলত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর, তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে বহুকালাবধি বর্ধমানের সংস্কৃতিতে প্রধানত জমিদার-জোতদার-পাটনিদারদের প্রাধান্য ছিল প্রশ্নাতীত। গত শতাব্দের সত্তরের দশক থেকে বর্ধমানে মিউনিসিপালিটিকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতির আবির্ভাব হল, তা রীতিরও গুণের বিচারে ছিল রাজভক্তিপূর্ণ মধ্যপন্থী নরম রাজনীতি; কিন্তু তখনই প্রথম রাজনীতির ক্ষেত্রে 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। বহুকাল পর্যন্ত সমগ্র বর্ধমান জেলায় সমাজই ছিল ব্যক্তির ও সমূহের জীবনের নিয়ন্ত্রক; এই সমাজ, রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ', যেখানে ব্যক্তি কখনওই সমাজের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু 'ভদ্রলোক'-দের পদলাভের জন্য রাজনীতিতে ব্যক্তিমানসের আধিপত্য ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত

হয়, এবং যখন আধিপত্যের প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে, তখন তাকে কেন্দ্র করেই আসে দল, দলের মতাদর্শ, সংগঠন এবং দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দলাদলি। বর্ধমানে উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে এই ঘটনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ বর্ধমানের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারেন; এই বোধ যতই তীব্র হয়, ততই ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আসে দেশের কথা, মানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা, পরাধীনতার মর্ম-দাহ। এই বিষয়টি অনিল শীল, গালাহার, জনসন প্রমুখ তথাকথিত 'কেম্ব্রিজ'—ঐতিহাসিকগণ আদৌ বুঝতে পারেননি। বর্ধমানে—পিছিয়ে থাকা বর্ধমানে—কেন হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অমন পরিব্যাপ্ত, অমন তীব্র হয়ে উঠল? কেন এই জেলার সোনার ছেলেরা যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়? কোন আলোকে তাঁদের প্রাণের প্রদীপ জ্বলেছিল? কেন বর্ধমানের মান্যগণ্য মুসলমান নেতাগণ বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করেননি? সামাজিকতার যে মধ্যযুগীয় আদর্শ, অথবা মূল্যবোধ ছিল, দেশপ্রেমে, নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনায়, তা এক নূতন অর্থে অন্বিত হল।

এ কথা না বলে উপায় নেই যে, গান্ধীজির দ্বারা পরিচালিত ১৯২০-তে যে আন্দোলন হয়, প্রধানত সংগঠনের দুর্বলতার জন্যই বর্ধমান জেলায় তা দুর্বার হয়ে ওঠেনি। ক্রমশ এই দুর্বলতা দূরীভূত হয়, এবং ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে বর্ধমান জেলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯২৫-এর পর থেকে বহু প্রতিভাশালী দেশপ্রেমিক তরুণ জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের উন্নতির কথা না ভেবে দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন। সমগ্র বঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট স্থান তাঁরাই নির্দিষ্ট করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্ধমানের তরুণরা ক্রমশ শ্রেণীসংগ্রামের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে থাকেন। কোনই সন্দেহ নেই যে, বঙ্গে মার্কসবাদী সর্বহারাদের আন্দোলনে বর্ধমান জেলার কমিউনিস্ট কর্মীগণ প্রধানত কৃষকদের সংগঠিত করে একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ জন্য তাঁদের যে পরিশ্রম করতে হয়েছে, যে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয়নি।

যে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপরেখা ১৯৩০-এর পরে বর্ধমান জেলায় পরিস্ফুট হল, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামে স্বাধীনতার এবং সাম্যের বার্তা-প্রচার। বৈপ্লবিক 'সন্ত্রাস' একটি আদর্শরূপে আর তো গ্রাহ্য ছিল না। হয়তো মনে হতে পারে যে, এত বড় বর্ধমান জেলার একজন দেশপ্রেমিক মানুষও ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেননি। কিন্তু শ্রমিক-কর্মী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৩৮-এ ১৫ নভেম্বরে রাণীগঞ্জের কাগজের কলের শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনার জন্য সাহেবরাই খুন করেছিল।

আরও লক্ষণীয়, বর্ধমান জেলায় কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে মতবিরোধ প্রবল হলেও, দক্ষিণপন্থার ও বামপন্থার বৈপরীত্য থাকলেও, সমস্ত ব্যাপক আন্দোলনে এবং একটি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নির্বাচনে, তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করেছেন। তাঁদের এই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের জন্যই বর্ধমান জেলায় সাম্প্রদায়িকতা কখনই প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। [এর একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ দ্রষ্টব্য: শাহেদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৫-৪০০] নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ এবং স্বার্থজাত সংঘর্ষ হলেও, তা কখনও বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেনি।
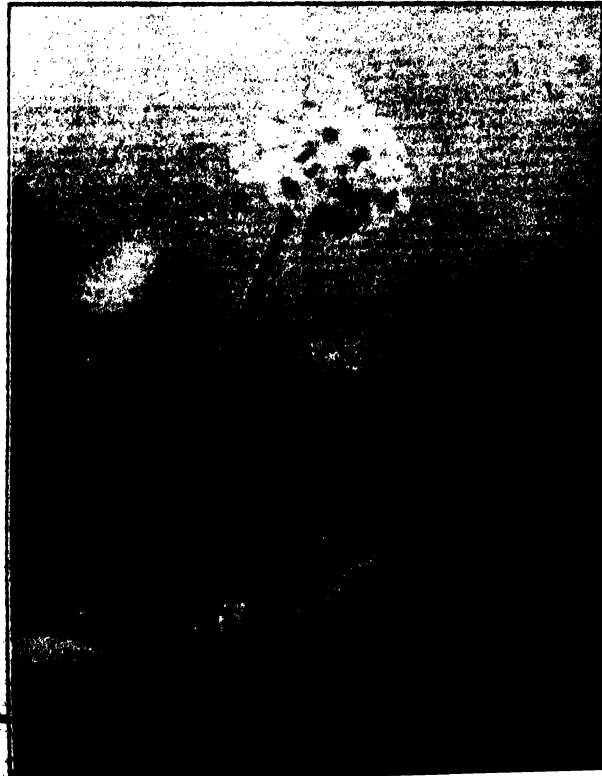
রানীগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিক

সুনীল বসুরায়

পর্ব এক

॥ ১ ॥
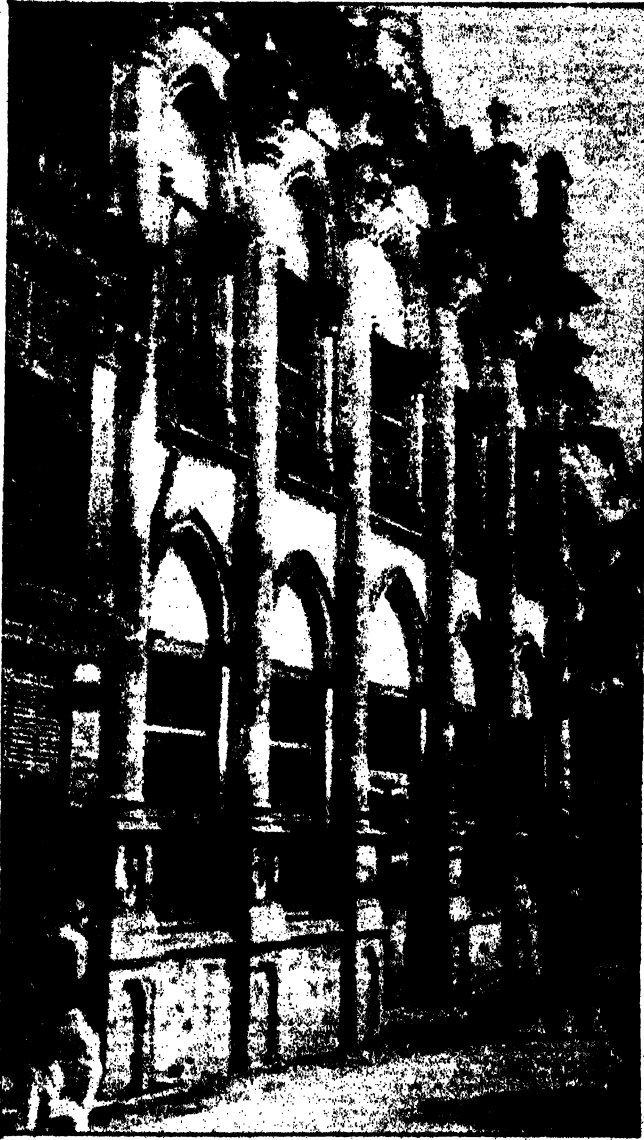
বর্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চল সন্নিহিত দামোদর নদের দক্ষিণ তীরবর্তী পুরুলিয়া-বাঁকুড়া এবং অজয় নদের উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলে (ইলামবাজার থেকে রাজমহল অবধি ভূখণ্ড) যে বিস্তীর্ণ কয়লার ভাণ্ডার রয়েছে, যার অধিকাংশই এখনও প্রকৃতই ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়েছে। যতটুকু খনন প্রক্রিয়ার অধীন হয়েছে তা গভীরতায় বা ব্যাপ্তিতে, তুলনায় সামান্যই।

বর্ধমান জেলায় অবস্থিত কয়লাখনি অঞ্চল, তৎসহ পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত কয়লাখনি ও বিহার রাজ্যের ধানবাদ জেলার অন্তর্গত নিরশা-মগম কয়লাখনি অঞ্চল নিয়ে গঠিত রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল বা রানীগঞ্জ কোলফিল্ড। অজয় উপত্যকা রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের অংশ বিবেচিত হয় না। তবে রাজমহল থেকে পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলই ইস্টার্ন কোলফিল্ডের অধীনেই সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা-বিহার বা আরও নির্দিষ্টভাবে, রানীগঞ্জ-ঝরিয়া একক কয়লাখনি অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। খনিশিল্পের বিকাশ, খনিশ্রমিকের উদ্ভব ও পরিণতি নৃতাত্ত্বিক বা ভৌগোলিক অর্থে স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না।

তা সত্ত্বেও, কয়লাখনি শিল্পের, বিশেষ অর্থে, পূর্বভারতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে, বর্ধমান জেলার স্থান অনন্য। তাই, জেলা পরিচিতি হিসেবে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হল।

॥ ২ ॥

বর্ধমান জেলার উত্তরে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলা; দক্ষিণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলা; পূর্বভাগে ভাগীরথী নদী, হুগলি ও নদিয়া; এবং পশ্চিমে বরাকর নদ, মানভূম ও সাঁওতাল পরগনা। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হতে বরাকর নদের পূর্বতীর অবধি জেলার দৈর্ঘ্য ২০৮ কি.মি.। অজয় নদের দক্ষিণ হতে দামোদরের উত্তর অবধি বিস্তার ২০ কি.মি.। জেলার পূর্ব-উত্তরে কুনা নদী থেকে দক্ষিণে দামিন্যা অবধি দৈর্ঘ্য ১০৫ কি.মি.। জেলার আয়তনের শতকরা ৭০ ভাগ পূর্বে এবং ৩০ ভাগ পশ্চিমে।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মানচিত্রে (রেনেল) বর্ধমান চাকলার আয়তন ছিল ৫১.৭৪ বর্গমাইল। এই তথ্যের ভিত্তিতে ১৮৫৪-৫৭ সালে বর্ধমান জেলার আয়তন নির্ধারিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার স্থান বিনিময় শেষ হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের তথ্যে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার আয়তন ২,৬৮৯ বর্গমাইল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকলা বর্ধমানের দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট হতে লাভ করে। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোং-এর লন্ডনে অবস্থিত ডিরেক্টর বোর্ড কলকাতা, বর্ধমান-সহ মোট ৪টি চাকলার রাজস্ব-জরিপের কাজ শেষ করতে নির্দেশ দেয়। তখনকার দিনে, আলিবর্দি খাঁর আমলে, সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় দিত চাকলা বর্ধমানই।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। এই বছর থেকেই বর্ধমান জেলাকে নানা রদবদলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

১৭৯৩ সালে রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, খুরসান, ফুলকুসুমা, সিমলাপাল ও ভেলিয়াদেহি, এই ছটি জঙ্গলমহল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। ১৭৯৪ সালে সাতসিক্কা ও সরস্বতী নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল নদিয়া থেকে বদলি করা হয়। ১৭৯৫ সালে হাওড়া-সহ হুগলি বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই সালেই বাগরি পরগনা মেদিনীপুরের অন্তর্গত হয়। ১৭৯৫-১৮০৭-এর মধ্যে অন্যান্য মহল-সহ পাণ্ডুয়া পরগনা হুগলির অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০১ বাগরি আর্থ-বিষয়ে মেদিনীপুরে বদলি হয়। ১৮০৫ সালে জঙ্গলমহল জেলাভুক্ত হয় পরগনা সেনপাহাড়ি, শেরগড় ও বিষেণপুর (কোতলপুর ও বানস্যো থানা দুটি বাদে)। ১৮০৬ সালে অজয় নদকে উত্তর সীমা হিসেবে স্থির করা হয়। ১৮০৯ সালে জঙ্গলমহলের রাজস্ব আদায়—বীরভূম ও মেদিনীপুর থেকে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। বাঁকুড়ায় অবস্থিত একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের উপর আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮১৯ (১৮২১) সালে হুগলি আর্থ-বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৩৩ সালে পরগনা সেনপাহাড়ী, শেরগড় এবং বিষেণপুরের অধিকাংশ জঙ্গলমহল থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৮৩৪ সালে বাঁকুড়ায় অবস্থিত একজন জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট-ডেপুটি কালেক্টরের উপর পশ্চিম মহলের ভার অর্পণ করা হয়। ১৮৩৭ সালে বাঁকুড়া শেষ অবধি বিচ্ছিন্নই হল। ১৮৪৮ সালে আওসগাঁও (=আউসগ্রাম), পোখনা ও ইন্দাস বাঁকুড়া থেকে কেটে বর্ধমানে সংযুক্ত হয়। ১৮৫১ সালে বুদবুদ মহকুমা বাঁকুড়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কেওগ্রাম থানা বীরভূম থেকে ১৮৭২ সালে আনা হল। ১৮৭২ সালে বাঁকুড়ার কোতলপুর ও সোনামুখী থানা দুটির সঙ্গে হুগলির জেহানাবাদ ও গোঘাট সংযুক্ত হয়। ১৮৭৯ সালে বুদবুদ মহকুমার অবলোপ হয়। এদের ইন্দাস থানা, কোতলপুর ও সোনামুখী-সহ বাঁকুড়ায় ফেরানো হয়। ১৮৭৯ সালেই গোঘাট ও জেহানাবাদ হুগলিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বক্ষেত্রেই 'প্রকাশক প্রয়োজন' বা 'দারুণ কাজ' বলা সত্ত্বেও ১৮৩৩ সালের আদিবাসী বিদ্রোহের দরুন প্রশাসনিক রদবদলের কথা বলা হয়েছে।[১]

॥ ৩ ॥

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার আয়তন, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যাদি নীচে উদ্ধৃত করা হল:

আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	৭০২৪০
জনসংখ্যা	৪৮,৩৫,৩৮৮
তার মধ্যে, গ্রামীণ	৩৪,১৪,২১৯
শহর	১৪,২১,১৬৯
তফসিলি জনসংখ্যার হার	২৫.০৯%
উপজাতি জনসংখ্যার হার	৫.৭৫%
শিক্ষিতের হার	৪২.৪৩%
তার মধ্যে, পুরুষ	৫১.২৯%
মহিলা	৩২.৫৬%
জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গ কি.মি. প্রতি)	৬৮৮
১০ বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	+২৩.৪৭
স্ত্রী-পুরুষের হার (প্রতি হাজারে)	৮৯৭ (পুরুষ)
ওই গ্রামাঞ্চলে	৯৩৪
ওই শহরাঞ্চলে	৮১৫
মোট গ্রাম	২,৬৭৯
পরিত্যক্ত মৌজা	১০৯
শহর	৪৯ "
গৃহসংখ্যা	৮,৮২,০৫৪[২]

এই পরিসংখ্যানগুলি ১৯৯১ আদমশুমারিতে নিশ্চিতই বেড়েছে। কিন্তু এখানে পৃথকভাবে বর্ধমান জেলার অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের বিষয়ে আলোচনা হয়নি। উপরের আলোচনা এবং শহরবাসী : গ্রামবাসী পরিসংখ্যান (৩০ : ৭০) থেকে অনুমান করা যায় যে বর্তমান আসানসোল-দুর্গাপুরের অতীত ধারাই বর্তমানের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে।

॥ ৪ ॥

১৮৭২ সালে বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, জাহানাবাদ, বুদবুদ ও রানীগঞ্জ এই ৬টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেদিনকার বর্ধমান জেলা। মোট লোকসংখ্যা ছিল ১৮,৬১,৬৬৩। জেলার মোট আয়তন ৩৫১৩ বর্গমাইল। মোট গ্রাম ছিল ৫১৯১। মোট শহর মাত্র ৬। এই সময় থেকে 'পরগনা' বদলে 'থানা' চালু হয়। রাজস্ব আদায় বিষয়ে 'পরগনা'ই ব্যবহৃত হত। মহকুমাসমূহের আয়তন, থানার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

মহকুমা	আয়তন	অন্তর্গত থানাসমূহ
১। বর্ধমান	৮৪১ বর্গমাইল	বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, ইন্দাস, সেলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ
২। কাটোয়া	৪০৭ ,,	কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট
৩। কালনা	৪৩১ ,,	কালনা, ভাতুরিয়া, মন্তেশ্বর
৪। জাহানাবাদ	৬৪১ ,,	জাহানাবাদ, কোতলপুর, গোঘাট, রায়না
৫। বুদবুদ	৬৭১ ,,	বুদবুদ, আউসগ্রাম, সোনামুখী
৬। রানীগঞ্জ	৫৩২ ,,	রানীগঞ্জ, কাঁকসা, নিয়ামতপুর

কিন্তু প্রশাসনিক প্রয়োজনে আঞ্চলিক হেরফের চলতেই থাকে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বুদবুদ মহকুমা অবলুপ্ত হয়। "১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল শহরটি পৌরসভার অধীনে আসে এবং রাণীগঞ্জের পরিবর্তে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল মহকুমা শহরে রূপান্তরিত হয়।" ১৯১০ সালে আসানসোল মহকুমার মধ্যে ছিল আসানসোল, রানীগঞ্জ, অণ্ডাল, জামুরিয়া ফরিদপুর, দুর্গাপুর, কুলটি, বরাবনী, সালানপুর। অর্থাৎ দুর্গাপুর মহকুমা গঠনের পূর্বে অবধি আসানসোল মহকুমা যেমন ছিল। ১৯১৯-২০ সালে ও শহরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে শিল্পাঞ্চলে দুটি শহরেই শতকরা এগারো ছিল জনসংখ্যা : রেট পেয়ার্স অনুপাত। নীচের তালিকাটি প্রণিধানযোগ্য :

শহর	স্থাপিত, ১ এপ্রিল	জনসংখ্যা	রেট পেয়ার্স	জনসংখ্যা : রেট পেয়ার্স অনুপাত
বর্ধমান	১৮৬৫	৩৫,৯২১	৭,৮৮১	২১.৯%
কালনা	১৮৬৯	৮,৬০৩	২,৬৯৪	৩১.৩%
কাটোয়া	১৮৬৯	৬,৯০৪	২,৪৮৮	৩৬.৩%
দাঁইহাট	১৮৬৯	৫,৩৪২	১,৩৮০	২৫.৮%
রানীগঞ্জ	১৮৭৬	১৫,৪৯৭	১,৭৫১	১১.৩%
আসানসোল (১ অক্টোবর)	১৮৯৬	২১,৯১৯	২,৬০৬	১১.৪%
		৯৮,১৮৬	১৮,৭৯৯	১৯.৯%

বর্ধমান জেলার আধুনিক ইতিহাস রচনাকারী ওই তথ্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করেছেন :

"উপরোক্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, রানীগঞ্জ ও আসানসোল শহরে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল অল্প, অর্থাৎ ঐ শহরে বহিরাগত চাকুরীজীবীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় তাঁরা রেট পেয়ার্স তালিকার আওতা-বহির্ভূত জনসংখ্যা।"

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম কমেছে, শহর বেড়েছে, ১৯৩১-৮১ এই পাঁচ দশকের ছবি :

সংখ্যা	১৯৩১	১৯৭১	১৯৮১
মহকুমা	৪	৫	৬
থানা	২৩	২৭	২৯
গ্রাম	২৬৩১	২৬০৯	২৫৭০
শহর	৯	২২	৪৯
জনসংখ্যা	১৫,৭৫,৬৯৯	৩৯,১৬,১৭৪	৪৮,৩৫,৩৮৮

বর্ধমানের ঐতিহাসিক আসানসোল-দুর্গাপুর নিয়ে পৃথক জেলা গঠনের দাবি অগ্রাহ্য করেছেন। তারপর তিনি শিল্পাঞ্চলের সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন :

"....শিল্পে সংকট ও তার ফলে কর্মসংস্থানের সমস্যা বেড়ে চলেছে। কয়লাখনি অঞ্চলে ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রধান সমস্যা। ....পুনর্বাসন, জমি রূপান্তর, ধস ও খনি দুর্ঘটনা এসব মূল সমস্যার যদি সমাধান না হয় তা হলে পৃথক জেলা সৃষ্টি করে খনি ও শিল্প অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। ....ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খনি অঞ্চলে যেভাবে বাসগৃহ নির্মাণের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি প্রায় ৬০০ বর্গমাইল অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লা তুলে নেওয়া হয়, তা হলে বাসস্থানের সংকট এড়াতে এই অঞ্চলের লোককে হয়ত আরও পূর্বে সরে যেতে হবে।"[৩]

শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতি যদিও খুবই দুর্বল তথাপি দেখা যাচ্ছে যে রুগ্ণ শিল্প পুরাতন আসানসোল মহকুমার সীমা ছাড়িয়ে পূর্বসন্ধানী হয়ে উঠছে।

॥ ৫ ॥

কয়লাখনির আবির্ভাব ও প্রসার ভারতের শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ কয়লার এই ঘটক ভূমিকা আজও আছে। আগামী দিনেও থাকবে।

১৭৭৪ সালে এথোরার কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন সামনার ও এস জে হিট্লি কয়লার সন্ধান পান। ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তারা ওই বছরের ১১ আগস্ট লাভজনক উন্নয়নের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

ক্রমে ক্রমে, বিশেষ ১৮১৩ থেকে, কয়লার চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে খনির সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রমিকেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। শ্রমিকরা অধিকাংশই বহিরাগত। দেশপাণ্ডে কমিটির রিপোর্টে[৫] বলা হয়েছে যে রানীগঞ্জ কয়লাখনি ক্ষেত্রেই প্রথম কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজ পুঁজি ও উদ্যোগ (''ইংলিশ ক্যাপিটাল ও এন্টার-প্রাইজ'') তার প্রভাব এই অঞ্চলে প্রসারিত করা শুরু করল। তবে, রাণীগঞ্জে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেল কোম্পানির লাইন না আসা অবধি কয়লা শিল্পের বিকাশে কোনও উল্লেখযোগ্য গতি লক্ষ করা যায়নি। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেল রানীগঞ্জ লাইন নিয়ে আসে ১৮৫৪ সালে। অচিরে দ্রুতগতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৮৬৫ সালে রেল লাইন বরাকরে পৌঁছয়। ''রানীগঞ্জ কোল- ফিল্ড, অতএব কয়লাখনি শিল্পের জন্মভূমি।''[৬]

১৮৫৬ সাল। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হল। ঝরিয়া-সহ বিভিন্ন কয়লা অঞ্চল আবিষ্কৃত হল। ১৮৯৪ সালে বরাকর থেকে বাতরানগর অবধি রেল লাইন পাতা হল। ১৮৯৫ সালে কুসমু-ডা-পাথরডিহি লাইন পাতা হল। ঝরিয়ার কয়লা উৎপাদন রানীগঞ্জকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করল''।[৬]

ঝরিয়ার আয়তন ১৭৫ বর্গমাইল। রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের আয়তন ৫০০ বর্গমাইল। তা ছাড়া, আরও নতুন নতুন কয়লা ক্ষেত্রের আবির্ভাব হতে থাকল। রানীগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য কোল ফিল্ড খনির সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ বাড়ল। রাণীগঞ্জে বাড়ল মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ। ১৯৩০-এর তুলনায় ১৯৪৪-এ এই বৃদ্ধি ঘটে। তবে, রাণীগঞ্জের খনির আয়তন ঝরিয়ার খনির থেকে বড়।

শ্রমিক নিযুক্ত, শ্রমিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে দেশপাণ্ডে রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি হাজির করেছেন যা আজও প্রাসঙ্গিক, ঐতিহাসিক ও বস্তুনিষ্ঠ। দেশপাণ্ডেই বলেছেন যে ভারত, জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত নারী শ্রমিক সেই সময়ে খনিতে নিযুক্ত হতেন না। তার উৎস ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের রিপোর্ট।[৭]

> ''ভারতে এই শিল্পটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে তার বিকাশের প্রথম যুগে বিহার ও বাংলায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যথা, বাউরি, কোড়া ও সাঁওতাল, পরিবার-পরিজনসহ বিপুল সংখ্যায় কয়লাখনি অঞ্চলে আসতে শুরু করেছিল। তারা পরিবার ভিত্তিতে খনিগর্ভে কাজ করত। নারী শ্রমিকরা তাদের স্বামীদের কয়লা বোঝাইয়ের কাজেই যে সাহায্য করে, তা নয়। কখনও কখনও তারা জল ফেলা ও টাগোয়ানের (ট্র্যামার) কাজও করে। ১৯১৫ সালে শিল্পে নিযুক্ত ৫১,৪৭৭ নারী ও শ্রমিকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ ভূগর্ভে কাজ করত। প্রতি দশজন পুরুষ- পিছু নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫.৬ জন। ১৯২০ সালে প্রতি দশজন পুরুষপিছু নারী শ্রমিক হয় ৬.১ জন। তারপরে অবস্থা পড়তে থাকে। ১৯২৩ সালে ইন্ডিয়ান মাইনস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পরে এই পড়তে থাকা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯২৯ সালে ভারত সরকার ফরমান জারি করে বসলেন যে অতঃপর ভূগর্ভে নারী শ্রমিক নিয়োগ ক্রমশ কমাতে কমাতে ১৯৩৮ সাল নাগাদ নারী শ্রমিক ভূগর্ভে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে হবে। তাই, ১৯৩৯ সালে ভূগর্ভ খনিতে কোনও নারী শ্রমিক ছিলও না। সমগ্র শিল্পে, সার্কেলে (ভূগর্ভের উপরে-সু), ১৯৩৯ সালের পরে মোট নারী শ্রমিক নিযুক্তি ছিল ২৩,০০০ মাত্র। ১৯৩৯-এর পরে সার্কেলে নিযুক্ত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৪২ সালে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১,০০০। ১৯৪৩ সালে নারী শ্রমিক নিযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। ১৯৪৪ সালে ভূগর্ভে কর্মরতা নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯০০। সার্কেলেও সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে তা ৬১,০৫৫ দাঁড়ায়। ১৯৪৩, ১৯৪৪ সালে কোয়ারি খাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। আসামে, নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরেও ভূগর্ভে কোনও নারী শ্রমিক নিযুক্ত হননি। কারণ খনির অবস্থা ছিল খুবই প্রতিকূল।''

১৯৪৬, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নারী ও শ্রমিক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা ভারত সরকার জারি করেন।[৮]

॥ ৬ ॥

বিগত পঞ্চাশ বছর কালে, বা তারও বেশি সময় যাবত শ্রমিকদের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কয়লাখনিতে নিযুক্তদের অধিকাংশই আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দা। দেশপাণ্ডে রিপোর্টের বক্তব্যকে যেখানে কাজের অবস্থা খুব খারাপ বা খনিপথের খাড়াই বেশি সে সব জায়গা ব্যতীত অন্যত্র কাজ করা কঠিন নয়। এমনও নয় যে খনিগর্ভে কাজের ফলে রোগব্যাধি বেশি হয়। ডাক্তারদের মতামতও ছিল তাই। ওপরে কাজের তুলনায় ভূগর্ভে কাজ বেশি প্রতিকূল ছিল, তা নয়। নারী শ্রমিকরা অধিকাংশই সাধারণত জলে তা তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে খনিগর্ভে কাজ করত। তাই, খনিগর্ভে তাদের নৈতিকতার উপর বেশি চাপের সম্মুখীন তাদের হতে হত এমন নয়।

রানীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লাখনি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে বাউরি, সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে দেশপাণ্ডে কমিটি বলেছে:

''আধা-আদিবাসী জনজাতি, বাউরি শ্রমিকরা ছিল ঝরিয়া কয়লাখনি ক্ষেত্রের প্রাচীনতম খনিশ্রমিক। দক্ষতা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য এখনও তাদের নামযশ আছে। ১৮৯০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে তাদের লাইন খোলার পর, ছোটনাগপুর

থেকে আদিবাসীরা যেমন, সাঁওতাল ও কোরারা দলে দলে এলাকায় আসতে শুরু করল। কালে কালে, ভুঁইয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা এবং নুনিয়া, বেলদার মিয়া, দোসাদি চামার, গোয়ালা, ঘটওয়ালা প্রভৃতি আধা-আদিবাসীরা ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় এলাকায় প্রবেশ করতে লাগল। শিল্পটির বিকাশের প্রাচীন লুপ থেকেই কয়েকটি জনজাতি ও জাত (কাস্ট) খনিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কাজে পারদর্শিতা দেখাতে থাকে। যেমন সাঁওতাল ও মাঝিরা ভাল পিক মাইনার (গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটা, প্রাচীনতম খনন যন্ত্র—সু), বাউরি ও কোরারাও তাই। ভুঁইঞা ও রাজোয়াররা বেশির ভাগই বোঝাই (লোডিং কুলি) ও ট্র্যামারের (টালোয়ান)কাজ করত। মাটি কাটা ও সার্ফেস শ্রমিকদের মধ্যে বেলদার ও নুনিয়াদের প্রাধান্যই বেশি। ইঞ্জিন খালাসি প্রভৃতি দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে বাউরি, মিয়া (বা ইনাহা)দের সংখ্যা বড়সড়ো। বিলাসপুরীরা সি পি ব্লাস্টিংয়ের জন্য সুবিখ্যাত (সি পি ব্লাস্টিং = কমপ্রেসড্ পেলেট বা কার্ত্রি পাউডার)।[৯]

কিন্তু বিহারের কয়লাখনি শ্রমিকরা প্রধানত বিহারেরই, শতকরা ৬০ ভাগ। মানভূম, মুঙ্গের, গয়া, হাজারিবাগ। প্রদেশের বাইরে, রায়পুর ও বিলাসপুর (সিপি); এলাহাবাদ, পরতাবগড়, মির্জাপুর, রায়বেরিলি, লখনউ, উনাও, কানপুর, গোরখপুর (ইউ পি); গঞ্জাম (ওড়িশা); নোয়াখালি (বেঙ্গল); লাহোর, অমৃতসর (পাঞ্জাব)।

ক্ষুদ্র ব্যতিরেক বাদ দিলে অধিকাংশ খনিতেই, যেখানে মেশিনে কয়লা কাটা হয় সেখানেই, প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই কোল কাটাররা প্রায় অধিকাংশই সাঁওতাল ও বাউরি। ঝরিয়ায় শ্রমিকদের সামাজিক গঠন যেমন তেমনই রানীগঞ্জেও। "রানীগঞ্জে অবশ্য সাঁওতাল পরগনা থেকে আগত সাঁওতালরাই প্রাধান্য বিস্তার করছে।" ডঃ শেঠের মতে, "বাংলার কয়লাখনি ক্ষেত্রে, কলিয়ারি শ্রমিকদের শতকরা ৭.৫ ভাগ, কয়লাখনির জেলার বাইরে থেকে সংগৃহীত, বিহার ও ওড়িশা থেকে ৩৩.৯ শতকরা এবং মাত্র শতকরা ২.১ ভাগ বাংলা ও বিহার থেকে।"[১০]

বাংলার কয়লাখনিতে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য ১৮৯৬ সালের দ্য নেচর এনকোয়ারি কমিশন, সব দিক বিচার-বিবেচনা করে স্থির করে যে খনিতে শ্রমিক সররবাহের জন্য একটি একক এজেন্সি থাকাই ভাল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা থেকেই প্রধানত বাংলার খনিসমূহের জন্য শ্রমিক সংগৃহীত হতে হবে।[১১]

॥ ৭ ॥

শ্রমিক নয় তার শ্রমশক্তিই পণ্য। স্বল্প মূল্যে (মজুরিতে) সর্বাধিক শ্রমশক্তি শোষিত হয় কয়লাখনি শিল্পে। কয়লাখনি শিল্পে তাই বহিরাগত, দৈহিক বলশালী, অগ্রণী চিন্তা-চেতনার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বা দূরে অবস্থিত, স্থিতাবস্থায় থামতে আগ্রহী, দিনগত পাপক্ষয় তত্ত্বে বিশ্বাসীরাই শোষণের সহজ ও অব্যর্থ লক্ষ্য। দেশপাণ্ডে রিপোর্ট বলছে:

"প্রধান কয়লাখনি ক্ষেত্রসমূহে সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল প্রধানত (ক) জমিদারি ব্যবস্থা ও (খ) অ-জমিদারি ব্যবস্থা। জমিদারি ব্যবস্থাটাই শ্রমিক সংগ্রহের প্রাচীন পদ্ধতি। অঞ্চলের বাইরের শ্রমিকদের প্ররোচিত করা হত কয়লাখনিতে আসতে, তাদের সামান্য চাষের জমি দেওয়া হত। প্রধানত রানীগঞ্জ ক্ষেত্রে এবং অংশত ঝরিয়ায়ও, সাঁওতাল ও শ্রমিকদের এই পদ্ধতিতেই ভর্তি করা হত। গিরিডিতেও জমি দেওয়া হত। ফলে, একটা স্থায়ী আবাসিক শ্রমিক গোষ্ঠী গড়ে উঠত। কলিয়ারিতে চাকরির শর্তে প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি বিষয়ে রয়াল কমিশন অন ইন্ডিয়ান লেবর এবং বিহার লেবর এনকোয়ারি কমিটি মন্তব্য করেছে এই বলে যে এটা ছিল শ্রমিকদের সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত চুক্তি (অ্যাজ বিয়িং অ্যান আনডিজারেবল ফর্ম অব কনট্রাক্ট')। জমিদারি প্রথাটা অবশ্য, মোটামুটি অচল হয়ে গেছে।"[১২]

ঝরিয়া ফিল্ডে তদানীন্তন কালে প্রচলিত শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল: প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, এই দুই রূপ। অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতির মধ্যে ছিল—রিক্রুটিং কনট্রাক্টর, কমিশন কনট্রাক্টর ও সর্দার, ম্যানেজিং কনট্রাক্টর। রানীগঞ্জ কোলফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন ও ডাইরেক্টোরেট অব আনস্কিল্ড লেবর সাপ্লাই। সরাসরি, নিজ তত্ত্বাবধানে শ্রমিক সংগ্রহকারী কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ নিজেদের অধীনে রিক্রুটিং সর্দার পুষত, আর থাকত জমাদার বা চাপরাসী। মাস মাইনে পেত এরা। গ্রামে গ্রামে যেত শ্রমিক সংগ্রহের জন্য। এই ঘোরাঘুরির জন্য যে খরচ হত তা পেত। মাইনার্স সর্দারদের মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহই ছিল সাধারণ স্বীকৃত পদ্ধতি। সর্দাররা লোক রিক্রুট করার খরচটা পেয়ে যেত। তা ছাড়াও পেত সর্দারি কমিশন। টাকা প্রতি ০-০-৬ হারে।

অন্যান্য কলিয়ারিতে রিক্রুট করার জন্য খরচ দেওয়া হত না। সর্দারদের টনপ্রতি উৎপাদন বাবদ টাকা ০-১-৩ দেওয়া হত। এর কোনও নীতি-নিয়ম না থাকায় অনুসন্ধান করাছিল প্রায় অসম্ভব। ঝরিয়ায় প্রতি টন কয়লা উৎপাদন-পিছু রিক্রুটিং খরচ দেওয়া হত টাকা ০-১-২ থেকে টাকা ০-৪-০-এর মধ্যে। মাথাপিছু শ্রমিক বাবদ ব্যয় হত ১ টাকা থেকে ৪ টাকা। রিক্রুট করার ব্যয়-তালিকায় থাকত গ্রামের ষোলো আনার ভোজ, সর্দাররা ছিল যার সংগঠক, গ্রাম থেকে কলিয়ারিতে শ্রমিকদের নিয়ে আসার জন্য যে ব্যয় হত তা কলিয়ারিতে পৌঁছনোর দিনের খোরাকি, মাটির হাঁড়ি, বাসন খরিদের জন্য কয়েক আনা খুচরা পয়সা (তা ছিল আগাম)। রানীগঞ্জ কোলফিল্ডেও এই পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি চালু ছিল। ৩৩টি কলিয়ারিতে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তথ্যে দেখা গেল যে ওই কলিয়ারিতে

রিক্রুটিং সর্দারদের সাহায্য নেওয়া হত। ১৮টিতে বেতনভোগী রিক্রুটার ছিল এবং রিক্রুটিং সর্দারও ছিল। দুটি বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কয়লা-মালিক গোষ্ঠী রানীগঞ্জ কোলফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন'কে এইভাবে ব্যবহার করে থাকে। রাণীগঞ্জের ১৩টি নির্ধারিত খনিতে গড়পড়তা রিক্রুটিং বাবদ ব্যয় হয় টাকা ০·২·৭ থেকে টাকা ৫-৩ টনপ্রতি।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন (বা সি আর ও) ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সংগঠনের পরিচালনায় ছিল একজন রিক্রুটিং তত্ত্বাবধায়ক ও একজন লেবর অফিসার। প্রয়োজনীয় কর্মচারী তাঁদের জন্য বরাদ্দ ছিল। ৮টি ডিপো ছিল। যখনই কোনও কলিয়ারির লোক দরকার হত, সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার কোনও একটি রিক্রুটিং ডিপোতে সর্দার পাঠিয়ে দিত। আগাম বাবদ একটা পরিমাণ টাকাও তার সঙ্গে থাকত। তারপর গ্রাম থেকে শ্রমিককে নিয়ে আসা হত। ডিপোতে খাওয়া পেত। খরচ-খরচা এই স্তরে ডিপোই মেটাত। তারপর একজন কেউ নবাগত শ্রমিককে নিয়ে নির্ধারিত পরিবহণে নির্দিষ্ট কয়লাখনিতে যেত। শ্রমিক সংক্রান্ত সকল বিবরণ বিশদে লিপিবদ্ধ থাকত। নবাগতদের শতকরা ২৫ ভাগ কাজে যোগদানের দিন থেকে সপ্তাহখানেকের মধ্যে কাজ ছেড়ে পালাত।

১৯৪৩ সালে যুদ্ধে কৃষকরা, শ্রমিকরা দলে দলে যোগ দেয়। ফলে বাংলা-বিহার কয়লাখনি ক্ষেত্রে তীব্র শ্রমিকাভাব দেখা দিল। গভর্নমেন্ট এই অভাব সামলাবার জন্য ডাইরেক্টোরেট অব আনস্কিল্ড ওয়ার্কার্স প্রতিষ্ঠিত হল। কয়লাখনি ক্ষেত্রের আশপাশে নির্মীয়মাণ বিমানবন্দরে বহু শ্রমিক কাজ নিচ্ছিল। কারণ যুদ্ধে বেশি মজুরি পাওয়া যেত।

কিন্তু, কয়লা তো চাই!

সরকার নভেম্বর ১৯৪৪-এ লেবর রিক্রুটমেন্ট কন্ট্রোল অর্ডার ১৯৪৪ জারি করল। অক্টোবর ১৯৪৫-এ এই অর্ডার খারিজ হয়ে গেল।

১৯৪৪ সালে ভর্তির জন্য একটি ডাইরেক্টরেট গঠিত হল। ১৯৪৪ সেপ্টেম্বরে ১২,০০০ অতিরিক্ত শ্রমশক্তি শিল্পে নিযুক্ত হল। এর একটা ভাল অংশ ছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে। ১৯৪৫-এর শেষের দিকে আমদানি করা শ্রমিক দাঁড়াল ৩০,০০০, ১৯৪৬ জুলাই-এ কমতে কমতে সংখ্যা দাঁড়াল ১৫,০০০ (জুলাই ১৯৪৬)। এই শ্রমিকরা অন্যদের তুলনায় মাইনে পেত বেশি। ২ হাজার ৩ হাজার বাদে বাকি সবাই কাজ করত কোফরি খাদে। কয়লা কাটা, বয়ে নিয়ে যাওয়া ও বোঝাই করা—এই ছিল কাজ। এরা যে কয়লা কাটত তার পরিমাণ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এ ছিল সপ্তাহে ৮,৫০০ টন। ডিসেম্বর (১৯৪৫) ছিল সপ্তাহে ৪০,০০০ টন। অতিরিক্ত ১০০০ ওয়াগন এই শ্রমিকরা সপ্তাহে বোঝাই করত। তা ছাড়া ৩০০০ শ্রমিক খনিগর্ভে কাজ করত। খোলামুখ কোয়ারিতে একজন শ্রমিক ১ দিনে ১.৪ টন উৎপাদন করত। ওয়াগন প্রতি গড় নিযুক্তি ছিল ৪ জন শ্রমিক। মেশিনে কাটা কয়লাই তারা বোঝাই করত।

গোরখপুরী শ্রমিক

মাত্র পুরুষই নিযুক্ত হত। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে ডিপোতে তাদের ভর্তি করা হত। ছ-মাসের চুক্তিতে স্বাক্ষরিত হতে হত। দৈনিক মজুরি ছিল ১২ আনা (মূল বেতন)। প্রতিদিনের উৎপাদন বোনাস ৪ আনা। বিনামূল্যে যে রেশন দেওয়া হত তার মূল্য ছিল ১০ ½ আনা (১ দিন x ১ সপ্তাহ x মজুরি)। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শ্রমিক পেত ১২ আনা। রুগ্ন শ্রমিক পেত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা। এবং ৮ আনা প্রতিদিন প্রতি শ্রমিক। বেশির ভাগ শ্রমিকই টাইম রেটেড। কিন্তু, কয়লা কাটা ও ওয়াগনে বোঝাই যারা করত তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

সি আর ও-র সঙ্গে টি ডিস্ট্রিক্ট লেবর অ্যাসোসিয়েশনের (টি ডি এল এ) কাঠামোগত ও উদ্দেশ্যগত মিল ছিল। এই দুটি সংগঠনের জন্য মালিকদের খুব দরদ ছিল। তবে, এখন আর এ সংগঠন দুটি নেই।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই পদ্ধতিতে ইউনিটপ্রতি শ্রমশক্তি বাবদ ব্যয় বেশিই হত। কার্যত, বেশি যেটা সেটা তো শ্রমিকরা পেত না। জমিদারি ভাষায় বলতে হয় শ্রম বাজারের মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই বেশিটা আত্মসাৎ করত। শোষণ হত সীমাহীন।

বিভিন্ন কোলফিল্ডের মধ্যে শ্রমিকদের যাতায়াত বেশ নিয়মিত ও বছরের নির্দিষ্ট কালভিত্তিক ছিল। বিভিন্ন সময়ে যে মাইগ্রেশন হত তার একটা ছবি নীচে দেওয়া হল (শতকরা)।

বিভিন্ন কালে মাসগ্রেশনের শতাংশ হার[১০]

কোলফিল্ড মার্চ-এপ্রিল	জুন-জুলাই	অক্টোবর-নভেম্বর নভেম্বর-ডিসেম্বর
ঝরিয়া	৩০-৪৫	২৫-৪৫
বোকারো	৪০	৩০
রানীগঞ্জ	৪০	৫০
সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস (সি পি) বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ এম পি) ২৫	৩০	৫০
অসম	৩৫	৪০-৫০

"এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের বেশি শ্রমিক সাধারণত এই সময়ে খনি থেকে চলে যায়।" এই অনুপস্থিতির সমস্যা আজও সমাধানকে অস্বীকার করে চলেছে।[১১]

১৯২৯, ১৯৩৯ ও ১৯৪২ ডিসেম্বরে কলিয়ারি শ্রমিকদের গড় দৈনিক আয়ের হিসাব নীচের সারণিতে দেওয়া হল :

দেশপাণ্ডে কমিটি রানীগঞ্জে ৬৩টি পরিবারের আয়ব্যয়ের সমীক্ষা করেন। সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কলিয়ারি শ্রমিকদের ২২.৩% (ঝরিয়া) পরিবার ঋণগ্রস্ত; পরিবারপিছু ঋণের পরিমাণ টাকা ২৮-৮-৯। ১৫% থেকে ৬০০% সুদের হার। ব্যাধি ও বিবাহই ঋণ গ্রহণে শ্রমিকদের বাধ্য করে। বহু দোকানদার, আত্মীয়রা ঋণ সরবরাহ করে।

পরিবারের আয়তন ৩.৬২ গড় ধরলে তার সাপ্তাহিক আয় হয় টাকা ১২.১.৬। সাপ্তাহিক গড় ব্যয় টাকা ১০.১০.২। সঞ্চয় হওয়া উচিত টাকা ১.৭.৪। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে পরিবারের ২.০২ জন উপার্জনকারী (১.১৫ সাবালক. পুরুষ, ০.৭৩ সাবালিকা নারী, ০.১৪ শিশু) তা হলে ১.৬০ জন প্রতি পরিবারে আয় করে না, তারা কারা?

রানীগঞ্জের ৬৩টি পরিবারের পারিবারিক আয়ব্যয় নিয়ে যে সমীক্ষা একই সঙ্গে হয়েছিল যে তাতে তদানীন্তন বাংলার তিনটি ভাগই সমীক্ষাধীন ছিল। ১৩টি পরিবার ছিল বাংলার পূর্বাঞ্চলে, ৩৯টি বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং ১১টি রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের বিহার-সংলগ্ন অঞ্চলে। এই সব অঞ্চলে অবস্থিত ৩৯টি খনিতে এই শ্রমিকেরা কাজ করতেন। পরিবারের গড় সদস্য ছিল ২.৬৮ জন; ১.১৬ পুরুষ, ০.৫৭ নারী; ০.৯৫ শিশু (১৭ বছরের নীচে বয়স)। ৩.০৬ জন প্রতি পরিবারের পোষ্য ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীই ছিলেন তাঁরা। পোষ্যরা নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পরিবারের কর্তার কাছ থেকে পেত। পরিবারের (২.৬৮) মধ্যে উপার্জনশীল ছিল ১.৩৮ এবং ১.৩০ ছিল পোষ্য। উপার্জনকারীদের মধ্যে পুরুষ ১.১১, নারী ০.১৯ এবং শিশু ০.০৮। গড় পারিবারিক আয় (বিভিন্ন সুবিধাজনক দরে প্রাপ্ত জিনিসপত্র বাবদ যে পেত সঞ্চয় তা ধরে) আয়ের যাবতীয় সূত্র ধরে ছিল টাকা ৯.৯.৩। পারিবারিক বাজেটের ৫৭.২% (৩ টাকা ৫ আনা ১০ পাই) ছিল শুধু চালের বাবদই। মাথাপিছু চাল খরচ হত দৈনিক ৯ ছটাক। শ্রমিকদের খাদ্য ছিল খুবই নিম্নমানের। পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ কিছুই যে খেত না।

বিবিধ খাতে ব্যয় হত ২১.৪%। এর মধ্যে ছিল মদ্যপান (টা.০.৬.৩) ও পান-সুপারি-তামাক (টা. ০.৪.৩)। সপ্তাহে ও ৬৩টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ২ জন সিনেমা দেখতেন, ৩৭ জন মদ খেতেন, ব্যয় হত পরিবারপিছু টা.০.১০.৮। ৬৩টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১৪টি (২২%) ঋণী ছিল। সহকর্মী শ্রমিকদের কাছ থেকেই ঋণ পাওয়া যেত।[১৫]

বাসস্থান প্রসঙ্গে দেশপাণ্ডে রিপোর্টের অন্তর্নিহিত সত্যতা আজও প্রাসঙ্গিক।

"কয়লাখনিগুলি সাধারণত শহর ও গ্রাম থেকে বহু দূরে অবস্থিত। শিল্পকে তাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। বিকল্প প্রাইভেট আবাসনও প্রাপ্য নয়। ঝরিয়া এবং রানীগঞ্জ

কয়লাখনি শ্রমিকদের গড় দৈনিক উপার্জন : ১৯২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ ডিসেম্বর ও ১৯৪২ ডিসেম্বর

কোলফিল্ডের নাম	মাইনার্স-আণ্ডারগ্রাউণ্ড									লোডস-আণ্ডারগ্রাউণ্ড									দক্ষ-সার্ফেস									অদক্ষ-সার্ফেস								
	১৯২৯			১৯৩৯			১৯৪২			১৯২৯			১৯৩৯			১৯৪২			১৯২৯			১৯৩৯			১৯৪২			১৯২৯			১৯৩৯			১৯৪২		
১	২			৩			৪			৫			৬			৭			৮			৯			১০			১১			১২			১৩		
	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প
ঝরিয়া	০	১৩	৬	০	৯	৯	০	১১	০	০	১১	০	০	৮	৯	০	১০	০	০	১৩	৩	০	১০	৩	০	১২	০	০	৮	৯	০	৫	০	০	৮	৩
রানিগঞ্জ	০	১৩	০	০	৯	০	০	১০	৯	০	০	৩	০	৭	৯	০	৯	৩	০	১১	৬	০	৯	৬	০	১১	০	০	৮	৬	০	৬	৩	০	৭	৩
গিরিডি	০	১২	৯	০	১০	০	০	১৩	০	০	১২	০	০	১১	০	০	১০	৯	০	১৪	০	০	১৪	০	১	২	৩	০	৮	০	০	৮	০	০	১০	৯
আসাম	১	৫	৬	১	০	৬	১	৩	৯	১	৩	৬	১	০	৩	১	২	৯	০	১৫	৯	০	১৪	০	১	২	৬	০	১২	০	০	১১	৬	০	১৩	৬
পাঞ্জাব	০	১৪	৩	০	১৪	০	১	৫	০	০	১২	৬	০	১৩	৩	১	৩	৬	০	১৪	৬	০	১২	৯	১	১	০	০	১১	৩	০	৮	০	০	১১	৩
পেঞ্চভ্যালি (সি পি)	১	২	০	০	১২	০	০	১৫	৯	০	০	৬	০	৭	৬	০	১৫	৯	০	১০	৬	০	৯	০	০	১১	৬	০	১০	৩	০	৬	৯	০	৭	৬

উভয় স্থানেই আবাসন সমস্যাটা এই কারণে একটু জটিল হয়েছে যে ভূগর্ভে কয়লা নেই এমন অঞ্চল সর্বত্র সুলভ নয়। কোনও কোনও জায়গায় তা পাওয়া যায় না। ঘটনা এই যে বর্তমান অনুসন্ধান চালাবার সময় লক্ষ করা গিয়েছে যে শ্রমিকদের আবাসন ও অফিসারদের কোয়ার্টার যা কয়েক বছর আগে নির্মিত তা ভেঙে ফেলতে হয়েছে কারণ ওই এলাকাগুলি কয়লা তোলার জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে।

"রানীগঞ্জ ও ঝরিয়ার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ খনি অঞ্চলে শ্রমিক-আবাসনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কেমন ঘর নির্মাণ করতে হবে তার নির্দেশ নানা আইনত নিয়ন্ত্রিত হলেও নিয়োগকর্তারা সকল কর্মীকে বা একাংশকে আবাসন দিতে বাধ্য নয়।"[১৬]

আবাসন—ঝরিয়া

বিহার ও ওড়িশা মাইনিং সেটলমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯২০ সেকশন ২৫(১) অনুযায়ী রচিত ৪নং বাই-ল।

নির্দেশিকা :

মেঝের আয়তন হবে ১০০ বর্গফুট (১৫০ বর্গফুট), বায়ু চলাচলের ক্ষেত্র ১০০০ ঘনফুট (১৫০০ ঘনফুট), কক্ষের প্রস্থ ৮ ফুট (১০ ফুট), গড় উচ্চতা ৭ ফুট (১০ ফুট), দেওয়াল কংক্রিট বা অনুরূপ জিনিস দিয়ে তৈরি ছাদ, কংক্রিট ম্যাসনরি, ট্রাইলস, জলরোধক; ভিটের উচ্চতা অন্তত ১ ফুট। প্রতি বাড়িতে ১টি বারান্দা আবশ্যিক ৫ ফুট এবং ৪০ বর্গফুট মেঝের আয়তন; প্রত্যেকটি ঘরে আলো-বাতাস খেলার ব্যবস্থা, একটি দরজা থাকবেই, উচ্চতা ৫ ফুট গড়ে। বায়ু ক্ষেত্র (এয়ার স্পেস) ৩০০ ঘনফুট, ১০টির বেশি ঘর নিয়ে কোনও ব্লক হবে না।

মাথপিছু (বয়স্কদের) জন্য মেঝের বরাদ্দের আয়তন বাড়িয়ে ৫০ বর্গফুট করা হয়েছে। গড় বায়ুচলাচল ক্ষেত্র ৩০০ ঘনফুট থেকে বাড়িয়ে ৫০০ ঘনফুট করা হয়েছে। ব্লকপ্রতি ঘরের সংখ্যা ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ করা হয়েছে। পিঠে-পিঠে লাগানো ঘর তৈরি করা নিষিদ্ধ হয়েছে। [(-) মধ্যের সংখ্যাগুলি বি ও এস এস অ্যাক্টের সংশোধনীর ফলে সংশোধিত সংখ্যা। উপরে প্রদত্ত বর্ধিত সংখ্যাগুলিও তাই।]

শ্রমিকদের আবাসনের নাম ধাওড়া। একটি কামরা ও একটি বারান্দাবিশিষ্ট। ১৯৪৪ সালের নয়া নির্দেশনামার আগের যুগে নির্মিত। প্রত্যেক কামরার সামনেটা খিলান (আর্চড) বিশিষ্ট। মোট আয়তনটা সিলিন্ডারের ন্যায় মনে হয়। নতুন নির্দেশনামার পরে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন হয়েছে। বেশির ভাগই পিঠে-পিঠে দাঁড়িয়ে আছে। ঝরিয়া কোলফিল্ডে ১৯২৯-৪৪-এর মধ্যে ধাওড়া ৩২,৭৯৩ থেকে ৩৩,৭৩৮ (+৯৪৫) হয়েছে, গড় দৈনিক শ্রমিক সংখ্যা ৬১,৭০৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,০১,৪৫৭ (+৩৯,৭৪৮), কলিয়ারির জনসংখ্যা ১,০৯,৩৮০ থেকে বেড়ে হয়েছে ২,০২,৯১৪ (+৯৩,৫৩৪) এবং ধাওড়াপ্রতি জনসংখ্যা ৩.৩৩ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.০০ (+২.৬৭)।

শ্রমিক বাড়ছে।

জনসংখ্যা বাড়ছে।

ধাওড়ার সংখ্যা প্রায় স্থির!

২৫% আবাসিক ছিল একক, ৫০% পরিবারওয়ালা, ২৫% প্রতিবেশী গ্রামের লোক। খিলান ধাওড়ার আগে ছিল পিঠে পিঠ লাগানো ধাওড়া। সামনে একটা বারান্দা ছিল, ছিল টালির ছাদ। মেঝে ছিল সাধারণত কাঁচা। জলের অভাব সাধারণ অভিযোগ ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে রানীগঞ্জের তৎকালীন অবস্থা বোঝা সহজ হবে। আবাসন আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথের নিয়মাবলী অনুযায়ী নির্মিত। আবাসন নিয়মাবলী ঝরিয়ার অনুরূপে।

৩৯টি নমুনা-কলিয়ারিতে অনুসন্ধান চলে। ৮০%-এর আবাসন আছে। কামরাপ্রতি লোকসংখ্যা ৪ থেকে ১০। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জল ইঁদারা বা পুকুরের। স্যানিটারির নামগন্ধ নেই।

পেশাজনিত ব্যাধি, পরিবেশজনিত ব্যাধির প্রাদুর্ভাব স্বীকৃত হয়েছে, তবে দ্বিধাজনিতভাবে। তা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হয়েছে চোখের রোগ, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকৃত। রিপোর্টে পেশাজনিত ব্যাধিকে তো ব্রঙ্কর সঙ্গে তুলনীয় করেছে। থাকতেও পারে, সমভাবেই নাও পারে। এই অবস্থায়ও রিপোর্ট বলতে বাধ্য হয়েছে যে মেডিকেল সহায়তা দানের ব্যবস্থা খুবই সামান্য।

রিপোর্টে দেশপাণ্ডে স্বাক্ষর করেছেন ২৫ এপ্রিল ১৯৪৬। স্থান—সিমলা। সুতরাং স্থির সিদ্ধান্তের পক্ষে খুবই অনুকূল। স্বাক্ষরদানের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তিনি লিখেছেন:

"যতদূর দেখা যায়, অপ্রতিহত প্রাইভেট উদ্যোগ। শতাধিক বর্ষের অবাধ দৌড়ের ভিতরে পরীক্ষিত হয়েছে এবং ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই রিপোর্টে শ্রমিকদের সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তা আলো-ছায়ার রচনা—ছায়া বেশি আলো কম। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রকে আরও সক্রিয় ও উদ্দীপনাময় ভূমিকা পালন করতে হবে কাজ, মজুরি ও কল্যাণব্যবস্থাবলীর কিছু ন্যূনতম নিরিখ রচনা ও প্রয়োগের জন্য।"[১৭]

পর্ব দুই

॥ ১ ॥

কয়লা শিল্পের বিভিন্ন দিক সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের অনুকূলে সংগঠিত করার জন্য দেশপাণ্ডে কমিটির রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, মজুরি, কাজ প্রভৃতি বিষয়ে একটি সুসংহত রিপোর্ট তিনি দেন। কিন্তু প্রাইভেট মালিকানা তিনিও বিশেষ সমর্থন করতে পেরেছেন, এমন নয়। ১৯৪৬ সালে তিনি রিপোর্ট দাখিল করেন। মজুরি, উপার্জন, আবাসন, স্বাস্থ্য, মেডিকেল রিলিফ, শ্রমকল্যাণ, শ্রমিকদের

ইউনিয়ন, শিল্প সম্পর্ক অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ক বিধেয়ক রচনা তাঁর রিপোর্টে আলোচিত হয়েছে।

আসানসোল কয়লাখনি তথ্য সমস্ত শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সংগঠন ব্যাপারে তাঁর রিপোর্টে আছে যে রানীগঞ্জে ওই সময়ে (যখন রিপোর্ট লেখা হচ্ছিল বা তার আগে) কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। এই তথ্য ঠিক নয়। ১৯৩৭-এ বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল শ্রমিক কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি। তখন কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের মধ্যে ছিল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি নেতৃত্বে ছিলেন। কংগ্রেস তাঁকেই প্রার্থী মনোনীত করেছিল। তারপর রানীগঞ্জে কমরেড সুকুমার শহিদ হন। বার্নপুর, কুলটি, বল্লভপুর ব্যতীত কয়লাখনি সমূহে লাল ঝাণ্ডার সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কমরেড বিজয় পাল ক্রমশ নেতৃত্বে আসেন। ইতিমধ্যে, ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন হয়। এবার প্রার্থী হন কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। তিনি পরাজিত হন। কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন বাড়তে থাকে। ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ ঘনীভূত হতে থাকে। কেন্দ্রে যৌথ সরকার গঠিত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে থাকে। দেশ বিভাগের পটভূমি রচিত হতে থাকে।

এ কথা ঠিক যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুবই দুর্বল ছিল। রানীগঞ্জে কোনও ইউনিয়নই ছিল না, রিপোর্টের তাই বক্তব্য।[১৮] ধর্মঘট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ১৯৪৩-এর পূর্ববর্তী ৫ বছরে কোনও ধর্মঘট হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধের বছরগুলিতে। রানীগঞ্জ ঝরিয়া উভয়তই এটা ঘটনা। রানীগঞ্জে অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী ধর্মঘট হয়েছে। গিরিডি- বোকারোতে ঝরিয়ার মতই অবস্থা। অপরদিকে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে ১৯৪০ থেকে শুরু করে ধর্মঘট হয়েছে যার ফলে ৫৭,৬০০টা দিন 'নষ্ট' হয়েছে। রানীগঞ্জ কয়লা-ইস্পাত শিল্পাঞ্চলে কাগজকল শ্রমিকদের মহান গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা তো আজ ইতিহাসের বিষয়, যে ইতিহাস জংগম, স্থাবর নয়।

১৯৪৬ সালে ইন্ডিয়ান কোলফিল্ডস্ কমিটি গঠিত হয়। কয়লা সংরক্ষণ ও র‍্যাশনালাইজেশন ছিল এই কমিটির প্রধান বিচার্য বিষয়। প্রসঙ্গত, শ্রম ও শ্রমিকের বিষয়ে ও প্রয়োজনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত জানাতে কমিটিকে বলা হয়েছিল।

কয়লাখনি শ্রমিকদের কাজের ও বাঁচার অবস্থার মধ্যে উন্নতি ঘটাবার কথা রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে। মজুরি ও সুখ-সুবিধা কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য ভাল করতে হবে। কয়লা শিল্পে একটি স্থায়ী খনিকর্মী বল সৃষ্টি করতে হবে।

ন্যাশনাল কমিশন অন লেবরের এই কথাটা ঠিক : "....ইন অর্ডার টু সিকিওর ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি এ সেটেল্‌ড্ মাইনিং ফোর্স"।[১৯]

এই সুপারিশের অনুসরণে বোর্ড অব কনসিলিয়েশন গঠিত হয়। ১২ মে ১৯৪৭ বোর্ডের রায় প্রকাশিত হয়। প্রধানত বাংলা ও বিহারের কোলফিল্ডের জন্যই এই রিপোর্ট প্রস্তুত হয়েছিল।

কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায়ের (১৯৪৭) অনুসরণে অসম-সহ বিভিন্ন খনি অঞ্চলে 'রায়' প্রস্তুত হয় ও তা প্রযুক্ত হয়।

কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায়ই আকার-আয়তনহীন একটি খনি শিল্পকে নির্দিষ্ট আকার-আয়তন দান করে। শ্রমিকদের অবাধ শোষণ সামান্য হলেও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সূত্রপাত ঘটে। সি বি অ্যাওয়ার্ডই খনিশিল্পে প্রথম আধুনিক মজুরি চুক্তি। অবশ্য সমগ্র যুদ্ধকালই মজুরি-কাজ-স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিশদভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং কমিটিতে আলোচিত হয়েছে, বিতর্কিত হয়েছে।

॥ ২ ॥

শ্রমিকদের চাহিদা যুদ্ধের সময় ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৪৪ সালে, শ্রমিক সংগ্রহ অব্যাহত রাখার জন্য একটি ডাইরেক্টোরেট গঠিত হয়। ১৯৪৪ সেপ্টেম্বরে ১২,০০০ শ্রমিক, প্রধানত উত্তরপ্রদেশ থেকে সংগৃহীত হয়। এরূপ সংগৃহীত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৪৫-এর শেষদিকে সর্বোচ্চ বিন্দুতে উপনীত হয় ৩০,০০০, তারপরে নেমে ১৯৪৬ জুলাইয়ে ১৫,০০০। এই শ্রমিকদের সরকার মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাবদ ব্যয়ের একটা অংশ বহন করত।

এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু আলোচনা হয়েছে। এখানে যে কথাটা মনে রাখতে হবে, তা হল এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে কয়লাশিল্পের পুরাতন কাঠামোটা বারে বারে কেঁপে উঠেছিল। পরম্পরাগত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জৈব পরিবর্তন যেটা হল সেটা সাধারণ নয়। সাঁওতাল, বাউরি প্রভৃতি তফসিলি জাতি জনজাতির মানুষ বাদেও বিভিন্ন বর্ণের মানুষও খনির কাজে আসতে শুরু করেন।

সাধারণভাবে, নারীশ্রমিকদের উপর থেকে কাজের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও সি আর ও লেবর ক্যাম্পের শ্রমিকরা সবাই 'ব্রহ্মচারী'। কোনও নারীশ্রমিক তাদের সঙ্গে কাজ করত না। সি আর ও বা গোরখপুরী শ্রমিকদের মজুরি সাধারণ হারের থেকে বেশি ছিল। তারা ছাউনি-শিবিরের কঠোর শৃংখলার মধ্যে বাস ও কাজ করত। ন্যূনতম ব্যয়ের পরে যে সঞ্চয় হত তাই সম্বল করে এই শ্রমিকদের ১১ মাস শেষে দেশে ফিরে যেতে হত। অনেকে আবার ফিরে আসত। এই ব্যবস্থা উত্তরপ্রদেশের বেকারি সমস্যাকে খানিকটা প্রশমিত অবশ্যই করেছিল।

যুদ্ধকালীন কয়লাখনি শিল্প দেখিয়ে দেয় যে শিল্পটি অদক্ষ শ্রমশক্তির উপরই নির্ভরশীল যেহেতু উৎপাদন পদ্ধতিও ছিল আদ্যিকালের গাঁইতি-শাবল-কুপিভিত্তিক।

॥ ৩ ॥

রানীগঞ্জ কোলফিল্ড অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা ও সংগঠিত করা ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ১৯১২ সালে গঠিত আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেল্‌থ-এর কয়েকটি বার্ষিক রিপোর্ট থেকে শ্রমিক, জনগণ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা প্রয়োজন।

১৯৪৩-৪৪ সালে বোর্ডের এলাকার আয়তন ছিল ৪১৩ বর্গমাইল। ১৯৪১ সালের আদমশুমারি মতে জনসংখ্যা ছিল ৫,১২,৬১৬। আসানসোল পুরসভা এলাকায় জনসংখ্যা ছিল

৫৫,৭৯৭ ; রানীগঞ্জ পুরসভা এলাকায় জনসংখ্যা ছিল ২২,৮৩৯। গ্রামাঞ্চলের (কয়লাখনি ও কারখানা-সহ) জনসংখ্যা ছিল ৪,৩৩,৯৮০। মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৯০ ; চালু কলিয়ারি ১৩০ ; লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কাগজকল, সেরামিক কারখানা। প্রথমটি বার্নপুর ও কুলটিতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি রানীগঞ্জে।

১৯৬৪-৬৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী বোর্ডের এক্তিয়ারে ছিল মোট ৫৪৭ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ৫০৫ বর্গ কিলোমিটার ; বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ১৫ বর্গ কিলোমিটার; বীরভূম জেলার অন্তর্গত ২৭ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৬১ সালে আদমশুমারী মতে আসানসোল ও রানীগঞ্জ পুরসভা বাদ দিয়ে বাকি এলাকার জনসংখ্যা ৯,৩৬,১৯১।

১৯৬৫-৬৬ সালে ২০০টি চালু কলিয়ারি, ৫০০টি গ্রাম ও শিল্পাঞ্চল (বার্নপুর, কুলটি ও বাজার এলাকাসমূহ যেমন নিয়ামতপুর, দোমোহানী, জামুড়িয়া, বল্লভপুর, অণ্ডাল, বরাকর, বেগুলিয়া, কেন্দুয়া, সীতারামপুর, কালিপাহাড়ি)।

বোর্ডের এলাকার মোট জনসংখ্যা স্থায়ী, অস্থায়ী, স্থানীয়-অনবাসী, এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বোর্ডের ১৯৬৫-৬৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ এই তিন বছরের জনসংখ্যা নিম্নরূপ দেখানো হয়েছে।

	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫
(ক) স্থায়ী (settled)	৮৬,৮৪৪	৮০,৩৩১	৯৫,৮২৯
(খ) অস্থায়ী (floating)	২৬,৪৮৩	২২,০৪৮	৩৪,২৩২
(গ) স্থানীয় অনবাসী	৩০,৯০১	৩২,৩১৬	৩০,৬৩৩
মোট	১,৪৪,২২৮	১,৩৪,৬৯৫	১,৬০,৬৯৪

অপরদিকে ১৯৬৩, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে কলিয়ারিতে কত পুরুষ, কত মহিলা কাজ করেছেন তার সংখ্যা নীচে দেওয়া হল :

বৎসর		আন্ডারগ্রাউণ্ড	সার্কেল	মোট
১৯৬৩*	পুরুষ	৫৭,৪৯৪	৩৬,২৭২	৯৩,৭৬৬
,,	মহিলা	—	৫,৩৫০	৫,৩৫০
	মোট	৫৭,৪৯৪	৪১,৬২২	৯৯,১১৬
১৯৬৪	পুরুষ	৪৬,৩৮৩	২২,৩৩৭	৬৮,৭২০
,,	মহিলা	—	৪,৯৬১	৪,৯৬১
	মোট	৪৬,৩৮৩	২৭,২৯৮	৭৩,৬৮১
১৯৬৫	পুরুষ	৫৯,১৫৯	২৪,৬১৭	৮৩,৭৭৬
,,	মহিলা	—	৪,৫০৩	৪,৫০৩
	মোট	৫৯,১৫৯	২৯,১২০	৮৮,২৭৯

* মূল পরিসংখ্যানে মুদ্রণ প্রমাদ আছে। তা সংশোধন করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ১৯৪৯ সালে ছিল ১০,৮৫৮। বোর্ডের বার্ষিক রিপোর্টে শ্রমিক সরবরাহের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। প্রতি রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে গোরখপুর লেবর অর্গানাইজেশন মরসুমি কারণে শ্রমিক সংখ্যায় যে হেরফের হয় তা পূরণ করে স্থিতাবস্থা রক্ষা করে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে গঠিত সংগঠনটি ১৯৬৫-তেও একই ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পরে এই সংগঠনের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসে গোরখপুরী লেবর অর্গানাইজেশন গোলামীর মূর্ত প্রতিরূপ।

মাইনস বোর্ডের রিপোর্টে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। তথ্যগুলি অনেক কথাই বলে। বার্ষিক রিপোর্ট :

১৯৪৯-৫০

মূল মজুরি গত বছরের স্তরেই ছিল। পিসরেটেড আন্ডার-গ্রাউন্ড শ্রমিকদের মূল মজুরি ছিল টা. ১/১৪/-৩৫ ঘনফুট টন কয়লা কেটে বোঝাই করলে এই মজুরি পাওয়া যেত। তা ছাড়া, শ্রমিক পেত—

ভারী গতর খাটানো কাজের জন্য এক পোয়া চাল বিনামূল্যে।

হাজিরা বোনাস ছিল—

নিজের জন্য ৩-½

স্বামী-স্ত্রীর জন্য ৪ ½ আনা

স্বামী-স্ত্রী, ২ সন্তানের জন্য ৬ ½ আনা

বাধ্য হয়ে কাজ না করতে পারলে, ১ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ না পেলে সে প্রতিদিনের বাবদ ১১ আনা বোনাস পাবে যদি বাধ্য হয়ে কাজ করতে না পারার মেয়াদ ৪ দিনের কম হয় এবং ৪ দিনের বেশি হলে দৈনিক সাড়ে ১৪ আনা হিসাবে।

সিক খোরাকি : ৩ দিনের বেশি অসুস্থ থাকলে দৈনিক দশ আনা হারে সিক খোরাকি পাওয়া যেত। কত দিন সিক থাকা যাবে তা নির্ভর করত মালিকদের মর্জির উপর।

৩ জুলাই ১৯৪৮ কোল মাইনস প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড বোনাস স্কিম অর্ডিন্যান্স জারি হয়। ১২ মে ১৯৪৭ থেকে তা কার্যকর হয়। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সটি আইনে পরিণত হয়। ত্রৈমাসিক বোনাস—সংশ্লিষ্ট তিন মাসে মোট মূল মজুরি যা আয় হয়েছে তার ⅓ হচ্ছে বোনাস। আন্ডারগ্রাউন্ড শ্রমিক ৫৪ দিন কাজ করলে অন্যান্যরা ৬৬ দিন, তবে এই বোনাস পাওয়ার অধিকারী হবে। বছরে ২১ দিন ছুটি পাবে। ত্রৈমাসিক বোনাস যে পাবে সে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অধিকারী হবে। মূল মজুরি প্রতি টাকায় মালিকরা দেবে ১ আনা, শ্রমিকও তাই দেবে। কোনও শ্রমিক যদি পরপর ৪টা ত্রৈমাসিক বোনাস না পায় তা হলে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকেও সে বাদ যাবে।

প্রতিদিন হাজিরা দিলে একজন খনিশ্রমিক সস্তা দরে চাল ও ডাল পাবে। চাল ১ সের ছ আনা দরে, ২ ছটাক (⅛) ডাল প্রতি সের চার আনা দরে।

মহিলা শ্রমিকরা মাতৃমঙ্গল ভাতা পাবে দৈনিক ১২ আনা হারে প্রসবের চার সপ্তাহ আগে প্রসবের চার সপ্তাহ পরে অবধি। তা ছাড়া, অতিরিক্ত ৩ টাকা। মোট পরিমাণে হয় টা. ৪৫.১২ আ। ছ-মাস চাকরি হলে মহিলা শ্রমিক মাতৃমঙ্গল ভাতা পেতে অধিকারী হবে। প্রসবের ১ মাস আগে তাকে নোটিশ দিতে হবে।

১৯৪৪ সালে ভারত সরকার কল্যাণনিধি (ওয়েলফেয়ার ফান্ড) প্রতিষ্ঠা করে। আবাসন, চিকিৎসা মাতৃ ও শিশুকল্যাণ, ক্রেশ, মহিলা কল্যাণ বিবিধ ব্যবস্থা এই নিধির অধীন।

১৯৫২-৫৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারের বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার কয়লাখনি অঞ্চলকে বোর্ডের অধীনস্থ করার প্রস্তাবে বোর্ড রাজি, তবে আইনের সংশোধন করতে হবে।

১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২ সালে কয়লা উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে (টন) ৮৮,২২,৩৯৩; ৯৬,৮০,৯৬০; ও ১০২,৩৬,২৮৭।

১৯৫১, ১৯৫২ সালে মাইনিং সেটেলমেন্ট অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল :

	১৯৫২	১৯৫১
স্থায়ী	৭৬,১৫৮	৭৫,৪১৯
অস্থায়ী	৩৭,৯৪৭	৩২,৮৮৬
স্থায়ী অনাবাসী	২৮,৮৭০	২৬,৬৯৯
মোট	১,৩৮,৯৭৫	১,৩৫,০০৪

কর্মস্থল হিসেবে নিযুক্তির হিসাব :-

বৎসর		আন্ডারগ্রাউন্ড	সার্কেল	মোট
১৯৫২	পুরুষ	৪৬,২৭৩	২০,৯৬৮	৬৭,২৪১
,,	নারী	—	১১,১৩৫	১১,১৩৫
	মোট	৪৬,২৭৩	৩২,১০৩	৭৮,৩৭৬
১৯৫১	পুরুষ	৪৩,৮৪৫	২০,৫৪০	৬৪,৩৮৫
,,	নারী	—	১০,৭৪৪	১০,৭৪৪
	মোট	৪৩,৮৪৫	৩১,২৮৪	৭৫,১২৯

কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায় অবশ্যই কয়লাখনি শ্রমিকদের বিক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারেনি।

মে ১৯৫৬। মজুমদার ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিক্ষোভ প্রশমিত হয় না। এই ট্রাইবুনালের সামনে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বক্তব্য রাখে। উল্লেখযোগ্য যে কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায় পরিবর্তন করে সর্বাঙ্গীণ নতুন মজুরি কাজ ইত্যাদি বিষয়ে একটি রায়ের জন্য ধর্মঘটের নোটিশ সকল ট্রেড ইউনিয়নই দেয়। এই ধর্মঘটের নোটিশের প্রতিক্রিয়াতেই মজুমদার ট্রাইবুনাল নিযুক্ত হয়। এই ট্রাইবুনালের রায় সংশোধনের দাবিতে এনড্রু ইউল ও ম্যাকনীল বেরি গ্রুপের কয়লাখনিসমূহের উপর ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়। এ আই টি ইউ সি এই ধর্মঘটেও যোগদান করে ও ধর্মঘট পরিচালনা এবং মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘটকারী ইউনিয়নসমূহের মধ্যে দেবেন সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত কলিয়ারি মজদুর কংগ্রেস (স্বীকৃত ইউনিয়ন) অন্যতম ছিল। ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে দাবিগুলি বিবেচনা ও মীমাংসার জন্য লেবর অ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল গঠিত হয় (দাশগুপ্ত ট্রাইবুনাল)। ১৯৫৯ ডিসেম্বরে দাশগুপ্ত (চেয়ারম্যান, আপিল ট্রাইবুনাল) তাঁর রায় দেন। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির স্কেল (ডেইলি-রেটেড শ্রমিকদের জন্য), কয়েকটি মান্থলি-রেটেড শ্রমিকদের জন্য টাইম-স্কেল প্রবর্তন দাশগুপ্ত অ্যাওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[২০]

১৯৬২ আগস্টে কয়লাখনি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়েজ বোর্ড নিযুক্ত হয়। মজুরি কাঠামো নিয়ে বোর্ড বিশদ বিশ্লেষণ করে। ১৯৬৭-র গোড়ার দিকে বোর্ড তার রায় দেয়। ১৯৬৭ জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লার মূল্য নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে ন্যাশনাল কমিশন অন লেবরের ওয়ার্কিং গ্রুপ মনে করে (নিয়ন্ত্রণ জারি হয় ১৯৪৪ সালে।[২১]

ন্যাশনাল লেবর কমিশনের কয়লাখনি-সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের রিপোর্টে (১৯৬৮) বলেছে যে 'বিগত চার বছরে' নিযুক্ত কমে গেছে যদিও উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৫১-১৯৬৭ এই ক-বছরের দৈনিক গড় নিযুক্তি ও বার্ষিক উৎপাদনের তথ্য নীচে দেওয়া হচ্ছে :

বৎসর		কয়লাখনিতে দৈনিক গড় নিযুক্তি ('০০০)	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	
১৯৫১		৩৩৯.২	৩৪.৯৮	
১৯৫৬		৩৩৩.৫	৪০.০০	
১৯৬১		৩৯৮.৭	৫৬.১০	
১৯৬২		৪১৬.৯	৬১.৫৫	
১৯৬৩		৪৩৩.৪	৬৬.৯২	
১৯৬৪	হ্রাস	৪১৪.০	৬৩.৯৯	বৃদ্ধি
১৯৬৫	হ্রাস	৪০৬.৭	৬৯.৪৬	বৃদ্ধি
১৯৬৬	হ্রাস	৪০৬.২	৭০.৫৪	বৃদ্ধি
১৯৬৭	হ্রাস	৪১১.৫	৭১.৩০	বৃদ্ধি

কোল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের কমিটি অন অ্যাসেসমেন্ট অব ডিমাণ্ড ফর কোল হিসাব করেছিল যে ১৯৭০-৭১ সালে প্রয়োজন হবে ৯৯.৫১ মিলিয়ন টন এবং ১৯৭২-৭৩ সালে হবে ১১৮.৭৭ মিলিয়ন টন। মতান্তরে ১৯৭০-৭১ সালে আসলে চাই ৮০-৮৫ মিলিয়ন টন। "চালু ঝোঁক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে তাও নাও হতে পারে"।

কয়লার দর বিনিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে লোকসানে চলা কলিয়ারিগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সমস্যা দেখা দেবে। পরিস্থিতি সামলাবার জন্য বেকারি বীমা (আনএমপ্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্স) বা রিডাকটান্সি পেমেন্ট চালু করা প্রয়োজন। সেদিন, ন্যাশনাল লেবর কমিশনের মতে, সরকার ছ-মাস অবধি বেকারিকালে শ্রমিকদের বেতনের ৫০% ভাগ মঞ্জুর করতে রাজি ছিল।

কয়লাখনিতে লাভ না হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। সংখ্যা ও তথ্যের বাইরে যে অন্তহীন গভীর শোষণের অস্তিত্ব তার সামান্যই শ্রমিকের জীবনে—আধি-ব্যাধি, বেকারি, ছাঁটাই, কাজ-না-করার ঝোঁক, এ সবের মধ্যে প্রকাশিত। আর তা প্রকাশিত শ্রমিকের বাঁচার সংগ্রাম।

(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

পর্ব তিন

॥ ১ ॥

কয়লাখনি শ্রমিকদের নানা বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সাধারণ। এরূপ একটি বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিকরা কতদিন কাজ করে। পরিভাষা অনুযায়ী 'অ্যাবসেন্টিজম্'' বা গর-হাজিরী। এই বৈশিষ্ট্যটি পশ্চিমবাংলার কলিয়ারি শ্রমিকদের মধ্যেও সুস্পষ্ট। ১৯৬৬-৭৭ সালের গরহাজিরীর পরিবেশিত তথ্যে দেখা যায় পশ্চিম বাংলা, বিহার, ওড়িশা একই হারে অবস্থান করছিল (১৯৬৬) কিন্তু ১৯৭৭ সালে বিহারের হার বেড়ে গিয়েছিল। নীচের সারণিতে দেওয়া সংখ্যাগুলি লক্ষণীয় :

তামিলনাড়ু একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে গরহাজিরী লাগাতার কমেছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সব থেকে কম হারে বেড়েছে।

একটি নমুনা সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছিল যে ই সি এল-এর সংগ্রামগড় (৩০ শ্রমিক), শ্যামসুন্দরপুর (২০ শ্রমিক), কুলুমতোরিয়া (৫৪) ও রানা (৩০ শ্রমিক) কলিয়ারিতে গরহাজিরীর জন্য যথাক্রমে ২৩, ১৮, ৬ ও ১ ঘটনা ছিল অসুস্থতার জন্য। অনুরূপভাবে শ্যামসুন্দরপুর কলিয়ারিতে ১৩ জন, সংগ্রামগড়ে ২১ জন, কুলুমতোড়িয়ায় ৩৮ জন, রানায় ২৭ জন ছিলেন দেশের বাড়িতে। মাত্র ২ জন আহত হয়ে ছিলেন কুলুমতোড়িয়ায় এবং ৮ জন কুলুমতোড়িয়া ও ২ জন রানায় কলিয়ারির কলোনিতে থাকতেন। এটা ১৯৭৯ সালের আগে-পরের ঘটনা। (সারণী পরের পাতায়)

১০০ সূচকাংকের উর্ধ্বে বিভিন্ন কেন্দ্রে যে মাসগুলি ছড়িয়ে আছে তাও তাৎপর্যপূর্ণ। ঝরিয়া ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, নভেম্বর ও ডিসেম্বর গড়হাজিরা ব্যাপক। রানীগঞ্জ ক্ষেত্রে এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই; মধ্যপ্রদেশে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন; সিঙ্গারেনী ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন এবং সারা ভারতের গড় মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, নভেম্বর এই ক-মাস। গরহাজিরীর ব্যাপ্তি সব থেকে প্রবল ঝরিয়ায়, তারপরেই মধ্যপ্রদেশ ও সিঙ্গারেনী। রানীগঞ্জে তার পরে। মার্চ, জুন ও নভেম্বর এই সর্বভারতীয় গড়ের মধ্যে নভেম্বর বেমানান। সাধারণভাবে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন তাপাধিক্যের জন্য, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এবং চাষবাসের জন্যও শ্রমিকরা দেশের গ্রামে ফিরে যান। গরহাজিরীর একটি অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। আবার এও সত্য যে এই কটা মাসে শহরের বাণিজ্যিক

কোলফিল্ড	১৯৬৬	১৯৭১	১৯৭২	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	১৯৭৩ সালের তুলনায় ১৯৭৭ সালে পরিবর্তন %
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬.৩০	২১.৫১	২০.০৯	২০.৯৫	১৯.৫০	২০.৩২	২২.১৮	২২.০৬	৯.১
বিহার									
বোকারো	১১.৯২	১৫.২০	১৩.৫২	১২.৫০	১২.৭৪	১৫.০৫	১৬.৯৫	১৫.৫৯	২৪.৭
ঝরিয়া	৯.২৩	৯.৪৪	৮.৮৫	১০.১৪	১১.১৪	১৪.০৮	১৭.৯৩	২০.১৩	৯৮.৫
করণপুরা	১১.০৪	১৪.১৮	১৪.৩৭	১২.৬৭	১৩.০৯	১৭.৯৮	১৮.০৯	১৭.৭৭	৪০.৩
সারা রাজ্য	১০.৪৯	১১.৯৪	১১.১৬	১১.৪০	১২.৪৩	১৫.৩৬	১৮.৫২	২০.১১	৭৬.৪
মধ্যপ্রদেশ	১১.৯৫	১৩.৮৭	১৩.৮৫	১৫.১৩	১৫.৯৮	১৭.৪৩	২০.২৮	২০.৭৯	৩৭.৪
মহারাষ্ট্র	১২.৭২	১৩.৮০	১৩.২৪	১৪.৯৫	১৫.৩২	১৫.২৯	১৯.০৬	১৯.৮৬	৩২.৮
ওড়িশা	১০.৭৫	৯.৩১	৮.৯০	১০.৩৮	৯.৮৭	১০.৭৩	১৫.৯৪	১৭.৬৮	৭০.৩
পশ্চিমবঙ্গ	১০.৪৯	১২.০৪	১১.৮২	১১.৪৮	১৩.০৪	১৪.০৫	১৬.০৮	১৭.৫৩	৫২.৭
তামিলনাড়ু	১৩.২৭	১২.০২	১০.১০	৯.৬১	৯.৩০	৮.৬১	৮.৭৩	৮.৭৫	-৮.৯
সারা ভারত	১১.১৮	১২.৮৮	১২.৩৮	১২.৬৪	১৩.৫৪	১৫.৫৪	১৮.৭০	১৯.৬৬	৫৫.৫

(ডি জি এম এস)

গরহাজিরীর আর একটি বিচিত্র দিক (সূচক সংখ্যা)

ঋতু বিবর্তন ও কলিয়ারিতে কাজ

জুলাই ১৯৭২-৭৭ জুন

মাস	ঝরিয়া	রানীগঞ্জ	মধ্যপ্রদেশ	সিঙ্গারেনী	ভারত
জানুয়ারি	৯১.০৫	৯২.৭০	৯০.৩০	৯০.৫৫	৯১.১৩
ফেব্রুয়ারি	৮৬.১৩	৯১.৯৫	১০৫.১৪	১১০.৭৭	৯৪.১৯
মার্চ	১০১.৬৮	৯৮.৫৯	১০৪.৪২	১১৫.৮৪	১০৩.১৯
এপ্রিল	১১১.১৬	১০৮.১৫	১০৭.৫০	১১৭.৬২	১০৯.০৫
মে	১১৩.৫০	১১৮.৯২	১১২.৭১	১১৮.৩৭	১১৩.৫২
জুন	১০৬.৬১	১০৯.২৪	১১০.৮০	১০০.৪৭	১০৬.৩৩
জুলাই	১০১.৪২	১০৩.৫২	৯৭.৭৩	৯২.৬৬	৯৯.৭৯
আগস্ট	৯৯.৮২	৯৭.৩৫	৯৬.৪৮	৯২.২০	৯৮.৫২
সেপ্টেম্বর	৯২.৪৬	৯০.১৯	৯১.১৪	৮৮.৪১	৯১.৯৬
অক্টোবর	৯৪.৮৬	৯৬.৭১	৯৩.৮৯	৮৮.১৮	৯৫.০৭
নভেম্বর	১০০.৭২	৯৭.৬৫	৯৯.৮০	৯৬.৯৮	১০০.৩৩
ডিসেম্বর	১০০.৫৯	৯৫.০৩	৯১.০৯	৮৭.৯৫	৯৬.৯২

সূত্র : ডি জি এম্ এস ও কোল ইণ্ডিয়া

পণ্য প্রবলবেগে গ্রামের জীবনে প্রবেশ করে। এই উভয় ধারা বজায় রেখেই গরহাজিরী দূর করা যায়। কৃষিতে সারা বছরই যাতে শ্রমিক নিযুক্ত থাকে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও নিযুক্তি হয় তা দেখা দরকার।

যত দিন অর্থনীতিতে কয়লার চাহিদা কম ছিল তত দিন গরহাজিরীর প্রশ্ন এত বড় হয়নি। প্রধানত তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে কয়লা শিল্পে সারা বছর নিয়মিত চাহিদা- মত শ্রম সরবরাহ প্রয়োজনীয় মনে হতে লাগল। অথচ, প্রাপ্যতার অভাব, অপর দিকে যা পাওয়া যায় সেটাই যথেষ্ট নয়। গরহাজিরী, বর্ধিত চাহিদার দরুন আরও শ্রমিকের অভাব পূরণের জন্য, বিশেষ যুদ্ধের জন্য কয়লা শিল্পে এক

স্বভাবতই এতে একটা নতুন তথ্য হাজির হচ্ছে। কলিয়ারি শ্রমিক শ্রেণীর গঠন-প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন। এই পরিবর্তন দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। এখনও চলছে। একদা যে নারী ও শিশুশ্রমিক প্রচলিত ছিল তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে শেষ হয়ে যায়। আরও বড় একটি যে পরিবর্তন ঘটেছে, ঘটে চলেছে তা হল কয়লাখনি শিল্পে যন্ত্রের বিদ্যুতের আপেক্ষিক আধুনিকতার প্রয়োগ এবং উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে শ্রমশক্তির ক্রমমিক অপসারণ।

একদিকে শ্রমনিবিড় অপরদিকে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি এই দুই চেহারা ১৯৪৭-৫৪ সালের মধ্যে যেভাবে ছিল তা নীচের সারণিসমূহ থেকে বোঝা যায় :

শ্রমিকসংখ্যা নিয়োগ অনুযায়ী কলিয়ারির শ্রেণীভাগ

বছর	৫০-এর কম	৫০-১৫০	১৫১-৩০০	৩০১-৫০০	৫০১-১০০০	১০০০-এর উর্ধ্বে	মোট কয়লাখনি
১৯৪৭	২১২	২৬০	১৭৬	৯৭	৮০	৭৭	৯০২
১৯৪৮	২৫৪	২৪২	১৬৮	৮২	৭৪	৭৭	৮৯৭
১৯৪৯	২৭৪	২১৬	১৬৫	৯৪	৬৯	৯০	৯০৮
১৯৫০	২২৫	২১৫	১৭৩	১০৪	৭৭	৯৬	৮৯১
১৯৫১	২৫১	২০৭	১৫৭	১০৯	৭১	৯৮	৮৯৩
১৯৫২	২৩৩	২০১	১৫০	১০১	৭৬	৯৯	৮৬০
১৯৫৩	২৩৭	১৯৬	১৬০	৮৪	৯০	৯১	৮৫৮
১৯৫৪	২৩৩	২০১	১৫৩	৮৫	৮৮	৯২	৮৫২

নতুন ধরনের শ্রমিক, নতুন ধরনের কাঠামো গড়ে তোলা হল।

এটাই হল ইতিপূর্বে আলোচিত গোরখপুর লেবর ক্যাম্প বা সেন্ট্রাল রিক্রুটিং অর্গানাইজেশন। গোরখপুর অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের (তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশের) 'বাড়তি' শ্রমিক সমস্যার যাতে খানিকটা সমাধান হয় যতই তা সাময়িক হোক না কেন।

কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারেও বড় খনিই প্রাধান্য বিস্তার করত। বড় পুঁজির মালিকদের হাতেই পুঞ্জিভূত বৃহৎ শ্রমশক্তি সঞ্চিত হত। এই যুগ বড় যন্ত্রণার—দেশের ও শ্রমিকদের পক্ষে।

যন্ত্রশক্তির পুঞ্জিভবনের চিত্র পরের পাতায় সারণিসমূহে পাওয়া যাবে।

উৎপাদন অনুযায়ী কয়লাখনির শ্রেণীবিভাজন ১৯৪৭-৫৪

বৎসর	৫,০০০ টনের কম	৫০০১-১০,০০০	১০,০০১-২০,০০০	২০,০০১-৩০,০০০	৩০,০০১-৫০,০০০	৫০,০০১-১,০০,০০০	১,০০,০০১-২,০০,০০০	২,০০,০০১-৩,০০,০০০	৩,০০,০০০-এর উর্ধ্বে	মোট কলিয়ারি
১৯৪৭	৩২৬	১৫২	১৩১	৯৭	৬৮	৫৯	৪৭	১৮	৪	৯০২
১৯৪৮	৩৩৫	১২৯	১২৯	৯৮	৬৫	৭৫	৪৫	১৮	৩	৮৯৭
১৯৪৯	৩৩৭	১০৫	১৩৬	৯১	৮২	৭৭	৫৪	২০	৬	৯০৮
১৯৫০	২৯২	১১২	১৩৫	১০১	৮৫	৭৮	৬৩	১৬	৯	৮৯১
১৯৫১	৩০১	৮৮	১৪৫	১০৩	৭৯	৮০	৬৫	২৩	৯	৮৯৩
১৯৫২	২৬৭	৯৭	১৩০	৯২	৮০	৯০	৬৯	২৪	১১	৮৬০
১৯৫৩	২৬১	১০৪	১৩৩	৯১	৬৪	১০২	৬৫	৩০	৮	৮৫৮
১৯৫৪	২৬০	৯৪	১৩৩	৮৯	৮৩	৯৬	৫৯	২৯	৯	৮৫২

বৎসর	কয়লা কাটা মেশিন ও উৎপাদন: মেশিন সংখ্যা	কয়লা কাটা মেশিন ও উৎপাদন: ব্যবহারকারী খনির সংখ্যা	কয়লা কাটা মেশিন ও উৎপাদন: উৎপাদনের পরিমাণ	বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারকারী কলিয়ারির সংখ্যা: খনির সংখ্যা	বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারকারী কলিয়ারির সংখ্যা: মোট অশ্বশক্তি
১৯৪৭	৩০৬	৯৭	৩,৭৬১,০৮৭	১৮৩	১৩৭,৬০০
১৯৪৮	৩০৮	৯৪	৪,১৫৮,২০১	১৯২	১৪১.৮২৫
১৯৪৯	৩৫৯	১০৫	৭,৮৬৩,৪৮২	২০০	১৪৯,৭০৯
১৯৫০	৩৯৯	১২০	৬,০৭৮,৪৬৮	২২৪	১৭১,৯৭৯
১৯৫১	৪২৪	১২৮	৬,৫১৪,৯৬৪	২৫৫	১৮৭,৯৭০
১৯৫২	৪৬০	১৪৮	৬,৯৭২,৯৪৩	২৬০	১৯৫,৬২৬
১৯৫৩	৪৮৫	১৫১	৭,৯৭৩,৮১১	২৯৩	২০৭,৪৭৩
১৯৫৪	৪৯৫	১৪৯	৮,১৮৩,৩০৬	৩৪৯	২২২,০০৬

বৎসর	মেকানিকাল লোডার: সর্বোচ্চ সক্রিয়	মেকানিকাল লোডার: সর্বোচ্চ বোঝাই ('০০০ টন)	মেকানিকাল কনভেয়র: সর্বাধিক দৈর্ঘ্য (ফিট)	মেকানিকাল কনভেয়র: মোট পরিবহণ ('০০০ টন)
১৯৫১	৮	১৯৩,০০০	১৪,৮৭৯	৭২০,০০০
১৯৫২	৮	১৯৬,০০০	২১,৯৯০	৮৮৫,০০০
১৯৫৩	৬	৭২,০০০	২৪,৬৫০	৯৬৯,০০০
১৯৫৪	৫	৯৩,০০০	৩৩,৭৫৩	১১৬৯,০০০

মেকানিকাল ভেন্টিলেটর			সেফটি ল্যাম্পের ব্যবহার	
বৎসর	কটি কলিয়ারিতে স্থাপিত হচ্ছে	কটি কলিয়ারিতে স্থাপিত হয়েছে	বৎসর	ব্যবহারকারীর সংখ্যা
১৯৪৭	—	১৬৯	১৯৪৭	৪৬,৯১১
১৯৪৮	—	১৬৭	১৯৪৮	৪৬,৩১৭
১৯৪৯	—	১৮০	১৯৪৯	৪৫,৬৫৯
১৯৫০	—	১৮৪	১৯৫০	৪৫,০০৫
১৯৫১	১৩১	২০০	১৯৫১	৪৪,৭৪৫
১৯৫২	১৩২	২০৩	১৯৫২	৪৫,৮০৭
১৯৫৩	১৪১	২০৭	১৯৫৩	৪৩,৪৭৬
১৯৫৪	১৪৩	২২৩	১৯৫৪	৪৪,৩৯৮

সেফটি ব্যবস্থাও যেমন যেমন দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত হতে থাকে তেমন তেমন কলিয়ারিতে কিছুটা লেখাপড়া জানা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জমায়েত কয়লাখনি অঞ্চলে হতে থাকে। বহুজাতিক বহুভাষাভাষী শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশের অভিন্ন ধারাতেই কয়লাখনি শিল্পে ও শ্রমিক শ্রেণী স্বল্প-বিকশিত জনজাতি পশ্চাৎপদ জাত, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে নিয়ে স্বয়ংগঠিত হয়ে ওঠে। আজ আর কয়লাখনিতে শ্রমিকের অভাব নেই, আছে কোল ইন্ডিয়া। ভারত সরকারের পরিভাষায় উদ্বৃত্ত। নারীশ্রমিকরা সর্বপ্রথম উদ্বৃত্ত হয়েছে, হচ্ছে। তার জন্যও অবশ্যই মেশিনিকরণ দায়ী।

অপরদিকে, মেশিনিকরণ যেভাবে হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তা কার্যত আত্মঘাতী। এইসব যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা বড় সংখ্যাই কাজে লাগে না। কোটি কোটি টাকার আমদানি করা যন্ত্রপাতি জং-মরচে ধরে নষ্ট হচ্ছে। ফলে, শিল্পের লোকসান বাড়ছে। শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়িয়ে মেশিনের বকেয়া উৎপাদন লাভের চেষ্টা হচ্ছে।

ফলে, কয়লাখনি শিল্পের স্বাভাবিক প্রসার হতে পারছে না। অথচ, স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পের আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত শ্রমিকসংখ্যা ও তাদের পরিবার-পরিজন সব নিয়ে কয়লাখনি অঞ্চলের সমস্যা বাড়ছে। পরিণতিস্বরূপ, শিল্পাঞ্চলে মাফিয়া-চক্র গড়ে উঠছে। কয়লা নিয়ে যে কালা কারবার প্রাক্-রাষ্ট্রীয়করণ পর্বে মালিকরা করত সেটাই আজ মাফিয়ারা করছে। এই মাফিয়া-অপারেটররা খনি অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক তথ্য, ভৌগোলিক বিবরণ, ভূগর্ভের ম্যাপ খুবই ভাল জানে। তাই নয়, এই মাফিয়ারা কয়লাখনি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে: (১) মজুরির অধিকার, (২) কর্মস্থলে নিরাপত্তা, (৩) কাজের স্থায়িত্ব, (৪) শিক্ষা স্বাস্থ্য ছুটি প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা, (৫) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা মৃত্যুতে কোনও চিকিৎসা বা ক্ষতিপূরণ অস্বীকৃত, এমনকি, পরিচয় লোপাট, (৬) থানা এদের বিরুদ্ধে কোনও এফ আই আর নেয় না, (৭) আইন মেনে খনন না হওয়ার দরুন কয়লায় আগুন লাগে, ধস হয়, জলপ্লাবন হয় খনিগর্ভে, (৮) জমি 'ইঁদুরের গর্তে' পরিণত হয়ে জমির ব্যবহারিকতা কমে যায়, গুণগতভাবে বদলে যায়, বসবাসের অযোগ্য অ-নিরাপদ হয়, (৯) এর ফলে কোনও পার্শ্বশিল্প গড়ে ওঠে না, এলাকার উন্নয়ন তো হয়ই না, অবনয়নই ঘটে। প্রাক্তন খনিমালিকরা, রাষ্ট্রায়ত্ত খনি কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় সরকারের কয়লা দফতর, শ্রম-মন্ত্রকের অধীনস্থ খনি-নিরাপত্তা দফতর কয়লাখনি শিল্পের ক্ষতিই সাধন করে চলেছে।

কয়লাখনি শ্রমিকরা জীবনের মূল্যবোধ হারাচ্ছে। গত এক শতকে কয়লাখনিতে একের পর এক নিহত হয়েছে শত শত শ্রমিক। একটি উদাহরণই যথেষ্ট:

"১৯৮৩ সালে কয়লাখনিতে দুর্ঘটনায় ১৭৯ শ্রমিক মারা গেছেন।" তার মধ্যে ইস্টার্ন কোলফিল্ডে ২৭ জন; ভারত কোকিং কোল-১৫২, সি সি এল-এ ২৪, ডবলু সি এল-এ ৫৩, নর্থ-ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এ ২ এবং সিঙ্গারেনীতে ২১ জন।[২৩]

শতবর্ষের মর্মান্তিক ঘাতক দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে সাম্প্রতিকতম হল (১) নিউকেন্দ্র-ই সি এল (২৫ জানুয়ারি ১৯৯৪) মৃত ৫৫; (২) গজলিটাঁড়—বি সি সি এল (সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, মৃত ৮০)। ১৯৯৪ সালে সারা ভারতে কয়লাখনিতে দুর্ঘটনায় ২৩৬ জন শ্রমিক নিহত হন, ৭১১ জন শ্রমিক গুরুতর আহত হন। কয়েকবছর আগে রানিগঞ্জে মহাবীর কলিয়ারিতে জলপ্লাবনজনিত দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হন। এই দুর্ঘটনার তদন্তে অপরাধী সাব্যস্ত অফিসাররা পরবর্তীকালে পদোন্নতি লাভ করেন। এই সিদ্ধান্ত দেখিয়ে দেয় ভারতের খনি কর্তৃপক্ষ কত নির্মম, অমানবিক।

ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস : ১৯৯৫
ঘাতক দুর্ঘটনা ❑ জানুয়ারী—নভেম্বর

২১ জানুয়ারি ১৯৯৫, পরাসিয়া কলিয়ারি (কুনুসতোড়িয়া এরিয়া) একটি ঘাতক দুর্ঘটনায় একজন লোডার নিহত হন। ব্লাস্টিং-এর ফলে একখণ্ড কয়লা ছিটকে গিয়ে তাকে আহত করে। ব্লাস্টিং হয়েছিল ডি-পিলারিং সেকশনে। আশ্রয় নিতে যখন লোডার অগ্রসর হচ্ছিলেন তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, খুদিয়া কলিয়ারি*, ম্যামা এরিয়া। ৩১ নং ওয়েস্ট লেভেলের ১৯ রাইজে কয়লা বোঝাই করার সময় ২ জন লোডার আঘাত পান। রুফ ফলের দরুন তাঁরা আঘাত পান। দুর্ঘটনা ঘটে বি পি ইনক্লাইনের ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্টে। আহতদের মধ্যে একজন মারা যান। অপরজনের আঘাত সামান্য ছিল।

৮ এপ্রিল ১৯৯৫, জামবাদ কলিয়ারি, কাজোরা এরিয়া। ২৩ WL ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট, ২৩ ওয়েস্ট লেভেল, ১৯ ডিপ-এর জংশনে রুফ-ফলের দরুন আহত হয়ে জনৈক M/S. (কাজ করছিলেন S/F রূপে) নিহত হন। ব্লাস্টিং-এর পরে (৩টি হোল ব্লাস্টিং করেন পার্শ্ববর্তী পিলারে) যখন তিনি রুফ পরীক্ষা করছিলেন, সে সময় রুফ-ফল হয়। তিনি আহত হয়ে মারা যান।

৭ জুন নূতনডাঙা কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় জনৈক টিম্বার মিস্ত্রি (খুটা মিস্ত্রি) দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২৪ নং ডিপ ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্টে ১৯ লেভেলের ২৬ রাইজে রুফ স্টিচিং-এর জন্য হল ড্রিলিং করছিলেন। হঠাৎ ছাদ ভেঙে (caved in) পড়ায় তিনি আহত হন। পরে মারা যান।

৯ জুন ১৯৯৫, সংগ্রামগড় কলিয়ারি, সালানপুর এরিয়া। জনৈক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়ে মারা যান। ৭ম রাইজ ও ১৯ ইস্ট লেভেল জংশনে, ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্টে সঙ্গীদের সঙ্গে তিনিও কয়লা বোঝাই করছিলেন। সহসা ছাদের খানিকটা ধসে পড়ে। চার জন লোডার গুরুতর আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চারজনের মধ্যে একজন মারা যান। বাকি তিনজন চিকিৎসাধীন।

১২ জুন ১৯৯৫, মাধাইপুর কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া। রাত্রি ৮-১৫ মিঃ। সেকেন্ড শিফট। শ্রীনারায়ণ কোঁইরি (M/S. cum S/F) কয়লার চাঙড়ের আঘাতে আহত হয়ে মারা যান। পিলারের কোণ থেকে ছিটকে এসে এক চাঙড় কয়লা তার বাম জঙ্ঘায় আঘাত করে। তখন তিনি দ্বিতীয় দফায় ব্লাস্টিং-এর জন্য ফেসের দিকে যাচ্ছিলেন। চটপট তাঁকে পঙ্কনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় (পাণ্ডবেশ্বরে)। সেখানে তিনি ওই দিনই রাত ১১.১০ মিনিটে মারা যান।

২৪ জুন ১৯৯৫, বেজডি কলিয়ারি, সীতারামপুর এরিয়া। জুগন মাহাতো, আন্ডার গ্রাউন্ড লোডার, কাজ করতে করতে আহত হন। ট্র্যামিং লেভেলে তাঁর আঘাত লাগে। ট্র্যামাররা ৭টি বোঝাই টবের একটি রেক নামাচ্ছিলেন। দুধারে টবের মাঝে তিনি আটকে যান। এভাবেই মারা যান। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। (সাক্ষী না থাকার কথা সম্ভবত সত্য নয়। কয়েকজন ট্র্যামার বা টালোয়ান মিলেই তো কাজটা করছিল!) তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পাওয়া মাত্র সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ২৬ জুন ১৯৯৫ মারা যান।

৮ জুন ১৯৯৫, চকবল্লভপুর কলিয়ারি, সালানপুর এরিয়া। এক টিম্বারমিস্ত্রি দু-জন জোগানদার (হেলপার) নিয়ে—একটি ক্রশ-বার ঠিক করে লাগাচ্ছিলেন (re-setting)। একটা [illegible] হওয়া (tilted) সফরি ক্ল্যাম্প ব্যবহার করছিলেন। একজন মাইনিং সর্দার তত্ত্বাবধান করছিলেন। একটা পাতলা ক[illegible]র স্তর (০.৭৫ মিঃ x ০.৬ x ৩.৭ সে. মি.) [illegible] যে সময় ছিটকে পড়ে যে সময়ই ফুলচাঁদা জয়সোয়ারে [illegible]ড়াতাড়ি একটা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য [illegible] করছিল। টিম্বার হেলপার জয়সোয়ারে পড়ে যান ও আহত হন। দাঁতে ও ডান পায়ে তাঁর আঘাত লাগে। আঘাত সামান্য হলেও ফুলচাঁদ পুরাতন COPA রোগী ও পেপটিক আলসার (সদ্য অপারেশন হয়েছে) রোগী ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে কালনা হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে ৮ জুন '৯৫ তিনি মারা যান।

১৬ জুন ১৯৯৫, কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার কুনুসতোরিয়া কলিয়ারি। গ্যারেজে পে-লোডার 'O' রিং মেরামতির পর রাখা ছিল। চেক করা হচ্ছিল। ফিটার হেলপার জিতেন হেমব্রম কাছেই দাঁড়িয়েছিল। পে লোডার তাকে ধাক্কা দেয়। সে আহত হয়। কোমরের কাছে হাড়ে (pelvis) আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ তাকে বাঁশরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কালনা হাসপাতালে। ৩ জুলাই ১৯৯৫ তিনি মারা যান।

২৮ জুলাই ১৯৯৫, জামুরিয়া কলিয়ারি, শ্রীপুর এরিয়া। ৬ নং প্যানেলের ৬ নং লেভেলে ২৩ $\frac{১}{২}$ রাইজ (সি প্লট) ৩ জন শ্রমিক হোল ড্রিল করছিলেন। যে সময় এক টুকরো পাথর (২.৪ মি. x ১.৫ মি. x ০.১০ সে. মি.-০.০২ মি.) ২.১৩ মিটার উচ্চতা (ছাদ থেকে) থেকে পড়ে। ৩ জনেই তাতে আহত হন। ১ জন মারা যান। ১ জন গুরুতর আহত ও ১ জন সামান্য আহত হন।

২ অগাস্ট ১৯৯৫, হরিয়াজাম কলিয়ারি, মগমা এরিয়া। ৪ জন মিলে ঝুড়িতে কয়লা ভরছিল। এমন সময় সহসা চেরাই পিলার থেকে ৫.৫ মি x ১.৫ মি. x ০.৬ মি আয়তনের এক খণ্ড পাথর পড়ে যায়। সকলেই আহত হন। তৎক্ষণাৎ তাদের সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেতে যেতে গঙ্গা নায়ক মারা যান। বাকিদের মধ্যে ১ জনের আঘাত গুরুতর হয়। বাকি ২ জনের আঘাত সামান্য হয়।

৪ আগস্ট ১৯৯৫, ডালুরবাঁধ কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া। একটি ডিপ গ্যালারিতে ৩ জন ড্রিলার ফ্লোরে ড্রিল করছিলেন। একটি ডেভেলপমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট-এর হলেজ লাইন-এর সঙ্গে সরাসরি লাইনে ছিল। কারণ, একই হলেজ প্লেনের রাইজে যে স্টপ ব্লক ছিল তা কাজ করছিল না। সাতটা বোঝাই টবে ৫০ মিটার দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভার্টিক্যাল বাফারটি ভেঙে দেয়। পরিণতিতে সব টাবই গড়িয়ে গড়িয়ে ফেসে গিয়ে পৌঁছয়। রঘু দাস, কোল কাটিং মেশিন হেলপার, ফলে আহত হন ও ২ ঘন্টা পরে হাসপাতালে মারা যান।

১৩ অগাস্ট ১৯৯৫, মাউথদি ইউনিট, সোদপুর কলিয়ারি। ৪৮ রাইজে ৩৫½ লেভেলে টিম্বার মজদুর বটরাম রজক একটা ফগ বসাচ্ছিলেন। ৯ ফুট উঁচু থেকে (২′ x ৩′ x ৩′) ছাদের এক খণ্ড পাথর পড়ে। রজক পিঠে আঘাত পান। রজক ফ্লোরে পড়ে যান। তার কোমরের নীচে মেরুদণ্ডের দু-পাশের হাড় চোট খায়। তৎক্ষণাৎ সাঁকতোড়িয়া হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেলে তাকে কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সেখানে রজক মারা যান।

১৪ অক্টোবর ১৯৯৫, ধেমো মেন কলিয়ারি, সীতারামপুর এরিয়া। ৪ নং লেভেল ফেস। ১১ নং ডিপ। জনৈক শট ফায়ারার একটা শট বিস্ফোরিত করে। এই ফেসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসা ফেস নং ১১ রাইজ (৫ লেভেল) ব্যবধান মাত্র ৪.৫ মিটার দাঁড়িয়েছিল। এখানে কয়েকজন লোডার কাজ করছিল। বিপরীত দিকে যে ব্লাস্টিং হয় তার ফলে ছিটকে আসা টুকরোটায় অশোক বাউড়ি আঘাত পান ও তাতে মারা যান। সর্বশ্রী শৈব মুধু, মোনোলা কিস্কু গুরুতর আঘাত পান। সর্বশ্রী শিবু বাউরি, সুবলচন্দ্র লোহার, স্বপন বাউরি ও রসিক মারান্ডি উল্লেখযোগ্য ("রিপোর্টেব্‌ল্") আঘাত পান।

১৪ অক্টোবর ১৯৯৫, খোট্টাডি কলিয়ারি, খোট্টাডি এরিয়া। বেল্ট কনভেয়রের টেল (tail) ড্রামের প্ল্যাটফর্মের নীচে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তারা লক্ষ করেন যে প্ল্যাটফর্ম থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। চটজলদি তারা কন্ট্রোল রুমে ছুটে যায়। কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট (CHP) অপারেটরকে তারা অবিলম্বে কনভেয়ার বন্ধ করতে বলে। বন্ধ হওয়ার পর তারা দেখে যে ঠিকাদার শ্রমিক সেখ আব্বাসের দেহটা টেল ড্রামের নীচে রয়েছে।

১৯ অক্টোবর ১৯৯৫, নিউকেন্দা কলিয়ারি, কেন্দা এরিয়া। কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের ১১ নং কনভেয়রে ৫ জন টিন্ডাল কাজ করছিল। বেলা ২.৩০ নাগাদ তারা তাদের কাজ শেষ করে। তারপর তারা একটু বিশ্রাম করছিল। এদের মধ্যে একজন কাউকে কিছু না বলে উঠে যায়। তারপর তার আহত দেহটির সন্ধান পাওয়া যায় ১২ নং কনভেয়রের নীচে (কনভেয়র স্ট্রাকচার)। এই জায়গায় কোনও কাজই হচ্ছিল না। পরিত্যক্ত সার্কিট। *(এই বিবরণটি খুবই সন্দেহজনক। —সু. ব. রায়)*

পর্ব চার

॥ ১ ॥

বিগত শতকের মধ্যে কয়লাখনি শিল্পে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে যান্ত্রিকীকরণ ও উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। রানিগঞ্জের কোলফিল্ডে ১২০টি কলিয়ারি আছে। ১৫৩০ বর্গ কি.মি. খনি অঞ্চলে (উত্তর-দক্ষিণে ৩৫ কি.মি. x ১৭৫ কি.মি. পূর্বে-পশ্চিমে) ২০টি খনি ওপোনকাস্ট (OCP)। ২৬টা সীমের অস্তিত্ব জ্ঞাত। ১.২ মিটার থেকে ৩০ মি. খাড়াই। ২৭০০ মিলিয়ন টন কয়লার ভাণ্ডার আছে। এটা সারা দেশের ২৪%। ১৯৮১-র আদমশুমারি অনুযায়ী কয়লা আছে এমন জমিতে বসবাসকারীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ (৫০% শহরে)। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জনসংখ্যা বেড়ে ৩০ লক্ষ হবে আশা করা যায়। রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের প্রায় ৮৭,০০০ লোক (কলিয়ারির শ্রমিক-কর্মচারী বাদে) কয়লা খননের ফলে প্রভাবিত হবে।

অতীতের খননের দোষে ২৭টি জায়গা (সার্ফেস) বিপন্ন। বরাকর, রানীগঞ্জ এমনকি আসানসোল শহরও বিপন্ন। ফলে, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধসের বিপদ রয়েছে। ধসের কবলে প্রায় ৫৭,০০০ লোক রয়েছে। কেভিং ও ওপোনকাস্ট পদ্ধতির দরুন বছরে ১০০ একর জমি নষ্ট হচ্ছে। ২০০০ সাল নাগাদ তা ৫০০ একরে দাঁড়াবে। এই প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের প্রতি বর্গ কিলোমিটার জনবসতি ১৩২৮.৪২ যখন পশ্চিমবাংলায় তা ৬১৪, ভারতে ২২০ (১৯৮১ আদমশুমারি)।[১]

ড. ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বলেছেন যে "দামোদর নদীর পাশে বরাকর, কুলটি, অণ্ডাল ও দুর্গাপুর", দুর্গাপুর নতুন শিল্পাঞ্চল। বরাকর কুলটি অণ্ডাল নিয়ে গড়ে উঠেছে দুইশত বছরের পুরাতন কয়লাখনি অঞ্চল। ড. সেনশর্মার আসানসোল সম্পর্কে অবজার্ভেশন হচ্ছে "এখানের বাতাসে ভাসমান কনা ২৬০ মাইক্রোগ্রাম (প্রতি ঘন মিটার) যেখানে আন্তর্জাতিক মাত্রা (US level) থাকা উচিত ৭৫ মাইক্রোগ্রাম (প্রতি ঘন মিটারে)। কলকাতায় এর মান ৫২৫ মাইক্রোগ্রাম (প্রতি ঘন মিটারে), দুর্গাপুর-আসানসোল সন্নিহিত এলাকার এই ভাসমান কণার পরিমাণ 260 Mg।"[২]

"ভাসমান Organic matter (জৈব পদার্থ) থেকে মূলত Carcinogenic ও অন্যান্য ব্যাধিগুলি ঘটে থাকে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বাতাসে এর পরিমাণ হচ্ছে শতকরা চল্লিশ ভাগ।"

"Toxic element-এর ভিতরে যেগুলি আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বাতাসে পাওয়া গেছে তারা হল—Chromium, Nickel, Manganese এবং Aluminium, Silicon, Chloride, Carbon ইত্যাদি"

পরিদূষণ সর্বাধিক দুর্গাপুরে, তারপরে আসানসোল রানিগঞ্জে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধি দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে

বছরে ৬.৫% হারে বেড়ে যাচ্ছে। বায়ু দূষণ এর মধ্যে ২.৫% এর জন্য দায়ী। তা ছাড়া, সিলিকোসিসের আশংকা ব্যাপক।

তা ছাড়া, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড আসানসোলে ২৩০ ও কলকাতায় ৩৬০।*

ধুলাজনিত ব্যাধি রাণীগঞ্জ খনি অঞ্চলে ব্যাপক। জলদূষণ থেকে ডায়রিয়া রোগের ব্যাপকতা প্রায়ই দেখা যায়। অবশ্য, এটা কমানো যায়। নীচের সারণি লক্ষণীয়:

ডায়ারিয়া

বছর	আক্রান্ত ব্যক্তি	মৃত্যু	ডিসইনফেকশন	ইনঅকুলেশন
১৯৪৮	১৫,৭৫৪	৬৮	—	—
১৯৪৯	২৮,৭৫৪	৮৬	—	—
১৯৬৩	৬০,০০২	৩৯	—	—
১৯৬৫	৮০,৩৬৭	১৫	—	—
১৯৮২	৯৯২	১৬	—	—
১৯৮৩	৫৭৫	০	—	৬১,৩৮৯
১৯৮৪	১,৮৬২	৫৩	৩,৬৯৬	১২,৩৩৬
১৯৮৫	২৫৪	২৪	২২,৫৬৫	১৯,২৫৯
১৯৮৬	১৩১	৩৮	১৪,২০৫	১৬,৬৩৮
১৯৮৭	২২৭	১৭	১৬,৬৬৮	—

॥ ২ ॥

শব্দ, বায়ু, জল ও ধূলি—তিনটি দূষণই রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। সারা দুনিয়ায় ৭ লক্ষ শ্রমিক ধূলি-সংক্রান্ত ফুসফুসের ব্যাধিতে ভোগেন। এই ধরনের ব্যাধি হল অ্যাসবেসটাসিস, রাইসিডিনোসিস, সিলিকোসিস বা কয়লাখনি শ্রমিকদের নিউমোকনিওসিস। এগুলি সবই দুরারোগ্য ব্যাধি, কিন্তু, রোগ নির্ণয়ই সঠিক হয় না। চিকিৎসা আর কী হবে? আসানসোল-ধানবাদ অঞ্চলে গত দশ বছর যাবত অ্যান্টিবায়োটিকের উপর রয়েছে এমন কয়লাখনি শ্রমিক আছেন। অথচ, খনিশ্রমিকদের কল্যাণ তহবিলসমূহের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ (১৯৮৭ সালে) ২০.১৬ কোটি টাকা। ৫ টাকা আছে চিকিৎসা নেই!

এই সমস্যাগুলি খনন পদ্ধতির জন্যও তীব্র হচ্ছে। আন্ডার গ্রাউন্ড খনি থেকে কয়লা তোলার পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা বালি দিয়ে ভরাট না করলে কেভিং হবে এবং সার্ফেসটা ধসে পড়বে। সার্ফেসে অবস্থিত স্থাবর-অস্থাবর, জীবজন্তু, ক্ষেত-খামার, মানুষজন ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, গ্যাস আগুন জল থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলি কম নয়। কিন্তু, কর্তৃপক্ষ তা সমাধানের জন্য সচেষ্ট বা উদ্যমী নয়।

ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এ সব যে জটিল সমস্যা নাগরিক জীবনে সৃষ্টি করছে তা অবশ্যই নজরে রাখতে হবে।

আসানসোল-রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে এখন আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং-এর পরিবর্তে জোর দেওয়া হচ্ছে ওপেনকাস্ট পদ্ধতির উপর। এই পদ্ধতিতে ধস হয় না ঠিক, তবে জমির সর্বনাশ ও তার সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্ধার-অযোগ্যভাবে পর্যাবরণ ধ্বংস হয়ে যায় এ কথা অনস্বীকার্য। ওপেনকাস্ট মাইন যেহেতু অনাবৃত সেহেতু ধূলি, শব্দদূষণ এখানে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। উপরিতলে ভারী যন্ত্রপাতির দ্রুত চলাচল হয়। তার জন্য উপযুক্ত নির্দিষ্ট পথ থাকা প্রয়োজন। তা না থাকার দরুন জমি নষ্ট হয়, ফলে অনেক সময় যন্ত্রপাতিও জমিতে আটকে যায়। উৎপাদন মার খায়। ওপেনকাস্ট খনিতে যত না কয়লা তোলা হয় তার থেকে বেশি তোলা হয় ওভারবার্ডেন অর্থাৎ কয়লার স্তরকে ঢেকে থাকে যে মাটি বালি পাথর ইত্যাদির মিশ্রিত স্তর। ওভার বার্ডেন জমা হয় ওপেনকাস্টের পাশেই। অর্থাৎ ওভার বার্ডেন যে জমির উপর পুঞ্জিভূত হয় তার একাংশের পার্শ্বদেশ থাকে শূন্য। এই শূন্যতা ক্রমবর্ধমান। তাই, যে দিকের মাটি উপরের চাপে ভারাক্রান্ত ও শিথিল তার উপর আকর্ষক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, জমিতে ফাটল ধরে। এরূপ জমি খনির হিসাবের বাইরে হলেও খনির জন্যই তা ব্যবহার অযোগ্য হয়। খনি অঞ্চলের জনবসতি এর দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। পর্যাবরণ মানুষের বিরোধী হয়ে ওঠে। যে সব খাদ কয়লা তোলার পরে পরিত্যক্ত হয়েছে (রানীগঞ্জ কোলফিল্ডে) তার সংখ্যা ২২৩। মাটি কাটা হয়েছে ৪৯০ হেক্টেয়ার ভূখণ্ডে, ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার আয়তন ৯ কোটি ৮০ লক্ষ মিটার। সি এম পি ডি আই-এর মধ্যে ১৫৬টির জন্য পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিল, কিন্তু তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের পূর্বাংশে রাণীগঞ্জ মেজার (Measure)। এই অঞ্চলে ৪৩.৪ বর্গ কিলোমিটার থেকে ৮৬ কোটি ৯০ লক্ষ টন কয়লা পাওয়া যাবে। পশ্চিমাংশে বরাকর মেজার। এখানে ৪৪.৯০ বর্গ কিলোমিটার থেকে ১২৫ কোটি ৩০ টন কয়লা পাওয়া যাবে। মোট ৮৮.৩০ বর্গ কিলোমিটার থেকে ২১২ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ১১০ বর্গকিলোমিটার জমি দরকার হবে ওভার বার্ডেন রাখার জন্য। অর্থাৎ, এই জমি বেকার হয়ে যাবে।

ক। আগামী ২০০০ সাল অবধি কলিয়ারির জন্য জমি চাই:

নতুন ইউ জি প্রজেক্টের জন্য	৮০০০ হেক্টেয়ার
নতুন ও সি পি-র জন্য	৮০০০ হেক্টেয়ার
নগরায়ন ও পরিকাঠামো বাবদ	৩০০০ হেক্টেয়ার
মোট	১৯০০০ হেক্টেয়ার

খ। আগামী ২০০০ সাল অবধি যে জমি নষ্ট হবে:

ও সি পি বাবদ	৮০০০ হেক্টেয়ার
ধসের জন্য	৫৫৮২ হেক্টেয়ার
মোট	১৩৫৮২ হেক্টেয়ার

ইতিমধ্যে যে জমি দখল করা হয়েছে:

১৯৮৮ সেপ্টেম্বর অবধি ২১০০ হেক্টেয়ার

১৯৯৪-৯৫ অবধি চাহিদা ছিল ২৮৮ হেক্টেয়ার [অতিরিক্ত (বন)]

বন-ব্যতিরেকে অন্যান্য বাবদ	৮৮১৫ হেক্টেয়ার
মোট	১১২০৩ হেকটেয়ার
বা	১১২ বর্গ কিলোমিটার

এর মধ্যে, বর্ধমান জেলায় ই সি এলের চাই ১০ এরিয়ায় ৪৪ খনিতে ৯১ মৌজায় ৫৬২৩.৪৮ হেক্টেয়ার।"

॥ ৩ ॥

রানীগঞ্জ কোলফিল্ডের আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে অতীতে যে ওপেনকাস্ট কলিয়ারি ছিল, এবং বর্তমানে আছে, তাদের যৌথ অবদানের চেহারাটা কী তার একটা বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছে "রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পরবর্তী যুগে কয়লা খননের এক বৈশিষ্ট্য হল ও সি / ও সি পি-র উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। একদা যা ছিল সামান্য 'খাদান' (স্থানীয় নাম) বা ছোট "কোয়ারি" যেখানে আদিম যন্ত্রপাতি দিয়ে কয়লা তোলা হত, কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিশিষ্ট রূপান্তর দেখা দিল। ডোজার, শোভেল, পে-লোডার ইত্যাদির ন্যায় সূক্ষ্ম ব্যবস্থাদি-সমন্বিত (সফিসটিকেটেড) যন্ত্রপাতি প্রবর্তিত হল। আজকের কয়লা খনন শিল্পে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাক্তন মালিকেরা একখণ্ড ছোট জমির প্লট কিনে অদক্ষ শ্রমিকের সাহায্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা তোলার কাজ শুরু করে দিতেন। যন্ত্রের ব্যবহার ও পুঁজির লগ্নি উভয়ই বেশ কমই ছিল। ১৯৭৩-এ (*১৯৭১-৭৩ সালে দুই পর্যায়ে রাষ্ট্রীয়করণ সম্পন্ন হয়—সু. ব. রায়*) রাষ্ট্রীয়করণের ফলে এই ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রয়োগবিধি-সম্পর্কিত জ্ঞান (টেকনিকাল নো-হাউ) ও লগ্নির পরিমাণে সাগর-প্রমাণ পরিবর্তন এল। শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির স্থান নিল পুঁজিনিবিড় পদ্ধতি, ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। বস্তুত ও সি / ও সি পি পিট-মাইনের শ্রেষ্ঠত্ব চ্যালেঞ্জ করে বসল মাথাপিছু শিফট-পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে। ও সি / ও সি পি-র খাতির বেশি হল কারণ আন্ডারগ্রাউন্ড খনির তুলনায় এতে উৎপাদনের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন কম এবং দুর্ঘটনাও কম হয়। (*এই মূল্যায়ন সঠিক নয়। দুর্ঘটনা বৃদ্ধির প্রতি ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব মাইনস সেফটি, ধানবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে—সু. ব. রায়*)। বিদ্যুৎ ছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ড খনিতে উৎপাদনই-সম্ভব নয়। পিট-মাইনে দুর্ঘটনার ঘটনাও বেশি। আবার, খননের পরে (কয়লা নিয়ে নেওয়ার পরে) ও সি পি-র বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব যেমন বনসৃজন, যদি কৃষির জন্য নাও হয়। **নিঃসন্দেহে আন্ডারগ্রাউন্ড খনির তুলনায় ও সি / ও সি পি সরাসরি জমির ক্ষতিসাধন করে** (মোটা হরফ লেখকের) কিন্তু এখানে অন্তত কিছু জমি পুনরুদ্ধার ও ব্যবহৃত হতে পারে। অথচ, আন্ডারগ্রাউন্ড খনি জমির উপরিস্তর (টপ সয়েল)-এর ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু আজকাল যে নতুন সমস্যার সম্মুখীন ও সি পি তা হল জমির সমস্যা। আজকের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জমি কেনা বা দখল করা খুবই সমস্যাসংকুল। বস্তুত, অনেক প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্প জমির মালিকদের প্রবল বাধার ফলে ছেড়ে দিতে হয়েছে।" সোনপুর বাজারি প্রজেক্ট, বাঁশরা প্রকল্প জমির সমস্যায় কার্যকরী হতে পারছে না। এটা অবশ্য ৯০ দশকের চিত্র নয়। এ ডি ডি এ বলেছে যে ফলে বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যের টাকা খরচ হতে পারছে না। ওঁরা হয়তো চারী কমিটির রিপোর্ট উপেক্ষা করেছেন। ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে স্থানীয় বাস্তবতা, সম্ভব-অসম্ভব, পরিবেশ ও পরিকাঠামো, মাটির গুণাগুণ, যন্ত্রের উপযোগিতা বিবেচিত হয়নি। আজও হচ্ছে তা নয়। বিশ্বব্যাঙ্ক সম্পর্কে এত ঔদার্য প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণে সহায়ক নয়। পুনর্বাসনের, বিকল্প জীবিকার, চাকুরির ও সামাজিক অবস্থান বজায় রাখার, পরিবহণের প্রশ্নগুলি বিশ্বব্যাঙ্কও উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই, তারাও একটি দলিল রচনা করে ভারত সরকারকে দিয়েছে যা এখনও ক্যাবিনেটের বাইরে আসেনি, অন্তত প্রয়োগ হয়নি। তবে বিশ্বব্যাঙ্ক সিংগ্রৌলি প্রভৃতি প্রকল্পে পুনর্বাসনের কাজ নিজেদের তত্ত্বাবধানে করছে যা প্রধানত সংশ্লিষ্ট মানবসমাজের ঐতিহ্যপরম্পরা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সংগঠিতপূর্ণ নয়।

"এই অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদকতা বেশি নয়। বর্ষার উপরই তা একান্ত নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও কৃষি এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রধান বৃত্তি। তাই খনি যদি বিশাল ভূখণ্ড গ্রাস করে তাহলে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।"

এখানে এ ডি ডি এ একটি বাস্তব অবস্থান গ্রহণ করেছে। এবং এই অবস্থান থেকে আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের ও সি / ও সি পি-র সমীক্ষা করেছে। প্রসঙ্গত সোনপুর-রাজারি ওপেনকাস্ট প্রকল্প বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে ৩০০০ বিঘা জমি এর খনন কাজের জন্য দরকার। কুমারখানার মতো বড় প্রকল্প এর অন্তর্গত। পুরোপুরি চালু হলে ৪টি গ্রাম উচ্ছেদ হবে। ইতিমধ্যে, সম্প্রতি রুইদাসপাড়া প্রভৃতি গরিব তফসিলি মানুষের গ্রামের উপর উচ্ছেদের নোটিশ জারি হয়েছে। আবার, আসানসোল কালিপাহাড়ির কাছে, জি টি রোডের পাশে 'গোবিন্দনগরী' তৈরির এক বোর্ড বসানো হয়েছে

সোনপুর-বাজারির উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য। বাঁসরা প্রকল্পের জন্য মঙ্গলপুর মৌজার ৮০০ মানুষ বিপন্ন হচ্ছে। এ ডি ডি এ-র আরও মন্তব্য যে এত পুঁজি লগ্নি ও ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার সত্ত্বেও সোনপুর-বাজারি কমপ্লেক্সে একটি প্রাইভেট কোম্পানি—অটওয়াল অ্যান্ড কোং—একটি ও সি পি চালাচ্ছে। এর কারণ বাইরের লোকেরা জানে না।[৮]

ও সি পিগুলি সালানপুর (৭) ও পাণ্ডবেশ্বর (৮) এরিয়ার অন্তর্গত।

পর্ব পাঁচ

॥ ১ ॥

কয়লাখনি শ্রমিকদের কয়েকটি সংগ্রামের বিষয়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আসানসোল মাইনস বোর্ড অফ হেলথের বার্ষিক বিবরণী থেকে তথ্য ও পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

১৩-১৫ নভেম্বর ১৯৭০। রানীগঞ্জের খনি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় তারিখ। এই সময়ে রামমিলন কোঁহার নগরে (কৃষ্ণনগর কলিয়ারি) কলিয়ারি মজদুর সভা (সি আই টি ইউ) বিশেষ সম্মেলন হয়। বর্তমান ভারতের কলিয়ারি মজদুর সভা (সি আই টি ইউ) এই সম্মেলনেরই পরিণতি।

সম্মেলনের 'কার্যবিবরণী'তে কয়লাখনি শ্রমিকদের লড়াই-আন্দোলনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে। এই সব লড়াইয়ের দাবি, নেতৃত্ব, গতি-প্রকৃতি, সংগঠন প্রায় অনুরূপ।

১৯৭০—সম্মেলনের 'কার্যবিবরণী' থেকে উধৃতাংশগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন:

'১৯৪৬-৪৭ সালে বিশেষত ১৯৪৭ সালে ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লাখনি শ্রমিকরা তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।' এর নিষ্পত্তির জন্য কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠিত হয়।

ই সি এল

			এরিয়া		কাজের ক্ষেত্র (একর)	মোট জমি দখল (একর)	%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সালানপুর	১. সংগ্রামগড়	(১৯৫২)	সালানপুর	১৯৯৯	৬৮	১৭৪	৭.০
	২. ডাবর	(১৯৬৩)	”	১৯৯৩	৩৪	২০৭	৪.৩
	৩. মোহনপুর	(১৯৬৪)	”	১৯৯৪	২০	১২০	৪.৯
	৪. গৌরাণ্ডি	(১৯৬৫)	”	২০২৫	১৫	১০০	৪.০
	৫. বন জে মে হারি	(১৯৫০)	”	২০০৬	৭৫	২৪৪	৯.৯
	৬. আমদিহা	(১৯৭১)	”	২০০১	১৫	৯০	৩.৬
	৭. ডালামিয়া	(১৯৫৪)	”	১৯৯৫	৩০	৮২	৩.৩
পাণ্ডবেশ্বর	৮. শংকরপুর	(১৯৮৩)	বাকোলা	১৯৮৯	৬২	১০৬	৪.৩
	৯. ছোরা	(১৯৮৪)	কেন্দা	১৯৮৮	৪৫	৮৩	৩.৩
	১০. কুমারখানা	(১৯৭৯)	সোলপুর বাজারি	১৯৯৫	১৯০	৪০৮	১৬.৬
	১১. ঘনশ্যাম	(১৯৮৬)	কেন্দা	২০০১	৩০	১০২	৪.১
	১২. তাণ্ডাদি	(১৯৮১)	কেন্দা	১৯৯৩	৬৪	১২২	৪.৯
	১৩. বাঁসরা	(১৯৮৬)	কুনুসতোরিয়া	২০০৭	২২৩	৩২৪	১৩.২
	১৪. ডালুর বাঁধ	(১৯৭৫)	কাটা	১৯৮৮	৯০	১০২	৪.১
	১৫. পুরুষোত্তমপুর	(১৯৭৮)	পাণ্ডবেশ্বর	১৯৮৮	২০০	২৯০	১১.৮
					১১৬১ (৪৭%)	২৪৫০	১০০%

প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভে কবে থেকে কাজ শুরু হয়েছে, তা বলছে, ৫ম স্তম্ভের পরিসংখ্যান কাজ কবে শেষ হবে তা বলছে। ১৫টি ও সি পি-তে মোট মাইনিং জমি ১৯৪৪ একর (৭৯.২%) অপরদিকে সার্ফেস এরিয়াতে ৫১০ একর জমি লেগেছে।''

কাজের এই পরিবেশে শ্রমিক বা অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সুন্দর হবে এমন আশা করা বৃথা। পানীয় জল, আবাসন এই উভয় ক্ষেত্রে বাস্তব যা তা শোচনীয়। নন-স্ট্যান্ডার্ড হাউসিং মানে গৃহহীনতা। নারীশ্রমিকরা প্রায় অপসারিত। মাতৃমঙ্গল ক্রেশ প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেছে।

কয়লাখনি শ্রমিকদের এই জীবনযাত্রা সারা ভারতেই প্রায় এক।

এই বোর্ড থেকে 'শ্রমিকেরা সর্বপ্রথম সর্বত্র চালু একই বেতন-হার এবং ত্রৈমাসিক বোনাস ও প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রথার সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন।'

'১৯৫৩ সালে বেঙ্গল কোল গ্রুপের ৪টি কলিয়ারিতে ১১ দিনের লাগাতার ধর্মঘট পালন করা হয়।... ১৯৫৬ সালে বেঙ্গল কোল ও ইকুইটেবল কোল কোম্পানিতে ৫০,০০০ শ্রমিকদের এক বিরাট অংশ ২৭দিন লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যায়।'' সংশোধনবাদীরা ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৫৬: মজুমদার ট্রাইবুনাল অ্যাডওয়ার্ড। ১৯৫৮ লেবর অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে দাশগুপ্ত রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে বেতন বোর্ড নিযুক্ত হয়।

বেতন বোর্ডের পরে বেতন ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য নিযুক্ত হয় জাতীয় কয়লা মজুরি নির্ধারণের জন্য দ্বি-পাক্ষিক কমিটি অর্থাৎ জে বি সি সি আই। ৫টি বোর্ড এ যাবত কলিয়ারি শ্রমিকদের বেতন মজুরি প্রভৃতি নির্দেশিত করেছে। ১৯৭০ সাল অবধি কলিয়ারি শ্রমিকদের লাল ঝাণ্ডার নীচে লড়াই-সংগঠনের ক্রমিক ইতিহাস পূর্বে উল্লেখিত বিশেষ সম্মেলনের রিপোর্টটি। পরবর্তীকালে ভারতের কলিয়ারি মজদুর সভার রিপোর্টগুলিও রানীগঞ্জের কয়লা শ্রমিকদের সংগ্রাম, সাফল্য-ব্যর্থতার জবানবন্দি হয়ে আছে। এই রিপোর্টের সঙ্গে ভারতের কলিয়ারি মজদুর সভার বিভিন্ন রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি একত্রে সম্পাদনা ও প্রকাশে শ্রমিকদের বড়ই উপকার হতে পারে।

১৯৬০ থেকে ১৯৭৭ সংকট ও সন্ত্রাসের যুগ। রানীগঞ্জের কয়লাখনি শ্রমিক আধা-ফ্যাশিস্ত সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ি (একে তো জরুরি অবস্থা ঘোষণাটাই ছিল একটা বৃহৎ ফাজলামি! তার আগে ছিল ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধজনিত দমননীতির যুগ। ১৯৬০-৭৭ এই ১৮টা বছর কয়লাখনির শ্রমিক লড়েছে। মরেছে, হেরেছে আবার জয়লাভও করেছে। ১৯৭৮ নির্বাচনে রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস ঠাঁই পায়নি। মনে রাখা দরকার যে এই অঞ্চলের কী বিধানসভা কী লোকসভা কী পঞ্চায়েত পুরসভা সকল নির্বাচনেই জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা বিজয়ী হয়েছিল। ১৯৯৬ নির্বাচনে কিন্তু অবস্থা বদলে গেল। আসানসোল, হীরাপুর, বরাবনী মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের হাতে থাকল না। এ সব ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রতিবিধান কী?

ওয়েজ বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কয়লাখনি শিল্পে পাঁচটি ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট হয়। এর মধ্যে প্রথম ও পঞ্চমটিতে সি আই টি ইউ/অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন সই করেনি। পঞ্চম এগ্রিমেন্টের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে শেষ হয়ে গেলেও তা কোল ইন্ডিয়া ও সিটু ব্যতীত অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতিতে ৩০ জুন অবধি ধার করা সময় নিয়ে বেঁচে রইল। ১ জুলাই ১৯৯৬ থেকে ৬ষ্ঠ চুক্তি চালু হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। অবশ্য সিটু, ফেডারেশন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

কয়লাখনিতে মজুরি আন্দোলন ধর্মঘট সংগ্রাম ছাড়া সফলেই হয়নি। ৪-৫ জুন ১৯৮৪, ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৪, ১৪ জুলাই ১৯৯৪, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ কয়লা শ্রমিকদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটিতেই শ্রমিকরা আগ্রহ ও উদ্যমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

নয়া অর্থনীতি কয়লা শিল্পে সংকট সৃষ্টি করেছে। কয়লা শিল্পে শ্রমিকদের সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়ে দেওয়া অনেক ইশতেহারের মধ্যে একটির প্রতিলিপি দেওয়া হল। এই ইশতেহারে কয়লাখনি শ্রমিকদের কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে।

সাড়ে সাত লক্ষ কয়লা শ্রমিকের প্রতি আহ্বান

কেন্দ্রীয় সরকারের বিধ্বংসী নীতির প্রতিবাদে আগামী ২৯ শে সেপ্টেম্বর '৯৪ দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘট সফল করুন

কেন্দ্রীয় সরকারের দেশবিরোধী তথা রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্প এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষুন্নকারী নীতির প্রতিবাদে গত ১৪ জুলাই '৯৪ দেশব্যাপী একদিনের ধর্মঘট সফল করার জন্য অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন সাত লক্ষ কয়লা শ্রমিককে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে যা একই সঙ্গে পরিতাপের এবং আনন্দের তা হল আই এন টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম ১৪ জুলাই-র ধর্মঘটের ডাক দিয়ে শ্রমিকের কোনও দাবি আদায় ব্যতিরেকেই তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া সত্ত্বেও ওই শ্রমিক সংগঠনের অন্তর্গত কয়লা শিল্পের অনেক নেতা এবং তাদের অনুগামী এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ওই দিনের ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করেছেন। আমাদের ফেডারেশনের দৃঢ় বিশ্বাস যে ১৪ জুলাই-র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে লব্ধ বিপুল ঐক্যকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করেই কয়লা শ্রমিকের দীর্ঘদিনের বকেয়া সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।

কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এস কে চৌধুরীর সগর্ব ঘোষণা সত্ত্বেও কয়লা শিল্প এক নিদারুণ সংকটের মুখোমুখি এবং এই শিল্প সম্পর্কে তাদের অধিকাংশ দাবিই অলীক। এই অবস্থা শেষমেশ কয়লা শিল্পকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে এবং কয়লা শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন করে তুলবে বলে অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন এখনই সতর্কীকরণ করতে চায়।

কেন্দ্রীয় সরকার কয়লা খনি ও ওয়াশারি বিরাষ্ট্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বেশ কিছু খনি বিদ্যুৎ উৎপাদন

সংস্থাগুলির হাতে-বন্দি খনি হিসাবে তুলে দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। আর ওয়াশারিগুলিকে দেশি ও বিদেশি ব্যক্তিমালিকানার হাতে অর্পণ করতে চেয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে মোহন কুমারমঙ্গলমের উদ্যোগে নেওয়া কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণের গুরুত্ব আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

কয়লাখনির বিরাষ্ট্রীকরণে শ্রমিক সংখ্যার ব্যাপক হ্রাসপ্রাপ্তি ছাড়াও শ্রমিকের কাজের পরিবেশ ও জীবনমানের অবনতি এবং জাতীয়করণের পূর্বে ব্যক্তিমালিকানাধীন খনিতে শ্রমিকের চরম হয়রানির অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কয়লার আমদানি শুল্ক যথেচ্ছ হ্রাস করার ফলে দেশের কয়লার বিক্রয়যোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা শিল্পের স্বার্থবিরোধী এবং তৎকারণে দেশবিরোধী। কয়লা শ্রমিককে তাই দৃঢ়তার সঙ্গে কয়লাখনি বিরাষ্ট্রীকরণ এবং কয়লার আমদানি শুল্ক হ্রাসের বিরোধিতা করতে হবে।

বিভিন্ন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কাছ থেকে কোল ইন্ডিয়ার প্রাপ্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা আদায় করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই টাকা পাওয়া গেলে কয়লা শিল্পের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

দেশব্যাপী খনি অভ্যন্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মরত কয়লা শ্রমিক কোল ইন্ডিয়া, সিঙ্গারেনি কোলিয়ারি আর টাটা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছেন এক অন্যায় বিচার। সি আই টি ইউ বাদে অন্যান্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক অতি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তিটি কয়লা শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী কেন না এই চুক্তির ফলে তারা অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের তুলনায় অনেক কম অন্তর্বর্তী ভাতা পেয়েছেন। বিগত মজুরি চুক্তির পর কয়লা শ্রমিক ও ইস্পাত শ্রমিকের মজুরি ছিল সমান-সমান। কিন্তু ইস্পাত শ্রমিক এবারে ন্যূনতম ১৫৫ টাকা ও উর্ধ্বতম ৩৫০ টাকা অন্তর্বর্তী ভাতা পাওয়ার ফলে একজন অদক্ষ ইস্পাত ও কয়লা শ্রমিকের মজুরির ফারাক দাঁড়াল মাসিক ৫৫ টাকা এবং অনুরূপভাবে একজন দক্ষ ইস্পাত ও কয়লা শ্রমিকের মজুরির ফারাক দাঁড়াল মাসিক ২৫০ টাকা। আগামী মজুরি চুক্তি আলোচনাকালে আমাদের কর্তব্য হবে কীভাবে এই মজুরি পার্থক্য কমিয়ে আনা যায় তা দেখা। তা না হলে দেশের কয়লা শ্রমিকের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক যেখানে অন্তর্বর্তী ভাতার সব টাকা এককালীন হিসাবে পেয়েছেন, কয়লা শ্রমিককে তা দেওয়া হচ্ছে একবছরের বেশি সময়ব্যাপী তিন দফায়। কয়লা শ্রমিকের প্রতি এই অবমাননাকর ব্যবহারে অন্য সব শ্রমিক সংগঠনের সম্মতিদানে আমাদের ফেডারেশন খুবই মর্মাহত কেন না আমরা মনে করি না যে যোগ্যতার মাপকাঠিতে কয়লা শ্রমিক অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকের থেকে কিছু কম। বরঞ্চ কয়লা শিল্পের দুর্ঘটনাগুলিই দেখিয়ে দেয় এই শিল্পের শ্রমিক জীবনহানি বা অঙ্গহানি ঝুঁকি নিয়েও কীভাবে প্রতিদিন কাজ করছেন।

আর যে বিষয়ে কয়লা শ্রমিক বস্তুত অপমানিত হয়েছেন, তা হল তাঁদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয়টি। কর্তৃপক্ষ পেনশন তহবিলে একটি কপর্দকও দেবে না জেনেও এমন একটি চুক্তিতে কতিপয় শ্রমিক সংগঠন কীভাবে স্বাক্ষর করলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ়বদ্ধ লড়াইয়ে এইসব নেতৃবৃন্দের অনীহাই কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার স্বাক্ষরিত পেনশন চুক্তিকে জঘন্যভাবে নস্যাৎ করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

শ্রমিকের বাসস্থান, চিকিৎসা, পানীয় জল, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তির বিভিন্ন ধারা কোল ইন্ডিয়া ও অন্যান্য কয়লা কর্তৃপক্ষ কার্যকর না করার ফলে শ্রমিকের জীবনমানের অবনতি ও স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। কর্তৃপক্ষ গভীর খনির উন্নতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র খোলা-মুখ খনির উপরই গুরুত্ব আরোপ করার ফলে কয়লা উৎপাদনের সার্বিক উন্নতি ঘটছে না।

কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ কয়লা উৎপাদন পরিমাণের হিসাব মিথ্যা উদ্ভাবনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জনের পর খনিমুখে সঞ্চিত একই কয়লা বার বার জ্বলে গেছে বলে দেখাচ্ছে। তাদের এই অপকৌশল সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। কয়লার সঙ্গে মিশে থাকা 'শেল' ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ অপসারণে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে উৎপাদিত কয়লা খুবই নিম্নমানের থাকছে এবং তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যে কারণে কয়লা আমদানি করতে প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকার অমূল্য বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে।

১৯৯১ সালের ৩০ জুন চতুর্থ বেতন চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওই বছরের ১ জুলাই থেকে পঞ্চম বেতন চুক্তি চালু হওয়ার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে তিন বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কয়লা শ্রমিকের বেতন সমঝোতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলি মীমাংসার জন্য আলোচনার কোনওও লক্ষণ নেই। অগামী একবছর সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোনওও উন্নতির সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আর বিপদ হচ্ছে যে অন্তর্বর্তী ভাতা হিসাবে দেওয়া মাসিক ১০০ টাকা বেতন বৃদ্ধির মধ্যেই কর্তৃপক্ষ পঞ্চম বেতন চুক্তি পাকাপাকি করে ফেলার চেষ্টা করবে। তাই অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন সমস্ত কয়লা শ্রমিককে এই গুপ্ত বিপদ সম্পর্কে সতর্কীকরণ করে জানাতে চায় যে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মতো একটি ভাল বেতন চুক্তি আদায় করতে হলে আগামী দিনে আরও বেশি লড়াই-সংগ্রামের জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

কয়লা শিল্পে দুর্নীতির মাত্রা বর্তমানে এক চরম সীমায় উপনীত। এই শিল্পের কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তা কিছু অসৎ অফিসার ও ঠিকেদারের পকেটস্থ হচ্ছে। এটা খুবই জঘন্য ব্যাপার যে মোট কয়লা উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ

ঠিকাদার দিয়ে সম্পন্ন করানোর পরও কর্তৃপক্ষের দাবি হচ্ছে শিল্পের বহু শ্রমিক উদ্বৃত্ত এবং ওভারটাইম ভাতার পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারের যোগসাজসে মাফিয়াদের দ্বারা দিবালোকে কয়লাখনি লুট হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনও গ্রাহ্য করছে না। কয়লা শিল্পের এই কলঙ্ককর ব্যাপারের অবসানকল্পে কয়লা শ্রমিককেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কয়লা শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি করলেই কর্তৃপক্ষ শিল্পের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে। কয়লা শিল্পে কর্তৃপক্ষের এই অপকৌশল কোনোক্রমেই সফল হতে দেওয়া উচিত হবে না।

খনি সুরক্ষার অবস্থা জঘন্য। কর্তৃপক্ষ কয়লা শ্রমিকের জীবনাশঙ্কার কোনও তোয়াক্কা না করে খনি সুরক্ষা নিয়ম লঙ্ঘন করছে। ডাইরেক্টর জেনারেল অব মাইনস সেফটি অফিস কোল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারা সুরক্ষার নিয়ম-নীতি লঙ্ঘনের প্রতি শুধু উদাসীনই থাকছে না, খনি দুর্ঘটনায় দোষী সাব্যস্তদের প্রায়ই রক্ষা পর্যন্ত করছেন। এ সব কারণে দেশে কয়লাখনি দুর্ঘটনায় প্রতি বছর প্রায় দুশ শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটছে।

কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই বহু শ্রমিককে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগত মজুরি চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকের অর্জিত বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কোনও আলোচনা ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।

এমতাবস্থায় আমাদের ফেডারেশন মনে করে যে কয়লা শিল্পের সবকটি সংগঠন কর্তৃক কর্তৃপক্ষের এইসব ক্ষতিকর নীতির বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা ব্যতিরেকে শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়।

এ বছরের পয়লা আগস্ট থেকে লাগাতার ধর্মঘট করার নামে একটি বড় তামাশা দেখিয়ে আই এন টি ইউ সি কয়লা শ্রমিকের কোনও দাবি আদায় ব্যতিরেকেই ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করে নেয়। পূর্বাহ্নেই প্রত্যাহারের অভিসন্ধিতে নেওয়া এই ধর্মঘটের ডাক আসলে শ্রমিককে প্রতারণা করার অভিলক্ষ্যে তাদের একটি নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিছু সুবিধা লভ্যার্থে নাটকের আশ্রয় নেওয়া এইসব নেতৃত্বের স্বরূপ কয়লা শ্রমিককে চিনে নিতে হবে। আমরা আই এন টি ইউ সি-র কাছে তাদের এই সুবিধাবাদী নীতি ত্যাগ করে সি আই টি ইউ-সহ সব শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কয়লা শিল্পের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যোগ দিতে আবেদন করছি। আই এন টি ইউ সি তাদের খেয়ালখুশিমতো ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করে নিয়ে শ্রমিক স্বার্থকে পেছন থেকে ছুরি মারতে চায় বলেই যৌথ আন্দোলনের শরিক হতে চায় না।

কয়লা শ্রমিকের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী তথা দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন গড়ে তুলতে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের ফেডারেশন এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস এবং বি এম এস নেতৃত্বের প্রতি আবেদন করছে। কয়লা শিল্পে লাগাতার ধর্মঘটের প্রস্তুতি গড়ে তোলা না হলে কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের ন্যায্য দাবি পূরণে কিছুতেই আগ্রহ দেখাবে না।

প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বকেয়া স্তরভিত্তিক মহার্ঘভাতা এখনও কার্যকর করেনি।

গণসংগঠনগুলির জাতীয় মঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের এইসব ক্ষতিকর নীতির প্রতিবাদে আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ৯৪ দেশের সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একদিনের ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়েছে। অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন দলমত-নির্বিশেষে সমস্ত কয়লা শ্রমিককে ওই দিনের ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করতে এবং দেশব্যাপী তাঁদের শক্তিশালী কণ্ঠে নিম্নলিখিত দাবির সপক্ষে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

১। কয়লাখনি ও ওয়াশারি বিরাষ্ট্রীকরণের পদক্ষেপ বন্ধ কর।
২। কয়লার আমদানি শুল্ক হ্রাস প্রত্যাহার করতে হবে।
৩। কয়লা শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা হ্রাস করার পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
৪। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে অবিলম্বে পঞ্চম বেতন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৫। কর্তৃপক্ষের দেয় টাকার অংশ-সহ পেনশন চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।
৬। কয়লা শিল্পে দুর্নীতি ও চুরি বন্ধ করতে হবে এবং দোষী অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭। কয়লা শিল্পের সমস্ত স্থায়ী কাজে ঠিকেদারি প্রথা বিলোপ করতে হবে।
৮। চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকের প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও কল্যাণমূলক ধারাগুলির রূপায়ণ সুনিশ্চিত করতে হবে।
৯। খনি সুরক্ষা নিয়মগুলি কার্যকর করা এবং দুর্ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।
১০। কয়লা শিল্পে নারীশ্রমিকের বিরুদ্ধে সমস্ত বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে।
১১। ইউনিয়ন কর্মীদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

কয়লা শিল্পের শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য—জিন্দাবাদ।

সি এম এ এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন,
কোল এ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন,
(এন সি ও ই এ) ডি সি সি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন,
অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

কম্‌ গোপীনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক নীপশ্রী মুদ্রণী, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

ই সি এল

১। ৩১.১.৯২ তারিখে মোট শ্রমিক ছিল ১,৭৪,৮০২
৩১.১২.৯৩ তারিখে এই সংখ্যা ছিল ১,৭২,৬২৪

২। বড় কোনও হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের সংখ্যা ৯। অপারেটিং ক্যাপাসিটি ১৩.৮৩ (মিলিয়ন টন)
বড় সি এইচ পি মারফত কয়লা প্রেরিত হয়েছে

	৪.৫৪ মিলিয়ন টন
ছোট সি এইচ পি মারফত হয়েছে	৩.৪৬ মিলিয়ন টন
মোট	৮.০০ মিলিয়ন টন

৩। ই সি এল-এর মোট ১২৭ খনির মধ্যে ১৯ বিহারে, পশ্চিমবাংলায় ১০৮।
বি সি সি এল-এর মোট ৭৮ খনির মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৩টি।

৪। ৩১ মার্চ ১৯৯১ তারিখে যে শ্রমিক সংখ্যা ছিল :

আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনার	১০১,৭৫৭
ওপেনকাস্ট প্রজেক্ট	১৬২৩৫
নন-মাইনিং	৫১,৮৯৭
মোট	১,৭৭,৮৮৯
৩১.৩.৯০ তারিখে যত শ্রমিক ছিল	১,৭৮,৭০৪

৫। ক্রমিক অবনতি লক্ষণীয়।

৬। ধর্মঘট, আন্দোলন :

	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
ভারত বন্ধ	১২ + ৩	৪০ + ২ + ১
বাংলা বন্ধ	৩	
অর্থনৈতিক অবরোধ	১	
শ্রমদিবস নষ্ট	৩৩,১৮,৪৩	১৫,৩৪,৮৬

৭।

	ধর্মঘট (সংখ্যা)	শ্রমদিবস নষ্ট (সংখ্যা)	উৎপাদন হয়নি (মিলিয়ন টন)
১৯৮৬-৮৭	৭১	৬,৮৪,৯৬৬	৫৭০,৫২৪
১৯৮৭-৮৮	৭৭	৯,৫৩,১২৮	৮২৮,০৯২
১৯৮৮-৮৯	৬৪+১ বাংলা বন্ধ	১,৯৫,৯৯৫	৫০৯,০৭৭
১৯৮৯-৯০	৬১+১ ভারত বন্ধ	২,২৯,৭১২	৪২২,৯১২
১৯৯০-৯১	৪৫+১ বাংলা বন্ধ	১,৯১,৬৮০	৩০২,৩৫০

মন্তব্য : ১৯৯০-৯১ সালে কোনও সাধারণ ধর্মঘট হয়নি। খনি অফিসাররা ১৯৯০, অক্টোবরের ১১, ১২ তারিখে ২ দিন ধর্মঘট করে। ৩২,৭৩২ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। মজুরি নষ্ট হয় ৬৫,৪৬,৪০০ টাকা। উৎপাদন ক্ষতি নেই।

৮। ৩১ মার্চ ১৯৯১ তারিখে বিভিন্ন পদে নিযুক্তির সংখ্যা

একজিকিউটিভ	:	৩৩৮৩
সুপারভাইজার	:	৮৯০৯
দক্ষ	:	৩৫৮৭২
অদক্ষ	:	১১৭১৫৩
মিনিস্টেরিয়াল	:	১০৯৮৩
ক্যাজুয়াল	:	৭৩৯
বদলি	:	২৯২
বিবিধ	:	৫৫৮
মোট	:	১,৭৭,৮৮৯
কোল ইন্ডিয়া	:	৬,৭২,৮৬৬

ন্যাশনাল কোল ওয়েজ এগ্রিমেন্ট

		সাক্ষর তাং	যে সময়ের জন্য
এন সি ডব্লু এ	১	১১.১২.৭৪	১.১.৭৫-৩১.১২.৭৮
ওই	২	১১.০৮.৭৯	১.১.৭৫-৩১.১২.৭৮
ওই	৩	১১.১১.৮৩	১.১.৮৩-৩১.১২.৮৬
ওই	৪	২৭.০৭.৮৯	১.১.৮৭-৩০.০৬.৯১

এন সি ডব্লু এ ৫ ১.৭.৯১ থেকে চালু হওয়ার কথা ছিল। জে বি সি সি আই ৫ পুনর্গঠিত হয়। কয়লা শ্রমিক সভা (এস ই সি এল), এন এফ আই টি ইউ কলিকাতা হাইকোর্টে কমিটি গঠনের বিরুদ্ধে লিখিত পিটিশন দাখিল করে। "কয়লা কোম্পানিগুলির তীব্র আর্থিক অনটন ও ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক এন্টারপ্রাইজের মজুরি আলোচনার জন্য প্রদত্ত নির্দেশের কথা মনে রেখে কয়লা কোম্পানিগুলি বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ।"

(বার্ষিক রিপোর্ট কোল ইন্ডিয়া, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯০-৯১)

প্রস্তাব

শিল্পাঞ্চল গণতান্ত্রিক কনভেনশন

২৫ আগস্ট, ১৯৮৫, সকাল ৯টা
নজরুল মঞ্চ, আসানসোল

আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের গণতান্ত্রিক মানুষ ও সংগঠন- সমূহের প্রতিনিধিদের এই কনভেনশন জনসাধারণের জীবনের ও জীবিকার সব ক্ষেত্রেই, বিশেষত এই অঞ্চলে যে ধারাবাহিক অবক্ষয় ঘটছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের, এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য পদক্ষেপ ও হীন অস্বীকৃতি এই কনভেনশন অধিকতর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে লক্ষ করছে। বিশাল খনি অঞ্চল (১৫৩০ ব. কি. মি.) সহ আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল যে পরিত্যক্ত জনপদে রূপান্তরিত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই

কনভেনশন পুনরায় তার অবশ্য করণীয় কর্তব্যরূপে বিবেচনা করছে।

'১৩টি শহরাঞ্চল ও ৩৬৯টি গ্রামাঞ্চল-সংবলিত এই এলাকায় ১৫ লক্ষ লোকের বসবাস দৈর্ঘ্যে ৭৫ কি. মি. (পূঃ-পঃ) এবং প্রস্থে ৩৫ কি. (উঃ-দঃ)। এর মধ্যে ৬৭৩ ব. কি. মি. (৪৪.০২%) লিজ-হোল্ড অঞ্চল, তার ৪১৮৩% ই সি এল-এর মালিকানায় বি সি এল-এর ২০৩% এবং ইস্কোর মাত্র ০.১৪%।

'বেপরোয়া ও অবৈজ্ঞানিক খনন বহু ক্ষেত্রেই আগুন, পুরু সীমে বহু অংশে বিভক্ত, পুরাতন খনি, ধসে যাওয়া জলে ভরা খনি এমন সব সমস্যা রেখে গেছে। মাইনস অ্যাক্ট চালু হওয়ার আগে যে সব খনিতে কাজ হয়েছিল তাদের কোনও প্ল্যান ছিল না এবং এখন এর অনেক জায়গায় পুরাতন খনির সীমানা খুঁজে বার করা কঠিন।'

পুরাতন খনিতে পিলারে ৯৩৮ মিলিয়ন টন কয়লার মজুত রয়েছে। 'আগুন অথবা ধসে পড়ার সমস্যার দরুন' ১৫০ মিলিয়ন টন কয়লা 'নাগালের বাইরে'।

একই রিপোর্টে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে 'অতীতে অবৈজ্ঞানিক ও এলোপাথাড়িভাবে খনির কাজ হয়েছে। ফলে সারা কয়লাখনি এলাকায় অনেক ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিবেশ দেখতে এখন বিধ্বস্ত অঞ্চল।'

'কয়লাখনি অঞ্চলের সর্বত্র অধিকাংশ খনির আশেপাশে বস্তি গড়ে উঠেছে। ধুলা, ধোঁয়া, জলদূষণ ইত্যাদির সমস্যাও রয়েছে। এই অতি পুরাতন কয়লাখনি অঞ্চলে এ সবই সাধারণ দৃশ্য। সারা কয়লাখনি অঞ্চল একটা নোংরা, কুৎসিত ছবি তুলে ধরছে।'

আগুন, জলভর্তি খনি, ধস, ভেঙেপড়া, এলোপাথাড়ি তৈরি খনি, পুরাতন জলভর্তি খনির উপর তৈরি বসত এলাকা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শেষোক্ত স্থানগুলি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।''

ডি জি এম এস-এর মতে 'রানীগঞ্জ, বরাকরের ন্যায় ঘন-বসতিপূর্ণ শহরাঞ্চল-সহ এরূপ ২৭টি এলাকায়'' মোট জনসংখ্যা ৭০,০০০। উপরোক্ত বিপদের সম্মুখীন এই এলাকাগুলি। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে 'এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। নিরাপদ অঞ্চলে নতুন বসতি গড়ে তুলে অথবা ধসের ভয় আছে এমন খনিগুলি ভরাট করে'' তা হতে পারে।

পুরাতন সমস্যাগুলির বহর আসলে আরও বড়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সূত্রে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ৪০টি মৌজা, পুরুলিয়া জেলার ২টি ও বাঁকুড়া জেলার ১টি মৌজায় ধসের আশংকা রয়েছে। পুরাতন খনির দরুনই তা হয়েছে। এর জনসংখ্যাও বৃহত্তর।

এর মানে যোগ হচ্ছে নতুন বিপদ। একই সূত্রের সংবাদ যে আন্ডারগ্রাউণ্ড ও ওপেনকাস্ট ও বিভিন্ন মাইনিং কাজের দরুন ১,২০,০০০ লোক বিপন্ন হয়ে পড়বে। একই সূত্রের বক্তব্য, কয়লাখনি অঞ্চলে স্থানীয় জনগণ কয়লা শিল্পের বিকাশের সঙ্গে অতি অল্পই যুক্ত। ফলে, পশ্চাৎপদ গ্রামাঞ্চলের থেকে কয়লা শিল্প বিচ্ছিন্ন। খনির প্রসারের ফলে ক্রমশ তারা তাদের জমি, বর্তমান জীবিকা ও জীবনধারণের ধারা হারাবে। কলিয়ারি শ্রমিক ও বাস্তুহারা জনসাধারণের জন্য শহর নির্মাণের পরিকল্পনা তৈরি করার সময় পশ্চাৎপদ গ্রামীণ এলাকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির উপর জোর দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।''

কয়লাখনির প্রকল্প রচয়িতারা বাঁচার জায়গাটুকুকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে 'যথাযথ পথঘাটসম্পন্ন কয়লাশূন্য জমিতে', '১২০০ মিটার নীচে কয়লা আছে এমন অঞ্চলে', 'ভবিষ্যতে খনন করা হবে কিন্তু মাটির উপরিতলের কাঠামো এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যাতে কোনও ক্ষতিই না হতে পারে এমন অঞ্চলে।'

এতদঅঞ্চলের কয়লাখনি শিল্পে, আগামী দিনে ৩০% কয়লা উত্তোলিত হবে ওপেনকাস্ট খনি থেকে। এগুলি মেকানাইজড হবে, আন্ডারগ্রাউন্ড খনিতে যে নতুন উন্নয়ন হবে তা অতি উচ্চমাত্রায় মেকানাইজড হবে। ভূগর্ভের শূন্যতা কেভিং পদ্ধতিতে ভরাট হবে। এইভাবে অধিকাংশ মানুষই তাদের জমি, বাড়ি, জীবিকা হারাবে।

II. এই কনভেনশন লক্ষ্য করছে যে খনিগুলি উচ্চ মাত্রায় যন্ত্র সজ্জিত হচ্ছে। ফলে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। কাজের সুযোগ খুবই কমে যাবে।

চাষবাস ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম ক্রমে ক্রমে প্রধান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপরূপে আয় না থাকার ফলে বেকারি খুব দ্রুত বাড়বে।

কলকারখানা বন্ধ হওয়া, রুগ্ন হওয়া, এই পুরাতন শিল্পাঞ্চলে আতংকের মত ক্রমশই বড়, আরও বড় হচ্ছে প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টর, সর্বত্রই চিত্র এক।

কেন্দ্রীয় সরকার বার্নস রিফ্র্যাকটরিজ (রানীগঞ্জ ও দুর্গাপুর) বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বার্নস স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন বন্ধের মুখে। ইস্কো গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত। কয়েকটি পুরাতন ও নতুন কয়লাখনি বন্ধ হচ্ছে। সাইকেল কর্পোরেশন এবড়ো-খেবড়ো জমিতে খোঁড়াচ্ছে। ১৯৮৫-র শেষাশেষি তাও বন্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অন্যান্য শিল্পের একই দুর্দশা।

প্রাইভেট সেক্টরে দীর্ঘ মাসের পর মাস বন্ধ রয়েছে।

(১) বেঙ্গল পেপার মিল (২) হিন্দুস্থান পিলকিনটন গ্লাস ওয়ার্কস (৩) বেঙ্গল রিফ্র্যাক্টরিজ নির্মম বর্তমান। অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

III. জনসাধারণের সাহায্যে এগিয়ে না এসে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে। কয়লাখনি শ্রমিকদের উপর আক্রমণ গভীর ও ব্যাপক। শিল্পের উপর এসমা প্রয়োগ করা হয়েছে। ১ দিনের ধর্মঘটের জন্য ৮ দিনের বেতন কাটা চালু হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের এ একটা আঘাত। বেআইনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ধ্বংসের জন্য সি আই এস এফ আনা হয়েছে। কাজের সুযোগ শেষ করা হচ্ছে। তৃতীয় বেতন চুক্তির মজুরি বাদে সবটাই কার্যকরী করতে অস্বীকার করা হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া ঘটছে ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের উপর। পোষ্যদের চাকুরি দেওয়ার

প্রশ্নে যে চুক্তি হয়েছে তা ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে। আরও মেকানাইজেশন ও কমপিউটারাইজেশন শ্রমিক সংখ্যা বেশ কমিয়ে দিবে। মহিলাদের খনিশিল্পে কাজ ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিত্যাগ করে পে-কমিশনের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে যেতে চাইছে। বর্তমানে ৬৭টি সংস্থায় পে-কমিশন চালু আছে।

IV. কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতিগুলির আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি, বিদেশি পুঁজিপতির অনুকূলে যেমন তা তেমনই তা নিশ্চিতই জনবিরোধী, শ্রমিকবিরোধী। সাধারণ ও রেল, এই দুটি কেন্দ্রীয় বাজেট এবং অতিরিক্ত বাজেট (১৯৮৫-৮৬) শ্রমিক ও জনগণের উপর বিপুল বোঝা ও দুঃখকষ্ট চাপিয়েছে। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত আয়কে নামিয়ে আনছে। টাকার দাম এখন মাত্র ১৬ পয়সা। বিপুল সরকারি ঋণের বোঝা, বিদেশি ঋণ, বাণিজ্য ঘাটতি ও সম্পদের দেশের বাইরে চলে যাওয়া অর্থনীতিতে সংকট স্থায়ী করে তুলেছে।

V. ফলত, শ্রমিকের নিরাপত্তা স্বাস্থ্যশিক্ষা, বাসস্থান, পানীয় জল বাবদ ব্যয় বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। কাজের বিপদ, পরিবেশ দূষণ বাড়ছে। দুর্ঘটনা বাড়ছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও গুরুতর আহত হওয়ায় ঘটনা বাড়ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সব শিল্পেই।

VI. এই অবস্থা রোধ করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারকে শ্রমিক ও জনসাধারণের অভিযোগ শুনতে বাধ্য করার জন্য এবং বাস্তব সমাধান খুঁজে বার করার জন্য শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন।

কনভেনশন তাই সকল জনগণকে বিশেষত কয়লাখনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে নীচের দাবিসনদের দাবিগুলি আদায়ের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

VII. দাবিসনদ

১। পরিত্যক্ত খনিগুলি ভরাট করে জমি ঠিক (স্টেরিলাইজ) করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত বিপজ্জনক ঘোষিত বা বিপজ্জনক ঘোষিত হতে পারে, এমন গ্রাম-শহরে পুরাতন খনি অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রকল্প রচনা প্রয়োজন।

২। যত কম সম্ভব ওপন-কাস্ট করা দরকার। কাজ হওয়ার পরে জায়গাগুলি চাষবাস ও অন্যান্য কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। কোনও কোনও খাদকে জলাশয় হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। বনসৃজন ও পুনঃ-বনসৃজন এবং সামাজিক বনসৃজন করতে হবে।

৪। জনবসতিসম্পন্ন এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এরূপ কোনওও অঞ্চলে খনি চালু করার আগেই তা করতে হবে।

৫। সমগ্র এলাকায় জমি ব্যবহারের জন্য প্রকল্প তৈরি করতে হবে। রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় তা কার্যকরী করতে হবে।

৬। নদী থেকে স্টোয়িং-এর জন্য বালি তোলার কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন নদীতীরে ক্ষয়জনিত ভাঙন / ধস না হতে পারে। এরূপ হলে গ্রামে জলপ্লাবন হবে (যেমন পাত্রা, মদনপুর, বাকশা, ডালুক-সুন্দা—অণ্ডাল থানা)। মাইনস অ্যাক্টের রুল ও রেগুলেশনে এ জন্য প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭। মাইনিং-এর ফলে রানীগঞ্জ কোলফিল্ডে জলের অভাব খুবই তীব্র। মাইনিং-এর ফলে ভূগর্ভের জলস্তর ও জলধারা স্থানচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমির ওপরে যে প্রাকৃতিক জলধারা তা-ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওপেনকাস্টের ফলে সমস্যা আরও সঙ্গিন হয়। খনি অঞ্চলে যে জল নষ্ট হচ্ছে তার সদ্ব্যবহারেরও কোনওও প্রকল্প নেই। তিনটি পদ্ধতিতে তা করা সম্ভব, যথা, (১) পুকুরে জমা করা ও নদী-নালাতে ফেলে দেওয়া, সাধারণের ব্যবহারের জন্য। (২) সেচের জন্য, (৩) অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানে যথাযথ শোধনের পর পানীয় জল হিসাবে ব্যবহারের জন্য। প্রশাসন ও অন্যান্য অভিজ্ঞ সংস্থা, যাদের সাহায্য পাওয়া সম্ভব, তাদের সহযোগিতায়ই তা করা সম্ভব।

৮। জমিতে ফাটল, ধস ও অন্যান্য আপদ-বিপদের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৯। খনির জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে যে সব বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষক কাজ হারিয়েছে তাদেরও ল্যান্ডলুজার হিসাবে বিবেচনা করে কাজ দিতে হবে। ১ একরে ১টি কাজ দেওয়ার নীতি পুনরায় প্রবর্তিত করতে হবে।

১০। কলিয়ারির প্রয়োজনীয় মালপত্র সরবরাহের জন্য অ্যান্সিলারি, ছোট, মাঝারি, কুটিরশিল্প স্থাপনে স্থানীয় যুবকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে, তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কয়লাভিত্তিক শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দিতে হবে।

১১। ব্লাস্টিং, ডামপার, ডজার চলার সময় কার্যকরী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। সকল খনিজের বেআইনি খনন নিষিদ্ধ করতে হবে।

১৩। জনসাধারণের জন্য নিরাপত্তা ও আপদহীনতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ই সি এল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে হবে।

১৪। আইন-শৃঙ্খলা, ভূমিক্ষয়, ভূমির অবনতি, জলাভাব, শস্য ও সম্পত্তির ক্ষতি, আগুন ও ধসের দরুন জীবনহানির ব্যাপারে রাজ্য সরকারকেই সব ঝক্কি পোয়াতে হলেও কয়লা খনি পরিচালনার ব্যাপারে তার কোনওও এক্তিয়ার নেই। সি আই এল-এর পরিচালনায় রাজ্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন সংস্থাসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব চাই।

১৫। সি আই এস এক ও ৮ দিনের বেতন কাটা প্রত্যাহার ৩১১ (২) ধারা-সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রত্যাহার, সকল ট্রেড ইউনিয়ন-বিরোধী সার্কুলার প্রত্যাহার করতে হবে।

১৬। যৌথ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চালু রাখতে হবে। সকল সংস্থাকেই এর আওতায় আনতে হবে।

১৭। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, শিল্প পরিচালনায়, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গোপন ব্যালটে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারিত করতে ও নির্ধারিত প্রতিনিধিদের হাতে পূর্ণ ও সমান অধিকার দিতে হবে।

১৮। তৃতীয় বেতন চুক্তি পুরোপুরি চালু করতে হবে। পোষ্যদের কাজ ও সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি চালু করতে হবে।

১৯। খামখেয়ালি বদলি, একতরফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে কলিয়ারি শ্রমিকদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

২০। অপ্রয়োজনীয় মেকানাইজেশন বন্ধ করতে হবে। কমপিউটারাইজেশন বন্ধ করতে হবে।

২১। সংবিধান সংশোধন করে সকলের জন্য কাজের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২২। বার্নস রিফ্র্যাক্টরিজ রানীগঞ্জ ও দুর্গাপুর ইউনিট দুটি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। সাইকেল কর্পোরেশনের ইউনিটগুলিকে পূর্ণত উৎপাদনশীল, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ও পুনরায় প্রাণচঞ্চল করে তোলার জন্য আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। অবিলম্বে বেঙ্গল পেপার মিল, হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস, বেঙ্গল রিফ্র্যাক্টরিজ রাষ্ট্রায়ত্ত ও চালু করতে হবে। ইস্কো, বার্নস স্ট্যান্ডার্ড কারখানা পূর্ণ উৎপাদনশীল করতে হবে।

২৩। ক্লোজার, লক-আউট, লে-অফ, ছাঁটাই বেআইনি ঘোষণা করতে হবে। কোনওও রুগ্ন/বন্ধ সংস্থা অধিগ্রহণে অধিগ্রহণকারীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির সকল দায় শোধের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ বাধ্যতামূলক এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার যে সার্কুলার জারি করেছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

২৪। জনবিরোধী কেন্দ্রীয় অর্থনীতি পরিবর্তন করতে হবে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যস্তর স্থির ও স্থিতিশীল করতে হবে। নির্ধারিত দরে সারা ভারতে ১৪টি পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

২৫। খনি অঞ্চলে পুনর্গঠন, পুনরুন্নয়ন বাবদ সম্পূর্ণ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে।

পরিশিষ্ট

মজুরি : মূল মজুরি—১৯৪৮ সালের কনসিলিয়েশন বোর্ড অ্যাওয়ার্ড মোতাবেক। অর্থাৎ, ১৯৩৯ সালের মূল মজুরির ৫০% বেশি তৎসহ মোট মূল মজুরির ১৫০%। **পিস রেট**—৩৬ ঘনফুটের টবের জন্য টা. ১-১৪ আ-০।

ত্রৈমাসিক বোনাস : পূর্ববর্তী তিনমাসে কোনওও আন্ডারগ্রাউন্ড কলিয়ারি শ্রমিক ৫৪ দিন হাজির থাকলে ওই তিনমাসের মোট মূল মজুরি এক-তৃতীয়াংশের সমান ত্রৈমাসিক বোনাস পেতেন। অন্যান্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বোনাস অর্জনের যোগ্যতার জন্য প্রয়োজন ৬৬ দিন।

প্রভিডেন্ট ফান্ড : শ্রমিক তার মূল মজুরি থেকে এক আনা এবং মালিকরা ও সম-পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড (ভবিষ্যনিধি) প্রতিষ্ঠা করেছে। ত্রৈমাসিক বোনাস-প্রাপক এই 'নিধি'-র সদস্য হতে পারবে।

সুবিধাজনক দরে খাদ্যশস্য : ভারী দৈহিক কাজ করে এমন শ্রমিকরা বিনামূল্যে এক পোয়া চাল পাবে। এক সের চাল ৬ আনা দরে, ১ পোয়া ডাল ৪ আনা সের দরে, প্রতিদিন প্রতি শ্রমিক পেতে অধিকারী ছিল।

সিক : এর জন্য সুবিধা-৮ তিনদিনের বেশি অসুস্থ থাকলে প্রতিদিনের জন্য ১২ আনা খোরাকি পাওয়া যেত। কতদিন দেওয়া হবে তা মালিকের মর্জি।

হাজিরা বোনাস : একা, ৩½ আনা; বাচ্চা সন্তান ও স্ত্রী, ৪½ আনা; নিজে, স্ত্রী ও ২টি সন্তান ৬ আনা প্রতিদিনের বাবদ।

আইড্‌ল বা বাধ্যতামূলক বেকারি : কর্তৃপক্ষ কোনওও কাজের জোগান না দিতে পারলে শ্রমিক ৪দিন অবধি প্রতিদিন ১১ আনা পাবে। মেয়াদ বেড়ে গেলে বোনাস হবে প্রতিদিন ১৪ আনা।

(নারীশ্রমিক নিযুক্তি চার্ট দ্রষ্টব্য)

মাতৃমঙ্গল : ৬ মাস কাজ করেছে এমন নারীশ্রমিক অন্তঃসত্ত্বা হলে, প্রসবের ৪ সপ্তাহ আগে ও পরে দৈনিক ১২ আনা ভাতা পাবে। তা ছাড়া ৩ টাকা।

১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২ সালে রানীগঞ্জের কোলফিল্ডে কয়লা উত্তোলিত হয়েছে যথাক্রমে ১,৬০,৪৬,৬১৪, ১,৫৯,১১,৭৬২, ১,৬১,৯৮,৪১৭ টন (প্রকৃত)। কয়লার দর ছিল (প্রতি টন) :

সফট কোক (৪৫% এর বেশি ছাই নয়) টা. ২৯.৭৪

হার্ড কোক (বড় বড় খণ্ড বা ½ স্মিদি) বাই-প্রোডাক্ট ওভেন থেকে (ছাই ২৪%-এর কম) টা. ৪৯.৮৮

বাই-প্রোডাক্ট ওভেন থেকে (ছাই ২৪%-এর বেশি কিন্তু ৩০%-এর কম) টা. ৪২.৪৮

বি-হাইভ ও দেশি ওভেন (ছাই ২৪%-৩০%) টা. ৪০.৭৩

বি-হাইভ ও দেশি ওভেন (ছাই ২৪%-এর নীচে) টা. ৪৮.১৩

কোক ব্রীজ (½"-র কম) টা. ৮.৩১

নন কোকিং : সিলেক্টেড-এ (টা. ২৩.৬১-টা. ২৪.৬৮)
সিলেক্টেড বি (টা. ২২.১১-টা. ২৩.১৭৮)
গ্রেড ১ (সর্বোচ্চ) টা. ২০.৯৯-টা. ২২.০৫
গ্রেড ২ (,,) টা. ১৯.৪৯-টা. ২০.৫৬
গ্রেড ৩এ (,,) টা. ১৭.৯৯-টা. ১৮.৯৯
গ্রেড ৩বি (,,) টা. ১৬.৮০-টা. ১৭.৮০

কোকিং : এ টা. ২৬.৭৬—টা. ২৭.৮১
বি টা. ২৫.৭৬—টা. ২৬.৮১
সি টা. ২৪.৭৬—টা. ২৫.৮১

ডি টা. ২৩.২৬—টা.২৪.৩১
ই টা. ২২.৭৬—টা. ২৩.৮১
জি টা. ২১.৫১—টা. ২২.৫৬
এইচ টা. ২১.২৬—টা. ২২.৩১

গড়ে প্রতি মাসে ১৯৬২ সালে কয়লাখনি অঞ্চলে মোট ১৫১৪৪৪ জন বাস করত, তার মধ্যে স্থায়ী ৮৪৭৬১, অস্থায়ী ২৯৩৯৮, স্থানীয় আবাসী ৩৬৮৬৭। বিভিন্ন স্থলে নিযুক্ত শ্রমিকের গড় সংখ্যা ছিল: আন্ডারগ্রাউন্ড (পুরুষ) ৫৩৬০৮; সার্ফেস (পুরুষ) ২৪৭৯৩ ও (স্ত্রী) ৫৩১৩, সব নিয়ে মোট গড় ৩০৯৪০।

বিভিন্ন ক্যাটেগরির শ্রমিক যে মজুরি পেতেন :

১৯৬২

ক্যাটেগরি	মূল মজুরি	মাগ্‌গি ভাতা	পরিবর্তনশীল মাগ্‌গি ভাতা (টাকা)	আন্ডারগ্রাউন্ড ভাতা	আন্ডারগ্রাউন্ড শ্রমিকের দৈনিক মজুরি	সার্ফেসের শ্রমিকের দৈনিক মজুরি
I	১.০৬	১.৫৯	০.৩৭	০.১৩	৩.১৫	৩.০২
II	১.০৯	১.৬৪	০.৩৭	০.১৩	৩.২৩	৩.১০
III	১.০৯	১.৭৩	০.৩৭	০.১৫	৩.৩৪	৩.১৯
IV	১.২৫	১.৭৩	০.৩৭	০.১৬	৩.৫১	৩.৩৫
V	১.৩১	১.৭৩	০.৩৭	০.১৬	৩.৫৭	৩.৪১
VI	১.৩৭	১.৭৩	০.৩৭	০.১৭	৩.৬৪	৩.৪৭
VII	১.৮৭	১.৮৭	০.৩৭	০.২৩	৪.৩৪	৪.১১
VIII	২.২৫	১.৯২	০.৩৭	০.২৮	৪.৮২	৪.৫৪
IX	২.৭৫	১.৯২	০.৩৭	০.৩৪	৫.৩৮	৫.০৪

পানীয় জল সরবরাহ: রানীগঞ্জ কোলফিল্ড সুসংহত জলসরবরাহ প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন। ইতিমধ্যে এন্ড্রু ইউল এ্যান্ড কোং-এর শীতলপুর কোলফিল্ড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম (টা. ১,৫৭,৫০০.০০ পরে হ্রাস করে টা ১,৩৫,০০০.০০) কার্যকরী হয়েছে এবং শোধিত জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। এন্ড্রু ইউল এ্যান্ড কোং পনিয়াটি গ্রুপের জন্য আর একটি স্কিম রচনা করেছে। শিবপুর, বাঁকশিমুলিয়া ৭ ও ৮ পিট, বাঁকশিমুলিয়া ১১ ও ১২ পিটে জল সরবরাহ হবে এই প্রকল্প থেকে। ব্যয় হবে মোট টা. ৫,১৭,৬০০। ভারত সরকারের নিকট অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে। ভারত সরকার এই ব্যয় হ্রাস করে করেছেন টা. ৪,৮৭,০০০। এর কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। অনুদানের প্রথম কিস্তি দেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ ময়রা কলিয়ারি জল সরবরাহ প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। সরববাহ শুরু হয়েছে। অনুদান দেওয়া ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। নাগেশ্বর সাতগ্রাম কলিয়ারি ২৩,৪৫০ টাকা ব্যয়ে একটি জল প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করেছে।

শ্রম-সম্পর্ক

মাইনস বোর্ড অব হেলথ (১৯৪৯-৫০)-এর রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে শ্রম-সম্পর্ক "খুব ভাল" ("ফেয়ারলি স্যাটিসফ্যাক্টরি")। শ্রমিক ও তাদের ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বড় বড় কলিয়ারিতে পার্সোনেল অফিসার থাকেন। তিনটি মালিকদের সংগঠনের যৌথ কমিটি জয়েন্ট কোলফিল্ড কমিটি শ্রম সমস্যাগুলি বিবেচনা করে।

১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে (৬.২.৫২-২৩.৪.৫২) মুসলিয়া কলিয়ারিতে, মার্চ মাসে (১৩.৩.৫২-১৪.২.৫২) ইকরানাড়ি কলিয়ারিতে, আগস্টে (২৫.৮.৫২-২৮.৮.৫২) কে সি পাল চৌধুরির কলিয়ারিতে এবং কাজোরা ও ওয়েস্ট কাজোরা কলিয়ারিতে, অক্টোবরে শিবপুর পনিয়াটি ওয়ার্কশপে (৬.১০.৫২-৭.১০.৫২) ও রিয়াল কাজোরা (২৩.১০.৫২-২৫.১০.৫২) এবং নভেম্বরে পাটমোহনার (১.১১.৫২—১.১১.৫২) শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

১ মার্চ ১৯৫২-২৪ মার্চ ১৯৫২ সেন্ট্রাল সামনা কলিয়ারিতে লক-আউট চলে। দেশেরমোহন কলিয়ারিতে ১০ মে ১৯৫২-২৩ জুন ১৯৫২, সেন্ট্রাল জামুরিয়া কলিয়ারিতে (২৯ মে '৫২-২৫.১০.৫২), মণ্ডলপুর কলিয়ারিতে ১০ জুন ১৯৫২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫২, ২০ সেপ্টেম্বর '৫২ থেকে ২৪ মার্চ '৫৩ অবধি লক-আউট চলে।

১৯৫৩ তালিকাটি দীর্ঘতর

কলিয়ারির নাম	ধর্মঘট শুরুর তারিখ	ধর্মঘট শেষ হয়	কত শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেন
১। ইস্ট কাজোরা	২১.৩.৫৩	২১.৩.৫৩ (কয়েক ঘণ্টা)	১৩৫
২। পনিয়াটি ওয়ার্কশপ	২৭.৪.৫৩	২৭.৪.৫৩ (১½ ঘণ্টা)	৪০০
৩। ঠেমো মেন	৪.৫.৫৩	৯.৫.৫৩ (১ দিন)	১০০০
৪। কাজোরা ও পশ্চিম কাজোরা	১১.৫.৫৩ (১ম শিফট্)	১৩.৫.৫৩ (২ দিন)	২০০
৫। ইস্ট জামুরিয়া	১৩.৫.৫৩	১৮.৫.৫৩ (৫ দিন)	৮০
৬। অমৃতনগর	১১.৫.৫৩	১১.৫.৫৩ (২ ঘণ্টা)	১০০
৭। শ্যামসুন্দরপুর	১৭.৫.৫৩	২০.৫.৫৩ (৩ দিন)	২০০
৮। মাধবপুর	২৩.৫.৫৩	২৬.৫.৫৩ (৩ দিন)	২০০
৯। শীতলদাসজী সিলেক্টেড	৮.৬.৫৩	৮.৬.৫৩ (কয়েক ঘণ্টা)	১৫০
১০। শিওর শীতলপুর	১২.৬.৫৩	১৭.৬.৫৩ (৫ দিন)	২৬২
১১। জোৎ ধেমো	১২.৬.৫৩	১৭.৬.৫৩ (৫ দিন)	২৩৩
১২। ইস্ট কাজোরা	৬.৭.৫৩	৮.৭.৫৩ (২ দিন)	২৭০
১৩। জোৎ জানকী	১০.৮.৫৩	১০.৮.৫৩ (কয়েক ঘণ্টা)	১০০
১৪। অজয় II			
১৫। বাঁকশিমুলিয়া ৭ ও ৮ নং ,, ১১ ও ১২ নং ,, ২ ও ৪ পিটে			
১৬। প্রিটোরিয়া			
১৭। পনিয়াটি ওয়ার্কশপ			
১৮। গিরিমিন্ট কলিয়ারি			
১৯। শিবপুর (আনুমানিক)	১.৯.৫৩	৭.৯.৫৩ (৬ দিন)	৪০০০
২০। কাজোরা সিলেক্টেড	১১.৯.৫৩	১২.৯.৫৩ (১ দিন)	৫৪০
২১। ঐ	২৮.৯.৫৩	৩০.৯.৫৩ (২ দিন)	১৫০
২২। পরাশিয়া কলিয়ারি	২৭.১০.৫৩	৪.১১.৫৩ (৮ দিন)	৮২৮
২৩। ঐ	ঐ	তীব্র প্রতিবাদ	২৬০
২৪। সাউথ পরাশিয়া	২৭.১০.৫৩	৪.১১.৫৩	
২৫। নিউ চুরুলিয়া	২৬.১০.৫৩	২৬.১০.৫৩ (কয়েক ঘণ্টা)	৩১
২৬। বাঁকশিমুলিয়া ১, ২*, ও ৪ নং পিট	২১.১২.৫৩	২৩.১২.৫৩ (২ দিন)	৮০
২৭। নর্থ ছোরা*	৩০.১২.৫৩	৩১.১২.৫৩ (১ দিন)	২৫০

* আনুমানিক

১৯৫৪-৫৫ : ধর্মঘটের খতিয়ান।

কলিয়ারির নাম	কবে হতে	কবে অবধি	মোট শ্রমিক জড়িত
১। সিলেক্টেড শিয়ার মেলে	৪.১.৫৪	১৫.১.৫৪	৫১
২। শীতলদাসজী সিলেক্টেড	৪.১.৫৪	৫.১.৫৪	১৬২
৩। নর্থ হরিপুর	৮.১.৫৪	৮.১.৫৪	৪০
৪। সিঙ্গারন	১১.১.৫৪	১২.১.৫৪	৪০
৫। সিঙ্গারণ	২০.১.৫৪	২২.১.৫৪	৫০
৬। খাসকাজোরা	১.৩.৫৪	৬.৫.৫৪	৮০০
৭। শীতলনগর	৮.৩.৫৪	৯.৫.৫৪	৮০
৮। কে সি পলস কাজোরা	৮.৩.৫৪	১১.৩.৫৪	২৫০
৯। পাটমোহনা	১৫.৩.৫৪	২২.৩.৫৪	৬০০
১০। চলবলপুর	১৭.৩.৫৪	১৮.৩.৫৪	৮০০
১১। নিউ সাতগ্রাম	১২.৪.৫৪	১৮.৪.৫৪	৩০০
১২। সিঙ্গারন	২৩.৪.৫৪	২৪.৪.৫৪	৫০
১৩। ধাদকা	১২.৫.৫৪	২৩.৬.৫৪	২০০
১৪। তোপসি	২৭.৬.৫৪	২৮.৬.৫৪	৩০
১৫। মিঠাপুর	১.৭.৫৪	৩.৭.৫৪	৩০
১৬। বেগোনিয়া	৭.৯.৫৪	৯.৯.৫৪	২০
১৭। তোপসি	২২.১০.৫৪	২৩.১০.৫৪	২৫০
১৮। নর্থ ছোরা	২৪.১০.৫৪	৪.১১.৫৪	১৮০
১৯। শীতলদাসজী সিলেক্টেড	২.১১.৫৪	৩.১১.৫৪	১৬০
২০। শীতলদাসজী সিলেক্টেড	১০.১১.৫৪	১৭.১১.৫৪	১৪০
২১। নর্থ হরিপুর	৯.১১.৫৪	১৪.১১.৫৪	২০০
২২। মহঃ জানকী খাস	২২.১১.৫৪	৩.১২.৫৪	৮৫
২৩। কে সি পালস কাজোরা	১৫.১১.৫৪	৬.১.৫৫	২৫০
২৪। তোপসি	২০.১২.৫৪	২১.১২.৫৪	২০০
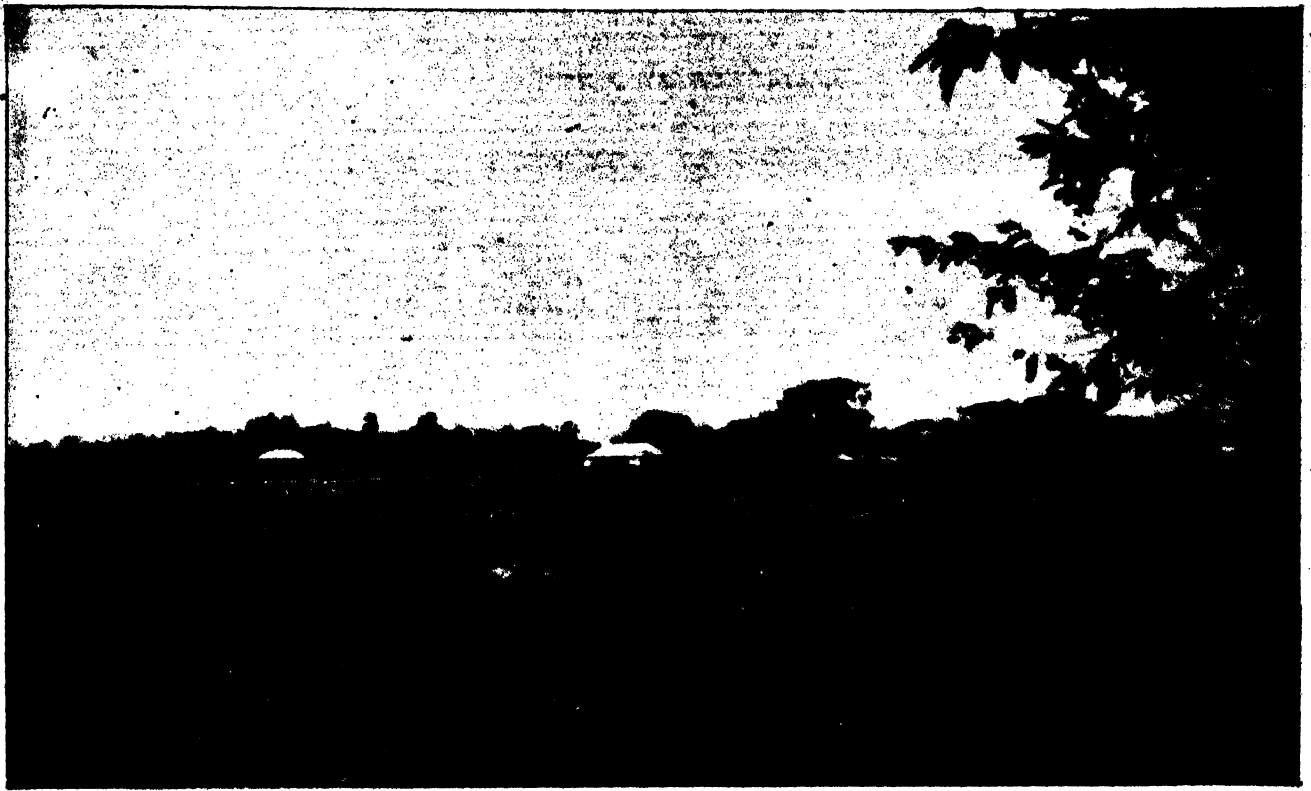
কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত শিল্প ট্রাইবুনাল সারা বছর কাজ করেছে। শ্রমিকদের দাবি ছিল ১৯৪৮ সালের কনসিলিয়েশন বোর্ডের রায় সংশোধন করা। এই দাবি বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য ট্রাইবুনাল উদ্যোগী ছিল।

১৯৫৬-৫৭ রিপোর্ট। ১৯৫৬ সালের শ্রম-সমপর্ব :

কলিয়ারির নাম	ধর্মঘট কবে শুরু	ধর্মঘট কবে শেষ	কত শ্রমিক
১। পরাসিয়া ও সাউথ পরাসিয়া	৩.১.৫৬	৯.২.৫৬	৮০০
২। ভিক্টোরিয়া ওয়েস্ট	২০.২.৫৬	২২.২.৫৬	১৩০
৩। জামুরিয়া এ ও বি ৮ নং পিট	২.৫.৫৬	৩.৫.৫৬	২৯৭১
৪। জামুরিয়া ৭ ও ৮ নং পিট	২.৫.৫৬	৩.৫.৫৬	১৬৯০
৫। সাউথ ইস্ট বরাবনী খাস	২৮.৫.৫৬ (১ম শিফ্ট)	২৮.৫.৫৬ (২য় শিফ্ট)	২৬৮
৬। জামুরিয়া এ, বি, সি, পিট	৪.৬.৫৬	৮.৬.৫৬	৩০৪১
৭। জামুরিয়া ৭ ও ৮ পিট	৪.৬.৫৬	৮.৬.৫৬	১৪৫২
৮। অণ্ডালপুর	৪.৬.৫৬	৮.৬.৫৬	১৬৩৩
৯। জামুরিয়া ওয়ার্কশপ	৪.৬.৫৬	৮.৬.৫৬	১৬৯
১০। ওয়েস্ট জামুরিয়া	৪.৬.৫৬	৮.৬.৫৬	১৪৯৬
১১। জামুরিয়া এ, বি, সি, পিট	২৬.৬.৫৬ (২য় শিফ্ট)	২৭.৬.৫৬ (সকাল ১০.৩০)	১৪৮৮
১২। জামুরিয়া ৭ ও ৮ পিট	২৬.৬.৫৬ (২য় শিফ্ট)	২৭.৬.৫৬ (সকাল ১১.৩০)	১৩৩৪
১৩। চরণপুর	২৬.৬.৫৬	২৭.৬.৫৬	১৬৩৪
১৪। শ্যামসুন্দরপুর	১১.৭.৫৬	১৫.৭.৫৬	১৫০
১৫। জামুরিয়া এ ও বি পিট	১৯.৭.৫৬	১৯.৭.৫৬ (সন্ধ্যা ৮টা)	১৪১৩
১৬। খাস শীতলপুর	১৭.৭.৫৬	২৩.৭.৫৬	২৯০
১৭। খান্দ্রা শীতলপুর	১৭.৭.৫৬	২৩.৭.৫৬	৮৫
১৮। জামুরিয়া এ ও বি পিট	১৫.৭.৫৬	১৬.৭.৫৬	৬৭
১৯। জামুরিয়া ৭ ও ৮ পিট	১৫.৭.৫৬	১৬.৭.৫৬	৩৩
২০। অণ্ডালপুর	১৫.৭.৫৬	১৬.৭.৫৬	৪৫
২১। পিওর জামবাদ	২৪.৭.৫৬	২৮.৭.৫৬	৯০৯
২২। শ্যামসুন্দরপুর	২৭.৮.৫৬	২৯.৮.৫৬	৩০২
২৩। কাজোরা সিলেক্টেড	৬.৯.৫৬	১১.৯.৫৬	৫০০
২৪। ম্যাকনীল বেরি লি-এর ১৮ কলিয়ারি	১৭.৯.৫৬	১৫.১০.৫৬	৩৬০০০
২৫। ম্যাকনীল বেরি লি-এর ৭ কলিয়ারি	১৭.৯.৫৬	১৫.১০.৫৬	আনুঃ
২৬। শীতলদাসজী সিলেক্টেড	২৫.৯.৫৬	৩.১০.৫৬	২৫০
২৭। সিজারন কলিয়ারি	৭.১১.৫৬	৯.১১.৫৬	৮৬

১৯৫৭-৫৮ সালের রিপোর্ট। ১৯৫৭ সালে কলিয়ারিতে শ্রম-সমপর্ব:

সার্কেল	কলিয়ারি	ধর্মঘট কবে থেকে	ধর্মঘট কবে শেষ	কত শ্রমিক জড়িত	কতদিন স্থায়ী
আসানসোল	সাউথ কেন্দা	৮.৫.৫৭ (১ম শিফট)	১১.৫.৫৭	২২০	৩ দিন
(আসানসোলের পশ্চিমে)	ঐ	১২.৬.৫৭ (১ম শিফট)	১২.৬.৫৭ (২য় শিফট্)	২২০	১ম শিফট শুধু

১৯৫৮-৫৯ সালের রিপোর্ট ১৯৫৮ সালের শ্রম-সমপর্বের চিত্র :

কলিয়ারির নাম	ধর্মঘট কবে শুরু	ধর্মঘট কবে শেষ	কতদিন স্থায়ী	কত জন জড়িত
১। শ্যামসুন্দরপুর	২৭.১২.৫৭	১৫.১.৫৮	১৭	১৮৩
২। বেগুনিয়া	১০.১.৫৮	১১.১.৫৮	২	৪০৮
৩। সাউথ কেন্দা	১২.২.৫৮	১৫.২.৫৮	৪	১২০
৪। জয়পুরিয়া কাজোরা	১৭.৩.৫৮	২৬.৩.৫৮	৯	৬০০
৫। পিওর শামনা	১১.৩.৫৮	১২.৩.৫৮	২	১৮৪
৬। শালতোড়	৩১.৩.৫৮	১.৪.৫৮ (সকাল)	১	১৪০০
৭। কারাবাদ	৭.৪.৫৮	২২.৪.৫৮	২১	১৭৫
৮। কাস্তা	১৫.৪.৫৮	১৯.৪.৫৮	৫	১৩৫
৯। মিঠাপুর	৮.৫.৫৮	১৯.৫.৫৮	১০	৩০০
১০। ইস্ট জেমেহারি	৩০.৫.৫৮	২.৬.৫৮	১	৩০০
১১। মিঠাপুর	১৭.৬.৫৮	চলতে থাকে	১৬৫	২০০
১২। মদনপুর	৭.৭.৫৮	১০.৭.৫৮	৪	২০০
১৩। ডানোরা	২৮.৭.৫৮	২৯.৭.৫৮	১	২১
১৪। সিলেক্টেড কাজোরা জামবাদ	২৪.৮.৫৮	২৮.৮.৫৮	[illegible]	৩৫
১৫। ডানোরা	২৩.৮.৫৮	২৫.৮.৫৮	১	২২০
১৬। জয়পুরিয়া কাজোরা	১৩.৯.৫৮	১৪.৯.৫৮	২	৫০০
১৭। নর্থ জামবাদ	৪.১০.৫৮	৮.১০.৫৮	৫	৪৫০
১৮। ইস্ট নিমচা	৮.১০.৫৮	৯.১০.৫৮	২	৬৬৬
১৯। সিলেক্টেড কাজোরা জামবাদ	৮.১০.৫৮	৮.১০.৫৮	১	২৪
২০। ঐ	১৪.১০.৫৮	১৫.১০.৫৮	২	৩৪৬
২১। সিয়ারাশোল	৮.১১.৫৮	১০.১১.৫৮	২	২৮০
২২। নর্থ জামবাদ	১১.১২.৫৮	২৯.১২.৫৮	১৬	৩৫০

১৯৫৯ সালে ১৫টি ধর্মঘট হয়। ৯টি ১ দিন, ১টি ২ দিন, ২টি ৩ দিন, ১টি ৫ দিন, ১টি ২০ দিন, ১টি ৩৭ দিন স্থায়ী ছিল। বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

কলিয়ারির নাম	কবে শুরু হয়	কবে শেষ হয়	কতদিন স্থায়ী	কতজন ধর্মঘটী
১। ধেমোমেন কলিয়ারি	১৩.৩.৫৯ (সকাল ৮টা)	১৩.৩.৫৯ (সন্ধে ৬টা)	১	৩৩৪
২। মহাবীর	৮.৬.৫৯	১৯.৭.৫৯	৩৭	৩৭৫
৩। গজদার কাজোরা	২২.৬.৫৯	২২.৬.৫৯	১	২০০
৪। রিয়াল জামবাদ	১৬.৭.৫৯	১৬.৭.৫৯	১	১০০
৫। জে কে নগর	২৪.৭.৫৯	২৪.৭.৫৯	১	২৫০
৬। খাস চলবলপুর	৬.৮.৫৯	১১.৮.৫৯	৫	২০০
৭। সিলেক্টেড কাজোরা জামবাদ	৪.৮.৫৯	৬.৮.৫৯	৩	৬০০
৮। চুরুলিয়া	১৯.৮.৫৯	১৯.৮.৫৯	১	৪৭
৯। রিয়াল জামবাদ	১৮.৮.৫৯	১৮.৮.৫৯	১	৮
১০। নিউ জেমেহারি	২২.৮.৫৯	২২.৮.৫৯	১	৪১
১১। ইস্ট নিমচা	১৪.১০.৫৯	১৫.১০.৫৯	২	১৫০
১২। পি সি দত্ত কাজোরা	১০.১১.৫৯	১০.১১.৫৯	১	১৯৩
১৩। বি এন মণ্ডল'স সাঁকতোরিয়া	২১.১১.৫৯	২১.১১.৫৯	১	৮৬
১৪। ঐ	৩০.১১.৫৯	২২.১২.৫৯	২০	৮৬৫
১৫। খাস চলবলপুর	২২.১২.৫৯	২৪.১২.৫৯	৩	৩৫০

১৯৬১-৬২ রিপোর্ট। ১৯৬১ সালের শিল্প-সম্পর্ক ধর্মঘটের খতিয়ান

কলিয়ারির নাম	করে থেকে শুরু	কবে শেষ	কতদিন স্থায়ী	কত লোক জড়িত	
				প্রত্যক্ষ	অপ্রত্যক্ষ
১। সাউথ শামলা	৩০.১১.৬০	২২.৩.৬১	৪৪ দিন	২৩০	১২০
২। বেগুনিয়া কলিয়ারি	৭.৩.৬১	৭.৩.৬১	১ দিন	১২৫	—
৩। ওয়েস্ট জামুরিয়া	২০.৩.৬১	২১.৩.৬১	২ দিন	৫৮৫	৭৪
৪। অখলপুর	২১.৩.৬১	২১.৩.৬১	১ দিন	১০৬৪	—
৫। শিয়ারশোল	১৭.৫.৬১	১৭.৫.৬১	১ দিন	১৫০	—
৬। নিউ জেমেহারি	৭.৬.৬১	৭.৬.৬১	১ দিন	২০০	—
৭। দত্ত'জ সেন্ট্রাল কাজোরা কলিয়ারি	৭.৭.৬১	১০.৭.৬১	৩ দিন	২০০	—
৮। ইস্ট জামবাদ	১২.৮.৬১	১৬.৮.৬১	৪ দিন	৩০০	—
৯। সিলেক্টেড জেমেহারি খাস	২২.১১.৬১	২৩.১১.৬১	২ দিন	২৬	২৭০

১৯৬৩ সালে ধর্মঘটের খতিয়ান

কলিয়ারির নাম	কবে থেকে শুরু	কবে শেষ	বিরোধীয় বিষয়	নিযুক্ত শ্রমিক	নষ্ট শ্রমদিবস	নষ্ট মজুরি টা.	নষ্ট উৎপাদন টা.	কীভাবে মীমাংসা হল
১। ডি'ব্রাইট্‌স্‌ রানা কলিয়ারি, পোঃ চরণপুর, বর্ধমান	২৮.১.৬৩ (১ম শিফট)	২৮.১.৬৩ (২য় শিফট)	২১.১.৬৩ তারিখের মজুরি ১০ জন মাইনারকে না দেওয়া। অজুহাত তারা টব বোঝাই করেনি। ইউনিয়নের বক্তব্য তাদের ঘর দেওয়া হয়নি।	৩৫৯	৩০৮	১২৬৩.০০	৪৩৬০.০০	শিল্পবিরোধ মীমাংসা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ
২। চুরুলিয়া কলিয়ারি, চুরুলিয়া	২৬.৩.৬৩	৩০.৩.৬৩	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরি দিতে ব্যর্থতা	২৫০	৫৬৫	২৫০০.০০	৪৫০০.০০	ঐ
৩। সামনা কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	৭.৪.৬৩	৮.৪.৬৩	ছুটির দিনে স্ট্যাগারিং কাজ	৪৫০০	৩০০	১২০০.০০	পাওয়া যায়নি	ঐ
৪। ঐ	২৫.৪.৬৩	২৫.৪.৬৩	সব ওয়াগন লোডারের হাজিরা না করা	৪৫০০	২০০	১৬০০.০০	ঐ	ঐ
৫। জমিহানি খাস কলিয়ারি, জে কে নগর, বর্ধমান	১.৬.৬৩	৩.৬.৬৩	বোনাস না দেওয়া	৩৭০	৪৮৫	২০০০.০০	১২০০.০০	ঐ
৬। নর্থ ছোরা কলিয়ারি, উখরা, বর্ধমান	১৯.৬.৬৩	২১.৬.৬৩	মজুরি, বোনাস না দেওয়া	২০০	৪০০	১৫০০.০০	৬০০.০০	ঐ
৭। রিয়াল জামবাদ কলিয়ারি, বহুনা	২৬.৬.৬৩	২৮.৬.৬৩	নির্দিষ্ট দাবি নেই	৬৬০	৬৪	২২০.০০	২৮৬০.০০	শ্রমিকরা নিজেরাই কাজে যোগ দেয়
৮। শালতোড় কলিয়ারি, শালতোড়	১৩.৮.৬৩	১৫.৮.৬৩	ওয়াগন লোডিং বাবু শ্রমিকদের সঙ্গে কথিত অসদ্ব্যবহার	১৮৩২	২৪০	৪৯২.৯১	—	শ্রমিকেরা বিনা শর্তে কাজে যোগদান করে·
৯। পাটমোহনা কলিয়ারি, আসানসোল	২০.১১.৬৩	২৩.১১.৬৩	C.M.U.-র ২জন শ্রমিককে কথিত আক্রমণ	১০০০	৯৮৪	৪০৬৮.০৫	১৯৩৭৫.৫৫	শ্রম-সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যস্থতায় শ্রমিকরা কাজে যায়।
				১৩,৬৭১	৩৫৪৬			

১৯৬৪ সালের কলিয়ারি ধর্মঘটের খতিয়ান (টা. প.)

কলিয়ারির নাম	কবে থেকে শুরু	কবে শেষ	বিরোধীয় বিষয়	নিযুক্ত শ্রমিক	নষ্ট শ্রমদিবস	নষ্ট মজুরি টা.	মাসের উৎপাদনের মূল্য টা.	মীমাংসার উপায়
১। জামবাদ কলিয়ারি, বহুলা	৯.৬.৬৪	১১.৬.৬৪	ব্লাস্টেড কয়লা বোঝাই করতে কথিত অস্বীকৃতি	২৫০	১৭৮	৭২০.০০	৪৫০০.০০	আপস মীমংসা
২। সাউথ সামলা কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	১১.৬.৬৪	১২.৬.৬৪	বর্ধিত মজুরি না দেওয়ার অভিযোগে	৬১৫	৫১৫	২০০০.০০	৭০০০০.০০	CIRM-এর হস্তক্ষেপে (কেন্দ্রীয় শিল্প-সম্পর্ক ব্যবস্থা)
৩। ইস্ট শীতলপুর কলিয়ারি, উখরা	২৬.৬.৬৪	২৭.৬.৬৪	নতুন লোডার ভর্তির অভিযোগ	১১৫৪	৫৮	২৪০.০০	১৫০০.০০	আপস মীমাংসা
৪। বেবিসোল কলিয়ারি, অণ্ডাল	১.৭.৬৪ (৮.০৮ সকাল	১.৭.৬৪ (১০টা সকাল)	মজুরির দাবিতে	৫২৫	১৬	১৩৫.০০	—	বিনা শর্তে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে
৫। লোয়ার কেন্দা কলিয়ারি, কাজোরাগ্রাম	২২.৭.৬৪ (বিকাল ৪টা)	২২.৭.৬৪ (১২ মধ্যরাত্রি)	একজন লোডারের কর্মচ্যুতির অভিযোগ	৭০০	৪২	১৮৩.০০	২১৬২.০০	ঐ
৬। চাপতোরিয়া কলিয়ারি, সালানপুর	২৫.১১.৬৪ (সকাল ১ টা)	২৫.১১.৬৪ (সকাল ১১.৩০)	স্বামীনাথ আহীরের উপর থেকে মাস পেনশন অর্ডার প্রত্যাহার দাবি	১৬৪	৪৬	১৮৯.০২	৬৯০.০০	CIRM-এর মাধ্যমে।
৭। বেবিসোল কলিয়ারি, অণ্ডাল	২.১১.৬৪	৩.১১.৬৪	বিকল্প কাজ স্বীকার না করার অভিযোগ	৪২৪	১৩৬	৫৪৪.০০	৪২০৯.০০	ঐ
৮। ঐ	৫.১১.৬৪	৫.১১.৬৪	মাইনিং সর্দারের অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি	৪২৪	৫৮	২৩২.০০	৪০০০.০০	ঐ
৯। ঐ	৭.১১.৬৪	৭.১১.৬৪	ঐ	৪২৪	৮৩	৩৩২.০০	৪১৪০.০০	ঐ
১০। কাঁকরতলা কলিয়ারি, কাঁকরতলা	১৬.১১.৬৪	১৬.১১.৬৪	বাইরেব উস্কানিতে কাজ বন্ধ	২২৫	৬০০	২৪০০.০০	২৩৩০.০০	শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়
১১। নিউ জেমেহারি খাস কলিয়ারি, জে কে নগর	২০.১১.৬৪	৯.১২.৬৪	শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেয়	৫১৭	৫৭৮০	২৪৮৮০.০০	১২৬১৭৫.০০	CIRM-এর হস্তক্ষেপ

কয়লাখনিতে ধর্মঘট : ১৯৬৫

কলিয়ারির নাম	কবে থেকে শুরু	কবে শেষ	বিরোধীয় বিষয়	শ্রমিকসংখ্যা	নষ্ট শ্রমদিবস	নষ্ট মজুরি টা.	মাসের উৎপাদনের মূল্য	মীমাংসার মাধ্যম হল
১। সামনা রামনগর কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	২৫.৫.৬৫ (সকাল ১০টা)	২৫.৫.৬৫ (সন্ধ্যা ৬টা)	৪জন লোডারের নিযুক্তিতে আপত্তি	৬৫০	১৪০	৬০০.০০	১৬০০,০০	শ্রমিকরা বিনা শর্তে কাজে যোগদান করে
২। সামনা ডালুরবাঁধ কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	২৮.৬.৬৫	২৯.৬.৬৫	অজ্ঞাত	৭৩৭	২০০	৯০০.০০	১৬০০.০০	ঐ
৩। মাউবডি কলিয়ারি, দিশেরগড়	২১.৭.৬৫ (সকাল ৮টা)	২১.৭.৬৫ (বিকাল ৪টা)	মার্চ ১৯৬৫-তে শেষ ত্রৈমাসিকের দরুন প্রাপ্য বোনাস না পাওয়া	২২৫	৭০	৩৫০.০০	১০০০,০০	সহকারী লেবর কমিশনারের হস্তক্ষেপে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত
৪। সামনা ডালুরবাঁধ কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	১৬.৭.৬৫ (২য় শিফট)	১৭.৭.৬৫ (২য় শিফট)	ম্যানেজমেন্ট জানে না	৭৫০	১১০	৫১২.০০	২২৮২.০০	ঐ
৫। সামনা রামনগর কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	১.৯.৬৫ (বিকাল ৪টা)	২.৯.৬৫ (বিকাল ৪টা)	শ্রমিকরা যথেষ্ট সংখ্যক ওয়ার্কিং ফেস জারি করে	১০০০	১৬৯	৮৪০.০০	৩৭৪১.৯১	ঐ
৬। ভানোরা এন্ড সাউথ ভানোরা কলিয়ারি, চরণপুর	২৭.১০.৬৫ (সকাল ৮টা)	২৮.১০.৬৫ (সকাল ১১টা)	এক ঝগড়ার পরিণতিতে শ্রমিকরা জনৈক সুপারভাইজারি স্টাফের তৎক্ষণাৎ বরখাস্তের দাবি করে	২৫২০	২৫২০	১৫০০০.০০	৩৮৫০০.০০	এ এন সি আসানসোলের হস্তক্ষেপে বিনা শর্তে মিটে যায়
৭। সামনা ডালুরবাঁধ কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	২.১১.৬৫ (৩য় শিফট)	৩.১১.৬৫ (৩য় শিফট)	একজন শ্রমিকের বরখাস্তের জন্য	৭৩০	৬২	২৫০.০০	১৫০০.০০	বিনাশর্তে শ্রমিকরা কাজে যান
৮। ইস্ট সাতগ্রাম কলিয়ারি, জে কে নগর	১৬.১১.৬৫ (২য় শিফট)	১৬.১১.৬৫ (২য় শিফট)	১২ জন সাসপেন্ডেড শ্রমিক অন্য শ্রমিকদের কাজে যেতে বাধা দেয়	৯০৮	৪৪	১৮৭.০০	৭৪৮.০০	ঐ
৯। ওয়েস্টার্ন কাজোরা কলিয়ারি, রানীগঞ্জ	১৬.১২.৬৫	১৭.১২.৬৫	টব সরবরাহ যথেষ্ট নয়	৫০০	৬০	৩৬২.১০	১২০০.০০	ঐ
১০। রামনগর কলিয়ারি, পাণ্ডবেশ্বর	১৫.১২.৬৫ (দুপুর ১২টা)	১৫.১২.৬৫ (বিকাল ৪টা)	লে-অফ সময়ের জন্য পুরা বেতন	১০০০	১০০	৫০০.০০	১৮৪২.৪০	ঐ

১৯৬০ জুন ১ থেকে কার্যকর মোট আয় (এমলুমেন্টস্) : সকল ক্যাটাগরির জন্য (টা. নপ. হিসাবে)

ক্যাটেগরি	মূল মজুরি	মাগ্‌গীভাতা	অতিরিক্ত মাগ্‌গীভাতা	আন্ডারগ্রাউন্ড ভাতা	সার্ফেস শ্রমিকের মোট দৈনিক মজুরি*	আন্ডারগ্রাউন্ড শ্রমিকের মোট দৈনিক মজুরি	বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ৬ বছর অবধি (মূল মজুরির উপর)	মন্তব্য
I.	১.০৬	১.৫৯	০.৩৭	০.১৩	৩.০২	৩.১৫	০.০৩	
II.	১.০৯	১.৬৪	০.৩৭	০.১৪	৩.১০	৩.২৪	০.০৫	
III.	১.১৯	১.৭২	০.৩৭	০.১৫	৩.২৮	৩.৪৩	০.০৮	
IV.	১.২৫	১.৭২	০.৩৭	০.১৬	৩.৩৪	৩.৫০	০.০৯	
V.	১.৩১	১.৭২	০.৩৭	০.১৬	৩.৪০	৩.৭৬	০.০৯	
VI.	১.৩৭	১.৭২	০.৩৭	০.১৭	৩.৪৬	৩.৬৩	০.১০	
VII.	১.৮৭	১.৮৭	০.৩৭	০.২৩	৪.১১	৪.৩৪	০.১২	
VIII.	২.২৫	১.৯২	০.৩৭	০.২৮	৪.৫৪	৪.৮২	০.১৪	
IX.	২.৭৫	১.৯২	০.৩৭	০.৩৪	৫.০৪	৫.৩৮	০.১৪	
X (MLY).	৮৫.০০	৫৬.৬৬	৯.৭৫	১০.৬২	১৫১.৪১	১৬২.০৩	৫.০০	

মূল মজুরির শতকরা হিসাবে মাগ্‌গীভাতা

মাসিক মূল মজুরি	মূল মজুরির শতকরা হিসাবে মাগ্‌গীভাতা	ন্যূনতম
টা. ৩০.০০ অবধি	১৫০%	টা. ....
টা. ৩০.০০—৫০.০০ অবধি	১০০%	টা. ৪৫.০০
টা. ৫০.০০—১০০ অবধি	৬৬২/৩%	টা. ৫০.০০
টা. ১০০.০০—৩০০.০০ অবধি	৪০%	টা. ৬৭.০০

(এ এম বি এইচ রিপোর্ট ১৯৬০-৬১, পার্ট-টু, পৃ. ২২)

সূত্র-নির্দেশ

১। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ; পরিবেশক, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা-৯[১]। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯০, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ১-২২।
২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩
৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩-১৭
৪। রিপোর্ট অন অ্যান এনকোয়ারি ইনটু কন্ডিশনস অব লেবর ইন দ্য কোল মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া বাই এস আর দেশপান্ডে, ডাইরেক্টর, কস্ট অব লিভিং ইনডেক্স স্কিম, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৪৫, পৃঃ ৭।
৫। ওই
৬। ওই
৭। ওই পৃঃ ১৮
৮। ওই
৯। ওই পৃঃ ২১
১০। ওই, পৃঃ ২১ ; ড. বি আর শেঠ প্রণীত লেবর ইন ইন্ডিয়ান কোল মাইনস (পৃঃ ২৭) থেকে দেশপাণ্ডে রিপোর্টের ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
১১। দেশপাণ্ডে রিপোর্ট, পূর্বে আলোচিত, পৃঃ ২২
১২। ওই ; রিপোর্ট অন দ্য রয়াল কমিশন অন লেবর, পৃঃ ১১৮ ও বিহার লেবর এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট, ভল্যুম ১, পৃঃ ১৮৭।
১৩। দেশপাণ্ডে রিপোর্টের ২৭ পৃষ্ঠায় বিহার লেবর এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট (পৃঃ ১৮৬)।
১৪। ওই
১৫। ওই, অধ্যায় ৫
১৬। ওই, অধ্যায় ৬
১৭। ওই, পৃঃ ১৮৬

'So far as one can see, untravelled private enterprise which has had a free run for over a century has been tried and found wanting. The picture of labour conditions to be found in this Report is one of light and shade—were shade than light. In the larger interests of the country, therefore, the state has to play a more active and energetic role in laying down and enforcing certain minimum standards of work, wages an welfare than it has done so far.'

১৮। দেশপাণ্ডে রিপোর্ট, অধ্যায় ৯, পৃঃ ১০৫-৬
১৯। রিপোর্ট অব দ্য স্টাডি গ্রুপ ফর কোল : ন্যাশনাল কমিশন অন লেবর, ১৯৬৮, পৃঃ ১০
২০। রিপোর্ট অব দ্য স্টাডি গ্রুপ ফর কোল : ন্যাশনাল কমিশন অন লেবর (১৯৬৮), পৃঃ ১১
২১। ওই
২২। ওই, পৃঃ ১৩
২৩। ৪-৫ জুন ১৯৮৪ কো কোয়লা মজদুরোঁ কি দেশব্যাপী হড়তাল কোঁ ? —এস কে পান্ডে (প্রকাশক, অল ইন্ডিয়া কোল ওয়ার্কস ফেডারেশন, এপ্রিল ১৯৮৪।

বর্ধমান জেলায় কয়লাশিল্পের বিকাশের ধারা

(আদিপর্ব)

প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত

বর্ধমানবাসী হিসাবে এটা আমাদের গৌরবের বিষয় যে, ভারতবর্ষের মাটিতে বাণিজ্যিকভাবে কয়লাশিল্পের প্রথম সূত্রপাত ঘটে এই বর্ধমান জেলার বর্তমান রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই। এ বিষয়ে গর্ব করার অবকাশ যেমন আছে, তেমনই এই গর্ব করার অধিকার আমাদের কতখানি আছে সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য থেকে যায়। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীমহল পাট, বয়ন, এমনকি সুদূরে অবস্থিত চা শিল্পের আর্থ সামাজিক প্রভাব নিয়ে প্রচুর বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কয়লাশিল্প নিয়ে অনুরূপ আলোচনার স্বল্পতা নিশ্চয়ই পীড়াদায়ক। এই দায়িত্ববোধের প্রেক্ষাপটেই আমার এই প্রচেষ্টা। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় তা জানি, আরও ভাল করে জানি ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতা এবং বিশ্লেষণে পারদর্শিতার অপূর্ণতা।

১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর উদ্যোগে বেসরকারিভাবে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পায় ১৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে। এই উদ্যোগ এবং তার পরিপূরণের বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের শস্যভূমি এবং তা থেকে কর আদায় সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে

তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মোদ্যোগকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অপরদিকে তৎকালীন যুগে কয়লার প্রয়োজনও ছিল সীমাবদ্ধ এবং এই প্রয়োজন মেটাতে কাঠকয়লা এবং ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত কয়লা। সুতরাং ইংল্যান্ডের কয়লাশিল্পের বিক্রির বাজার ছিল ভারতবর্ষ। সেই শিল্পপতিরা এই বাজার হাতছাড়া করতে চায়নি। ব্রিটিশ সরকারও এই শিল্পপতিদের স্বার্থে আঘাত হানতে চাননি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটা পট পরিবর্তন ঘটে। ফরাসিদেশের শাসক প্রথম নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে জব্দ করার জন্য বাণিজ্যিক অবরোধ নীতি গ্রহণ করে। ইংল্যান্ডের সরকার এর প্রত্যুত্তরে ফরাসিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে কয়লা আগমনে বাধা সৃষ্টি হয়। ১৮০৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক সমিতি বাংলাদেশের গভর্নরকে কয়লা অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এই প্রেক্ষাপটেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগেই জোনস্ (Johns) নামে এক যন্ত্রকুশলীকে নতুন করে কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিঃ জোনস্ ১৮০০ খ্রিঃ কলকাতায় এসেছিলেন John কোম্পানির যন্ত্রবিদ হিসাবে। কিন্তু তিনি হাওড়াতে একটি Canvas Factory গড়ে তোলেন। তিনি খুব ভাল বাংলা বলতে পারতেন এবং হাওড়ার লোকেরা তাঁকে 'গুরু জোনস্' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই জোনস্‌কে রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। জোনস্ বর্ধমানের রানীর কাছ থেকে ৯৯ বিঘা জমি লিজ হিসাবে নিয়ে কয়লা অনুসন্ধানে ব্রতী হন। ১৮১৬ খ্রিঃ তিনি সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে তিনি বলছিলেন যে 'আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল চিনাকুড়ি এবং মুদগা (Mudgeah) অঞ্চলে কয়লা অনুসন্ধানের জন্য।....................... আমি এই দুই অঞ্চলেই কয়লা অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।' তিনি ৩৯ ফুট ভূ-অভ্যন্তরে কয়লা অনুসন্ধান করেন। শেষপর্যন্ত তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে এই অঞ্চলের কয়লা ইংল্যান্ডে উৎপাদিত কয়লার সমগুণসম্পন্ন। তিনি গড়ে দুটি দলে ভাগ করে ৯৮ জন শ্রমিককে নিয়ে কাজে নেমেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে রাত্রিবেলা ভালুক এবং বাঘের ভয়ে শ্রমিকরা কাজ করতে চাইত না বলে মিঃ জোনস্ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মিঃ জোনস্ যদিও গভীর নিষ্ঠা এবং পারদর্শিতার সঙ্গে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিন্তু তার ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাব ছিল। তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হলেও তিনি ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়লেন এবং দায়িত্ব থেকে সরে এলেন।

মিঃ জোনস্ যখন কয়লা অনুসন্ধান করছিলেন সেইসময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার অবস্থিতির কথার উল্লেখ আছে। Reverend R. Everest—'Geological Observations made on a journey from Calcutta to Ghazipur' প্রবন্ধে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার স্তরগুলি পুড়ে যাওয়াকে তিনি 'Volcanic Eruption' বলে বর্ণনা করছে। Dr. F. Royle ১৮৩৯ খ্রিঃ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে চিনাকুড়ির খনি অঞ্চলের কথা বর্ণনা করেছেন। চিনাকুড়ি থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত ভূতলে কয়লা আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ১৮৩৫ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত—'Report of the Committee for investigating the coal and Mineral resources of India'-তে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে আসামের সিলেট অঞ্চলের কয়লা রাণীগঞ্জ অঞ্চল থেকে বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু তাদের এই ধারণা যে সঠিক নয় তা পরবর্তীকালে Dr. W. T. Blanford বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তিনি অবশ্য রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। Mr. J. Homfray ১৮৪২ খ্রিঃ 'Journal of Asiatic Society of Bengal'—এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাশিল্পের বিকাশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন।

১৮৪০-এর দশক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ইংল্যান্ডের অনুরূপ ভারতে Museum of Economic Geology প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবনা-চিন্তা করেছিলন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া, নমুনা সংগ্রহ করা এবং উৎপাদন পদ্ধতির কলাকৌশল রপ্ত করা। এই প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হয় Geological Survey of India। ১৮৪৫-৪৬ সালে সর্বপ্রথম D. H. Williams রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা চালান এবং একটি মানচিত্র তৈরি করেন। পরবর্তীকালে Mr. Blanford (১৮৫৮-৬০) আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করে কয়লার গুণগতমান পরীক্ষা করে তার শ্রেণীবিন্যাস করেন। ১৮৬১ সালে Mr. G. A. Stonier আরও অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ১৯০৫ সালে কয়লার বিস্তৃতি নির্দেশ করে মানচিত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৫-২৮ সালে Dr. E. R. Gee রাণীগঞ্জ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে এক বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ('Geology and Coal resources of the Rani Coalfield')।

১৮২৪ সালে 'Jessop & Company' দামুলিয়া এবং নারায়ণপুরে কয়লা খননের কাজ শুরু করে। এই কোম্পানি পরবর্তীকালে কয়লা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। কয়লাখনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক ছেদ হলেও এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু কয়লাখনি অঞ্চলে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করতে শুরু করে। জেশপ কোম্পানির কাছ থেকে খনি অঞ্চল কিনে নেয় Gilmore, Homfray & Co. এরা কয়লা উৎপাদন শুরু করে। Erskine & Co. প্রথমে নীল চাষ করে পুঁজি সংগ্রহ করছিল। কিন্তু নীলবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তারা নীলচাষ ছেড়ে কয়লাখনির ব্যবসায়ে এগিয়ে আসে।

মঙ্গলপুর অঞ্চলে তারা কয়লাখনির কাজ শুরু করে। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তির উপরেই গড়ে উঠেছিল 'বীরভূম কোল কোম্পানি'। তপসী, জোড়জোনাকি, বাঁশড়া ,বং পুরানদীপ অঞ্চলে খননকার্য শুরু করে 'Old East India Coal Company'। এরা ব্যর্থ হওয়ার পর এদের সম্পত্তির উপরেই গড়ে উঠেছিল Raneegunge Coal Association। চৌকিডাঙা এবং তপসীর কাছে খননকার্য শুরু করে Dhoba Coal Comany। বর্ধমান জেলার কালনার কাছে গুড়ের কারখানা ছিল। এই কারখানায় তারা কয়লা রপ্তানি করত। এই কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় Nicol & Sage-এর কাছে। এরা আবার ধোসুল অঞ্চলে খননকার্য শুরু করে। এই সম্পত্তির উপরেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল Equitable Coal Company। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা উৎপাদনে এই কোম্পানির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Bengal Coal Company-র একচেটিয়া আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এদের আবির্ভাব কয়লাভূমিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

সমকালীন নথিপত্র থেকে জানা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কয়লাশিল্পের বিস্তার রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি হল এগারা, রঘুনাথচক, নিমচা, জামাড়ি, সাতগ্রাম, মঙ্গলপুর, জোড়জোনাকি, বাঁশরা, চরণপুর, চৌকিডাঙা, ধোসুর, কস্তুরিয়া, বোবিসোল, নিঙ্গা, দামুলিয়া, বরাবণী, রঘুনাথবাটি, চিনাকুড়ি, দামোদরকুন্ডা, চান্স ইত্যাদি অঞ্চলে। তখনও পর্যন্ত কিন্তু রুচিপুর, নিয়ামতপুর, দিশেরগড়, সীতারামপুর, সাক্‌তোড়িয়া অঞ্চলে তেমনভাবে কয়লার খননকার্য শুরু হয়নি।

কয়লাভূমিতে মহাবিদ্রোহের প্রভাব প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে। রাণীগঞ্জ অঞ্চল ছিল প্রাক্ মহাবিদ্রোহের কয়লাশিল্পের পীঠস্থান। মহাবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপীয় কর্মচারীরা বিহার অঞ্চলের বিদ্রোহের বিস্তৃতিতে আতঙ্কিত হল। দামোদর নদীপথে বিহার থেকে বিদ্রোহের ঢেউ রাণীগঞ্জে আসার সম্ভবনায় তারা নানারূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কয়লা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকরা রানীগঞ্জে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রান্তিক স্টেশন বলে উত্তরভারতগামী সৈন্যবাহিনী এখানে মোতায়েন হতে শুরু করে। রাণীগঞ্জ ইউরোপীয়দের এক নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হল। কিন্তু বিহারের পালামৌ অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। বেঙ্গল কোল কোম্পানি ওখানে কয়লাখনি প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে দায়িত্বে ছিলেন Mr. Greendy। বিদ্রোহীরা কয়লাখনি আক্রমণ করে। Mr. Greendy খনি ছেড়ে পালিয়ে যান। নীলাম্বর ও পীতাম্বর নামে দুই নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা রাজারা (Rajara) কয়লাখনি আক্রমণ করে। তারা ব্রিটিশদের আবাসস্থানে আগুন লাগিয়ে দেয়। খুব সম্ভবত Mr. Greendy নিহত হন। ব্রিটিশ সরকার বেঙ্গল কোল কোম্পানিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল রাজারার ক্ষয়ক্ষতির জন্য।

মহাবিদ্রোহের পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা কয়লা উৎপাদনে জোয়ার দেখতে পাই। ভারতে রেল যোগাযোগ না থাকায় বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী দ্রুত পাঠাবার জন্য জলপথে স্টিম বোটের সংখ্যা বেড়ে যায়। অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সমাপ্তি ও প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের পর রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা (১৮৫৭-১৮৬৬) দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিছু নতুন শিল্পও গড়ে উঠে। এর ফলে কয়লার চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কয়লা উৎপাদনে জোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৮৩৯ সালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ মন। ১৮৪৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ মন। কিন্তু ১৮৫৮-১৮৬০ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭,৮০৮,৫৬৬ মন। ওই সময়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা-উৎপাদনভূমির পরিমাণ ছিল ৫০০ বর্গমাইল। ৫০টি কয়লাখনি উৎপাদনের কাজ সক্রিয় ছিল। এই জোয়ারের চাপে বেঙ্গল কোল কোম্পানি তার ভূ-অভ্যন্তরস্থ কয়লা বহনের জন্য ৭২৫ ফুট দৈর্ঘ্য ট্রাম লাইন প্রতিষ্ঠা করেছিল। আরও লক্ষণীয় যে ১৮৫৮ সালে রাণীগঞ্জ এবং চিনাকুড়ি কয়লাখনি অঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যাও শতকরা ২৫ ভাগ বেড়ে যায়। ১৮৫৯ সালে বেঙ্গল কোল কোম্পানির কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,৩০,০০০ টন। গত পাঁচ বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণের প্রায় দুইগুণ বেশি।

এবার বেঙ্গল কোল কোম্পানির আবির্ভাব পর্ব নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। Mr. Jones সরকারের কাছ থেকে ৪০,০০০ হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে খনি অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছিলেন। এই অ্যাডভান্সের শর্ত ছিল যে তাঁকে ৬% সুদ দিতে হবে। Mr. Jones সবকারি টাকা ফেরত দিতে অপারগ হন। ১৮২০ সালে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এগিয়ে এল Messrs Alexander & Co. নামে একটি Agency House. তারা Mr. Jones-এর ঋণ পরিশোধ করে খনি খননের দায়িত্ব ও অধিকার লাভ করে। ১৮২৭ সালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০৭,০০০ হাজার মন। ১৮৩২ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ৪,০০,০০০ মন। প্রতি বছরে এই Agency House-এর লাভের পরিমাণ ছিল ৭০,০০০ টাকা। কিন্তু এই সময় ভারতের Agency Houseগুলি চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এই আবর্তে Alexander & Co. তাদের কয়লা সম্পদ (ভূমিসহ) বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এগিয়ে এলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩৬ সালের ২ জুলাই তিনি মাত্র ৭০,০০০ টাকার বিনিময়ে ওই সম্পত্তি কিনে নিলেন। Carr & Tagore Co. (যেটা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারতীয় যৌথ উদ্যোগে কয়লা উৎপাদনের কাজ শুরু হল। ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যান্ড ভ্রমণে যান এবং সেখানকার কয়লা উৎপাদন বিষয়ে ওয়াকিবহাল

হন। ফিরে আসেন ১৮৪৩ সালে। এর পরই শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বী Gilmore, Homfray & Co. -র সঙ্গে কয়লাভূমিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসানের প্রস্তুতিপর্ব, Carr & Tagore সংস্থার সঙ্গে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাভূমি দখল, নদীর ঘাট দখল, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে Homfray & Gilmore Company—যারা ছিল নারায়ণকুড়ির পরিচালক এবং Erskine Company-র (মঙ্গলপুর অঞ্চলে এদের কয়লাখনি ছিল) সঙ্গে মামলা, মোকদ্দমা এবং লাঠিয়াল নিয়ে লড়াই ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। এই বিরোধ ও শক্তিক্ষয়ের অবসান ঘটিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহযোগিতা ও ঐক্যের পরিমণ্ডল তৈরি করেন। এই প্রসঙ্গে William Princep-এর ভূমিকাও স্মরণীয়। ১৮৪৩ সালে Carr & Tagore এবং Gilmore, Homfray & Co.-র মিলনে জন্ম নিল Bengal Coal Company। সেই সময় এর মূলধন ছিল ১১ লক্ষ টাকা। রাণীগঞ্জের মাটিতে Bengal Coal Company-র জন্ম কয়লা শিল্প বিকাশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৮৭০ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত রাণীগঞ্জ কয়লা শিল্পবলয়ে ছিল 'রমরমা' যুগ। Apcar & Co. সীতারামপুরে খননকার্য শুরু করে। এই সংস্থাটি কিন্তু ছিল আর্মেনিয়ান সংস্থা। Birbhum Coal Company বেলোড়ি অঞ্চলে খননকার্য শুরু করে। এই বেলোড়ি ক্ষত্রিয় 'রায়'রা লুচিপুর অঞ্চলে খননকার্যে এগিয়ে আসে। 'Equitable Coal Company—কুমারডি, নিয়ামতপুর এবং দিশেরগড়ে খনি খুঁড়তে শুরু করে। মধু রায় এবং প্রসন্ন দত্ত বামুনডিহা অঞ্চলে খনির কাজ শুরু করে। 'Boria Coal Company' সালানপুর এবং শিবদাসপুরে কয়লা উৎপাদনে হাত লাগায়। Birds & Co. আলিপুর ও পানুরিয়াতে কাজ শুরু করে। 'South Barakar Coal Company' খননকার্য শুরু করে পাতলাবাড়ি অঞ্চলে। বেঙ্গল কোল কোম্পানি সোদপুর, সাকতোড়িয়া, দামোদরকুণ্ডা, চান্স এবং লুচিবাদ অঞ্চলে তাদের শিল্পকে সম্প্রসারিত করে। রাণীগঞ্জ অঞ্চল থেকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আসানসোল অঞ্চলের দিকে খনির কাজ এগিয়ে যায়। এরই সঙ্গে আমরা প্রশাসনে পরিবর্তন দেখতে পাই। ইতিপূর্বে রাণীগঞ্জ ছিল সাব-ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার, কিন্তু কয়লা শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসানসোলে স্থানান্তরিত হল সাব-ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার। আসানসোল, প্রশাসনের মধ্যমণিতে পরিণত হল। সেখানে গড়ে উঠল বিশাল রেলওয়ে কারখানা, যা একসময় এশিয়ার সর্ববৃহৎ রেল কারখানার গৌরব অর্জন করেছিল।

পরবর্তী অধ্যায়ে Bengal Coal Company রাণীগঞ্জ থেকে বিহারের পালামৌ পর্যন্ত তাদের কয়লা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে Andrew Yule এই কোম্পানির Managing Agent-এর দায়িত্ব নেয় এবং কয়লা শিল্প জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্বে বর্তমান ছিল। নিউ বীরভূম কোল কোম্পানি (New Beerbhum Coal Company) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে কিন্তু লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে রেজিস্ট্রি হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। The Equitable Coal Company প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, The Raneegunge Coal Association ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এবং The Barakar Coal Company ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। Balmer-Lawrie ছিল New Beerbhum Coal Company, Managing Agent 1955 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—এরপর এর দায়িত্ব নেয় Andrew Yule। Equitable Coal Company'-র Managing Agent ছিল Macneills। The Raneegunge Coal Association-এর Managing Agent ছিল Kilburs এবং The Barakar Coal Company-Managing Agent ছিল Birds.

কয়লা কোম্পানিগুলির গঠনতন্ত্র, Managing Agency Houseগুলির পরিচালন-পদ্ধতি ইত্যাদি জটিল বিষয় নিয়ে জার্মান, ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং কিছু ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে নাক না গলানোই ভাল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই ম্যানেজিং এজেন্ট ব্যবস্থা ভারত থেকে বিদেশে সম্পদ পাচারের একটা সূক্ষ্ম বাতাবরণ তৈরি করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা কৌশলগত হাতিয়ার। এর ফলে ভারতের শিল্পবিকাশও ঘটেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থপূরণ বেশি হয়েছিল না ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সে যাই হোক, মূল কথা হল রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে কয়লাশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

শ্রমিকদের জাত-পাত: পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতের কয়লা শ্রমিকদেরও ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হত। এরা জাতিগত দিক থেকে ছিল সমাজের নিম্নবর্গের লোক। ভারতের আদিযুগের রূপার খনির শ্রমিকরা সম্ভবত ক্রীতদাস ছিল। পাঞ্জাবের লবণের খনির শ্রমিকরা কিন্তু ছিল স্বাধীন এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে স্থানীয় বাউড়িরা প্রথম কয়লাখনির শ্রমিকেরা কাজ করতে শুরু করে। এরা নিম্নবর্গের হিন্দু। নৈতিকতার দিক থেকে এরা সাঁওতালদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল, কিন্তু বুদ্ধির দিক থেকে তারা ছিল তুলনামূলকভাবে অগ্রবর্তী। তারা ইঞ্জিন ড্রাইভার, পাম্পম্যান ইত্যাদি কাজে পারদর্শী ছিল। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে তাদের কোনও অনীহা ছিল না। কৃষিজীবী হলেও সাঁওতাল এবং কোলদের মতো তাদের কৃষিজমির প্রতি আকর্ষণ ততটা ছিল না।

রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়লা শিল্পের বিকাশের পূর্বেই সাঁওতালরা কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। এরা ছিল পরিশ্রমী এবং নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কৃষিজীবী হলেও খনি-শ্রমিক হিসাবে এরা যথেষ্ট সুনাম কিনেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর থেকেই কয়লা শিল্পাঞ্চলে এদের আগমনের

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোলদের সঙ্গে সাঁওতালদের অনেক বিষয়ে মিল ছিল। এরাও ছিল পরিশ্রমী এবং কৃষিজীবী। পিলার কাটার কাজে এরা ছিল আগ্রহী এবং দক্ষ। সাঁওতালদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা এরা পছন্দ করত।

রাজোয়াররা এসেছিল মূলত পাটনা এবং গয়া জেলা থেকে। কয়লাখনিতে শ্রমিক ও সর্দারের কাজ এরা করত। কয়লা কাটা ছাড়াও খনির অন্যান্য কাজেও এদের আগ্রহ ছিল। এরা প্রতিদিনকার কাজের কর্মী হিসাবে (Daily wage) কাজ করা পছন্দ করত। অন্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করতে এদের আপত্তি ছিল না। ভুঁইঞারা এসেছিল হাজারিবাগ থেকে। কোররা ছিল সাঁওতাল ও কোলদের বংশজাত। মাটিকাটার কাজ (escavation) এরা বেশি পছন্দ করত। ধাঙড়রাও কোরদের মতো কাজে আগ্রহী ছিল। দেওঘর অঞ্চল থেকে ডোমরা এসেছিল কয়লাভূমিতে শ্রমিকের কাজ করতে। এরা সর্দার ও কয়লাশ্রমিকের কাজে বেশি আগ্রহী ছিল। লোধারা উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিল। অনেকে কয়লা শিল্পাঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে আবার অনেকে শুধুমাত্র অর্থ রোজগার করে নিজ বাসভূমিতে ফিরে যেত। এরা স্বজাতির সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসত এবং প্রায়ই অন্য অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হত। ইংল্যান্ডের কয়লা শ্রমিকদের মতো এরা ছিল দক্ষ এবং পরিশ্রমী। পাসিসরা এসেছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে। এরা ছিল কিছুটা পরিমাণ উদ্ধত প্রকৃতির। সর্দারের কাজ ও কয়লা কাটার কাজে এদের আগ্রহ বেশি ছিল। কুর্মীরা এসেছিল উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে। এরাও সর্দারের কাজে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বেলদাররা ছিল যাযাবর জাতীয়-মুঙ্গের ও গয়া থেকে এরা এসেছিল। এরা মাটি ও কয়লা কাটার কাজে দক্ষ ছিল। অন্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এরা ভাল কাজ করত।

এবার সাঁওতাল ও স্থানীয় বাউড়ি ছাড়া অন্যান্য যে সব সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তারা কেন এবং কীভাবে রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে এল তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

১৮৯০ দশক পর্যন্ত রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে বাউড়ি ও সাঁওতালদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কয়লাখনির মালিকরা অনুযোগ করছিল যে তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যার শ্রমিক পাচ্ছেন না এবং সেই কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং শ্রমিক সমস্যা তীব্রতর হয় কিন্তু রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির মালিকরা কেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি এবং অযোধ্যা থেকে বহিরাগত (Migrant) শ্রমিক সংগ্রহে সচেষ্ট হয়নি তা নিয়ে ১৮৯৬ সালে Labour Commission বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ওই সময়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে শ্রমিকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ—

পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
৩৫,৩৬৪	১৪,৬৫৯	৩,১৮৭	৫৩,২১০

সূত্র—Labour Movement in India: Documents: 1850-1890 Vol.-I, পৃঃ ৭৪।

১৮৯৬ সালের Labour Commission এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে জব্বলপুর (সেন্ট্রাল প্রদেশ) ও রাওয়া (Rewah State) থেকে বসবাসকারী কোল এবং গোন্ড (Gonds)-দের বাংলার কয়লাখনিতে কর্মী হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা থেকে দক্ষ কয়লাশ্রমিক সংগ্রহ করা যেতে পারে। কমিশনের যুক্তি হল যে ওই দুটি প্রদেশের Umaria, Warora এবং Singareni অঞ্চলে খনির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং Warora অঞ্চলে কয়লাখনিতে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। সেখানে শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছিল না তাই Unao এবং তার আশেপাশের জেলা থেকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে খনিশ্রমিক আসতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে জাতিগত দিক থেকে অধিক সংখ্যায় ছিল পাসিস, লোধ, কুরমী, আহির, কোয়ার এবং জামার। এরা আসতো উনাও, রায়বেড়ি, এলাহাবাদ, বেনারস ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এ ছাড়া বেলদার এবং নুনিয়ারা বেনারস, গোরক্ষপুর এবং অযোধ্যা থেকে এসেছিল। এদের এক কথায় বলা হত বিলাসপুরী এবং সি পি (সেন্ট্রাল প্রভিন্স) কয়লা শিল্প শ্রমিক। Jobber বা সর্দাররা এদের নিয়ে আসত। আসানসোলে ডিপোপাড়া বলে একটি অঞ্চল আছে। রেলস্টেশনের কাছেই, সেখানে ট্রেনে করে এনে তাদের রাখা হত, তারপর বিভিন্ন খনিতে তাদের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ঝরিয়া ও ধানবাদ অঞ্চল থেকে বেশি ছিল তাই বড় বড় কয়লা কোম্পানিগুলি (বেঙ্গল ও ইকিউটেবল্) জমির উপরিভাগও লিজ নিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থাও করত। প্রত্যেকটি বড় কোল কোম্পানির আবার 'Labour Talook' থাকত, সেখানে শ্রমিকদের জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল কি না—এ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। তবে Service land ব্যবস্থার ফলে জমি-সংক্রান্ত জটিল সমস্যার যে সৃষ্টি হয়েছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আবার এই ব্যবস্থা যে শ্রমিকদের নতুন বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তাও বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। জমি থেকে ছিন্নমূল (uprooted) শ্রমিকরা কিন্তু আবার এখানে এসে জমির গন্ধ পেয়েছিলেন। এই ব্যবস্থার রূপান্তর ওই অঞ্চলে এক জটিল ভূমিসমস্যার সৃষ্টি করেছে।

১৮৯১-৯৪ পর্যন্ত মূলত রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে কয়লাখনির সংখ্যা এবং পুরুষ, মহিলা ও শিশুশ্রমিকের সংখ্যা

সাল	খনিরসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
১৮৯১	৭৭	১৫,২১৪	৭,০২১	২,৫৯৯	২৪,৮৩৪
১৮৯২	৭৬	১৮,৪৪০	৮,৩৫৫	২,৭০০	২৯,৪৯৫
১৮৯৩	৮২	১৭,৫৭৮	৭,৬৯৮	২,১৭৭	২৭,৪৫৩
১৮৯৪	১৯৪	১৯,৬১৬	৮,৫৩৮	২,৪১৯	৩০,৭৭৩

সূত্র—*Labour Movement in India: Documents: 1850–1890, Vol.-1, Ed. S. D. Punekar, Page-68.*

পরিবহন ব্যবস্থা—জলপথ থেকে রেলপথ

পরিবহনের দিক থেকে রাণীগঞ্জের খনিগুলির অবস্থান কিন্তু ইংল্যান্ড ও আমেরিকার কয়লাখনি অঞ্চলের মতো সহায়ক ছিল না। ওই দুই দেশের কয়লাখনির অবস্থান ছিল সহজে বহনযোগ্য নদীর কাছাকাছি। কিন্তু দামোদর ও অজয় দুটি নদীই ছিল অশান্ত এবং পরিবহনের অযোগ্য। আবার ইংল্যান্ডে আগে রেল এবং পরে কয়লাখনির কাজ শুরু হয়েছিল। ভারতে কিন্তু আগে কয়লাখনি পরে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে যদিও কয়লার পিছনে ছুটেছিল রেল কিন্তু পরবর্তীকালে রেলের পিছনে ছুটেছিল কয়লা শিল্পপতিরা। কোথায় রেল যোগাযোগ হবে তা জানবার জন্য কয়লা শিল্পপতিরা (বিশেষ করে বেঙ্গল কোল কোম্পানি সুদূর ইংল্যান্ডে তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিল) সর্বদা যোগাযোগ রাখতে তৎপর ছিলেন। রাণীগঞ্জে কয়লার বাজার ছিল না। কলকাতা বন্দরে না পৌঁছালে কয়লার বাজার পাওয়া যাবে না সুতরাং রাণীগঞ্জে উৎপাদিত কয়লা কলকাতার বন্দরে পৌঁছাতেই হবে। ১৮৫৪-৫৫ সালের আগে খোলা ছিল একমাত্র জলপথ—দামোদর–অজয় আমতা, বৈদ্যবাটী, কলকাতা। আর্মেনিয়ান ঘাট, বাবুঘাট এবং বর্তমান রেলওয়ে অফিস কয়লাঘাটার (কয়লাহাটা/কয়লাহাট) কাছেই Andrew Yule-এর কেন্দ্রীয় অফিস, ৮ নং ক্লাইভ রো—এক সময় নিশ্চয়ই ছিল রাণীগঞ্জের কয়লার বাজার।

Alexander & Co. কয়লা পরিবহনের জন্য ৩০০ থেকে ৪০০ নৌকার ব্যবস্থা করেছিল—পরবর্তীকালে দামোদর নদীর তীরবর্তী ঘাটের দখল নিয়ে বিভিন্ন কোল কোম্পানির সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে Erskine-এর সঙ্গে বেঙ্গল কোল কোম্পানির রঘুনাথপুর ঘাট দখল নিয়ে বিরোধের উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্ষার সময়ে দামোদর ছিল বহনযোগ্য। তখন দামোদরে জলের পরিমাণ থাকত পাঁচ লক্ষ কিউসেক। কিন্তু অন্য সময় থাকত মাত্র ১৫০০ কিউসেক জল। কোল কোম্পানিগুলি দামোদরে বন্যার জন্য দিন গুনতেন কখন দামোদর হবে বহনযোগ্য। ভারতের কৃষিসম্পদ যেমন মৌসুমীবায়ুর উপর নির্ভরশীল ছিল; দামোদরে কয়লা বহনও ছিল; প্রকৃতির অনুরূপ জুয়াখেলা। প্রতি নৌকা গড়ে বছরে তিন থেকে চারবার যাতায়াত করতে পারত। নৌকাচালকদের অগ্রিম অর্থ দিতে হত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবিতকালে বেঙ্গল কোল কোম্পানির নিজস্ব নৌকার সংখ্যা ছিল ১৫০০, চালকের সংখ্যা ছিল ৯০০ জন। রাণীগঞ্জ থেকে নৌকো করে কলকাতায় কয়লা পাঠাতে ১০০ মনে খরচ পড়ত ১০ টাকা। পরিবহনের দুর্দশা ঘোচাবার জন্য ১৮৫৫ সালে হাওড়ার সঙ্গে রাণীগঞ্জের রেল যোগাযোগ হল। কিন্তু সমস্যার সমাধান আশানুরূপ হয়নি। রেলের ভাড়াকে কেন্দ্র করে কোল কোম্পানিগুলির অভিযোগ ছিল। তাই ১৮৭০ খ্রিঃ পর্যন্ত জলপথে কয়লা পরিবহনের উল্লেখ আছে বেঙ্গল কোল কোম্পানির নথিপত্রে। ওয়াগনের স্বল্পতা নিয়ে কোল কোম্পানিগুলির অভিযোগ প্রথম থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কয়লাশিল্পের আদিপর্বে কয়লা উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষ কোনও মৌলিক পার্থক্য ছিল না। কোদাল, বেল্চা, গাঁইতি, শাবল, ক্রো-বার ইত্যাদি শ্রমিকরা ব্যবহার করত কয়লা খননের জন্য। কিন্তু ১৮৫০-এর দশকে Underground Minning শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তির সঙ্গে যান্ত্রিক শক্তির সহাবস্থান আমরা দেখতে পাই। এই শিল্পে প্রধানত তিন ধরনের যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল—কোল কাটিং, কোল লোডিং এবং কোল ট্রান্সপোর্টিং। এ ছাড়া আর একটা বড় সমস্যা ছিল, তা হল বর্ষার সময় পিটগুলিতে জল ঢুকে যেত। এই জল বার করবার জন্য কৃষিভূমির অনুরূপ ডোঙা ব্যবহার করত। Carr & Tagore Company কিন্তু ১৮৪০ সাল নাগাদ এই কাজে স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু করে। ১৮৫০ থেকে ৬০-এর দশকে রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলে স্টিম ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল ২৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোল কোম্পানিগুলি লাভের কথা হিসাব করে যন্ত্র প্রয়োগের কথা ভাবতেন এবং এটাই স্বাভাবিক। কয়লা উত্তোলনে পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং যন্ত্রের প্রয়োগ শ্রমিকদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমদিকে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী ছিল মূলত সাঁওতাল, আবার চিনাকুড়ির শ্রমিকরা ছিল বাউড়ি। এই সাঁওতালরা কাজ করত ক্রো-বারস্ এবং Wedges দ্বারা। আবার বাউড়িরা ব্যবহার করত গাঁইতি (Picks)। চিনাকুড়ি কোলিয়ারি থেকে বাউড়িদের নিয়ে আসা হয়েছিল রানীগঞ্জের কয়লা খনি অঞ্চলে এবং খনি মালিকরা বাউড়িদের নির্দেশ দিয়েছিল সাঁওতালদের Picks ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে কয়লা তোলার জন্য। ঘটনা হল সাঁওতালরা বাউড়িদের তাড়িয়ে দেয় এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। William Blanford এই ঘটনাকে সাঁওতালদের সংরক্ষণশীলতা বলে চিহ্নিত করেছেন এবং ধর্মকেও টেনে এনেছেন। মূল বক্তব্য হল শ্রমিকরা অভিনবত্ব বা নতুনত্বের প্রয়োগ বিরোধী। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয় বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সাঁওতালরা

কয়লা খনির মালিকাদর সন্দেহেরর চোখে দেখতেন। সুদখোর এবং মধ্যসত্ত্বভোগী জমির মালিকদের ভূমিকা তাদের অভিজ্ঞতায় ছিল। সুতরাং মালিক জমিদার বা শিল্পপতি যেই হোক না কেন তাদেরকে সহজভাবে নিতে পারেননি। তাছাড়া নতুনত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে শ্রমিকদের সঠিক শিক্ষাও দেওয়া হত না। এই প্রসঙ্গে ঠিকাদারী সর্দারদের ভূমিকাও বিবেচ্য। আসল কথা হল, শ্রমিকদের উপর কোনও ব্যবস্থা চাপিয়ে দিলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রমিকদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সঠিক নয় বলেই মনে হয়।

"Apear & Co." ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে Jin-lamp প্রচলন শুরু করেন। তারা দুদিকে ধারালো গাঁইতিরও প্রচলন করেন। শ্রমিকরা কত কয়লা তুলল তা পরিমাপের জন্য মেশিনেরর ব্যবস্থাও করেছিল। কয়লা খনির মালিকরা অভিযোগ করছেন যে, শ্রমিকরা এই উন্নততর ব্যবস্থাকে প্রতারণা বলে মনে করতেন। তাদের এই অভিমতও সমর্থনযোগ্য নয়। উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে শ্রমিকদের বোঝানোর কোনও চেষ্টা হয়েছে কি? সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে মালিকদের কোনও যোগাযোগ ছিল না; ভাষা এবং Status ছিল অন্যতম অন্তরায়। সর্দারদের মাধ্যমে এ কাজ হত। আর এই সর্দার বা Jobber রাও ছিল স্বার্থপর ও অর্থপিশাচ। সুতরাং শ্রমিকদের উপর দোষের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সমস্যার সরল সমাধান সম্ভব হলেও বাস্তবতাকে কিন্তু অস্বীকার করা হয়।

তথ্যসূত্র :

(1) A Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter.

(2) Labour Movement In India: Documents: 1850-1890, Vol.-1, Ed. by-S. D. Punekar.

(3) Zamindars, Mines & Peasants—Ed. by—D. Rothermund, D. C. Wadhwa.

(4) Partner In Empire—Blair B. Kling.

(5) The Development of Capitalist Enterprise In India—D. H. Buchanan.

(6) The Economic Development of India—Vera Anstey.

(7) Gazetteer of the Burdwan District—Peterson.

(8) C. P. Simmons রচিত প্রবন্ধাবলী যা Bengal Past & Present এবং Social & Economic History Review-এ প্রকাশিত হয়েছে।

(9) M. G. M. I. I. সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার প্রবন্ধাবলী।

(10) B. I. M.—গুরুসদয় দত্ত রোড, কলকাতা। এখানে Andrew Yule Company-র Manuscripts Papers যা সংরক্ষিত আছে।

আমাকে এই তথ্যগুলি দেখার সুযোগ দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় সময় বাগচী। আমি এ জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক রঞ্জিত দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধাবলী যা E. P. W. এবং Social Scientist প্রকাশিত হয়েছে সেই প্রবন্ধগুলি।

বর্ধমান জেলা পরিষদ কয়লা অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগ নিয়েছেন বেসরকারিভাবে জানা গেছে। এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

এই প্রবন্ধ লিখতে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহধন্যা রূপভাপস কোনার ও দেবিকা হাজরা। তাঁদের সাহায্য অনস্বীকার্য।
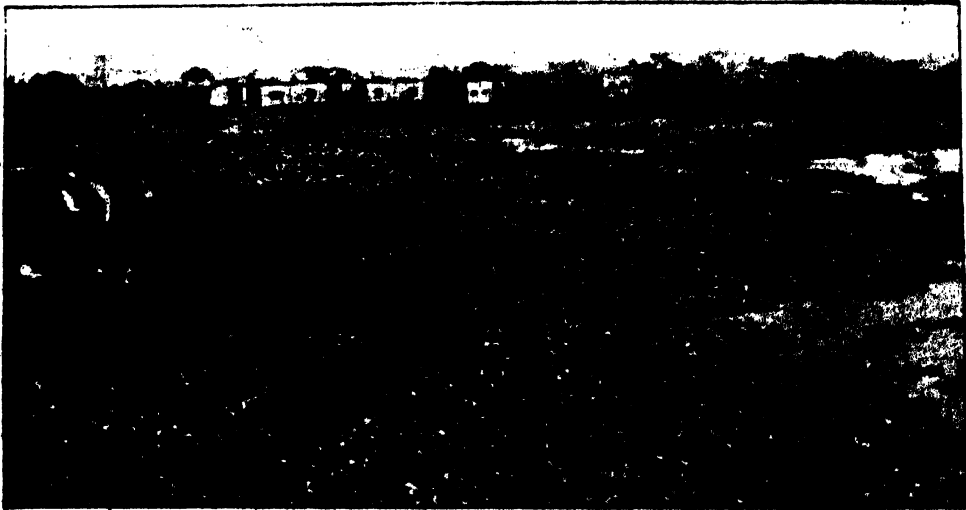
ক্ষেতমজুর আন্দোলনে বর্ধমান জেলা

সমর বাওরা

বর্ধমান জেলার ক্ষেতমজুর আন্দোলন সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ক্ষেতমজুর আন্দোলন, সামগ্রিক কৃষক আন্দোলনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের মতো কৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন, সেখানে কৃষকসমাজের বিভিন্ন অংশের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ বিশেষ জরুরি। লক্ষ্যটা শুধু কৃষকসমাজের কিছু উপকার করে দেওয়া নয়, সমগ্র মেহনতী জনগণের স্বার্থে একটি শোষণহীন সমাজ গড়ার সংগ্রামে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের উপযোগী করে এই বিশাল কৃষক জনগণকে প্রস্তুত করার লক্ষ্য নিয়েই কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করা দরকার। আর এ জন্যই প্রয়োজন—কৃষক আন্দোলন সংগঠনের মেরুদণ্ড হিসাবে নিঃস্ব কৃষক তথা ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করা এবং তার চারপাশে কৃষকসমাজের বিভিন্ন স্তরকে যথাযথ স্থানে সমবেত করা।

বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৯৯৬ অর্থাৎ বর্তমান বছরটি হল দেশের বৃহত্তম গণসংগঠন সারা ভারত কৃষকসভা গঠনের ৬০ বছর পূর্তির বছর। ১৯৩৬ সালে তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে অধিবেশন বসেছিল সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির। তখন কংগ্রেস ছিল একটি বৃহত্তর মঞ্চ। বিভিন্ন রাজনৈতিক

মতাবলম্বীরাও তাঁদের স্বকীয় অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ বজায় রেখেও এই মঞ্চের শরিক ছিলেন। ফলে তাঁরাও হতেন এ আই সি সি অধিবেশনের প্রতিনিধি। অধিবেশন চলাকালীন ১১-১৩ এপ্রিল প্রতিনিধিদের একাংশ, যাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এক পৃথক অধিবেশনে সমবেত হয়ে গঠন করলেন সারা ভারত কৃষকসভা। এ কথার অর্থ এই যে, ১৯৩৬-এর পূর্ব থেকেই কিছু প্রদেশে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। তৎকালীন যুক্ত বাংলা প্রদেশ, এই প্রদেশগুলির অন্যতম এবং বাংলা প্রদেশের যে জেলাগুলিতে ১৯৩৬-এর পূর্বেই কৃষক সংগঠনের তৎপরতা ছিল, বর্ধমান জেলা তার অন্যতম। বাংলা ১৩৪০ সালের ২১ জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ ১৯৩৩ সালেই জেলার হাটগোবিন্দপুর গ্রামে বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর্ধমান জেলা কৃষকসভার এই ৬৩ বছরের ইতিহাস, কৃষক ও জনস্বার্থে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস। কৃষক সমিতি গঠনের পর থেকেই মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের বিরুদ্ধে, জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ সরকারের বর্ধিত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম ও সাফল্য, পঞ্চাশের মন্বন্তরে ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ সংগঠিত করা, বন্যা প্রতিরোধী নদী-বাঁধের জন্য আন্দোলন প্রভৃতি সংগঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে মৌলিক ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাবোধে কৃষক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতি বিভিন্ন সংগ্রামের পথ বেয়েই এগিয়ে চলেছে কৃষকসভা। এ ছাড়া প্রতি বছর অভাবের সময় খাদ্যের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন তো ছিলই। এসব আন্দোলন সাধারণ কৃষকগণকে কৃষকসভার প্রতি আকৃষ্ট করেছে; কৃষকসভার কর্মীদের কৃষকদের নিকটাত্মীয় হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে। কিন্তু কৃষক আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের স্বল্পকালীন অস্তিত্বের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়। জেলার ৮টি চিহ্নিত জমিদার পরিবারের উদ্বৃত্ত জমি দখলের সংগ্রামের যে আহ্বান জানিয়েছিল জেলা কৃষকসভা, সে আহ্বানে প্রাথমিক দ্বিধা জড়তা কাটিয়ে এগিয়ে এসেছিল হাজার হাজার গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর। জোতদার জমিদারদের সংগঠিত হিংস্র প্রতিরোধের মুখে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের পথে। সে সাফল্য তাঁদের আত্মবিশ্বাসে করেছিল বলীয়ান। এতদিন ধরে সামন্ততান্ত্রিক দাপটের মুখে নিজেদের অসহায় ভাবতে অভ্যস্ত গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর অভিজ্ঞতার আলোয় দেখল নিজেদের সংগঠিত শক্তির পরাক্রম। জমির আন্দোলন আরও কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই শক্তির অভ্যুদয়ে কৃষকসভার কর্মীরাও উৎসাহিত। জমিদারী প্রতাপের মুখে সামাজিক নিপীড়ন বা অবমাননার শিকার গ্রামসমাজের অন্য স্তরের মানুষদেরও একটা বড় অংশের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল চিহ্নিত জমিদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর কৃষক আন্দোলন দাঁড়াতে পারলেও, তখনও গ্রামীণ সর্বহারাকে ভিত্তি হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

১৯৭০-৭১ সাল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামের যুগ। ১৯৭২-৭৭ সাল। আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মুখে সংগঠনকে, সংগঠনের কর্মীদের রক্ষা করাটাই তখন একটা সংগ্রাম। প্রায় ২০০-র মতো কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী শত্রুর হিংস্র আক্রমণে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন; শত শত কর্মী এলাকাছাড়া; হাজারের ওপর কর্মী ও নেতা বিভিন্ন জেলে বন্দি; বাকিরা আত্মগোপনে। আত্মগোপনের আশ্রয়স্থল—দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর। রাতের অন্ধকারে স্থানান্তর যাত্রায় তাঁরাই রক্ষী ও সাথী। তাঁদের দুর্দশাক্লিষ্ট দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সংগঠনের কর্মীদের প্রত্যক্ষ পরিচিতি, আবার তাঁদের সাহসী সংগ্রামী ভূমিকায় কর্মীরা মুগ্ধ। একটা তাগিদ অনুভূত হয় গ্রামীণ সর্বহারার নিজস্ব দাবি, মজুরীর দাবিতে এঁদের সংগঠিত করার। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। কর্মীদের আলাপ-আলোচনার প্রভাবে, কিছু কিছু এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে কিছু সাহসী মজুর, চাষের কাজের চাপের মুখে কিছুটা বাড়তি দর চায়। কোথাও পায়, কোথাও পায় না। কিন্তু সংগঠিত কোনও আন্দোলন তখন সম্ভব ছিল না।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে সরকার পরিবর্তন ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অনুকূল পরিবেশ। হৃত জমি পুনরুদ্ধারের সঙ্গে নতুন উদ্বৃত্ত জমি দখলের সংগ্রামও ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকে। সেই সঙ্গে কয়েকটি থানা এলাকায় বর্ধিত মজুরীর দাবিতে সংগ্রামের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়।

সমস্যাগুলি কি? তখন ১৯৭৯-৮০ সাল, সরকার নির্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরী ৮.১০ টাকা। প্রচলিত মজুরী সারাদিনের জন্য নগদ ১.২৫ টাকা ও 'পাই' মাপে পাঁচ পোয়া চাল, এর সঙ্গে কোথাও কোথাও অনুগ্রহ হিসাবে এক 'দশান' তেল ও ৫টি বিড়ি। এক দুপুর কাজের জন্য বারো আনা নগদ ও আধ সের চাল। সারাদিনের জন্য মজুরী সাকুল্যে ৩ টাকার বেশি নয়। এ অবস্থায় ৮ টাকা মজুরীর দাবি! ক্ষেতমজুরদের একাংশের মধ্যেও প্রশ্ন—এ মজুরী কি সম্ভব? কোথা থেকে দেবে চাষী? কর্মীদের মধ্যেও দ্বিধা একই প্রশ্নে। সেই সঙ্গে শ্রেণী উৎসজনিত কারণে দ্বিধা, কারণ মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন তো আঘাত করবে কর্মীদেরও একটা বড় অংশের পরিবারকে, তাঁদের আত্মীয়স্বজনকে। এ ছাড়া এ আন্দোলনের ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও সমর্থন হারানোর আশঙ্কাও তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ততার অন্যতম কারণ। জমি দখলের

আন্দোলনে উদ্বৃত্ত জমির মালিক প্রতিপক্ষ, বড় জোর সেই মালিকের কিছু আত্মীয়-বান্ধব। কিন্তু মজুরী আন্দোলনে যে প্রতিপক্ষ পাড়ায় পাড়ায় এবং তাদের সংখ্যায়ও কম নয়। এমনকি গরিব কৃষক, বর্গাদারদের একাংশও বিরূপ হতে পারে এবং আশঙ্কাটাও অমূলক নয়।

অতএব জেলা কৃষক সংগঠন ১৯৮০-৮১ সালে কেন্দ্রীয়ভাবে সমগ্র জেলায় মজুরী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করল। সেই কর্মসূচি ছিল ত্রিমুখী : (১) মজুরী আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করার জন্য কর্মী সভা, (২) ব্যাপকভাবে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রচার চালানো এবং (৩) সমাজের অন্য অংশের মধ্যেও তথ্য ও যুক্তিনির্ভর আবেদনমূলক ব্যাপক ও তীব্র প্রচারান্দোলন গড়ে তোলা। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের 'অ্যাকাউন্টস্ অব বেঙ্গল' বই থেকে তুলে ধরা হল ১০৯ বছর আগের, ১৮৭২ সালের বর্ধমান জেলার ক্ষেতমজুরের প্রচলিত মজুরীর তথ্য। ওই সময় ধানের দাম ছিল আট আনা মণ, আর গ্রামের ক্ষেতমজুর মজুরী পেত দশ পয়সা (ষোল আনায় টাকা) অর্থাৎ সিকি মণেরও বেশি ধানের দাম পেত মজুরী হিসাবে। ওই সময় রানিগঞ্জের রেললাইন পাতার কাজে গ্রাম থেকে আসা মজুররা মজুরী পেত দৈনিক চার আনা। অথচ ১৯৮০ সালে ধানের মণ ৩০ টাকা, আর ক্ষেতমজুর সর্বোচ্চ মজুরী পায় ৩ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত মজুরী কমেছে অনেক। সুতরাং এ মজুরী বৃদ্ধির লড়াই কার্যত হত মজুরী পুনরুদ্ধারের লড়াই। 'চাষীদের' সর্বনাশ হয়ে যাবে—এই বক্তব্যের উত্তরে বলা হল, দীর্ঘ ১০৯ বছরের মজুরী হ্রাসের মধ্যে দিয়ে 'চাষীদের' সর্বনাশের প্রক্রিয়া কি বন্ধ করা গেছে? সর্বনাশের কারণ অন্যত্র এবং সে কারণ দূর করার জন্য সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে গ্রামীণ এলাকার অগ্রগামী বাহিনী এই ক্ষেতমজুরদের বেঁচে থাকার জন্য যে বর্ধিত মজুরীর দাবি, তাকে সমর্থন দেশের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এক ধরনের বিনিয়োগ। 'চাষে লোকসান হচ্ছে, অতএব কোথা থেকে দেবে?' এ প্রশ্নের উত্তরে তথ্য দিয়ে বলা হল—৭৫ টাকা কুইন্টাল ধানের বাজার দরে একজন ক্ষেতমজুর সারাদিনের মেহনতের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টি করছে কম করে ১৭ টাকা। সুতরাং একজন ক্ষেতমজুর ৮ টাকা মজুরীর দাবি করে ৯ টাকা রেখে দিচ্ছে যিনি মজুর খাটান তার জন্য। সুতরাং এ দাবি তো ঐক্যের দাবি। এই ত্রিমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট সংগ্রাম ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল সমগ্র জেলায়। জেলার ২৭২৮টি মৌজার প্রায় আড়াই হাজার গ্রামের মধ্যে ১৯৮৪-র মধ্যে ১৪৮৬টি গ্রামে আন্দোলন সফল হয়। ১৯৮৬-র মধ্যে ১৮০০-র মতো গ্রাম আন্দোলনের আবর্তে আসে। মজুরী আদায় হয় গড়ে ১২ টাকা নগদ ও ২ কেজি চাল।

কিন্তু এ সাফল্য কি বিনা প্রতিরোধে এসেছে? অবশ্যই নয়। এলাকা বিশেষে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সর্বোচ্চ ৪৪ দিন পর্যন্ত ধর্মঘট চলেছে। ক্ষেতমজুর ধর্মঘটের মোকাবিলায় প্রতিপক্ষ চালিয়েছে মজুর বয়কটের কর্মসূচি, সংঘবদ্ধভাবে চাষের কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ফলে মাঝে মাঝে সংশয়ও জেগেছে, আন্দোলনকে ধরে রাখা যাবে কিনা। ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হলে মজুরদের তো কোনও সঞ্চিত সংস্থান নেই, অতএব বিকল্প কোনও কাজের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। আহ্বান জানানো হল—বামফ্রন্ট সরকার যেমন সংগ্রামের সহায়ক শক্তি, তেমনই বামফ্রন্ট পরিচালিত পঞ্চায়েতকেও এই সংগ্রামের সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রথমদিকে ফুড ফর ওয়ার্ক ও পরে এন আর ই পি-র মাধ্যমে ধর্মঘটী মজুরদের বিকল্প কাজের সংস্থান করতে এগিয়ে এল। এ ছাড়াও চলেছে বিরোধিতার ধারকে ভোঁতা করার জন্য যুক্তিপূর্ণ আবেদনমূলক তীব্র প্রচারান্দোলন। ফলে সাফল্য এসেছে। কিন্তু এলাকায় এলাকায় বর্ধিত মজুরী লাভের পরেও প্রচারান্দোলন চালাতে হয়েছে। কারণ লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষ যেন পরাজিতের আহত মানসিকতায় না ভোগেন। মজুরীর দাবি মেনে নিয়েও তারা যেন সমর্থকে পরিণত হন, বা সমর্থনের ধারা অব্যাহত থাকে। সাফল্যও এসেছে এ কাজে। মজুরী আন্দোলনের এলাকাগুলিতে নির্বাচনী সংগ্রামে বামফ্রন্টের সমর্থন বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

১৯৮৬ সালে বলা হল—মজুরী আন্দোলন ক্ষেতমজুর আন্দোলনের শুরুর কথা অবশ্যই, কিন্তু শেষ কথা নয়। মজুরী আন্দোলনের মাধ্যমে তারা এক সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাদের পেটের ক্ষুধার সঙ্গে মনের ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সংগ্রামী বাহিনী হিসাবে তাদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তাদের সমাজের সমমর্যাদাবিশিষ্ট অংশীদারে পরিণত করতে হবে। তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে আত্মবিশ্বাসী, সচেতন ও বিভিন্ন পশ্চাদপদ ধারণা থেকে মুক্ত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন তাদের মধ্যে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সাক্ষরতার আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৯৮৭ সালে সমগ্র জেলা জুড়ে বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠিত হল শ্রমজীবী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পরিচালনায়—বর্ধমান জেলা কৃষকসভা। গ্রাম, অঞ্চল, ব্লক ও জেলা—এই সমস্ত স্তর মিলিয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়াল দু হাজারেরও বেশি। এরা সবাই গ্রামীণ শ্রমজীবী পরিবারের। বিভিন্ন স্তরের এই বিপুল উদ্দীপনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে গিয়ে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। এ টাকার জোগান দিয়েছিল ওই গ্রামের গরিবরাই। একে সফল করার জন্য এগিয়ে এসেছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষ। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসে জেলা পরিষদ। পরের বছর থেকে জেলা পরিষদের পরিচালনায়, কৃষকসভার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে এই প্রতিযোগিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও। জেলা পরিষদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হওয়ার

কারণে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে জেলা প্রশাসনের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের।

১৯৮৯ সালে কৃষকসভার পরিচালনাতেই সমগ্র জেলায় ২৭২টি সাক্ষরতা কেন্দ্র চলত। ইতিমধ্যে কেরালার এর্নাকুলাম জেলার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বর্ধমান জেলাকেও সাক্ষর জেলায় পরিণত করার জন্য তৎপরতা শুরু হয়। প্রস্তুতি পর্বেই জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হয় বর্ধমান জেলা। নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ নিরক্ষর মানুষ চিহ্নিত হন লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে, যাদের একটা বড় অংশই গ্রামের ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষক। কৃষক সংগঠনও ঝাঁপিয়ে পড়ে এ কাজে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাহায্যে এবং প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় কিছুকালের মধ্যেই লক্ষ্যমাত্রার ৮২ শতাংশ সাক্ষর হন এবং জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের বিচারের নিরিখে বর্ধমান জেলা পশ্চিমবাংলার প্রথম সাক্ষর জেলা ঘোষিত হওয়ার সম্মান অর্জন করে। পরবর্তীকালের সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি ও ধারাবাহিক শিক্ষার কর্মসূচিকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও উদ্যোগের প্রয়োজন আছে।

মজুরী আন্দোলন দিয়ে শুরু করে ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সাক্ষরতা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেয়ে বর্ধমান জেলার সাড়ে ৫ লক্ষ ক্ষেতমজুর আজ এক সংগঠিত শক্তি। জেলার কৃষক সংগঠনের ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার সদস্য সংখ্যার মধ্যে এদের প্রায় সকলেই আছেন সংগঠনের ভিত্তিভূমি হিসাবে। কিন্তু এদের তো গ্রামীণ বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় আনতে হবে। নেতাকে তো অন্যের কথাও ভাবতে হবে। সমাজের কোন কোন অংশের সঙ্গে কি রকমের সম্পর্ক হবে, কাদের সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, কোন কাজটি করণীয়, কোনটি নয়—এ সম্পর্কে এদের সুশিক্ষিত করার কাজটি অতি প্রয়োজনীয়। সমাজের অন্য অংশ থেকে আসা কৃষক নেতৃত্ব সে কাজ করছেনও। কিন্তু সামাজিকভাবেই সে কাজে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাই প্রয়োজন, এদের মধ্য থেকেই নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। ক্ষেতমজুর কর্মশালা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সে কাজ চলছেও। সমস্যাও আসছে নতুন নতুন। আজ আর গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক ভাত-কাপড়ের সমস্যায় জর্জরিত নয়। এক সময় গ্রামের গরিবের সমস্যা ছিল, ভাদ্র মাসে গ্রামের সম্পন্ন পরিবারের পুকুরপাড়ের তালতলায় পাকা তাল কুড়ানোর সমস্যা, বনে জঙ্গলে শিকড়-বাকড় খুঁজে ফেরার সমস্যা; কৃষকে গৃহিণীর কাছে চেয়ে নেওয়া এক 'দশান' তেলে নিজের খড়ি-ওঠা সন্তানদের তেল চকচকে করার সমস্যা। আজ সমস্যার রূপান্তর ঘটেছে—তালআঁটি চোষার সমস্যা আজ খামার পাওয়ার সমস্যায় পরিণত; তেল চাইতে যাওয়ার সমস্যা আজ সাবান, শ্যাম্পু কেনার সমস্যায় পরিণত। আজ তার সামনে নতুনতর সমস্যার সারি—রেডিওর ব্যাটারী কেনার সমস্যা, সাইকেলের টায়ার-টিউব পাল্টানোর সমস্যা, সাইকেল চালানোর রাস্তার সমস্যা, চেয়ে আনা দু আঁটি খড় দিয়ে ঘরের চালের ফুটো মেরামতের সমস্যার পরিবর্তে আজ তার ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগের সমস্যা। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের সমস্যা—সীমিত সামর্থ্যের সমস্যা। সুতরাং চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। নতুনতর সমস্যার সমাধানের জন্য বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন, মেহনতী মানুষের পক্ষের এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠার। আর সে কাজের জন্য আরও বেশি বেশি মানুষকে সচেতন ও সংগঠিত করে বিভিন্ন আন্দোলনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কোনও ঘাটতি ঘটলেই না পাওয়ার ব্যথা-বেদনার জায়গায় আঘাত করে, বিভিন্ন বিরোধী শক্তি, যারা সমাজ পরিবর্তনের বিরোধী, তারা এদের মূল গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেবার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। কখনও জাতপাতের নাম করে সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করে, কখনও বা তফসিলি জাতি উপজাতি স্বার্থরক্ষার কথা বলেই তারা কৃষক তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেবার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ সবের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক থেকেই বর্ধমান জেলার কৃষক আন্দোলন তাদেরই দ্বারা জাগরিত এই বিপুল শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

ঔপনিবেশিক শাসনের আবর্তে কয়লা শিল্পের প্রাথমিক স্তরে কয়েকজন ভারতীয় শিল্পোদ্যোগী

দেবিকা হাজরা

ভারতের কয়লা শিল্পের বিকাশে ভারতীয় হিসাবে প্রথম উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে, তিনি ইউরোপীয় এক ব্যক্তি কার-এর (Carr) সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সংগঠনের নাম ছিল Carr & Tagore Company; Tagore & Carr Company নয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে (১৮৪৩ খ্রিঃ) সৃষ্টি হয়েছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানী। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বেঙ্গল কোল কোম্পানীতে ইওরোপীয়দের প্রাধান্য লক্ষণীয়। ১৯০৮ খ্রিঃ Andrew Yule বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সির দায়িত্ব নেন। এই সংগঠনেও ইউরোপীয়ানদের নিয়ন্ত্রণের কব্জায় ছিল। সমসাময়িক যুগে কয়েকজন ভারতীয় (বিশেষ করে বাঙালি) কয়লা শিল্প গড়ে তুলতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এইসব ভারতীয়দের কথা কয়লা শিল্পের ইতিহাসের পাতায় যতটা মর্যাদা পাওয়া উচিত ছিল তা পায়নি। এদের কথা বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমি এদের মধ্যে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছি (সকলকে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয় বলে)। এঁরা হলেন—গোবিন্দ পণ্ডিত, শিবকৃষ্ণ দাঁ, নিবারণচন্দ্র সরকার এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি উত্তর ভারতের এবং পরবর্তী তিনজন বাঙালি।

গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত

গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত ভাগ্যান্বেষণে উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন (অনেকের মতে তিনি পাঞ্জাবী, কারও কারও মতে কাশ্মীরী)। পিতার নাম ছিল সদাশিব পণ্ডিত। তিনি শ্রীরামপুরের কেরীসাহেবের বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সাহচর্যে এসেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। প্রথম জীবনে তিনি আলেকজাণ্ডার এন্ড কোম্পানির কর্মী হিসাবে (১৮৩০-এর দশকে) রাণীগঞ্জে কয়লা শিল্পের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। ১৮৩৬ খ্রিঃ এই কোম্পানী দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে কয়লা শিল্প থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। পরবর্তীকালে গোবিন্দ পণ্ডিত যোগ্যতার সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা পান। এই পদে থাকাকালীনই অথবা অবসর গ্রহণ করে তিনি আবার কয়লা শিল্প গঠনে এগিয়ে আসেন। ১৮৫৯ খ্রিঃ মিঃ টমাস ওল্ডহামের (Mr. Thomas Oldham), জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সুপারিনটেনডেন্ট, প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ঐ সময়ে কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি হল - বেঙ্গল কোল কোম্পানী, বাবা গোবিন্দ পণ্ডিত, আরস্কাইন কোম্পানি, ইস্ট ইন্ডিয়ান কোল কোম্পানি ইত্যাদি। উৎপাদনের দিক থেকে প্রথমে ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানি এবং তার পরের স্থানটি ছিল বাবু গোবিন্দ পণ্ডিতের। এই গোবিন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে বেঙ্গল কোল কোম্পানির কয়লাভূমি দখলকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচুর ঘটনা আছে। ১৮৫৯ খ্রিঃ গোবিন্দ পণ্ডিতের সংস্থার কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ মন, বেঙ্গল কোল কোম্পানির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ মণ, অপরদিকে আরসকাইন সংস্থার পরিমাণ ছিল ১২½ লক্ষ মন। ১৮৭০ খ্রিঃ গোবিন্দ পণ্ডিতের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪.৩ লক্ষ মন। এই সময়েও তাঁর অবস্থান ছিল বেঙ্গল কোল কোম্পানির পরেই। খুব সম্ভবত ১৮৭০ খ্রিঃ পর গোবিন্দ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়।

তাঁর কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর পর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন তাঁর স্ত্রী দারিম্ব দেবী। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যা হরসুন্দরী দেবী সম্পত্তির অধিকারী হন। এই হরসুন্দরী দেবীর সঙ্গে মালিয়া বংশের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। হরসুন্দরী দেবীর তিন পুত্র ছিল—বীরেশ্বর, রামেশ্বর এবং দক্ষিণেশ্বর। এই সময় থেকেই পণ্ডিত বংশ মালিয়া বংশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এই মালিয়া বংশও কয়লা শিল্পে এগিয়ে আসে। তবে তাঁরা কয়লাভূমি কিনে এই ভূমি নিয়ে জমিদারী ব্যবসার দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে অর্থাৎ তাঁরা জমিদার হয়ে যায়। রাণীগঞ্জের শিয়ারশোলের রাজা এবং রাজবাড়ি বর্ধমানের রাজবাড়ির অনুকরণেই তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্পত্তি ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহ ও মামলা-মোকদ্দমায় তাঁরা জড়িয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত Deoli সম্পত্তিকে নিয়ে মামলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিবকৃষ্ণ দাঁ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এই জোড়াসাঁকোরই দাঁ পরিবারের কথা অনেকের হয়তো অজানা। এঁদের পূর্বপুরুষরা বর্ধমান জেলায় মেমারি-সাতগাছিয়া অঞ্চলে বসবাস করত। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোতে বসবাস করতে শুরু করে। জাতিতে এরা ছিল গন্ধবণিক। এই পরিবারের গোকুলচন্দ্র দাঁ শিবকৃষ্ণ দত্তকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এই সূত্র ধরেই তিনি শিবকৃষ্ণ দাঁ নামে পরিচিত হন। ১৮৬৯ খ্রিঃ এই পরিবারের সম্পত্তি বিভাজনের একটি দলিল পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত সম্পত্তি বিভাজনের পরেই শিবকৃষ্ণ দাঁ সুদূর আসানসোল অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে কয়লাশিল্প গড়ে তুলেছিলেন। শিবপুর এবং কাইথি (Kaithi) অঞ্চলে Apcar & Co. (Armenian) বৃহৎ আকারে কয়লা শিল্প গড়ে তুলেছিল। এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিবকৃষ্ণ দাঁ এন্ড কোং ১৮৭৬ খ্রিঃ কয়লা পরিবহণের সুবিধার জন্য দীর্ঘ পাঁচ মাইলব্যাপী ন্যারো-গেজ রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রিঃ শিবকৃষ্ণ দাঁ মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র দাঁ ও হরিদাস দাঁ নাবালক ছিলেন। ফলে মালিকানার অধিকারী হন শ্রীমতী কাদম্বরী দাসী এবং তাঁর ভাইপো কেষ্টধর দত্ত। ১৮৯১ খ্রিঃ শিবকৃষ্ণ দাঁ মহাশয়ের দ্বিতীয় তথা কনিষ্ঠ পুত্র হরিদাস দাঁ একটি উইল করে তাঁর অংশের মালিকানা তাঁর মা এবং বড় ভাই পূর্ণচন্দ্র দাঁকে দিয়ে যান। তাছাড়া এরা দেন্দুয়া এবং রূপনারায়ণপুরেও কয়লা খনির প্রচলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারেননি।

১৮৯৩ খ্রিঃ পূর্ণচন্দ্র দাঁ এবং তাঁর মা Katras-Jharia Coal Company যার ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল Andrew Yule কে তাঁদের কয়লাভূমি, সম্পত্তি এবং কৃষিজমি লিজ দিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। এই লিজের অন্যতম শর্ত ছিল যে Katras-Jharia Coal Company দাঁ পরিবারকে মাসিক এক হাজার টাকা কর হিসাবে দেবে। পরবর্তীকালে পূর্ণচন্দ্র দাঁর বংশধরেরা খনিগুলি মালিকানা নিয়ে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জমিদারী বিলোপ আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। তাঁর বংশধরেরা উত্তরকালে বিহারের মধুপুরে এস পি সিরামিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া সঙ্গীত এবং বিদ্যাচর্চায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্গাপূজায় তাঁদের জাঁকজমক কলকাতাবাসীর আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা প্যারিস থেকে হীরে-চুনীর গয়না নিয়ে আসতেন দুর্গাঠাকুরকে সাজানোর জন্য। শিবকৃষ্ণ দাঁই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতীয়দের মধ্যে টেলিফোনের প্রথম গ্রাহক হয়েছিলেন।

নিবারণচন্দ্র সরকার

নিবারণচন্দ্র সরকারের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ দামোদরের রায়না থানার বলীয়ারপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন সাধারণ কৃষক

পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। খুব সম্ভবত রাণীগঞ্জ অঞ্চলেই তাঁর কর্মস্থল ছিল। নিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয় কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানির অতি সাধারণ কর্মচারি হিসাবে। যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানির এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। দীর্ঘ এগারো বছর (১৮৭৯-১৮৯০ খ্রিঃ) তিনি এই কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবং বার্নার্ড নামে এক ইংরাজকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সরকার অ্যান্ড বার্নার্ড কোম্পনি এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানির চাকরি ছেড়ে নিজ প্রচেষ্টায় কয়লা শিল্পপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। সরকার ও বার্নার্ড চারটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন—বরাবনী কোল কোম্পানি, ইম্পিরিয়াল কোল কোম্পানি, ফুলারিতাণ্ড কোল কোম্পানি, বেনালীয়া কোল কোম্পানি। এই চারটি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে কয়লাখনির সংখ্যা ছিল ত্রিশের বেশি।

১৯০৮ সালে সরকারের সহযোগী বার্নার্ড বিলাতে চলে যান। তাঁর সম্পত্তির অংশ তিনি মি. ল (Mr. Law) নামে এক ইউরোপীয়ানকে বিক্রি করে দেন। সহযোগীর বিচ্ছেদে শ্রীসরকার কিন্তু ভেঙে পড়েননি। তিনি সরকার অ্যান্ড সন্স নামে নতুন ম্যানেজিং এজেন্সি গড়ে তোলেন। তাঁর এই নতুন প্রতিষ্ঠানে ১৫ জন ইংরাজ কর্মচারী কয়লাখনির ম্যানেজার হিসাবে কর্মতর ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি আটটি কয়লা কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এই কোম্পানিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বরাবনী কোল কোম্পানি, নিমচা কোল কোম্পনি, সীমাতাণ্ড কোল কোম্পানি ইত্যাদি। বেঙ্গল কোল কোম্পানির সঙ্গে শ্রীযুক্ত সরকারের বড় রকমের কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। উপরন্তু বেঙ্গল কোল কোম্পানির পরিত্যক্ত খনি অঞ্চলে সরকার মহাশয় নতুন করে উৎপাদন শুরু করেছিলেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অণ্ডাল অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনা করে তিনি সফলতা লাভ করেন। খুব সম্ভবত তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের কয়লা প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ চলাকালীন জাপানে রপ্তানি করে সরকার মহাশয় প্রচুর লাভ করেছিলেন। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বাঙালি হিসাবে সেই যুগে তাঁর সুখ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই তাঁকে 'কোল প্রিন্স' এর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

রাণীগঞ্জে কয়লার বাজার ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ কয়লার মূল বাজার ছিল কলিকাতায়। সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা চালান দেওয়া হত। এই বাজারের দখল নিয়ে বিভিন্ন কোল কোম্পানির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই পরিস্থিতিতে কয়লার বাজারের দিকে তাকিয়েই তিনি ইটভাটা, চুন এবং সিমেন্টের কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। এই সব সহযোগী শিল্প কয়লা শিল্পের বিকাশকে সাহায্য করেছিল এবং শিল্পপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত সরকারের দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

কয়লা শিল্পে ঔপনিবেশিক সরকারের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে ইউরোপীয় কয়লা শিল্পপতিরা ১৮৯২ খ্রিঃ গড়ে তুলেছিলেন Indian Mining Association। কয়লা শিল্পে ইউরোপীয় শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় তথা বাঙালি কয়লা শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই অভাব অনুভব করে নিবারণচন্দ্র সরকার এগিয়ে আসেন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯১৩ খ্রিঃ গড়ে ওঠে Indian Mining Federation। ১৯১৩-১৯২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত এই সংগঠনের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন শ্রীযুক্ত সরকার। স্বদেশী কয়লা শিল্পপতিদের অস্তিত্ব এবং সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এই সংস্থা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল। বাঙালি ও ভারতীয় কয়লা শিল্পপতিদের অভাব-অভিযোগ এবং সাধারণভাবে কয়লা শিল্পের বিকাশকে অব্যাহত রাখতে এই সংগঠন সর্বদা মুখর ছিল। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ১৯২১-১৯২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত আইনসভারও সদস্য ছিলেন। এই পদের সুবাদে তিনি আইনসভার আলোচনায় কয়লা শিল্পের সমস্যা তুলে ধরতে এবং সমাধানের বিধান নির্দেশ করে সরকারের সহযোগিতার আবেদন জানাতে কখনও দ্বিধা করেননি। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২০ সালে কয়লা শিল্প-সংক্রান্ত সমস্যা এবং প্রতিবিধান অনুসন্ধানের জন্য যে সরকারি সমিতি গঠিত হয়েছিল শ্রীযুক্ত সরকার এই সমিতিরও সদস্য ছিলেন। উপরোক্ত পদ এবং মর্যাদা যা নিবারণচন্দ্র সরকারকে বিভূষিত করেছিল তা থেকে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে মাননীয় শ্রীযুক্ত সরকার দীর্ঘ দশ বছর ধরে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে একজন কয়লা শিল্পপতি এবং একই সঙ্গে কয়লা শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে কয়লা শিল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ইউরোপীয়ানদের পরিমণ্ডলে এই স্বদেশী বাঙালিবাবুর কর্মতৎপরতা, দূরদৃষ্টি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ভারতীয়দের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ প্রান্তিক অর্ধে সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তৎকালীন বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগে কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন (Political Department of the Govt. of Bengal)। কিছুদিন বাদে এই চাকরি ছেড়ে রেল কোম্পানির কাজে যোগ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানি হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছিল মূলত কয়লা বহনের জন্য এবং রেল কোম্পানিগুলিও ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। মি. ব্যানার্জি আবার এই রেল কোম্পানির কয়লা বহন সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এই কর্মসূত্রে তিনি কয়লা শিল্পপতি, কয়লার বাজার, কয়লা পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। রেলের চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি তিন বছর ধরে Messrs Grindlay & Co.তে কাজ করেন।

পরে এই চাকরিও ছেড়ে দিয়ে তিনি ব্যবসায় নেমে পড়েন। কয়লা ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ শুরু করেন। প্রধানত কমিশনের ভিত্তিতে তিনি কয়লা খনি থেকে কয়লা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন (Selling Agent of Coal)।

ইতিমধ্যে ১৯০৭ খ্রিঃ নাগাদ কয়লা শিল্পে জোয়ার দেখা দিয়েছিল (Coal Rush)। এই সুযোগ নিয়ে তিনি কয়লা শিল্পপতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্যোগ নেন। কয়লা বিক্রি ব্যবসার মাধ্যমে তিনি কিছু পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা হল সমকালীন কয়লার উৎপাদন ব্যবস্থা, বাজার, যোগাযোগ এবং ক্রেতাদের সঙ্গে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এই পরিচিতি এবং মূলধনকে সম্বল করে তিনি পরবর্তীকালে একজন কয়লা শিল্পপতিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এই রূপান্তর সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে Poniati Coal Company-র মালিক ছিলেন তিনি। ফরিদপুর ও দোমোহনীতে এই কোম্পানির পরিচালনায় কয়লা খনি ছিল। এই কোম্পানির জমির পরিমাণ ছিল ২৫০ বিঘা। বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪৮,০০০ টন। Joogidih Coal Company ও তাঁর পরিচালনাধীন ছিল। জমির পরিমাণ ছিল ৩৩০ বিঘা। বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৮,০০০ টন। ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানির Katrasgarh স্টেশনের তিন মাইল দূরে Sinidih কয়লা খনির মালিকও ছিলেন তিনি। এই খনির বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল গড়ে ২৪,০০০ টন। বর্ধমান জেলার Jambad খনিরও মালিকানা স্বত্ব ছিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই খনি অঞ্চলে ৯০০ বিঘার মতো জমি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক গড়ে ১৮,০০০ টন। Bengal-Nagpur রেল যোগাযোগের সন্নিকটে Peepratand কয়লা খনিরও অধিকারী ছিলেন মাননীয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। এই খনি থেকে গুণগত উচ্চমানের কয়লা উৎপাদিত হত। এছাড়া তিনি দক্ষিণ বরাবনী কোল কোম্পানি এবং নতুন বরাবনী কোল কোম্পানির কাছ থেকে দুটি কয়লা খনি কিনে নেন। এই দুইটি খনি থেকে বৎসরে গড়ে ৪০,০০০ টন কয়লা উৎপাদিত হত। বর্ধমান জেলার নিমচা অঞ্চলেও তিনি একটি খনি লিজ নিয়েছিলেন।

মাননীয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এখানেই থেমে যাননি, "Mr. Banerjee & Co." নাম নিয়ে ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে কতকগুলি কোল কোম্পানিকেও তিনি পরিচালনা করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল New Kusumda Coal Company, Central Tentulia Coal Company, Salanpur Coal Concern, The Central Kendah Coal Company ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্ট কয়লা বিক্রির এজেন্সিও নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে Mr. Laikদের নিয়ামতপুর এবং জিনাগড় খনির কয়লা বিক্রি তাঁর মাধ্যমেই হত।

ব্যানার্জি এ্যান্ড কোং-এর কয়লার ডিপো ছিল হাওড়ার শালিমারে, হুগলি নদীর তীরে। এখান থেকে হাওড়া এবং কলকাতার কলে-কারখানায় কয়লা জোগান দেওয়া হত। উল্টোডাঙ্গাতেও তাঁর একটি ডিপো ছিল। এই ডিপো থেকে তেলকল ও আটাকলগুলিতে কয়লা জোগান দেওয়া হত। ভদ্রেশ্বরেও গঙ্গার ঘাটে তাঁর একটা ডিপো ছিল। সেখান থেকে জুটমিল এবং ইটভাটাগুলিতে কয়লা বিক্রি করা হত। ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে কয়লা শিল্পে মূলত ব্রিটিশরা একচেটিয়া প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে N. C. Sarkar এবং W. C. Banerjeeর সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল Indian Mining Federation (1913)।

ভারতীয় কয়লা শিল্পপতিদের মুখপাত্র হিসাবে এই সংস্থার পুরোধায় এগিয়ে গিয়েছিলেন মাননীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ইউরোপীয়ানদের পরিচালনায় রেল কোম্পানিগুলি কয়লা পরিবহনের ব্যাপারে স্বজাতিদের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন। এর ফলে অব্রিটিশ সংস্থাগুলি বঞ্চিত হচ্ছিল এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত চারজন ভারতীয় শিল্পপতি ছাড়াও ওই সময়ে আরও অনেক ভারতীয় বিশেষত বাঙালি সংস্থা, 'ব্যক্তিগত এবং যৌথ' কয়লা উৎপাদনে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন R. L. Dutta & Co., Bholanath Dhar & Co., Joggeswar Roy & Co., Laik & Banerjee Co., Prasanna Dutta ইত্যাদি ইত্যাদি। লায়েক অ্যান্ড ব্যানার্জি—বীরভূম জেলার লাভপুরে মুকুন্দ লায়েক ছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী। ওই জেলারই হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির সঙ্গে তিনি গড়ে তুলেছিলেন লায়েক এবং ব্যানার্জি কোম্পানি। ১৮৭৮ খ্রিঃ এঁরা এই সংস্থা গড়ে তোলেন। মূলত ঝরিয়া অঞ্চলে এরা কয়লা উৎপাদনের কাজ করেন, এ ছাড়া বেগুনীয়া ও বরাকর অঞ্চলেও এদের কয়লাখনি ছিল। কিছুকাল কয়লা শিল্পপতি হিসাবে কয়লা উৎপাদন করার পর এই সংস্থা উপলব্ধি করে যে কয়লাভূমি কেনাবেচা, ভূস্বামী হিসাবে রয়্যালটির অর্থ লাভ করা, জমি লিজ দেওয়া বেশি লাভজনক; উপরন্তু কয়লা শিল্প গঠনের ঝুঁকি একেবারেই নেই। পরে যৌথ মালিকানার লভ্যাংশ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে উভয় পরিবারই কয়লা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে জমিদারিতে মনোযোগী হন। অন্যান্য সংস্থার কার্যাবলী সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু স্বল্প পরিসরের কথা চিন্তা করে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে এদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সংগঠন এবং উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। তা সত্ত্বেও এদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ভারতীয় তথা বাঙালি শিল্পপতিদের (স্থানীয়)

কর্মোদ্যোগের সীমাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যে চারজন কয়লা-শিল্পপতিকে নিয়ে আলোচনা করা হল প্রথমেই দেখা দরকার তারা কীভাবে এই শিল্পে এগিয়ে এসেছিলেন। গোবিন্দপণ্ডিত এসেছিলেন কয়লাশিল্পের কর্মচারী এবং পরবর্তীকালে সরকারি কর্মচারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে। শিবকৃষ্ণ দাঁ এসেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং কয়লা শিল্পাঞ্চলে জমি লাভ করে। নিবারণচন্দ্র সরকার বেঙ্গল কোল কোম্পানির কর্মচারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন রেলকর্মচারীর অভিজ্ঞতা নিয়ে। এরা কেউই কিন্তু বিরাট অঙ্কের পুঁজি নিয়ে কয়লাশিল্প গড়ে তুলতে আসেননি। কয়লাশিল্পের সঙ্গে পরিচিতি এবং যোগাযোগ ছিল এদের প্রধান মূলধন। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ১৯২৭ খ্রিঃ থেকে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে পুঁজির অভাব দেখা দিল। সেই ধাক্কা সামলাইবার মতো সহায় এবং সম্পদ ছিল না। অপরদিকে কিন্তু ইউরোপীয় পরিচালিত সংস্থাগুলির অবস্থা ছিল উন্নততর। তারা ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে টাকা ধার নিতে পারত। বর্ণ-সাজুয্যে প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনও ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত ছিল। তাদেরকে ব্যক্তিগত সংস্থা থেকে চড়া সুদে টাকা ঋণ করতে হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ নিবারণচন্দ্র সরকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, কারনানীর কাছ থেকে চড়া সুদে অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য ঋণ নিয়েছিলেন এবং এই ঋণের দায়ে তাঁর খনি সম্পদ, এমনকি কৃষিজমিও হাতছাড়া হয়েছিল।

ইউরোপীয় সংস্থাগুলির অনুকরণে ভারতীয় কয়লা-শিল্পপতিরাও গড়ে তুলেছিলেন ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা। কিন্তু ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে কয়লা ছাড়াও অনেক বৃহৎ শিল্প সংগঠনও ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে Andrew Yule-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের নিয়ন্ত্রণে কয়লা ছাড়াও ছিল চা, জুট, জাহাজ ইত্যাদি নানা বৃহৎ শিল্প। অর্থনীতির ভাষায় এই বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে এরা 'Inter locking' ব্যবস্থা প্রচলন করেছিল। এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা এদের ছিল। দুর্বিপাকে পড়লেও এদের বিলুপ্তি ঘটেনি। কিন্তু ভারতীয় কয়লা শিল্পপতিরা দাঁড়াতে পারলেন না।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার বাজার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কয়লার বাজার সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। কলকাতা বন্দর থেকে কয়লা চালান যেত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, এমনকি বিদেশেও। সুতরাং, পরিবহনের সমস্যা ছিল। রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রেল কোম্পানিগুলি কয়লা পরিবহনের দায়িত্ব নিয়েছিল। এই কোম্পানিগুলিও ছিল ইউরোপীয় পরিচালনাধীন। এখানেও জাত এবং বর্ণ ভারতীয় তথা বাঙালি শিল্পপতিদের বিপাকে ফেলেছিল। কয়লা পরিবহনের জন্য ন্যায্য ওয়াগন-থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছিল। কয়লা উৎপাদন করেও বাজারে চালান দিতে না পারার জন্য তারা সত্বর পুঁজি সংগ্রহে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। এ নিয়ে তাদের অভিযোগ তারা সরকারের কর্ণগোচরে আনলেও সমস্যার বিশেষ সুরাহা হয়নি।

তা ছাড়া বিভিন্ন কোম্পানিগুলি যত বেশি লাভ করতে পারবে তত বেশি অর্থ বা পুঁজি তারা দেশে পাঠাতে পারবে। স্বদেশপ্রীতি এবং উপনিবেশ শোষণ এই চিন্তা ব্রিটিশ শাসকবর্গকে অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশীয় শিল্পপতিদের বঞ্চিত করে তারা স্বদেশী এবং স্বজাতীয় শিল্পপতিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের কয়লা অঞ্চলে ভূমিনীতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীদের একটা চক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে বাধ্য করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আইনগতভাবে তৈরি করা হয়েছিল একদল ভূস্বামী সম্প্রদায়কে। এরা জমির উপরিভাগ এবং নিম্নভাগ উভয়েরই মালিকানা লাভ করেছিল। রয়্যালটির অর্থ, করের টাকা, সেলামির টাকা এরাই পেত। সরকারকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কর দিলেই সরকার সন্তুষ্ট থাকত। এই ভূস্বামী সম্প্রদায়কে প্রথমদিকে ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই শত্রু শিবিরে ঠেলে দিতে চাননি ; তাদের তোয়াজ করার নীতি নিয়েছিলেন। পূর্বের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত এবং তার পরিবার, নিবারণচন্দ্র সরকার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকৃষ্ণ দাঁ এমনকি লায়েক এবং ব্যানার্জি কয়লাশিল্প ছেড়ে কয়লাভূমিতে জমির লেনদেন করে অর্থোপার্জনে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। কয়লাভূমিতে জমির লেনদেন নতুন এক ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। এই ব্যবসা অলসতার প্রশ্রয় দিয়েছিল। কলকাতা শহরের আকর্ষণ এদের মোহিত করেছিল। কয়লা ব্যবসার ঝুঁকির চাইতে কলকাতায় বসে জমির লেনদেন করে অর্থোপার্জনকে এরা অর্থ উপায়ের সহজ রাস্তা হিসাবে বেছে নিলেন। কয়লাশিল্প থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। এই পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকারের ভূমিনীতি। এর জন্য ভারতীয়দের অভিযুক্ত করা সত্যের অপলাপ করা হবে।

এ তো গেল সাধারণ কারণ, তা ছাড়া পারিবারিক কিছু কারণও ছিল। গোবিন্দ পণ্ডিতের উত্তরসূরীরা সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে তাদের কয়লাশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শিবকৃষ্ণ দাঁ-এর বংশধরেরা কলকাতার মোহে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মান-সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা তাদের মোহিত করেছিল। কলকাতায় এসে পূজা অর্চনা, সংগীতচর্চায় বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। কয়লা ব্যবসার ঝুঁকি থেকে সরে আসতে চাইছিল এবং নতুন অন্য ধরনের শিল্প গঠনে উৎসাহী হয়ে পড়ল। নিবারণচন্দ্র সরকারের পুত্র পিতা প্রদর্শিত পথে হাঁটবার চেষ্টা করেছিলেন। কয়লাশিল্পের পরিধি সম্প্রসারিত না হলেও তিনি অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাঁর পরবর্তী বংশধর অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ তা বাঁচাতে পারেননি। এখানে বংশানুক্রমিক তৃতীয় বংশ পুরুষের তত্ত্বকে পতনের জন্য চিহ্নিত করা যায়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী পুরুষ জমি লেনদেনের ব্যবসায়, অর্থাৎ জমিদারতন্ত্রের আকর্ষণে কয়লাশিল্প থেকে সরে গিয়েছিলেন।

পূর্ব আলোচিত স্থানীয় ভারতীয় কয়লা-শিল্পপতিদের প্রস্থানের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণে এগিয়ে এল ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে শিল্পপতিরা এবং বৃহৎ আকার ইউরোপীয় কয়লা-শিল্পসংস্থাগুলি। নিবারণচন্দ্র সরকারের কয়লাভূমির উপর গড়ে উঠল কারনানীর কয়লাসাম্রাজ্য (মাড়োয়ারী সংস্থা)। শিবকৃষ্ণ দাঁ-এর সম্পত্তি লিজ নিল Andrew Yule পরিচালিত খাতড়াস ঝরিয়া কোল কোম্পানি। গোবিন্দ পণ্ডিতের কয়লাভূমির অধিকাংশই দখল করেছিল Andrew Yule পরিচালিত বেঙ্গল কোল কোম্পানি। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়লাসম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল Andrew Yule পরিচালিত বিভিন্ন কোল কোম্পানিগুলি।

দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্ অধ্যায়ে বাঙালির কয়লাশিল্পের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। আজকের দিনেও তা দৃষ্টান্ত হিসাবে অনুপ্রেরণার জোয়ার আনতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে স্বল্প পুঁজি নিয়ে কয়লাভূমিতে বাঙালির শিল্পোদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সমকালীন অন্য শিল্পগুলিতে বাঙালির অনুরূপ কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন কয়লাশিল্পে জোয়ার আসে তখনও আমরা বাঙালিদের অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। যদিও আকারের দিক থেকে তারা ততটা বৃহৎ ছিল না।

সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং হাতে লেখা নথিপত্র

(1) Partner in Empire—Blair, B. Kling.

(2) Zamindars, Mines and Peasants—Ed. by D. Rothermund & D. C. Wadhwa.

(3) Studies in Economic Policy and Development of India 1848–1939—Sunil Kumar Sen.

(4) Andrew Yule & Co. Ltd. 1863-1984—Private Publication.

(5) Bengal and Assam Behar and Orissa—
Complied by Somerset Play ne.
Edited by Arnold Wright

(6) C. P. Simmons রচিত প্রবন্ধাবলী যা Bengal Past & Present এবং Social & Economic History Review-তে প্রকাশিত হয়েছে।

(7) M. G. M. I. I. সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার প্রবন্ধাবলী। বিশেষ করে 1982 খ্রিঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ—300 Years of Raniganj Coalfield—Amalendu Banerjee.

(8) বর্ধমান রাজ কলেজ শতবর্ষ (১৮৮১-১৯৮১) পূর্তি সংখ্যায়—১৮২৯ সালের বর্ধমান, জাকর্ম ভ্রমণ বৃত্তান্ত যা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক অবন্তীকুমার সান্যাল।

(9) ইতিহাস অনুসন্ধান ৮ম এবং ৯ম সংখ্যায় আমার লেখা দুইটি প্রবন্ধ।

এ ছাড়া—

B. I. M.—গুরুসদয় দত্ত রোড, কলিকাতা। এখানে Andrew Yule Co.-র Manuscripts Papers সংরক্ষিত আছে—আমাকে এগুলি দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন মাননীয় সমর বাগচী মহাশয়। এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখা লিখতে আমি তথ্য এবং পরামর্শ যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তিনি আমার মাস্টার মহাশয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রিয়ব্রত দাশগুপ্ত। তাঁর কাছেও আমি ঋণী।

কয়লা খাদ
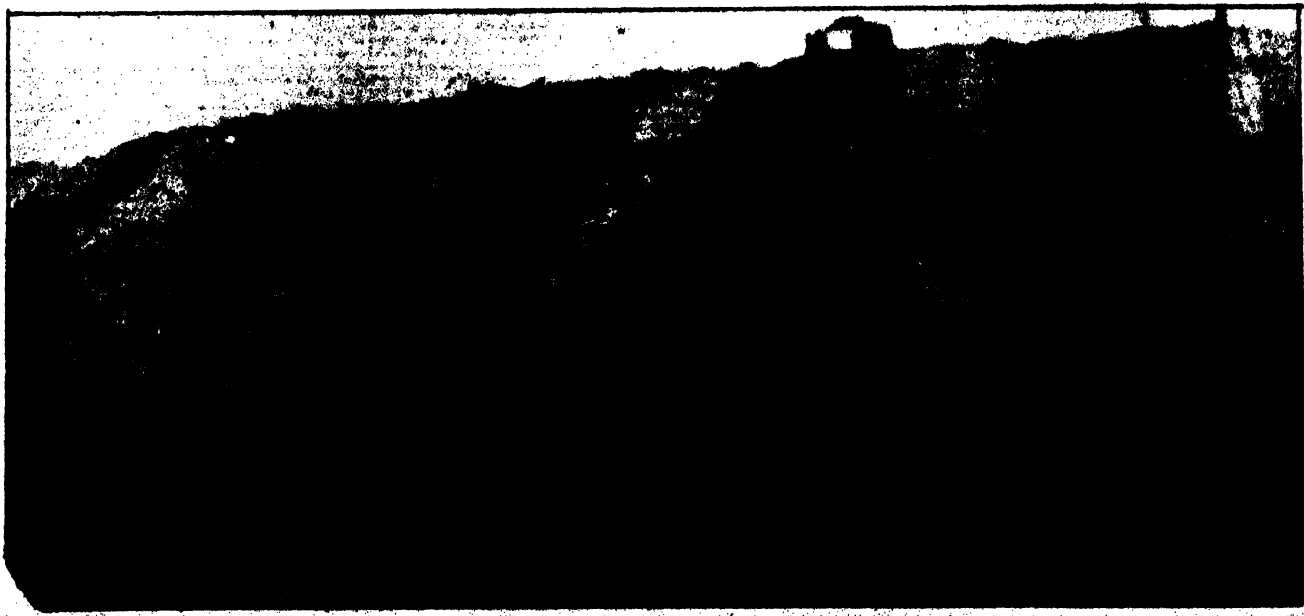
বর্ধমানের কৃষি

অজিত হালদার

মানুষের জীবনে অনন্ত অভাব। অভাব পূরণের জন্য সচেতন প্রয়াসজাত ফলকে আমরা উৎপাদন বলে থাকি। অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের মতো প্রাথমিক অভাব পূরণের জন্য মানুষের যে প্রকৃতি সম্পর্কিত আয়োজন তাই কৃষি উৎপাদন। প্রকৃতিদত্ত উপকরণের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি একত্র হয়ে উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় আর এই বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেটি মানবসমাজের মূল ভিত্তি। এই সম্পর্কের পরিবর্তন হলে সামাজিক বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান উপকরণ ভূমি। ভূমি মালিকানাকে কেন্দ্র করে এবং কৃষি উদ্বৃত্ত বণ্টনকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয় কৃষিপ্রধান দেশে সেটি সামাজিক আধিপত্য ও ক্ষমতার বিন্যাসের প্রধান নির্ধারক। এই সম্পর্ক একদিকে যেমন ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতার বিন্যাস তৈরি করে অন্যদিকে তেমনই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারকেও ত্বরান্বিত করে। বর্ধমানের কৃষি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাই উপকরণ ও প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উৎপাদন ক্ষমতার আর সেইসঙ্গে কৃষি সম্পর্ক নির্ভর উদ্বৃত্ত বণ্টন ও সামাজিক আধিপত্যের ধারাবাহিকতার বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে বর্ধমানের কৃষি ব্যবস্থাকে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করব। পর্যায়গুলি যথাক্রমে প্রাকঔপনিবেশিক পর্যায়, ঔপনিবেশিক পর্যায়, স্বাধীনতা-উত্তর ভূমি সংস্কার পর্যায় এবং বামফ্রন্ট শাসনের পর্যায়।

বর্ধমানের কৃষি : প্রাকঔপনিবেশিক পর্যায়

মধ্যযুগের বর্ধমানে দু-ধরনের মানুষের কাছে ভূমি শব্দটি দুটি পৃথক অর্থ বহন করত। স্বাধীন কৃষক বা রায়তের কাছে ভূমি ছিল সম্পত্তি—উৎপাদনের উপকরণ, অধিকার ছিল স্থায়ী। কিন্তু এই অধিকার ঠিক পুঁজিবাদী অর্থে যে অধিকার বোঝায়, তা নয়। এই অধিকারের বলে ভূমি ব্যবহার করা যেত, উত্তরাধিকারীকে অর্পণ করা যেত, এমনকি দান বিক্রয়ও চলত কখনও কখনও, কিন্তু কখনই অব্যবহারে ফেলে রাখা যেত না। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য হত। অন্যদিকে বাদশা, জমিদার আর অন্য মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে ভূমি ছিল এমন একটি স্থান যার অধিবাসী প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব বা কর-খাজনা আদায় করা সম্ভব হত।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান চাকলার (এখনকার জেলা) ভূমির উপর ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত অধিকারের অদ্ভুত ধরনের সংমিশ্রণ চালু ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভূমির ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত অধিকার বজায় থাকত, যার ফলে নিষ্ফলা ভূমি, গোচর, সেচের খাল ও দিঘি, শ্মশান প্রভৃতির অধিকার কোনও ব্যক্তির উপর বর্তানো সম্ভব হত না। অন্যদিকে ফলবতী ভূমির দখলীস্বত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যক্তির হাতে থাকত, আর এই অধিকারের জন্য শাসনকর্তা বা তার মনোনীত কোনও ব্যক্তিকে কর-খাজনা দিতে হত। যদি এই কর-খাজনা সরাসরি রাজকোষে জমা পড়ত তাহলে যে ভূমি এই আদায় দিয়েছে তাকে বলা হত খালসা ভূমি। কিন্তু মোগল আমলে শাসনকর্তাদের কদাচিৎ নগদ মাইনে দেওয়া হত, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষার উপায় হিসাবে যা চালু ছিল তা হল নগদ মাইনের পরিবর্তে রাজস্ব আদায়ের ভূমি বন্দোবস্ত। যখন কর-খাজনা সরকারি কোষাগারে জমা না পড়ে এইরকম ভূমিস্বত্বভোগী নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে যেত, তখন সেই খাজনা-আদায়ী ভূমিকে নিষ্কর বা লাখেরাজ ভূমি বলা হত।

সব লাখেরাজ ভূমিই ছিল বৃত্তি খাজনার অন্তর্গত। রাজস্ব আদায়কারীর মাইনের পরিবর্তে প্রদত্ত ভূমির নাম ছিল নানকর। চৌকিদার-থানাদারদের জন্য ছিল চাকরান, পাইক বা সৈন্য-সংগ্রাহকের জন্য ছিল পাইকান। এমনকি কামার, কুমোর, স্যাকরা, তাঁতি, নাপিত, ডোম, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ, ইমাম প্রভৃতি ব্যক্তিরা পেশাগতভাবে সমগ্র গ্রামসমাজের স্বার্থে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁদের পেশাগত কাজের বিনিময়ে তাঁরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করতেন। প্রত্যেকের জন্য লাখেরাজ ভূমি থাকত এবং সেই ভূমি প্রজারা চাষ করে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ তাঁদের দিতেন। এইভাবে গ্রামের প্রত্যেক অধিবাসী সমগ্র গ্রামসমাজকে শ্রম খাজনা দিতেন। এ ছাড়া দেবতা বা পীরের সেবার জন্য দেবোত্তর বা পীরোত্তর ভূমি ও নিষ্কর বলে গণ্য হত। ১৭৪০ সালে রাজা তিলকচাঁদের আমলে বর্ধমান চাকলায় চার লক্ষ বাষট্টি হাজার বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল, যা তখনকার সমগ্র কর্ষিত ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ। শুধু ব্রহ্মোত্তর জমির পরিমাণ যখন এই তখন সহজেই বোঝা যায় সব রকমের লাখেরাজ ভূমি যোগ করলে তার পরিমাণ অনেক বেশি হবে। বর্ধমানে তখন সমগ্র কর্ষিত জমির পাঁচ ভাগের চার ভাগই লাখেরাজ বা নিষ্কর ছিল।

বর্ধমান যখন একটি পরগনামাত্র ছিল, তখন রাজা টোডরমল বর্ধমানের রাজস্ব নির্ধারণ করেন। এই সময় খালসা ভূমির রাজস্ব হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয় ক্রমশ বাড়তে থাকায় এবং কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ বাড়ানোর কোনও সম্ভাবনা না থাকায় রাজস্ব হার বাড়তে লাগল। বর্ধমান চাকলা হওয়ার পর ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজস্ব হার উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয়। পরে তা আরও বাড়ে। তাই চাষের খরচ এবং খাজনা বাদ দিয়ে বর্ধমান চাকলার রায়তরা বেশি উদ্বৃত্ত ভোগ করার সুযোগ তখনও পেত না। ১৭৬০ সালে সমগ্র চাকলার রাজস্ব বা মালগুজারী ছিল তিরিশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। প্রথম শ্রেণীর সালি জমির খাজনা ছিল বিঘা প্রতি এক টাকা। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ তিন-চারটি স্তরে জড়িত ছিলেন। প্রথমেই ছিলেন প্রত্যেক গ্রাম বা মৌজায় একজন প্রাথমিক জমিদার। অবশ্য এই জমিদার ইংরেজ আমলের জমিদার নয়, এঁরা কখনই কেবলমাত্র রাজস্ব-আদায় চুক্তিতে মালিক ছিলেন না। এঁরা আসলে ছিলেন খুদকস্ত রায়ত অর্থাৎ স্বাধীন কৃষক, নিজেরা চাষ করতেন, কখনও অন্যদের অর্থাৎ পাইকস্ত রায়ত অথবা আদিবাসী ও খিদমত প্রজাদের দিয়ে চাষ করাতেন। রায়তকে কী পরিমাণ কর-খাজনা দিতে হবে তা হিসাব করার এবং তা সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার ভার প্রাথমিক জমিদার বা গ্রামপ্রধানদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তিনি একদিকে ছিলেন গ্রামসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় স্বাধীন রায়ত অন্যদিকে ছিলেন রাজস্বআদায়কারী কর্মচারী। আমিলদার দ্বারা নির্ধারিত সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় দিতে পারলে তিনি মোট রাজস্বদায়ী ভূমির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ লাখেরাজ ভূমি হিসাবে ভোগ করতে পারতেন। এর পরের স্তরের ব্যক্তিরা মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকারী ছিলেন। কয়েকটি গ্রাম বা মৌজা নিয়ে তৈরি হত একটি মহাল বা পরগনা। মহালের প্রাথমিক জমিদারদের মধ্যে যাঁকে সব থেকে বিচক্ষণ বা সমর্থ মনে করা হত তাঁকে নাজিমের তরফ থেকে মুখ্য বা মণ্ডল নিযুক্ত করা হত। এঁরা প্রাথমিক জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে জমা দিতেন এবং আদায়ের এক-দশমাংশ ভোগ করতেন। এর পরের স্তরে থাকতেন চৌধুরী, এঁদের কিছু শাসনক্ষমতাও থাকত। কোনও কোনও শক্তিশালী চৌধুরী বাদশা বা নবাবের তরফ থেকে রাজা বা তদনুরূপ খেতাব পেতেন। বর্ধমান চাকলার চৌধুরী রাজা খেতাব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মোগল যুগের ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক দখলিস্বত্বের দ্বৈতাবস্থা বজায় থাকার ফলে বর্ধমানের গ্রামসমাজে এক ধরনের সম্পত্তিগত অসাম্যের উদ্ভব ঘটে। ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে বর্ধমানে জবৎ প্রথার পরিবর্তে নকস্ প্রথায় রাজস্ব নির্ধারণ শুরু হয়েছিল। নকস্ প্রথায় রাজস্ব নির্ধারণের প্রাথমিক একক ছিল গ্রাম। আমিলদার গ্রামের রাজস্ব নির্ধারণ করে দেওয়ার পর

কোন রায়তকে কত দিতে হবে তার হিসাব করতে হত গ্রামপ্রধানকে। বর্ধমানের কবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে সুন্দর বর্ণনা করেছেন কেমন করে অসাধু গ্রামপ্রধান রায়তের রাজস্ব নির্ধারণের সময় ১৫ কাঠা জমিকে ২০ কাঠা দেখাতেন এবং অকর্ষিত ভূমিকে কর্ষিত ভূমি দেখিয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করতেন, কিন্তু সরকারি খাতে নিয়মমত কম জমা দিতেন। ফলে কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত তাঁর হাতে থেকে যেত। এমনকি সমগ্র গ্রামসমাজের জন্য নির্দিষ্ট জমির কিয়দংশ কখনও কখনও নিজের বলে দাবি করে নিষ্কর ভোগ করতেন। ফলে অসাম্য আরও বাড়ত। এই অসাম্য বৃদ্ধির প্রসার দ্রুতহারে ঘটত তখনই, যখন খাজনার হার বাড়ত অথবা শস্যের ভাগের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা হত। এইভাবে অনেক গ্রামপ্রধান পঞ্চাশ বিঘা থেকে শুরু করে দুশো-তিনশো বিঘা পর্যন্ত ভূমির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে উচ্চ পদাধিকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থের সংঘাত ঘটত প্রায়শই। গ্রামপ্রধানরা যেমন ছলে বলে কৌশলে ও তোষণের মাধ্যমে উচ্চ পদাধিকারীদের স্থান দখল করতে চাইতেন, তাঁরাও তেমনই গ্রামপ্রধানদের ক্রমশ দরিদ্র করে একেবারে ভাগচাষীর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চাইতেন।

যেহেতু সে সময় বর্ধমানে বেশিরভাগ খাজনাই আদায় হত ফসলী ও খামার পদ্ধতিতে এবং যেহেতু গ্রামের পেশাজীবী মানুষরা লাখেরাজ ভূমির উদ্বৃত্তজাত বৃত্তিভোগী ছিলেন, সেজন্য কী সরকার কী রায়ত কি পেশাজীবী ব্যক্তি সকলেই কৃষির উন্নতির প্রতি যত্নবান ছিলেন। ভূমি যাতে অকর্ষিত না থাকে সেদিকে নজর দিতেন। এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও ফসলের ভাগে নিজেদের আয় সংগ্রহ করতেন বলে নিজের নিজের জায়গিরে কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে তার দিকে লক্ষ রাখতেন। এই কারণে সরকার যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার ঘটাতেন, তেমনই গ্রামসমাজের মধ্যে বাঁধনির্মাণ ও খাল খননের প্রয়োজনে একটি সামাজিক দায়িত্বেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এর নাম ছিল পুলবন্দী। 'জলের সাধারণ ও সার্থক ব্যবহারের প্রাথমিক প্রয়োজনেই' এই সামাজিক দায়িত্বের উদ্ভব ঘটেছিল। বর্ধমানে জলের সাধারণ ও সার্থক ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মৌজায় মৌজায় মাঠে মাঠে ছড়ানো সেচের খাল ও দিঘির ব্যবহারের মধ্যে। দিঘিগুলির আয়তন ছিল বিরাট, জলকর তিরিশ বিঘা থেকে তিনশো বিঘা পর্যন্ত। বর্ধমানের এগুলির প্রত্যেকটিই খনিত হয়েছিল প্রাক-ইংরেজ পর্বে। বর্ধমানের সেচখালের প্রসঙ্গে উইলিয়াম উইলকক্সের 'বাংলার প্রাচীন সেচব্যবস্থা'র নিম্নলিখিত অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য।

'দামোদরের প্রধান স্রোতধারা জামালপুরের পরে সমকোণে বেঁকে গিয়ে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল, মূল স্রোতধারার বাঁদিকে একটি শক্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছিল যাতে বর্ধমান, হুগলি, হাওড়ার (সব মিলিয়ে তখনকার বর্ধমান চাকলার) উর্বর জমিগুলি রক্ষা পায়। এই জমিগুলিতে সেচের জন্য সাতটি খাল কাটা হয়েছিল এবং এই সাতটি খাল মিলে বদ্বীপ সৃষ্টি করেছিল। এই খাল বা কানানদীগুলি দামোদরের উপচে পড়া জল নিজেদের মধ্যে বহন করে সারা বর্ধমান জুড়ে ছড়িয়ে দিত। দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যে এই খালগুলি মোট সত্তর লক্ষ একর জমি সেচের আওতায় এনেছিল। এমন সুন্দরভাবে এই খালগুলি তৈরি হয়েছিল যাতে বহু শতাব্দী ধরে তারা কাজ করে যেতে পেরেছে। .....সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে দুবার বাংলা ভ্রমণ করে লিখেছিলেন : রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বহু পরিশ্রমে খনন করা অসংখ্য খাল অনেককাল ধরে সেচ ও পরিবহনের কাজ করত। .....১৮১৫ সালে হ্যামিল্টন বর্ধমানের ভিতর দিয়ে ভ্রমণ করে লিখেছিলেন : সারা হিন্দুস্তানের মধ্যে কৃষি-উৎপাদনের দিক থেকে বর্ধমান প্রথম স্থান অধিকার করে, দ্বিতীয় তাঞ্জোর।

সেই সময় বর্ধমানের কৃষি ও শিল্পে শ্রমবিভাগ তেমন স্পষ্ট ছিল না এবং শিল্প তখনও পৃথক বৃত্তি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। কৃষক পরিবারগুলি তখন চাষ করা এবং অবসর সময়ে সুতো কাটা ও হাতে তাঁত বোনার এক বিচিত্র সমন্বয়ে স্বয়ম্ভর জীবন যাপন করত। ১৭৫২ সালে রবার্ট ওরমে লিখেছেন : 'বর্ধমানে একটি গ্রামও খুঁজে পাওয়া শক্ত যেখানে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু বস্ত্র উৎপাদনে ব্যস্ত নয়।' অন্য হস্তশিল্পগুলিও অনিবার্যভাবে কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকত। গ্রাম সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের গ্রাহকরা সাধারণত সেই গ্রামেরই অধিবাসী হতেন, কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী দুটি একটি গ্রাম থেকেও আসতেন। কারিগররা যেসব দ্রব্য তৈরি করতেন সেগুলির প্রত্যেকটি ধরে ধরে তাঁদের দাম দেওয়া হত না। তাঁদের পরিশ্রমের পরিবর্তে সাধারণত প্রতি রায়তের কাছে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ তাঁরা পেতেন, অথবা কিছু পরিমাণ লাখেরাজ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করতেন। এইভাবে আর্থিক বিনিময় বাজারের অভাব থাকলেও ভূমি ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য পেতেন। তাই গ্রামগুলি বস্তুতপক্ষে এক-একটি স্বয়ম্ভর সমাজ হিসাবে টিঁকে থাকত। বাইরের জীবনের, রাষ্ট্রীয় ঘটনার, দেশি-বিদেশি নায়কের উত্থান-পতনের ফলে এই সমাজে বিশেষ পরিবর্তন ঘটত না।

কোম্পানির রাজত্ব তথা ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বর্ধমানের এই ছবিটি থেকে মার্কস-কথিত 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র একটি সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। উৎপাদন ক্ষমতার নিম্ন মান, জলসম্পদের 'সাধারণ ও সার্থক' ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পের স্বাভাবিক সংযুক্তি, পণ্যের আর্থ বিনিময়ের অভাব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতিকে নিশ্চিতভাবে সমর্থন করে। তবু বর্ধমানের ইতিহাসে এটাও স্পষ্ট বাস্তব তেখন বর্ধমানে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধীরে ধীরে কৃষক বিভাজন শুরু হচ্ছিল। গ্রাম সমাজে সামন্তবর্গীয় মানুষের মধ্যে ইজারা-প্রথার মাধ্যমে স্তরবিভাজন দেখা যাচ্ছিল, গ্রামপ্রধানদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্জনের সঙ্গে অসাম্য এবং পুঁজি সৃজন ঘটছিল। নিষ্ক্রিয় উদ্ভিদধর্মী জড়ত্বের বদলে বর্ধমানে সক্রিয় গতির চিহ্ন ফুটে উঠছিল।

বর্ধমানের কৃষি : ঔপনিবেশিক পর্যায়

বর্ধমানের গ্রামসমাজে ভূমি ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে পরিবর্তন আনার একটা সচেতন প্রয়াস প্রথম দেখা গেল ইংরেজ আমলে।

১৭৬০ সনের একটি সনদের মাধ্যমে মীরকাশিম বর্ধমান চাকলাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দিলেন। এই সনদে তিনি বর্ধমানের রাজা ও গ্রামপ্রধানদের নির্দেশ দিলেন যে তাঁরা যেন ইংরেজ কোম্পানির কাছে সরাসরি রাজস্ব আদায় দিতে অন্যথা না করেন। কোম্পানির আমলে বর্ধমানে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম হওয়ার পর বিলেতের তত্ত্বীয় ধারণাকে বর্ধমানের ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরীক্ষা শুরু হল। ইংল্যান্ডের ধ্রুপদী দর্শনের 'অদৃশ্য হস্তের' ধারণা এবং কৃষি ও শিল্পে স্বাধীন পুঁজির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সম্ভাবনা বর্ধমানে এই প্রয়োগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুটি মূলনীতির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। দুটি নীতির একটি হল ভূমিতে 'ব্যক্তিগত মালিকানার যাদু', যার স্পর্শে বিত্তশালী ব্যক্তিরা ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে আকৃষ্ট হবেন এবং ভূমির উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করে নিজেদের আরও অর্থবান করবেন। এবং অন্য নীতিটি হল রাজস্বের হাত স্থিরনির্দিষ্ট করে দেওয়া, যার ফলে একদিকে যেমন ভূমিত উদ্বৃত্তের কিছু অংশ ভূমিতে পুনর্বিনিয়োজিত হয়ে পুঁজি বিকাশ ত্বরান্বিত করবে অন্যদিকে তেমনই নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিয়মিত হবে।

স্বাধীন ভূমি বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্ধমানের রেসিডেন্ট কালেক্টর সামন্ত-কাঠামোর লাখেরাজ জমিতে 'আধা ভূমিদাস' প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রথম একটি আর্থ-বিনিময় ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করলেন। সরকারি অধিগ্রহণের জন্য তিনি যে যুক্তি দেখালেন তা হচ্ছে: যে সব জমি থেকে সরকার কোনও কর-খাজনা পেত না তা থেকে ন্যায়সঙ্গত কিছু আদায় করা যাবে, সামগ্রিকভাবে রাজস্বহার বৃদ্ধি পাবে, বেনামি হস্তান্তর বন্ধ হবে এবং অকৃষক ভূমি মালিকের কাছ থেকে ভূমি কেড়ে নিয়ে প্রকৃত কৃষকের হাতে দিতে পারলে ভূমির সদ্ব্যবহার হবে ও কৃষি উৎপাদন বাড়বে। ১৭৯৩ সালের এক আইনবলে সরকার বর্ধমান রাজের থানাদারি ও পাইকান জমির সবটুকু যা একাংশ অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা গ্রহণ করল। ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বর্ধমানের ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫১৬ বিঘা থানাদারি জমি রাজস্বদানকারী সম্পত্তিতে পরিণত হল, আর পুলিশ জমা বাড়তি কর হিসাবে রায়তদের ঘাড়ে চাপল। ওই একই বছরের ২২ মার্চের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণায় সরকার সমস্ত লাখেরাজ ভূমির ব্যাপারে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা গ্রহণ করল আর ১০০ বিঘার নীচে যেসব লাখেরাজ ভূমি ছিল সেগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রতিশ্রুতি দিল।

বর্ধমানের লাখেরাজ ভূমি-মালিকদের এই আইন সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, যেমন করে হোক আইনের ফাঁকে জমি ধরে রাখার চেষ্টা করা। তাঁরা ১৭৬৫ সালের আগের তারিখের জাল বাদশাহী সনদ জোগাড় করতে লাগলেন, আর তার সঙ্গে বড় বড় সম্পত্তিকে একশো বিঘার কম ছোট ছোট টুকরো করে আইনের ফাঁকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন। অথবা নানা ছল-ছুতোয় মামলা করেও নিষ্কর জমি ধরে রাখতে চাইলেন। বর্ধমানে কেবলমাত্র এক বছরে ৭০ হাজারের মতো বিরাটসংখ্যার সনদ রেজিস্ট্রিকরণ মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য যেমন মামলা, তেমনই তার বিচার। শুধুমাত্র একদিনে (৩রা মে, ১৮৩৭) বর্ধমানের ডেপুটি এইরকম ৪২৯টি মামলা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তি করেছিলেন। এইভাবে ৪৫ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হল। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সরকার অর্ধেকের বেশি লাখেরাজ ভূমি অধিগ্রহণ করতে পারেননি। তার কারণ গ্রামপ্রধান ও বড় বড় জমি-মালিকদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া হাজার হাজার ছোট ছোট লাখেরাজদের খুঁজে বের করা সরকারের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। আর তাঁরা এ ধরনের সাহায্য করতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার মতো বোকা ছিলেন না। শুধু তাই নয়, যেসব জমি সরকার অধিগ্রহণ করতে পেরেছিল সেগুলিরও বেশিরভাগ কম খাজনায় পূর্বতন মালিকদের কর্মচারী ও মুৎসুদ্দিদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দিতে হয়েছিল। এইভাবে সরকারকে প্রধান ভূমি মালিকদের সঙ্গে একটা আপসে আসতে হল। প্রায় ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার বিঘা জমি মাত্র ৭০ জন লোক এবং তাদের অনুগতদের হাতে বিলি করতে হল। আর বর্ধমানের রাজার পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলের একটি রায়ের পর এই চেষ্টা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

সুতরাং বর্ধমানের লাখেরাজ জমি অনেক থেকে গেল। থেকে গেল সামন্ত কাঠামোর আগল ধরেই। কারণ বর্ধমানে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর, আয়মা, মহত্তরণ প্রভৃতি নামে যেসব লাখেরাজ ভূমি ছিল, সেগুলির অধিকারীরা বিশ শতকের মধ্যভাগেও ধর্মীয় এবং সামাজিক নিষেধে ভূমিকর্ষণ এমনকি তার তদারকি করা থেকেও বিরত থাকতে বাধ্য হতেন। কাজেই জমি ভাগে দিয়ে অনর্জিত উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা ছাড়া তাঁদের অন্য উপায় ছিল না। অবশ্য এই ঐতিহ্যমণ্ডিত উপায়টি থেকে উদ্বৃত্ত কিছু কম আসত না, প্রায়শ রীতিমাফিক ন্যায্য পাওনার থেকে বেশি পাওয়া যেত। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদাররাই এসব জমি নানা কৌশলে ভোগ করতেন। ১৮৭৩ সালে শতকরা ৮ জন পত্তনিদার শতকরা ৭০ ভাগ লাখেরাজ ভূমির অধিকারী ছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের দেয় রাজস্ব-হারের পরিমাণ চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গেল আর তা স্থির হল টাকার অঙ্কে। কিন্তু নামের দিক থেকে পরিহাসের ব্যাপার এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকেই জমিদারদের দেয় রাজস্ব নগদ অর্থে স্থির হয়ে গেলেও প্রকৃত অর্থে দ্রুত কমতে লাগল। ১৭৬৩ সালে বর্ধমানে সালি জমির একর প্রতি দেয় রাজস্ব ছিল ৪ টাকা ৫ আনা ৭ পাই। তখন মন প্রতি ধানের দর ছিল চার আনা। ১৭৯৩ সালে ওই রাজস্বহার 'চিরকালে'র জন্য স্থির হয়ে গেল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলেই বর্ধমানে ধানের দাম বত্রিশগুণ বেড়ে গেল। ১৮০০ সালে বর্ধমান ধানের দর হল মন প্রতি সাড়ে ৯ আনা, ১৮২৫ সালে পাঁচসিকে, ১৯০০ সালে দেড় টাকা, ১৯২৫ সালে সাড়ে চার টাকা আর ১৯৫০ সালে ৯ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে জমিদারদের একর প্রতি দেয় রাজস্বের পরিমাণ ১৭৯৩ সালে ছিল ১৮ মন ধান, তা ১৮০০ সালে হল ৮ মন, ১৮২৫ সালে চার মন আর ১৯৫৩ সালে মাত্র আধমন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চালু হওয়ার পর থেকে জমিদারদের দেয় প্রকৃত রাজস্বের পরিমাণ দ্রুত কমলেও রায়তদের কাছ থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের আদায় কিছুই কমল না। বরং বেড়ে গেল। জমিদাররা যাতে নিয়মিত রাজস্ব জমা দিতে পারে সেজন্য রায়তদের কাছে অবাধে খাজনা আদায় করার অধিকার জমিদারদের দেওয়া হল। জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে তখন খাজনা আদায় করত ফসলের হিসাবে। ১৭৯৩ সালের আইনে প্রজাদের ফসল কেড়ে নেবার জন্য জমিদারকে ক্রোকের অধিকার দেওয়া হল। ১৭৯৯ সালের সপ্তম রেগুলেশনে রায়তদের উচ্ছেদ করার জন্য জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা দেওয়া হল। ওই আইনে আরও বলা হল প্রজারা এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না, অন্য জমিদারের অধীনে জমি চাষ করতে পারবে না, করলে জমিদার তাদের আটক বা কয়েদ পর্যন্ত করতে পারবে। ১৮১২ সালের পঞ্চম রেগুলেশন জমিদারদের যে কোনও হারে খাজনা ধার্য করে প্রজাদের পাট্টা দেওয়ার ক্ষমতা দিল। প্রজাপীড়ন আইনের বলে বলীয়ান হয়ে এখন থেকে জমিদাররা বর্ধিত খাজনা, নানা রকমের আবোয়াব, মাথোট, মাঙ্গট ইত্যাদি মিলিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেকের অনেক বেশি আদায় করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই আদায়-ব্যবস্থার বাস্তবানুগ অথচ করুণ শিহরণকারী বর্ণনা দিয়েছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শস্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, এই দুইয়ের যোগাযোগে মধ্যস্বত্বভোগীদের ঘরে কৃষি-উদ্বৃত্ত দ্রুতহারে বাড়ল। জমিদারী বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে লাভজনক হয়ে উঠল। একদিকে এই নিশ্চিত মুনাফা ও অন্যদিকে ঠিক সময়ে রাজস্ব আদায় করা ও জমা দেওয়ার জন্য সরকারি চাপ, এই দুটি শক্তির প্রতিক্রিয়ায় বর্ধমানে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনায়াস উদ্বৃত্তভোগের আর একটি সুগম রাস্তা তৈরি হল। ইজারা ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারি কেনাবেচা শুরু হল। মোগল আমলের ইজারা তালুক এখন একটু পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হল পত্তনী তালুকে। আগে ইজারা তালুক ছিল অস্থায়ী, পত্তনী তালুকের নতুন ব্যবস্থায় তা হল স্থাবর সম্পত্তি, উত্তরাধিকারে প্রাপ্তব্য ও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। পুরনো ব্যবস্থায় জমিদার যেমনভাবে সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন, নতুন ব্যবস্থায় পত্তনীদার ঠিক তেমনইভাবে দায়বদ্ধ হলেন জমিদারের কাছে, দরপত্তনীদার পত্তনীদারের কাছে, সে পত্তনীদার দরপত্তনীদারের কাছে, চারপত্তনীদার সেপত্তনীদারের কাছে ইত্যাদি। এইভাবে স্তরে স্তরে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা যেমন দ্রুতহারে বেড়ে চলল তেমনই প্রত্যেক স্তরেই মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্বৃত্ত সংগ্রহ পুরোপুরি আয়াসহীন হয়ে গেল, কেবল সবশেষে নিম্নতম স্তরে গোমস্তারা প্রজার গলায় গামছার পাক দিতে লাগল।

১৮৭৩ সালে বর্ধমানে এরকম মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ৮০ হাজার। অবশ্য এই ৮০ হাজারের মধ্যে শতকরা ৯৬ জনই বাৎসরিক জমা দিতেন ৫০০ টাকার কম। অর্থাৎ তাঁদের বছরে নীট আয়ের পরিমাণ ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে থাকত। এত কম আয় হওয়া সত্ত্বেও এঁরা পত্তনী তালুক কেনার জন্য আগ্রহী হতেন দুটি কারণে। একটি ছিল বংশপরম্পরায় আয়াসহীন নিশ্চিত আয়। তবে প্রধান কারণ এই ছিল যে এঁদের সকলকেই স্থানীয়ভাবে জমিদার বলা হত, আর জমিদার নাম পাওয়া তখন সামাজিকতায় সম্মানের ব্যাপার ছিল। তবু এই বর্গের জমিদারদের বাদ দিলেও বর্ধমান জেলায় উনিশ শতকের শেষদিকে প্রায় ৫০০০ জমিদার ছিলেন যাঁদের আয় বেশ ভাল ছিল। অন্তত দশজন ছিলেন যাঁদের আয় বছরে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি ছিল। যেহেতু পত্তনী ইজারা কখনই উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষি ইজারা ছিল না, সেজন্য পত্তনীদাররা প্রকৃত অর্থে জমিমালিক ছিলেন না কোনদিন। তাঁদের মালিকানা ছিল মাথা গুণতি প্রজাদের, যাঁদের গলায় গামছা দিয়ে কিছু আদায় করা যেত। মাঝারি মাপের রায়ত প্রজার সংখ্যা কমলে তাঁদের আয়ত্ত যেত কমে। জমি-মালিক হিসাবে গ্রামপ্রধান ও বড় রায়তদের বিকল্প হওয়া এঁদের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না। বরং বড় রায়ত এবং মোড়লরাই মাঝে মাঝে বড় পত্তনী কিনে এঁদের বিকল্প হয়ে যেতেন। পত্তনী কেনাবেচার বাজার তাই বর্ধমানে প্রকৃত ভূমি বাজার হিসাবে গড়ে উঠতে পারল না।

বিলেতে শিল্প-বিপ্লবের পর সেখানে ভারতে তৈরি কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত কমে গেল। ফলে ভারতের বহির্বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটল। শিল্পজাত দ্রব্যের বদলে রপ্তানী হতে লাগল নানা ধরনের কাঁচামাল। বর্ধমান থেকে রপ্তানী হত প্রধানত তুলো, নীল আর চিনি। বর্ধমানের কৃষকরা কোম্পানির শোষণের শিকার হলেন প্রধানত নীল, তুলো আর চিনির উপর দাদনের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে উৎপাদন বাড়ল, কিন্তু চাষীদের ঋণভার কমল না। ঋণ শোধ করা ও রাজস্ব দেওয়ার জন্যই নগদ অর্থের চাহিদা বাড়ল। ফলে দ্রব্য-অর্থ সম্পর্ক নিয়ে যে বাজার তৈরি হল তা দাদনের বাঁধনে স্বাধীন বিকাশের পথ হারাল আর রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্তের সবটুকু গ্রামের বাইরে চলে যাওয়ায় এই বাজার স্বয়ম্ভর গ্রাম অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারল না। কৃষি উৎপাদনের পুরনো প্রথাই চালু থাকল, উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠল না। গড়ে যে উঠল না তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বর্ধমানের তুলো চাষের ইতিহাসে। বর্ধমানে তুলো চাষ কিছু কম হত না, কিন্তু তুলোর কোনও বাজার বর্ধমানে গড়ে ওঠেনি। যা উৎপাদন হত তার সবটাই গ্রামের কুটিরশিল্প তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে ব্যয়িত হত। তাই কোম্পানি যখন থেকে বস্ত্র কেনার জন্য 'বিনিয়োগ' বন্ধ করে দিল, তখন থেকেই তুলোর উৎপাদন কমতে আরম্ভ করল। ১৮৬০ সালেও বর্ধমানে দশ হাজার মন তুলো উৎপন্ন হত। কিন্তু ১৮৮০-তে তা দাঁড়াল পাঁচ হাজার মণে আর বিশ শতকের প্রথমে এই চাষ বন্ধ হয়ে গেল।

তবে নীল চাষের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমানের নীলপুরে জন চীপ্ এই চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু করেন। তুলো কিম্বা আখ চাষের মতো এই চাষ বর্ধমানে প্রথাগত চাষ ছিল না। তবু কয়েক দশকের মধ্যে বর্ধমানে নীল চাষ ব্যাপকভাবে হতে থাকে, পরিমাণে ঢাকা জেলার

পয়ই বর্ধমানের স্থান ছিল। অন্যান্য জেলা থেকে এই জেলার এ ব্যাপারে পার্থক্য এই ছিল যে এখানে নীল চাষের প্রায় সবটাই 'নিজ চাষ' পদ্ধতিতে হত। রায়তী পদ্ধতিতে দাদনের মাধ্যমে চাষ না হওয়ার কারণেই বোধহয় এই জেলায় নীলবিদ্রোহের কোনও প্রভাব পড়েনি। নিজ চাষ পদ্ধতিতে সাহেবরা জমি ইজারা নিয়ে সাঁওতাল 'কুলি' দিয়ে চাষ করাতেন। জমি ইজারা নিতে প্রচুর সেলামী আর উঁচু হারে খাজনা দিতে হত। তা সত্ত্বেও লাভ বেশ ভালই হত। ১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বর্ধমানের কালনার নীলকর মিঃ সয়ার্স জানাচ্ছেন, একমন নীলে সব খরচ মিটিয়ে নীট লাভ ছিল ৫০ টাকা। আর ১০০০ বিঘা নীল চাষ করলে নীল পাওয়া যেত ৫০ মন। সয়ার্স তখন ১৭ হাজার বিঘা জমি চাষ করতেন। বর্ধমানের নীল চাষ পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হলেও তার মধ্যে প্রকৃত পুঁজিবাদী চরিত্র গড়ে উঠল না। নীলকররা দ্রুত লাভ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, আর যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ধনী হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। যেহেতু এদেশের অধিবাসী হয়ে বর্ধমানে দীর্ঘদিন থাকা তাঁদের পছন্দসই ছিল না, সেজন্য তাঁরা কৃষি-উদ্বৃত্ত জমিতে পুনর্নিয়োগের কথা ভাবতেনই না। ফলে কৃষি পুঁজি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট হল। নীলের দাম কমতে শুরু করার অনেক আগে বর্ধমান জ্বর দেখা দেওয়ামাত্র বর্ধমানের নীলকররা নিঃশব্দে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেন। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা অনর্জিত আয়ে অভ্যস্ত থাকার জন্য এই চাষে আগ্রহী হলেন না।

ইংরেজ আমলের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বোঝা গেল যে বড় মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের ধারক-বাহক হতে পারবেন না। তাই উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজ সরকারের নজরে পড়ল বড় রায়ত এবং গ্রামপ্রধানরা। এঁরাই কৃষিজোত পরিচালনা করতেন। কিন্তু এতদিন এঁদের দখলি সম্পত্তির কোনও আইনগত অধিকার ছিল না। যদিও এঁরা জমিদারদের সামনে প্রায়শ খুব একটা অসহায় ছিলেন না, তবুও কিছুদিন পর পর এঁদের উপর উচ্চহারে খাজনার চাপ পড়ত। কাজেই কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য এঁদের আইনগত অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন ঘটল। এঁদের স্তরে পুঁজি জমা করার জন্য উদ্বৃত্ত বাড়াবার প্রয়োজন হল, আর তা করতে গিয়ে দেখা গেল রায়তদের দেয় খাজনার হার বেঁধে না দিলে সব উদ্বৃত্ত জমিদারের হাতে চলে যাচ্ছে। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন এই কাজেই ব্যবহৃত হল। এই আইনে একজন রায়তের একাদিক্রমে ১২ বছরের দখলিস্বত্বকে অধিকার বলে স্বীকার করা হল। অথচ এই আইনে দখলিস্বত্বহীন কোর্ফা প্রজা ও ভাগচাষীদের কোনও অধিকারই দেওয়া হল না। বস্তুতপক্ষে সরকার এই আইনের মাধ্যমে কৃষক-সাধারণের মধ্যে একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী বর্গকে বেছে নিল যার সম্পন্ন সদস্যরা ক্রেতা হিসাবে কাজ করে একটি ভূমি বাজার তৈরি করতে পারবে। এঁদের বিপরীতে প্রচুর সংখ্যক ঋণগ্রস্ত ছোট রায়ত ভূমি বিক্রেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ফলে বর্ধমানে এই সময় থেকে ভূমি হস্তান্তর প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে ভূমির কেন্দ্রীভবন ঘটাতে লাগল। যে ভূমি বাজারের মাধ্যমে এই ভূমি হস্তান্তর ঘটত তা ঋণের ফাঁদে এমন জড়ানো থাকত যে তাকে স্বাধীন ভূমি বাজার বলে ভাবাই কষ্টকর।

এই সময় থেকে যদিও অনেক গরিব রায়তদের জমি বড় রায়তরা তাঁদের দখলে এনেছিলেন, তবু তাঁরা সেইসব জমি বড় জোতে রূপান্তরিত করে নিজ চাষের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। প্রচলিত পশ্চাদপদ কৃতকৌশল, ভাগচাষের মাধ্যমে অতি সহজে উদ্বৃত্ত আহরণের উপায়, আর পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষির রূপান্তরকরণের অনভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতা তাঁদের বড় জোত তৈরি করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছিল। আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে তাঁরা প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সরে এসে বর্গার মাধ্যমে চাষকেই উৎপাদনের লাভজনক উপায় হিসাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আবার ছোট ছোট রায়তরা যত বেশি করে ভূমিহীন হয়ে পড়তে লাগলেন, বর্গাচাষে জমি পাওয়ার জন্য তত বেশি তাঁদের প্রতিযোগিতা বাড়ল, আর সেজন্য বর্গার হারও তাঁদের বিপক্ষে যেতে লাগল। ক্রমশ এইসব সদ্য ভূমিহীন রায়তরা বীজ, বলদ ও অন্য উপকরণের জন্য বড় রায়তদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগলেন, যার ফলে বাজার সম্পর্কের বিকাশ ঘটা ব্যাহত হতে লাগল। এমনকি কৃষি-শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও মজুরি দেওয়া হত বহুদিন ধরে প্রচলিত হারে খাদ্য-বস্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকেও বর্ধমানে কৃষি উৎপাদন বড় রায়ত বা জোতদারের ছত্রছায়ায় ছোট ছোট জোতে শ্রমনিবিড় ও বহুকাল ধরে প্রচলিত পদ্ধতিতেই নির্বাহ হতে থাকল।

বর্ধমানের কৃষি : স্বাধীনতার পর তিন দশক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে প্রভূত সাহায্য করেছিল, আর তার প্রতিদানে তাঁরাও ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বে শাসকদের যথেষ্ট অনুগত হস্ত হিসাবে কাজ করতেন। তবু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজরা দেখল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থির আয় আর ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। তাই ১৯২০ সালে তাদেরই নিযুক্ত ভূমিরাজস্ব কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করল। এই কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হল ১৯৪০ সালে। ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা একই সিদ্ধান্ত নিল। ভারত স্বাধীন হল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিসংস্কার কমিটিও কাকদ্বীপ আন্দোলনের মতো নানা কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিফলিত জনসাধারণের ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৪৯ সালে তার প্রতিবেদন পেশ করল। এই প্রতিবেদনে মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হল। ফলত ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি উচ্ছেদ আইন চালু হল।

জমিদারি উচ্ছেদ আইন পুরোপুরি কার্যকর হল। আইনে যেসব ফাঁক-ফোঁকর দেখা গেল পরবর্তী পনেরো বছরের মধ্যে দশবার এই আইন সংশোধন করে সেগুলি বন্ধ করা হল। তবু এই আইনের প্রয়োগ ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক

পরিবর্তন ঘটাল না। দেখা গেল, এই আইন প্রয়োগ অর্থাৎ জমিদারি উচ্ছেদের ফলে জমিদারদের যে খুব ক্ষতি হল—তা নয়। বর্ধমানের মহারাজা থেকে শুরু করে প্রায় সব জমিদাররাই তাঁদের মধ্যস্বত্বজাত উদ্বৃত্ত শিল্প ও ব্যবসায়ে নিয়োগ করে আসছিলেন অনেকদিন ধরে, যার ফলে জমিদারি উচ্ছেদের সময় তাঁদের জমিদারির ব্যবহারযোগ্য উদ্বৃত্ত তাঁদের মোট আয়ের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিগণিত হয়েছিল। তাছাড়া জমিদারির আয় পত্তনীব্যবস্থার ফলে আরও বাড়ানোর কোনও সুযোগ ছিল না। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত দ্রুতহারে বেড়ে চলছিল, ফলে শুধুমাত্র জমিদারির আয়ে জমিদারির ঠাটবাট বজায় রাখা দিন দিন অসাধ্য হয়ে উঠছিল। আর যেসব জোতদার জমিদারির মর্যাদা অর্জনের জন্য সে পত্তনী, চারপত্তনীর টুকরো-টাকরা কিনেছিলেন, তাঁদের জমিদারির আয় এমনিতেই নগণ্য ছিল। সুতরাং জমিদারি উচ্ছেদ আইন চালু হওয়ার ফলে বর্ধমানে জমিদারদের তরফ থেকে কোনও সোচ্চার প্রতিবাদ উঠল না। তাঁরা সকলেই তৎপর হয়ে উঠলেন দপ্তর দপ্তরে তদ্বির করে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করতে। উল্টোদিকে এই আইনের ফলে রায়তের দৃশ্যত কোনও লাভ হল না, কারণ খাজনার হার কমল না, উঠে যাওয়া তো দূরের কথা। 'দৃশ্যত' বলা হচ্ছে এই জন্যে যে একটা অপ্রত্যক্ষ লাভ হল এর ফলে। আগে খাজনা বাকি পড়লে মামলা হত, চাষীর জমি নীলামে উঠত। এখন থেকে তা বন্ধ হল। আর ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের এই আইনে কোনও জায়গাই হল না।

কিন্তু জোতদার অর্থাৎ বড় রায়তদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ভূমিসংস্কার আইনের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটল। ১৯৫৬ সালে গৃহীত আইনে বড় রায়তদের বিভিন্ন ধরনের জমি-মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হল এবং সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করবে বলা হল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, জমি মালিকানার একটা সীমা বাঁধা থাকলে জোতদারেরা আরও জমি অধিকার করে ভাগচাষে দিয়ে অনর্জিত আয়ের প্রলোভন থেকে মুক্ত হবে এবং আয় বাড়াবার জন্য নিজ মালিকানার জমিতে উদ্যোক্তাসূচক মনোভাব নিয়ে ভালভাবে চাষ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত সরকারে ন্যস্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করে ভূমি বণ্টনে কিছুটা সমতা আনা যাবে। এই আইনের দুটি ব্যবস্থা বড় রায়তদের স্বার্থে প্রচণ্ড ঘা দিল। প্রথম ব্যবস্থায় ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হল : যে কোনও ব্যক্তি কৃষি জমি ২৫ একর এবং অকৃষি জমি ১৫ একর নিজ মালিকানাধীনে রাখতে পারবেন। এই পরিমাণ জমি বর্ধমানের বড় রায়তদের মালিকানাভুক্ত জমির অনুপাতে খুব কম এবং ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি বিনা ক্ষতিপূরণে ন্যস্ত করা সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ বলে বড় রায়তরা অভিযোগ করলেন। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় ভাগচাষীর সংজ্ঞা দিয়ে ভাগচাষে বর্গার হার স্থির করা হল এবং বর্গা উচ্ছেদের ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করা হল। মালিক চাষের খরচ দিলে বর্গার হার হবে আধাআধি আর তা নাহলে ভাগচাষী পাবে শতকরা ৬০ ভাগ এবং মালিক শতকরা ৪০ ভাগ। উচ্ছেদের ব্যাপারে শর্ত হল যে মালিক যদি নিজে চাষ করতে চায় অথবা ভাগচাষী যদি চাষে অবহেলা করে তবেই বর্গা উচ্ছেদ সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। দুটি ব্যবস্থাই বড় রায়তদের ভাতের হাঁড়িতে ঘা দিল। সেজন্য আইন যাতে বাস্তবে কার্যকর না হতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে তাঁরা অত্যন্ত দ্রুত তৎপর হয়ে উঠলেন।

স্বাভাবিকভাবেই বর্ধমানের বড় রায়তরা অনর্থক মারদাঙ্গার মধ্যে যেতে চাননি, যতক্ষণ পেরেছেন আইনের মাধ্যমেই আইনকে ফাঁকি দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, তখনকার আইনসভার সদস্যদের শতকরা আশি জনই ভূমিজ আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং সরকারের পুলিশ প্রশাসনে যাঁরা তখন ছিলেন তাঁদের অনেকেই বড় রায়ত পরিবারের সদস্য ছিলেন। এছাড়া জমি-সংক্রান্ত আইন নিয়ে বড় রায়তদের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। তাই তাঁরা খুব সহজে নিজ মালিকানার জমি পরিবারের সদস্যদের এবং কিছু বেনামদারের নামে হস্তান্তর করে ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন অকার্যকর করে তুললেন। যেসব ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ কারণে আইনের ফাঁক দিয়ে আইনসঙ্গতভাবে সব জমি তাঁরা নিজ অধিকারে রাখতে পারলেন না, সেসব ক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত জমি সরকারে অর্পিত না করে বেআইনিভাবে কার্যত তাঁদের দখলে রাখলেন।

এই বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে বর্ধমানে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে একটি নতুন ধরনের ভূমি দখল আন্দোলন শুরু হল। পদ্ধতিটি ছিল এইরকম : সরকারে ন্যস্ত জমি বড় রায়ত বেআইনিভাবে চাষ করে থাকলে, চাষের সময় কিংবা ফসল কাটার সময় কৃষক সভার নেতৃত্বে বহুসংখ্যক ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর একত্র হয়ে জমির সীমানায় পতাকা পুঁতে জমির দখল নিতেন। এতে বড় রায়তরা শারীরিকভাবে আন্দোলনকারীদের বাধা দিতে না পারলে আইনত কিছু করার থাকত না। কারণ আইন লঙ্ঘন করার দায়িত্ব তাঁদের উপরই আগে পড়ত। এই অবস্থায় যেখানে কৃষক সভার শক্তি বেশি সেখানে ভূমি দখলের আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে প্রসারিত হল। আর যেখানে বড় রায়তের শক্তি বেশি সেখানে শান্তি বিঘ্নিত হল। বর্ধমানের চৈতন্যপুর গ্রামে এইরকম একটি সংঘর্ষে বনমালী কুশমেটে এবং পাঁচকড়ি মাঝি বন্দুকের গুলিতে নিহত হলেন। পুলিশকে বড় রায়তের বেআইনি কাজে সহায়তা করতে না দেওয়ায় এবং ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর ভূমিক্ষুধা প্রবল থাকায় এই ভূমি দখল আন্দোলন অল্পসময়ের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করল। বর্ধমান জেলা কৃষকসভাও ছোট রায়ত, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরকে এই আন্দোলনের সমর্থনে একত্র করতে পারল। বর্ধমানে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ক্রমশ অন্যত্র ছড়িয়ে

পড়ল। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ভূমি দখল আর তেমন হতে না পারলেও এত অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনের এত তীব্র গতি শাসকদলে রাজনৈতিক জনসমর্থন হারাবার আশঙ্কা ঘনীভূত করল।

এই আশঙ্কার ফলে ভূমিসংস্কার আইন পুনরায় সংশোধিত হল। ব্যক্তি মালিকানার উর্ধ্বসীমার বদলে পরিবারভিত্তিক মালিকানার উর্ধ্বসীমা স্থির হল, জমির গুণাগুণ বিচার করা হল। একজন সদস্যবিশিষ্ট পরিবার ৬ একর সেচসেবিত জমি অথবা ৯ একর অন্য ধরনের জমি রাখতে পারবে—তার বেশি নয়। পরিবার বড় হলে উর্ধ্বসীমা বাড়বে। ৯ জন বা তদূর্ধ্ব সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে—সেচসেবিত ১৭ একর অথবা অন্য জমি ২৪ একর। এসব ঠিক করার সময় ভাবা হয়েছিল, এতে বেনামি হস্তান্তর বন্ধ হবে, উদ্বৃত্ত জমি মিলবে। কিন্তু আইন তৈরি করা আর আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা, দুটিতে সমান সদিচ্ছা দেখা গেল না। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও দেখা গেল, বর্ধমানের মোট কৃষিজমি যা সরকারে ন্যস্ত হওয়ার কথা তার দশভাগের একভাগ মাত্র সরকার অধিগ্রহণ করতে পারল। অথচ তখন শতকরা চারজন বড় রায়ত শতকরা তিরিশ ভাগ জমি ভোগ করতেন। সাদা কথায় বলতে গেলে, এই সময় পর্যন্ত ভূমির উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন কার্যকর হল না, বড় রায়তদের মোট জমির শতকরা নব্বই ভাগ জমিই তাঁদের হাতে থেকে গেল। বর্ধমানে কৃষি জমি-বন্টনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটল না।

পরিবর্তন ঘটল অন্যদিকে। সাধারণভাবে এটা দেখা গেছে যে সমস্ত রকম খরচ হিসাবের মধ্যে রাখলে আমন ধান চাষে উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন ফসলের প্রায় অর্ধেক হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য কম-বেশি হতে পারে—তবে বাজার চলতি মজুরি ও ধানের স্বাভাবিক বাজার দাম বিচার করলে এর ব্যতিক্রম কমই হয়। তাই ভাগ চাষে বর্গাদার সমস্ত ব্যয় বহন করে জোতদারকে পঞ্চাশ শতাংশ ধান খড় ঘরে পৌঁছে দিলে জোতদারের অনর্থক ঝুঁকি নিয়ে দেখাশুনার পরিশ্রম করে চাষ করার আগ্রহ থাকে না। বর্ধমানে ১৯৫৬ সালের আগে বেশিরভাগ জোতদারের ক্ষেত্রে এটা বাস্তব সত্য ছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের আইন মোতাবেক মালিকের পাওনা কমে হল ৪০ শতাংশ। এই আইন সংশোধিত হয়ে ১৯৬৬ সালে পাওনা আরও কমল, একেবারে ২৫ শতাংশ। এ ছাড়া আইন চালু হওয়ার পর ভাগচাষী উচ্ছেদের যে শর্ত আরোপিত ছিল তা নিতান্ত সহজ। সুতরাং ব্যাপকহারে ভাগচাষী উচ্ছেদ চলল। ব্যাপকতা এতই বেশি হল যে সরকারকে ১৯৭১ সালে এ ব্যাপারে আরও কঠিন শর্ত বিধান করতে হল। এমনকি জোর করে উচ্ছেদকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হল। তবু সবরকম আইনকানুন উপেক্ষা করে উচ্ছেদ চলতেই লাগল। যে সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হলে দরিদ্র ভাগচাষী প্রচণ্ড ক্ষমতাবান জোতদারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে তা তখনও হয়নি। ফলে জোতদার বা বড় রায়তরা ক্রমশই ভাগচাষের জমি নিজচাষের অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য আগে ছিল না। তবু একটা সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বর্ধমানে ভাগচাষের পরিমাণ গড়পড়তা ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৫ শতাংশে এসে দাঁড়াল ২০ বছরের মধ্যে। জোতদার বা বড় রায়তদের এখন থেকে চাষী হওয়ার প্রবণতা বাড়তে লাগল।

এই প্রবণতা বৃদ্ধিতে প্রভূত সাহায্য করল দুটি পৃথক ঘটনা। প্রথমটি হল, কৃষিতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকারের সাহায্য, যার বেশিরভাগই বড় রায়তদের ঘরে ঢুকেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকাঠামো গড়ে তোলবার জন্য বর্ধমানে সরকারি প্রচেষ্টা প্রথমদিকে যা ছিল তা হচ্ছে দুটি বড় বড় সেচ পরিকল্পনার রূপায়ণ। সেগুলি ডি ভি সি ও ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা। এগুলি রূপায়িত হওয়ার পর ১৯৬০ সালে বর্ধমানে ক্যানেলবাহিত জলসেচের সুবিধা তিন গুণ বেড়ে গেল। ১৯৩৩ সালে তৈরি দামোদর ক্যানেল বর্ধমানে মোট কৃষিজমির ২০ শতাংশ সেচের আওতায় এনেছিল। এইসব জমির বেশিরভাগই ছিল বড় রায়তদের হাতে। তাই ইংরেজদের চাপানো উঁচুহারে ক্যানেল করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। ডি ভি সি ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার শেষে সেচের সুবিধা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় ৬০ শতাংশ। ১৯৬০ সালের পর যেসব জায়গায় ক্যানেল পৌঁছতে পারত না সেখানে গভীর নলকূপ, নদী থেকে উত্তোলন প্রভৃতি ক্ষুদ্র পরিকল্পনার সাহায্যে সরকার বর্ধমানে সেচের সুবিধা ৭৫ শতাংশ কৃষিজমিতে পৌঁছে দিল। বর্ধমানে জোতদারদের জমির পরিমাণ অনেক,—ভাল জায়গায় বেশিরভাগ জমি তাদেরই হাতে। সুতরাং সেচের সুবিধা বাড়ায় তাদের সুবিধাই বেশি বাড়ল। জোতদারদের চাষী হওয়ার সুবিধা বাড়ল।

সরকারের দেওয়া সাহায্যের আর একটি দিক হল কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনা। সেচের সুবিধার ফলে এক-ফসলী জমির দো-ফসলী এমনকি বহুফসলী হওয়ারও সম্ভাবনা বাড়ল। এইসব জমিতে উচ্চফলনশীল এবং বর্ধমানের জমির উপযুক্ত বীজ সরবরাহ করার জন্য দুটি বীজ খামার তৈরি হল। এতে সাধারণভাবে কৃষির উন্নতি হওয়ার কথা, প্রযুক্তি-শিক্ষার মাধ্যমে কেবলমাত্র বড় রায়তেরই বিশেষ সুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের পর সরকারের কৃষি-নীতিতে এমন একটি পরিবর্তন এল যাতে কেবল জোতদারেরাই উপকৃত হতে থাকলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটি কৃষি বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শক্রমে ১৯৬২ সালে বর্ধমান জেলার সেচ-সেবিত কৃষি এলাকাগুলিকে নিবিড় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই প্রকল্প বর্ধমান জেলার ১০টি ব্লকে শতকরা ৩ ভাগ কর্ষিত জমি নিয়ে শুরু হয় ১৯৬৩ সালে,

আর ১৯৭৬ সালে তা বিস্তৃত হয় ২৪টি ব্লকে শতকরা ৮০ ভাগ কর্ষিত জমিতে। নিবিড় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের নীতিগত যুক্তি হল এই যে, গরিব দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলি সংগ্রহ করে সেখানেই সংহত করা উচিত যেখানে সর্বোচ্চ উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে কৃষি প্রযুক্তির পরিবর্তনের জন্য উপকরণগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে না দিয়ে এমন কিছু 'প্রগতিশীল' কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়া উচিত যাঁরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবেন। এই ধরনের যুক্তির পরিণতি অনিবার্যভাবে বর্ধমানে কেবলমাত্র বড় রায়তদেরকেই এই 'প্রগতিশীল কৃষক গোষ্ঠী' হিসাবে তুলে ধরল। যুক্তি আর কিছু নয়, এঁদের হাতেই যথেষ্ট সম্পদ ও উদ্বৃত্ত জমা আছে, উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন এঁরাই জোগাতে পারবেন। সুতরাং, কৃষিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনার জন্য সরকার থেকে আর্থিক, কৃষি-গবেষণাপ্রসূত এবং প্রশাসনগত সাহায্যের বৃহদংশই বর্ধমানের জোতদারদের হাতে জমা হল। এর ফলে তাঁদেরও চাষীতে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ বাড়ল।

১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কি কি সরকারি সাহায্য কীভাবে ও কত পরিমাণে বর্ধমানের বড় রায়তদের হস্তগত হল তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমে কৃষিঋণের কথা ধরা যাক। এই সময় কৃষিঋণের বেশিরভাগই সরবরাহ করা হত সমবায় ঋণ সংস্থাগুলি থেকে। ট্রাক্টর কেনার মতো কিছু বড় ঋণ জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলি ১৯৭১ সালের পর দিতে শুরু করল। ছোট ঋণের সবটাই আসত সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে। আর ১৯৭৭ সালের আগে বর্ধমানের সবকটি সমবায় সংস্থাই বড় রায়তদের প্রাধান্যে পরিচালিত ছিল। এখান থেকে তাঁরা যে কম সুদে ঋণ পেতেন শুধু তাই নয়, অনাদায়ী ঋণ মকুব হলে একমাত্র তাঁরাই লাভবান হতেন আর ঋণ অনাদায়ী থাকার ফলে সংস্থাগুলির প্রসারের পথ বন্ধ হয়ে যেত। প্রশাসনের সাহায্যের ব্যাপারেও একই কথা। বর্ধমানের প্রশাসনের উঁচু ও মাঝারি কর্তাদের সঙ্গে জোতদারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নানাভাবে বিধৃত। তাই কৃষির উন্নতির জন্য দেয় সরকারি সুযোগ-সুবিধার সবটুকু এঁদের ঘরেই পৌঁছত। দু-একটি উদাহরণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাদানের জন্য অনেক প্রদর্শনী খামারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই সময়ে পুরোপুরি সরকারি ব্যবস্থায় ও খরচে। সরকারি খরচে চাষ করা, সার দেওয়া, কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার সবই চলত। যে সমস্ত জমিতে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হত তা একেবারে ব্যতিক্রমহীনভাবে বড় রায়তদের মালিকানায়। তখনকার দিনে কম্পোস্ট সার তৈরি করার জন্য পাকা চৌবাচ্চা ও গোবর গ্যাস তৈরির ব্যবস্থার জন্য সরকারি সাহায্য (কম নয়, ক্ষেত্র পিছু দশ হাজার টাকা তখনকার দিনে) যা দেওয়া হয়েছে তারও সবটুকু ঢুকেছে জোতদারদের ঘরে। ফসল বাজারজাত করার জন্য ডি পি এজেন্সির মতো এজেন্সি পেয়েছে জোতদারেরাই। যে কজন বাঙালি বর্ধমানে হিমঘর তৈরি করার জন্য ব্যাঙ্ক সাহায্য পেয়েছেন এই সময়, তাঁরাও জোতদার। সরকার রাসায়নিক সারে প্রচুর পরিমাণ ভরতুকি দিয়ে সারের দাম কম রাখে। এই সময় বর্ধমানে ৩০ হাজার টন করে বছরে সার বিক্রি হয়েছে, কিনেছেন প্রধানত বড় রায়তরা। সুতরাং ভরতুকির টাকা অনেকটাই এঁদের কাছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সার বিক্রির এজেন্সি ও সাব-এজেন্সি এঁরাই পেয়েছেন। ফলে বাজার-দামে নিজেদের কেনা ও বাজার ছাড়া দামে অন্যদের বিক্রি করার মাধ্যমেও এঁদের লাভ কম হয়নি।

জোতদারদের ক্রমশ কৃষকে রূপান্তরিত হওয়ার পিছনে এগুলি ছাড়া আর একটি ঘটনার অবদান কম নয়। সেটি হল কৃষি-উন্নত অন্য রাজ্যের তুলনায় বর্ধমানে এই সময় অনেক কম মজুরিতে ক্ষেতমজুরের জোগান বেড়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে বর্ধমানের জনসংখ্যা দু-গুণ হয়েছে, ভূমির অনুপাতে মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, ভূমির কেন্দ্রীভবন অনুপাত স্থির থাকায় ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়েছে অথচ শিল্পে নিয়োগের সংখ্যা তদনুপাতে বাড়েনি, এর উপর ভাগচাষী উচ্ছেদ ঘটেছে খুব বেশি। ফলে বর্ধমানে ১৯৫১ সালে লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী যে ক্ষেতমজুর ছিল (৩৩৪৭১) তা ১৯৭৬ সালে দশগুণ বেড়ে দাঁড়াল ৩৩৪৪৫৯। এর উপর মজুরি নিয়ে যাতে দরাদরি না ঘটে সে ব্যবস্থা পাকা করার জন্য রোয়ার সময় ও কাটা-ঝাড়ার সময় বিহার, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া থেকে ক্ষেতমজুর আনার ব্যবস্থা করলেন বর্ধমানের জোতদারেরা। এ সবের ফলে বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে মজুরির হার নির্ধারিত হতে থাকল শ্রমের চাহিদা অনুযায়ী। জেলার সর্বত্র সমান চাহিদা না থাকায় মজুরির পার্থক্য প্রকট হল। এমনকি পাশাপাশি গ্রামেও মজুরির পরিমাণ ও কীভাবে মজুরি দেওয়া হবে তা পৃথক হল চাহিদানুযায়ী। আর এরকম নিম্নমজুরি ক্রমবর্ধমান শস্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিকে বেশ লাভজনক করে তুলল। শুধু আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক তাই নয়, প্রয়োজনের তুলনায় ক্ষেতমজুরের জোগান বেশি থাকায় তাদের উপর ক্ষমতাবান বড় রায়তদের সামাজিক আধিপত্যও অত্যন্ত স্পষ্ট হল।

এ সব সত্ত্বেও বর্ধমানের জোতদারেরা তাঁদের উদ্বৃত্তের খুব কম অংশই কৃষিতে বিনিয়োগ করেছেন। তাঁরা সরকার কর্তৃক প্রগতিশীল কৃষক হিসাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জমিতে কৃষি উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশ বিশেষ ঘটেনি। বর্ধমানে বড় রায়তরা ১৯৭৬ সালে তাঁদের কর্ষিত জমির মাত্র ৩৬ শতাংশ উচ্চফলনশীল বীজের চাষ করেছেন অথচ ওই সময় পঞ্জাবের কৃষকরা তাঁদের কর্ষিত জমির ৯৩ শতাংশেরও বেশি জমিতে উচ্চফলনশীল বীজের চাষ করেছেন।

বর্ধমানের কৃষি : বামফ্রন্ট শাসনের দুটি দশক

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে বর্ধমানের গ্রামসমাজে মূল দ্বন্দ্বের একদিকে ছিলেন বড় রায়তরা আর

অন্যদিকে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুররা। এই দ্বন্দ্বের মূলে ক্ষমতার যে বিন্যাস তার ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। ক্ষমতার এই বিন্যাসই বর্ধমানের কৃষিতে পুঁজিসম্পর্ক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছিল এবং উৎপাদন ক্ষমতায় প্রায় নিশ্চলাবস্থা বজায় রেখেছিল। জমিদার-প্রজা সম্পর্কের অবসানের পর কৃষক বিভাজনের কিছু অগ্রগতি হলেও এবং নতুন প্রযুক্তিতে উৎপাদন ক্ষমতার কিছু বিকাশ ঘটলেও বিদ্যমান ক্ষমতার বিন্যাসে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসেনি। বস্তুত এই ক্ষমতার বিন্যাসকে ভাঙতে গেলে যে আঘাতের প্রয়োজন ছিল সেরকম আঘাত দেবার মতো সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অভাবই তাকে টিকিয়ে রেখেছিল। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের বিজয় সেই ক্ষমতার জন্ম দিল।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকায় একটা বড় পরিবর্তন এল। মোগল আমল থেকে এ পর্যন্ত বর্ধমানের ইতিহাসে (স্বল্পস্থায়ী যুক্তফ্রন্টের সময় বাদে) এমন কখনও দেখা যায়নি যে পুলিশ ও প্রশাসন ক্ষুদ্রচাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহ দেখিয়েছে অথবা বড় রায়তদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ করেছে। ১৯৭৭ সালের পর এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল। বেনামি জমি উদ্ধার এবং জোতদারদের দখলে থাকা সরকারে ন্যস্ত জমি সরকারি দখলে আনার চেষ্টা চলতে লাগল। বর্গাদার উচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য সরকারি প্রচেষ্টায় এবং কৃষকসভার সহযোগিতায় বর্গা-রেকর্ড আন্দোলন শুরু হল। আইনেরও একটা বড় পরিবর্তন হল। এখন থেকে বর্গা-সংক্রান্ত মামলায় বর্গাদারকে প্রমাণ করতে হবে না যে সে বর্গায় চাষ করে, উলটে মালিককেই প্রমাণ করতে হবে সে বর্গাদার নয়। যার ফলে মামলায় জোতদারের আধিপত্য প্রয়োগের সুযোগ অনেক কমে গেল। আবার বহু বছর পর এই সময়েই নতুন ত্রিস্তর কাঠামোয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হল এবং বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যের পৃথকীকরণের মতো বিরাট পরিবর্তন ঘটল। অর্থনৈতিক আধিপত্য বর্ধমানের গ্রামে এখনও জোতদারদের হাতে থাকলেও রাজনৈতিক আধিপত্য তাঁদের হাতছাড়া হল। ফলে বর্গাদার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ হল এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের বারো আনাই নিজের মুঠোয় ধরে রাখতে পারল। একদিকে বেনামি জমি উদ্ধার, খাসজমি দখল আর অন্যদিকে ভাগচাষীদের নিজেদের অধিকার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতার প্রসারের পরিণামে ক্ষমতার একটি নতুন বিন্যাস তৈরি হল।

এতদিন পর্যন্ত বর্ধমানের গ্রামে মজুরি নির্ধারিত হত নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী। কিন্তু এখন থেকে ক্ষেতমজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন এবং তদনুযায়ী ধর্মঘট মজুরি নির্ধারণে একটি নতুন মাত্রা আরোপ করল যার পরিণামে প্রকৃত মজুরি দুগুণের কাছাকাছি বেড়ে গেল। হিসাবটা এইরকম: ১৯৭৬ সালে গড়পড়তা দিনমজুরি ছিল ৭ টাকা, দশঘণ্টা খাটুনি দিনে,—ঘণ্টাপিছু প্রকৃত মজুরি ৩০০ গ্রাম চাল। ১৯৯৬ সালে দিনমজুরি হয়েছে ৩২ টাকা, ৭ ঘণ্টায় দিন, অর্থাৎ ঘণ্টাপিছু প্রকৃত মজুরি ৫৭০ গ্রাম চাল। বড় রায়তরা যাঁরা মাত্র আংশিক সময়ের দেখাশুনার মাধ্যমেই কৃষির সব কাজ সম্পন্ন করতেন তাঁরা বিপন্ন হলেন এই মজুরি আন্দোলনের তীব্রতায়। তাঁদের কাছে কৃষি তাঁদের অন্য আয়ের তুলনায় আর মোটেই লাভজনক থাকল না অথচ জমি বর্গাচাষে দেওয়ার বিকল্পটুকুও এখন তাঁদের হাতছাড়া হল। এমন অবস্থায় জমি কোনরকমে টিকিয়ে রেখে বিক্রি করার সুযোগ খোঁজা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না। কাজেই এঁদের জোত ক্রমক্ষয়িষ্ণু হতে থাকল।

বর্ধমানের পঞ্চায়েত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কৃষি-ঋণ ও অন্যান্য সরকারি সাহায্য কেবলমাত্র বড় রায়তদের একচেটিয়া প্রাপ্য বলে আর বিবেচিত হল না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন মুখ্য সাহায্যপ্রাপক হল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা, বড় রায়তরা নয়। সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেত্রেই প্রসারিত হতে থাকল। এর ফলে বড় রায়তদের যে অংশ জমিতে উন্নতিবিধান না করে সরকারি সাহায্য কেবলমাত্র হস্তগত করাকেই ভূমি মালিকানার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন, তাঁরা এখন সেই সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে লাগলেন।

উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার পরিবর্তনের মাধ্যমেই উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। বর্ধমানের গ্রামসমাজে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ভূমি। কাঠামোগত পরিবর্তনের একটি দিক তাই ভূমি-মালিকানার পরিবর্তন। বর্ধমানে এই সময় সরকারি প্রচেষ্টায় ভূমি মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছে দুভাবে। প্রথমটি বর্গা নথিভুক্ত করে বর্গাচাষে প্রদত্ত ভূমির উপর ভাগচাষীর মালিকানাস্বত্ব আরোপের মাধ্যমে। ক্ষমতার নতুন বিন্যাস হওয়ার ফলে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ৩০ হাজার থেকে বেড়ে এ সময় ১ লক্ষ ১১ হাজার হল। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার সময় বর্ধমানের মোট কৃষিজমির প্রায় ১৫ শতাংশ বর্গায় প্রদত্ত ছিল। সেই জমির মালিকানা আংশিকভাবে বর্গাদারের অনুকূলে গেল। বর্গাস্বত্বের অনুকূলে এই মালিকানা পরিবর্তনের অর্থ কিন্তু সামন্ত-সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা নয়, বরং তার পরিবর্তনেরই সূচনা। বর্গার হার এখন আইনত বর্গাদারের অনুকূলে এবং বাস্তবে নতুন প্রযুক্তির ধানচাষে ঠিকা-খাজনা প্রথায় স্থির থাকছে। এতে পুঁজি সম্পর্কের বিকাশ ঘটারই কথা। কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন তো মোট বর্গায় প্রদত্ত জমির পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তাই এর শেষ সীমা এখানেই।

সরকারি প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় ধরনের ভূমি মালিকানার পরিবর্তন হল সরকারে ন্যস্ত জমি অধিগ্রহণ করে ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বণ্টন করা। বর্ধমান জেলায় সরকারে ন্যস্ত জমির মোট পরিমাণ ৭৫ হাজার একরের মধ্যে ৫০ হাজার একর অধিগ্রহণ করে

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেড় লক্ষ ক্ষেতমজুরকে বণ্টন করা হয়েছে, আর ২২ হাজার একর আদালতের স্থগিতাদেশের ফলে এখনও জোতদারদের দখলে আছে। ন্যস্ত জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই অধিগৃহীত এবং বণ্টিত হলেও এই বণ্টিত জমির পরিমাণ বর্ধমানের মোট কৃষিজমির শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি নয়। তবে পরিমাণে খুব কম হলেও এই অধিগ্রহণ ও বণ্টনের আসল তাৎপর্য এই যে জমি আদায় করা হয়েছে ক্ষমতাবান বড় রায়তদের দখল থেকে এবং বণ্টিত হয়েছে দুর্বল ক্ষেতমজুরদের মধ্যে, আর এই কাজে অনিচ্ছুক পুলিশ ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে বাধ্য করা হয়েছে। বর্ধমানে এখনও অর্থাৎ ভূমিসংস্কার আইন চালু হওয়ার পঁয়ত্রিশ বছর পরেও আদালতের স্থগিতাদেশে বড় রায়তদের দখলে রয়েছে ২২ হাজার একর ন্যস্ত জমি,—এই তথ্যের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে বামফ্রন্ট সরকারের সীমাবদ্ধতা।

বামফ্রন্টের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ব্যতিরেকেও বাজার সম্পর্কের মাধ্যমে ভূমিবণ্টনের একটি জোরালো প্রক্রিয়া কাজ করেছে এই সময়। বামফ্রন্টের আমলে ভূমির কেন্দ্রীভবন যে বন্ধ হয়েছে, শুধু তাই নয়, বড় রায়তদের অনেকেই জমি বর্গাচাষে দেওয়ার বিকল্প হারিয়ে এবং দেখাশুনো করার সময়ের অভাবে জমি বিক্রি করতে চেয়েছেন। আবার অন্যদিকে ক্ষুদ্র কৃষকের শতাব্দী প্রাচীন ভূমিক্ষুধা প্রবল থাকায় এবং এই সময়ে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বর্ধিত উৎপাদন ও অনুকূল শস্যমূল্যজাত উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হওয়ায় তাঁরা জমি কিনতে চেয়েছেন। ফলে বড় রায়তরা তাঁদের স্বনামে এবং বেনামে রাখা জমির প্রায় ১৫ শতাংশ বিক্রি করতে পেরেছেন এই কুড়ি বছরে। এ ছাড়া ভূমি কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কুড়ি বছর অনেক সময়। এই সময়ের মধ্যে একটি নতুন প্রজন্মের উত্তরাধিকার তৈরি হয়। সুতরাং বড় রায়তদের যৌথ পরিবারগুলির ভাঙন এবং তাদের দখলী ভূমির খণ্ডীকরণ অনিবার্যভাবে ঘটেছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্ধমানের বড় রায়ত পরিবারগুলির ৪০ শতাংশই ভেঙে গেছে। ভেঙে গিয়ে এমন টুকরো টুকরো হয়েছে যে বর্তমান প্রজন্মের উত্তরাধিকারীদের শতকরা ৯৬ জনেরই হাতে এখন জমির পরিমাণ দশ একরের নীচে। অর্থাৎ বড় রায়তদের প্রায় ৪০ শতাংশই এখন আর বড় রায়ত নয়। এসব সত্ত্বেও এটা সত্য যে শতকরা ৬০ জন বড় রায়ত এখনও তাঁদের বামফ্রন্টপূর্ব দখলী জমির শতকরা ৭০ ভাগ ধরে রাখতে পেরেছেন।

বর্ধমানের বর্তমান ভূমি মালিকানার বিন্যাসে ৪ হেক্টরের উপর জোতের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার এবং মোট জোত সংখ্যার ৬ শতাংশ ২৫ শতাংশ জমির দখলীকার। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর হাতে আছে মোট কৃষিজমির ৪০ শতাংশ, অথচ এঁরা গ্রামীণ জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ। এই তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে বর্ধমানে বড় রায়তদের ভূমিমালিকানাজাত অর্থনৈতিক ক্ষমতা খুব কমেনি, যদিও সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য তাঁদের হাতে আর নেই। শাসক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এঁদের অংশগ্রহণ ও সমর্থন একটি-দুটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সর্বত্র বিরোধী পক্ষে। বর্ধমানের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের ছবি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে সেগুলি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভাগচাষী এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই একদা দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষ ক্ষমতা দখল করে যখন সচেতনভাবে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করছেন তখন তাঁদের দ্বারা উৎপাদন-ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত স্বাভাবিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কৃষি বিশেষজ্ঞ দল পরামর্শ দিয়েছিলেন এই দুর্বলতর গ্রামীণ মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন সহায়তা না দিয়ে কেবলমাত্র প্রগতিশীল বড় রায়তদের ঘরে তা পৌঁছে দিলেই কৃষির উন্নতি ঘটবে। তাঁদের যুক্তি ছিল এই: আমাদের দেশ গরিব, কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মহার্ঘ উপকরণের জোগান খুব কম, যা আছে তার অপচয় না করে পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত আর তা করতে পারবে কেবলমাত্র বড় রায়তরাই। যদি এই উপকরণগুলি তাদের হাতে না দিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী কী ভাগচাষীর ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় তাহলে তা অভাবের সংসারে ভোগে ব্যয়িত হবে, উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে না। বর্ধমানে এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বর্ধমানে 'প্রগতিশীল কৃষক গোষ্ঠী' হিসাবে একমাত্র বড় রায়তদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ১৫ বছর ধরে এঁদের জমিতেই সেচ, সার, কীটনাশক ওষুধ, উন্নত বীজ প্রভৃতি সরকারি সাহায্য ঢালা হয়েছিল অকৃপণভাবে। এর ফলে ১৫ বছর পর ১৯৭৭ সালে উৎপাদন ৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৮ লক্ষ টন হল। অর্থাৎ এই ১৫ বছরে যখন কেবলমাত্র বড় রায়তদেরকেই নতুন প্রযুক্তিতে উৎপাদন শক্তির বিকাশের বাহক ভাবা হয়েছিল, তখন উৎপাদন বাড়ল ৪ লক্ষ টন। কিন্তু পরবর্তী ১৫ বছরে যখন সরকারি সাহায্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ভাগচাষীদের অনুকূলে গেল, তখন উৎপাদন ব্যবস্থা আরও অনেক গতিশীল হল, উৎপাদন ৮ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ লক্ষ টন হল। অর্থাৎ ক্ষমতার বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হল দ্বিগুণ। গড় উৎপাদন হল হেক্টর প্রতি আড়াই টন যা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম তো নয়ই, বরং বেশি।

ভূমিসংস্কারে বর্ধমান জেলা কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে বর্ধমান জেলার রয়েছে এক বিশেষ অবদান। এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যেমন রয়েছে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চাষযোগ্য জমি ঠিক তেমনই এই জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমায় রয়েছে এক বিশাল অঞ্চল যা শিল্প প্রসারের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার এক বিশাল মজুত ভাণ্ডার। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে আমাদের মতো গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশে প্রকৃত ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষির উন্নতির দ্বারা ক্রয় সক্ষম আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি না হলে শিল্পের প্রসার ব্যাহত হয় এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন বেকার। এটাও সকলেই জানেন যে, বেকারের সংখ্যা বর্তমানে আমাদের দেশে তথা রাজ্যে পাহাড় প্রমাণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত যে কোনও সুষ্ঠু চিন্তা-আলোচনা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। ভূমিব্যবস্থার কী ধরনের পরিবর্তনকে আমরা আমাদের ভৌগোলিক তথা সামাজিক পরিকাঠামোয় প্রকৃত ভূমিসংস্কার বলব তা নিয়ে বিভিন্ন স্তরে সমাজবিজ্ঞানী-চিন্তাবিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। বর্তমান আলোচনায় ওই বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা অথবা দুঃসাহস কোনটাই আমাদের নেই।

আমাদের এই আলোচনা মূলত সীমাবদ্ধ থাকছে বিভিন্ন সময়ে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন সংক্রান্ত (যাকে ভূমিসংস্কারের এক একটি ধাপ বলে ভাবা যায়) সরকারি আইন-নির্দেশ-নিয়মাবলীর রূপায়ণের মাধ্যমে বর্ধমান জেলার ভূমিসংস্কারের গতিপ্রকৃতি এবং সেই সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত দখল থাকলেও তার উপর ছিল পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র হিসাবে বাংলা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বেছে নিয়ে, এই সমস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশরা রাজস্ব বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তাদের আস্থাভাজন একশ্রেণীর পত্তনিদার তালুকদার-জমিদার সৃষ্টি করার উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে অবিভক্ত বাংলায় ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (পারমেনান্ট সেটেলমেন্ট) এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন রেগুলেশন সমূহের প্রচলন। ভূমিব্যবস্থার এই সূত্রে সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলা ছিল অন্যতম প্রধান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত ভূমিব্যবস্থার ভালো ও মন্দ দিক বিচার বিবেচনা করার জন্য এবং এই ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হলে তা সুপারিশের জন্য ১৯৩৮ সালে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠিত হয়। এর অন্যতম সদস্য ছিলেন বর্ধমানের তদানীন্তন মহারাজাধিরাজ, যিনি নিজেই ছিলেন একজন বিশিষ্ট মধ্যস্বত্বভোগী। 'ফ্লাউড কমিশন' গঠিত হওয়ার পূর্বেই অবশ্য চালু হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজা স্বত্ব আইন বা অবিভক্ত বাংলার ভূমিব্যবস্থায় তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি উল্লেখযোগ্য আইন। কারণ এই আইনের মাধ্যমেই রায়তদের (অর্থাৎ যারা বাস্তব অর্থে নিজেরা জমি চাষ করেন) জন্য সামান্য হলেও কিছুটা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীদের খামখেয়ালীপনা বা অত্যাচারের শিকার হতে না পারে। এই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিভিন্ন ধারা-বিধান মতে সর্বপ্রথম জমির ম্যাপ ও রেকর্ড প্রস্তুত করার কাজকেই ক্যাডাস্ট্রাল সেটেলমেন্ট (সি. এস) বলা হয়। বর্ধমান জেলায় এই কাজ হয় দুই পর্বে। প্রথম পর্ব ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সন (আসানসোল মহকুমার জন্য-বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে) এবং দ্বিতীয় পর্ব ১৯২৭-থেকে ১৯৩৪ সন (জেলার অন্যান্য অংশের জন্য)। প্রকৃত অর্থে যে জমি চাষ করে তার স্বত্ব (স্ট্যাটাস) কোন শ্রেণীভুক্ত হবে তা নিরূপণই ছিল ওই সেটেলমেন্টের অন্যতম প্রধান সমস্যা। মিঃ কে এ এল হিল, আই সি এস সাহেবের বর্ধমান জেলা সংক্রান্ত সেটেলমেন্ট রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় যে, 'এই জেলায় দ্বিতীয় পর্বে রেকর্ড তৈয়ারির সময় মোট দাখিলীকৃত ৬৪,১৭৭টি আপত্তির মধ্যে ৩৬,০১৬টি আপত্তিই ছিল জমিতে স্বত্ব (স্ট্যাটাস) নিরূপণ সংক্রান্ত।' ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় যে, বর্ধমান জেলার মৌজাওয়ারী এই সি এস রেকর্ড মুদ্রণের কাজ শেষ হয় ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই রেকর্ডই বর্ধমান জেলায় জমিজমা সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশিত রেকর্ড যার সূত্র ধরেই এখানকার পরবর্তী ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করার চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ (ডব্লিউ বি ই এ অ্যাক্ট, ১৯৫৩)

আমরা যারা বর্তমান প্রজন্মের মানুষ তাদের কাছে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' সৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিক / আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি প্রথার কুফল হয়তো ক্ষীণ। কিন্তু সেই সময়কার জনমানসে এই প্রথার বিরুদ্ধে ক্রমশ গড়ে উঠছিল তীব্র অসন্তোষ যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সময়কার রকমফের কৃষক আন্দোলনে। বর্ধমান জেলাও এর বাইরে ছিল না। এই গণ অসন্তোষের মুখোমুখি হয়েই বোধ হয় 'ফ্লাউড কমিশন' সুপারিশ করেছিলেন জমিদারি / মধ্যস্বত্ব প্রথা বিলোপের জন্য। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এই সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এই সুপারিশের সূত্র ধরেই স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলায় চালু হয় 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন ১৯৫৩'। এই আইনের মুখ্য দুটি বিষয় ছিল (১) ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভূমিব্যবস্থায় সমস্ত রকম মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন এবং (২) বৃহৎ জমিদার / জোতদারদের খাস দখলীয় জমি এই আইনে নির্ধারিত উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত হলে সেই অতিরিক্ত জমি সরকারে বর্তানো।

সি. এস. রেকর্ড নবীকরণের মাধ্যমে বর্ধমান জেলায় এই কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। এই জেলার মোট ২৮২৬টি মৌজা রেকর্ডের নবীকরণের পর চূড়ান্ত প্রকাশনার কাজ শেষ হয় মোটামুটি ১৯৬০ সালে। সরকারি নথি থেকে দেখা যায় যে, বর্ধমান জেলায় এই আইনে এখনও পর্যন্ত ২,৮৯,৯৮৩টি ক্ষতিপূরণ তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনের মাধ্যমে বর্ধমান জেলায় ২,৮৯,৯৮৩ জন ভূমধ্যস্বত্বাধিকারীর বিলোপ সাধন সম্ভব হয়েছে। এই জেলায় এখনও পর্যন্ত ৩৮২৫ জন বৃহৎ জমিদার / জোতদার সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে যাদের এই আইনে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত খাস জমি ছিল এবং তাদের নিকট থেকে জুন '৯৬ পর্যন্ত উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত মোট ১,৫৪,১২০.৪৫ একর (৫৬,৪২৮.৬৭ একর কৃষি জমি ও ৬৫,৩৮৪.৫১ একর জঙ্গলসহ) জমি সরকারে ন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্ধমান জেলায় রয়েছে কয়লার এক বিশাল মজুত ভাণ্ডার। ১৯৭১-১৯৭২ সালে কয়লা শিল্পের জাতীয়করণের পূর্বে এই শিল্প ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত মালিকানায়। ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনে কোলিয়ারি

মালিকরাও মধ্যস্বত্বাধিকারী (লেসী / সাবলেসী যাই হোক না কেন)। বর্ধমানে এই ধরনের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সনাক্তকরণ এবং তাদের দখলে থাকা উপরকার জমি আদৌ ওই কয়লা শিল্পের জন্য প্রয়োজন কিনা তা নিরূপণ একটি বিশেষ কাজ। ওই আইনে বলা আছে এই ধরনের প্রয়োজনাতিরিক্ত উপরকার কোলিয়ারি জমি সরকার নিজে নিয়ে নেবেন (ক্ষতিপূরণ দিয়ে)। বর্ধমান জেলায় এই ধরনের সরকার কর্তৃক পুনর্গৃহীত (রিসিউমড্) কোলিয়ারি জমির পরিমাণ এখনও পর্যন্ত ১৩৯২.৭২ একর।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বিলোপ ঘটিয়ে বৃহৎ জমিদার / জোতদারদের ব্যক্তিগত সিলিংয়ের অতিরিক্ত খাস জমি সরকারে বর্তানো। কিন্তু বৃহৎ জমিদার / জোতদাররা সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তারা আত্মীয়স্বজনের নামে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছে। তারা আত্মীয়স্বজনের নামে জমি ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছে। কাগজে-কলমে জমির হাত বদল করে তা বেনামী করেছে। মিথ্যা আমলনামা / খাজনার রসিদ ইত্যাদি তৈরি করে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই ধরনের অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত আইনে ৫ (ক) ধারা সংযোজিত হয়। এই ধারায় একটি বিশেষ সময়কালের মধ্যে এই ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জমির হস্তান্তর বৈধ (বোনাফাইড) কিনা তা বিচার করার আইনি ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় অবৈধতার প্রাথমিক ধারণা সূত্রে এই ধরনের ৪৭০৯টি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ৫ (ক) ধারার তদন্ত করা হয় এবং তার মধ্যে ৬৭৭টি হস্তান্তর বৈধ নয় (নট বোনাফাইড) বলে ঘোষিত হয়। এই ৬৭৭টি অবৈধ ঘোষিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে মোট জমির পরিমাণ ৭৮০৩.৬৭ একর। অবৈধ হস্তান্তর ঘোষিত হওয়ার ফলে এই পরিমাণ জমি সরাসরি হস্তান্তরকারী বৃহৎ জমিদার / জোতদারদের নিজস্ব জমি বলে বিবেচিত হয় এবং তাদের জমির সিলিং নির্ধারণের সময় সরকারে বর্তিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৩ সালের জমিদারি গ্রহণ আইনের ৬(৩) ধারা এমন একটি বিশেষ ধারা যার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা চা বাগান, মিল, কারখানা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির প্রয়োজন মাফিক জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। জেলাস্তর থেকে প্রাথমিক অনুসন্ধান-প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকারি স্তর থেকেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন ধরনের মিল, কারখানা ইত্যাদির জন্য ১৩৩টি ৬(৩) ধারার তদন্ত শুরু করা হয় যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্থার নাম ইস্কো। এই কোম্পানির দখলে থাকা প্রায় তিন হাজার একর জমি মোট ৩৩টি মৌজায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে এই কোম্পানির আর্থিক দায়বদ্ধতা হেতু জমিদারি গ্রহণ আইনের ধারাসমূহ এর উপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি (সরকারি সিদ্ধান্ত মতে)। বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে এই দায়বদ্ধতার বিলোপ হয়েছে। অতি সম্প্রতি ইস্কোর জমি সংক্রান্ত ৬(৩) ধারার জেলাস্তরের অনুসন্ধান-প্রতিবেদন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে যথাযথ সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫ (ডব্লিউ. বি. এল. আর. অ্যাক্ট ১৯৫৫)

ভূমিব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন এবং বৃহৎ জমিদার / জোতদারদের ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি সরকারে বর্তানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন, ১৯৫৩-কে পশ্চিমবাংলার ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই আইনের বলেই ব্যাপক অর্থে জমিদারি প্রথা আজ ইতিহাস। রায়তরা সরাসরি চলে আসে সরকারের অধীনে। কিন্তু বাস্তব অর্থে জমিদার শ্রেণীর যে সাধারণ স্বরূপ জনমানসে আছে আমাদের মতো সংবিধান প্রতিশ্রুত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সরকার কখনও সেই স্বরূপ নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আশু প্রয়োজন অনুভূত হয় আরও একটি সুসংহত আইন তৈরি করার, যার দ্বারা জমিদারি গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ থেকে প্রাপ্ত সুফল সমূহসহ রাজ্যের ভূমিব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের পথ আরও সুবিন্যস্ত করা যায়। এই প্রয়োজনের তাগিদেই পাশ হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫ (ডব্লিউ, বি. এল. আর অ্যাক্ট ১৯৫৫)। প্রাথমিকভাবে এই আইনের মুখ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ :—

(১) রায়ত তথা জমিতে অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (যেমন বর্গাদার) অধিকার, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতার বিধিবদ্ধতার।

(২) সরকারে ন্যস্ত জমিসমূহ নির্দিষ্ট নীতি/বিধান মাফিক ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা।

(৩) জমিতে অন্যান্য অধিকার সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা।

কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতে সেচ ব্যবস্থাসহ কৃষিকার্য সংক্রান্ত অন্যান্য প্রযুক্তিতে যেটুকু উন্নতি ঘটে তাতে জমির ঊর্ধ্বসীমার আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৭২ সালের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় নির্দেশিকা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবাংলায় চালু হয় কৃষি। অন্যান্য জমিতে পরিবারভিত্তিক সর্বোচ্চ সীমার আইন। বর্ধমান জেলায় জুন '৯৬ পর্যন্ত মোট ৭২০৫টি পরিবারের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করে ২৭,৬৫৩.৫০ একর কৃষি এবং ১,৫২৩.১০ একর অন্যান্য শ্রেণীর জমি সরকারে ন্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই ন্যস্তকরণের কাজ যে সব সময় মসৃণভাবে হয়েছে—তা নয়। দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন জমির মালিকগণ বিভিন্নভাবে এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিবন্ধকতা কখনও করা হয়েছে জমির মালিকানা সম্পর্কে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে। আবার কখনও করা হয়েছে রায়ত-পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ম/মৃত্যু/বিবাহ ইত্যাদির তারিখ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে। এই জেলায় এমনও নজির আছে যেখানে 'জাল উইল'-এর মাধ্যমে উর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত জমি রাখার প্রয়াসকে রোখা হয়েছে 'উইল বাতিলকরণ' (রিভোকেশন অফ উইল) সংক্রান্ত মামলা রুজু করে এবং 'সংসার জীবন থেকে মৃত্যু' (সিভিল ডেথ)-এর অজুহাতে রোখা হয়েছে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করে।

সরকারে ন্যস্ত জমির বন্টন

ভূমিসংস্কারের মূল কথা জমির সুষম বন্টন যাতে করে তা মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত না থাকতে পারে। তাই যে জমি জমিদারি গ্রহণ আইন/ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে সরকারের ন্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে, ভূমিহীনদের মধ্যে তার বিলি বন্দোবস্ত করা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের ন্যস্ত (খাস) জমি কিভাবে বিলি বন্দোবস্ত করা হবে তা ভূমিসংস্কার আইনের ৪৯ ধারা এবং ভূমিসংস্কার নিয়মাবলীর ২০-ক বিধিতে নির্ধারিত হয়েছে। ধারা/বিধির একটি বিশেষ ব্যাপার এই যে জমি বিলির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপকৃতদের বাছতে স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থাকে প্রত্যক্ষ ভূমিকা। উল্লিখিত ধারা/বিধি মোতাবেক সম্ভাব্য উপকৃতদের তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের বন ও ভূমিসংস্কার স্থায়ী সমিতির সভায় অনুমোদিত হওয়ার পর সেটি মহকুমা শাসকের কাছে প্রেরণ করা হয়। মহকুমা শাসকের অনুমোদন পাওয়া গেলেই বিধিবদ্ধ বন্দোবস্ত দলিল (পাট্টা) সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জমি দেওয়া হয়। জুন '৯৬ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় এইভাবে বিলি করা চাষযোগ্য খাস জমির পরিমাণ মোট ৪৯৩৮৮.৪৮ একর এবং মোট পাট্টা প্রাপকদের সংখ্যা ১,৭৯,২৮১ জন (তফসিলি জাতি ৭৫৪৩০ জন তফসিলি উপজাতি ৩৭৯১৫ জন এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ৬৫,৯৩৬ জন) উক্ত সংখ্যক পাট্টা প্রাপকদের মধ্যে মোট মহিলার সংখ্যা ৩৬১৭ জন এবং ৪৭৬৮টি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যৌথভাবে পাট্টা দেওয়া হয়েছে যাতে করে একজনের ইচ্ছায় পাট্টাপ্রাপ্ত জমি হস্তান্তর না হয়ে পারিবারিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত থাকে।

বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণ

বর্গাপ্রথায় চাষ করানো পশ্চিমবাংলা তথা বর্ধমানের একটি সুপ্রাচীন প্রথা। কিভাবে এই প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল তা গবেষণার বিষয়। তবে একটা সাধারণ মতবাদ এই যে, জমিদারি এলাকায় অনেক প্রকৃত চাষী নির্মম জমিদারি শোষণের শিকার হয়ে জমি হারিয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল অধিকারহীন বর্গাচাষীতে। এছাড়াও জমিদারি প্রথা 'বাবু-কালচার'-এর অন্তর্ভুক্ত যে 'ভদ্রলোক শ্রেণীর' সৃষ্টি করেছিল তাদের কাছে স্বহস্তে জমি চাষ করা ছিল সামাজিক দিক দিয়ে অমর্যাদার বিষয়। তাই বর্গাদার দিয়ে জমি চাষ করানোই ছিল তাদের কাছে সহজলভ্য পথ। সুপ্রাচীন প্রথা হলেও সাধারণভাবে বর্গাদারদের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল মালিকের মর্জির উপর। উচ্ছেদ ও অন্যান্য ধরনের নিপীড়ন লাঞ্ছনা ছিল নিত্যকার ঘটনা। তাই উৎপন্ন ফসল থেকে বর্গাদারদের প্রাপ্য অংশ বাড়ানোর দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলনও হতে থাকে যা অপেক্ষাকৃত সুসংহত রূপ ছিল 'তেভাগা আন্দোলন।' এরই ফলে চালু হয় ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনে সেটেলমেন্ট রেকর্ড তৈরি করার সময় বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তাতেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। উচ্ছেদের ভয়ে সন্ত্রস্ত বর্গাদাররা তাদের দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট হাজির হওয়া থেকে বিরত থেকেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৮ সাল থেকে তাই বর্গা নথিভুক্তকরণের কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনেন। এই পদ্ধতিতে সান্ধ্য বৈঠক, সরেজমিন তদন্ত ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আধিকারিকগণ কে কোন জমিতে বর্গাদার তা নির্ণয় করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। এই বিশেষ পদ্ধতিই বর্গা আন্দোলনের সর্বশেষ স্বীকৃত রূপ যা সাধারণভাবে 'অপারেশন বর্গা' নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে বর্গাদাররা বর্ধমান জেলায় 'ভাগদার' নামে পরিচিত ছিল। বর্ধমান জেলায় বর্গাদারের সংখ্যা মোট কত তার কোনও সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। তবে এখানে এই প্রথার ব্যাপ্তি সম্পর্কে কোনও সংশয় নেই। মিঃ কে. এল. হিল. আই. সি. এস.সাহেবের (১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার) বিভিন্ন কারণে ধারণা হয়েছিল যে তাঁর সময়কার জেলার চাষযোগ্য জমির এক চতুর্থাংশ বর্গা প্রথায় চাষ হত। কিন্তু এই ধারণার ভিত্তি কি তা আমাদের জানা নেই। তবে 'অপারেশন বর্গা'-র সরকারি সিদ্ধান্ত রূপায়ণে এই জেলার সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জুন '৯৬ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় মোট ১,১০,৭০৩.৫১ একর জমিতে ১,২৫,৯৫৮ জন বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ১,২৫,৯৫৮ জন নথিভুক্ত বর্গাদারের মধ্যে ৯৫,৯৭৬ জন নথিভুক্ত হয়েছে 'অপারেশন বর্গা'র বিশেষ পদ্ধতিতে। পঞ্চায়েত তথা বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের সহযোগিতায় এক সময় এই জেলায় 'অপারেশন বর্গা' এক সংগঠিত রূপ ধারণ করেছিল। সান্ধ্য বৈঠক ছিল প্রায় রোজকার ব্যাপার। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি গলসী থানার পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাগুলিপাড়া গ্রামে

এই রকমই একটি সান্ধ্য বৈঠকে উপস্থিত থেকে 'অপারেশন বর্গা'-র সম্যক ধারণা নিয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত এক প্রতিনিধি দল। সমস্ত পশ্চিমবাংলার সঙ্গে এই জেলায়ও বর্গা নথিভুক্তকরণের কাজ এখনও অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর, কারিগর এবং মৎস্যজীবীদের বাস্তুজমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৫-এর বাস্তব প্রয়োগ

'অপারেশন বর্গা'-র দিশা বস্তুত বেরিয়ে এসেছিল সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত কয়েকটি রি-ওরিয়েনটেশন্ ক্যাম্পের আলোচনা থেকে এ সমস্ত আলোচনায় উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ভাগচাষী/ক্ষেতমজুরদের অংশগ্রহণ করানো হয়েছিল। বর্ধমান জেলার মলানদিঘিতেও (কাঁকসা থানাভুক্ত) এইরকম একটি রি-ওরিয়েনটেশন্ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সমস্ত ক্যাম্পে আলোচনায় বেসরকারি অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা গিয়েছিল যে, বর্গাদাররা তাদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত এবং এই দ্বিধাগ্রস্ততার পিছনে রয়েছে জমির মালিকদের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রকার ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনা যার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি বিষয় হল বাস্তুভিটা থেকে তাদের উৎখাতের ভীতি। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর, কারিগর এবং মৎস্যজীবীদের জন্য বাস্তুজমি অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৫-এর বাস্তব প্রয়োগে। গ্রামবাংলার এইসব শ্রেণীভুক্ত পরিবারের একটি বড় অংশ অন্যের জমিতে মাটির ঘর তৈরি করে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জমিতে তাদের কোনও স্বত্ব ছিল না। তাই ওই সময় থেকেই এই আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ৫ কাঠা পর্যন্ত বাস্তু জমিতে ক্ষেতমজুর, কারিগর, মৎস্যজীবী, বর্গাদার, কুম্ভকার, সূত্রধর বা কর্মকার শ্রেণীভুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বত্ব প্রদান ও নাম নথিভুক্ত করার একটা বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্ধমান জেলায় এই কর্মসূচির সাফল্য অতীব আশাপ্রদ। এই জেলায় জুন '৯৬ পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে উপকৃতদের সংখ্যা মোট ৫৮,২৮০ জন এবং তাদের বাস্তুভিটার মোট জমির পরিমাণ ২০৪৫.১৭ একর।

ছোট জোতের চাষীদের খাজনা মকুব সংক্রান্ত কাজ

ব্রিটিশ আমলে জমিদারগণ কর্তৃক প্রজাদের দেয় খাজনা নির্দিষ্টকরণের কোনও নীতিগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। জমিদার/নায়েবদের মর্জি অনুযায়ী অসংখ্য ছোট জোতের চাষীদের অসংগতিপূর্ণ চড়া হারে খাজনা দিতে হত এবং সময়মত ওই চড়া হারে খাজনা দিতে না পারলে, জমি নিলাম করা হত। সংখ্যাধিক্য ছোট জোতের চাষীদের খাজনার ক্ষেত্রে এই অসংগতি দূর করে তা পুনর্বিন্যাস করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে খাজনা মকুব করার ব্যবস্থা করা হয় পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ২৩(খ) ধারায়। এই ধারায় সেচ এলাকায় অনধিক ৪ একর এবং অসেচ এলাকায় অনধিক ৬ একর জমির অধিকারী রায়ত পরিবারের ক্ষেত্রে খাজনা বা রাজস্ব মকুবের আদেশ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমান জেলাতেও এই কাজ পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে। জুন '৯৬ পর্যন্ত এই জেলায় মোট ১,৪১,০০৫টি রায়ত পরিবারের জন্য খাজনা মকুবের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার প্রশাসনে অখণ্ড বিন্যাস (ইনটিগ্রেটেড সেট আপ)-এর রূপায়ণ

জনসাধারণের সুবিধার্থে জেলাস্তরে বিভাগের দুটি শাখাকে একত্র করে ভূমিসংস্কার প্রশাসনকে একেবারে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সাল থেকে পশ্চিমবাংলায় চালু হয় ভূমিসংস্কার প্রশাসনের অখণ্ড বিন্যাস (ইনটিগ্রেটেড সেট-আপ)। এই ধরনের অখণ্ড বিন্যাসের উপযোগিতা অনুভূত হচ্ছিল বর্ধমান জেলায় কিছু প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। এই জেলায় ১৯৭৯ সালেই দুটি শাখার আংশিক একত্রীকরণের মাধ্যমে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত অনেক কাজে (যেমন 'অপারেশন বর্গা' সরকারের বিরুদ্ধে করা বিভিন্ন মামলার যথাযথ মোকাবিলা ইত্যাদি) প্রশাসনিক অসুবিধাসমূহ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। ওই সময় থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত একজন আধিকারিকই জেলার ভূ-বাসন আধিকারিক (সেটেলমেন্ট অফিসার) এবং অবর জেলাশাসক (ভূমিসংস্কার) বা এ ডি এম (এল. আর) হিসাবে ভারপ্রাপ্ত থেকে জেলার সার্বিক ভূমিসংস্কার কার্য পরিচালনা করেছেন। যাই হোক বর্তমানে এই জেলায় এই অখণ্ড বিন্যাস (ইনটিগ্রেটেড সেট-আপ)-এর বাস্তবায়ন অনেকটা এগিয়েছে। ২৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজস্ব পরিদর্শক (আর. আই)-এর কার্যালয় (অফিস) চালু করা হয়েছে। কিছু ঘাটতি থাকলেও ওই সমস্ত অফিসে বিভিন্ন পদের কর্মী পাঠানো হয়েছে যাতে জনসাধারণ প্রয়োজনে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে ঐ সমস্ত অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। রাজস্ব পরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে জমি বিলি-বন্দোবস্ত/বর্গা নথিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সরেজমিন তদন্তগুলি তাড়াতাড়ি করানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া শস্য সমীক্ষা (ক্রপ-সার্ভে) কৃষি শুমারি (এগ্রি সেনসাস) এবং শিল্পের জন্য জমি সনাক্তকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও করানো হচ্ছে। অখণ্ড ভূমিসংস্কার প্রশাসন চালু হওয়ার পর এই জেলায় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে গৌণ খনিজ (মাইনর মিনারেল) থেকে রয়্যালটি/সেস আদায়ের ক্ষেত্রে। পূর্বের তুলনায় এই আদায়ের বাৎসরিক বৃদ্ধি প্রায় চার গুণ। ৮৯-৯০ সালের ৭৪.২৭ লক্ষ টাকার স্থলে ৯৫-৯৬

সালে ওই খাতে আদায় হয়েছে ২৯৬.১৫ লক্ষ টাকা। প্রশাসনিক সুবিধার্থে আপাতত ৯টি সমষ্টি ভূমি ও ভূমিসংস্কারকরণ (বি. এল.এল. আর. ও অফিস) এবং ৩০টি রাজস্ব পরিদর্শকের করণ (আই. আই. অফিস) এর জন্য নিজস্ব সরকারি বাড়ি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এই বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও অবশ্য অনেক কিছু করার আছে। জেলা প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় তা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জিম্বাবয়ে (আফ্রিকার একটি উন্নয়নশীল দেশ) সরকারের দুজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের আতিথ্যে পশ্চিমবাংলায় আসেন এখানকার ভূমিসংস্কার ও ভূমি প্রশাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের জন্য। এরই অঙ্গ হিসাবে তাঁরা বর্ধমান জেলায় থাকেন ১০ ডিসেম্বর '৯৪ থেকে ১২ ডিসেম্বর '৯৪ পর্যন্ত। ওই সময়কালে তাঁরা এই জেলার দুর্গাপুর/কাঁকসা বি. এল এল. আর. ও অফিস। বনবাটী আর. আই. অফিস প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে সরকারের ভূমিসংস্কার কর্মসূচির দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে কর্মসূচির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ভূমিসংস্কারের সমস্যা একটি মৌলিক সমস্যা। অনেকের মতে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হল ভূমি সমস্যা এবং তার সঙ্গে জড়িত কৃষি সমস্যার সমাধান। কিন্তু ভূমির প্রকৃত স্বত্বলিপি না থাকলে ভূমিসংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই ভূমির স্বত্বলিপি নবীকরণের কাজ ভূমিসংস্কার কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই কাজের গুণগত উৎকর্ষতাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জমির নির্ভুল ম্যাপ তৈরি করে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ স্বত্বলিপি (রেকর্ড অফ রাইটস্) প্রস্তুত বা নবীকরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, জমির হস্তান্তর ইত্যাদি কারণে এই স্বত্বলিপি নবীকরণের কাজ এক জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু জুন '৯৬ পর্যন্ত বর্ধমান জেলার ২৮২৬টি মৌজার মধ্যে ২৫৪২টি মৌজার স্বত্বলিপি ১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার আইন মোতাবেক নবীকরণ করে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করে তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি হাতের কাছে না আনতে পারলে ভূমিসংস্কারের পরবর্তী ধাপসমূহ অযথা বিলম্বিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত মতে এই বিভাগে চালু হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সুফল পরিগণক (কম্পিউটার)-এর ব্যবহার। অন্য আরও দু' একটি জেলার সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও এই সিদ্ধান্তের প্রাথমিক প্রয়োগ হয়েছে। ফলস্বরূপ এই জেলায় চলছে জমির স্বত্বলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য (ডাটা) সমূহ কম্পিউটারাইজেশনের কাজ। আশা করা যায় কিছু কিছু আনুষঙ্গিক অসুবিধা কাটিয়ে উঠে অদূর ভবিষ্যতেই ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এই কম্পিউটারাইজেশনের সুফল বর্ধমান জেলার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
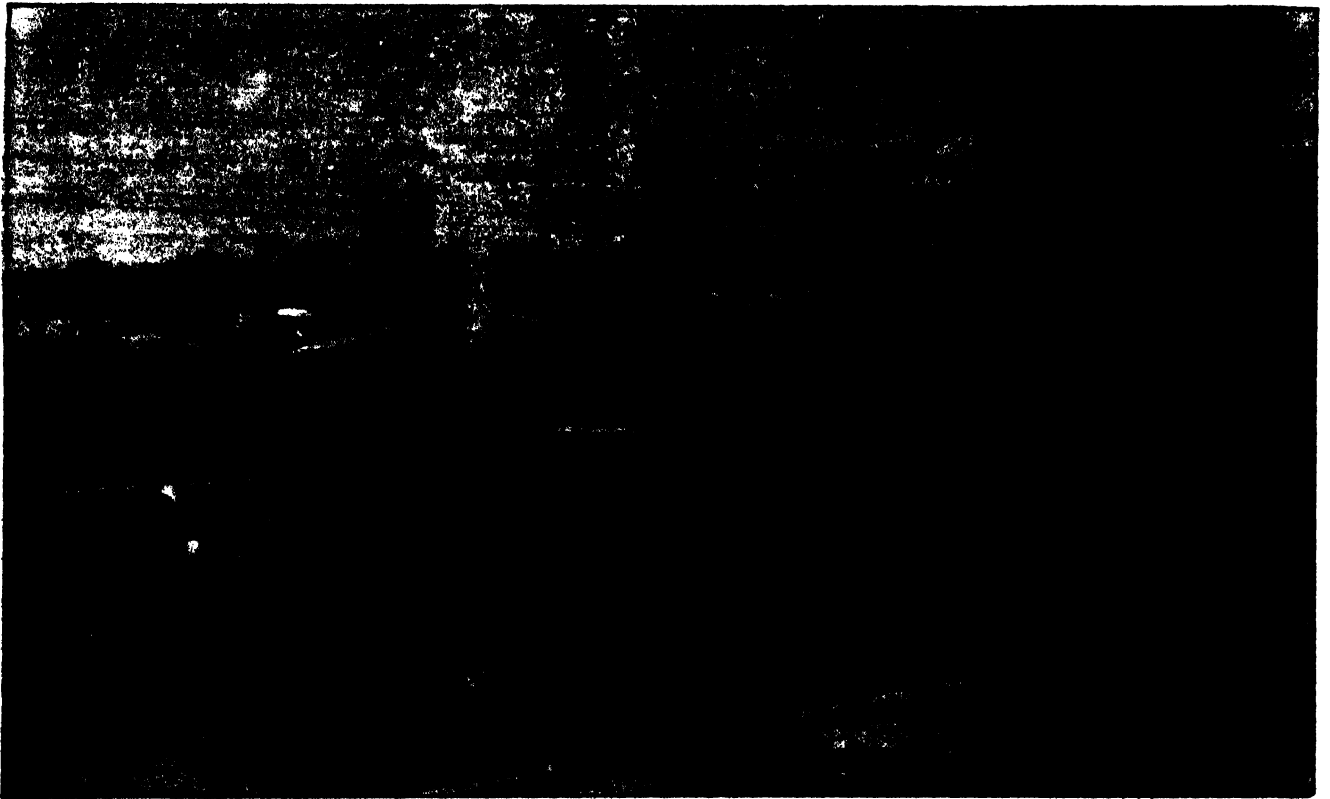
গ্রামোন্নয়নের কিছু কথা

স্বপন ভট্টাচার্য

উন্নয়ন বা বিকাশ যে নামেই বলি না কেন এর সরল অর্থ হল অবস্থার পরিবর্তন, খারাপ থেকে ভালো, ভালো থেকে আরও ভালো। বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের ক্রমোন্নতি সাধারণত তার পরীক্ষার ফলের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। গ্রামোন্নয়ন যা আমাদের আলোচ্য বিষয় তার কিছুটা পরীক্ষার ফলের মতো বোঝা যায় যেমন কাঁচা রাস্তার পাকা হওয়া, সে পথে বাস বা ট্রাকের যাওয়া আসা, পানীয় জল সংগ্রহের সমস্যা কমা প্রভৃতি। বাকিটা হল উন্নয়নের ফল বেশিরভাগ গ্রামবাসী ভোগ করতে পারছে কিনা বা উন্নয়নের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে (উন্নততর) যাবার জন্য একটা আন্তরিক বাসনা সৃষ্টি হচ্ছে কি না।

দেশ স্বাধীন হবার পর নানা জায়গাতে সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প বা আইনি ব্যবস্থায় (যেমন ভূমি অধিগ্রহণ আইন) কিছু কিছু পরিবর্তন আসছিল। প্রশ্ন ছিল এই পরিবর্তন তথা উন্নয়নের ফলভোগ কে বা কারা বেশি করছিল। উন্নয়নকে বহন করার জন্যও শক্তি চাই, চেতনা চাই। রাস্তায় বাস চলছে অথচ ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হল কিন্তু ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্রের ওপর ভরসা কমল না, দারিদ্র্যের চাপে বাল্যকালেই ছেলেদের রাখালি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হল কিংবা এক বছর কম বৃষ্টি হল তো অনাহার দেখা দিল এমন অবস্থাকে

উন্নয়ন বলা যায় না। যেমন বলা যায় না বিদ্যুৎবাহী তার লাগানোর পর তা চুরি হয়ে যাওয়াকে। যেটা বলতে চাই তা হল উন্নয়নের বিস্তারটা এমন হওয়া তা যেন গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ অবধি পৌঁছোয়—দারিদ্র্যতা সমাজের দুর্বলতর অংশে তার অবস্থান থাকলেও সেই উন্নয়নের ফল ব্যবহারিক জীবনের মান পরিবর্তন এনে দেয়। কোনরকম বৈষম্য যেন ছায়া ফেলতে না পারে। উপকরণগুলিকে সে যেন না মনে করে দয়ার দান বা আত্মমর্যাদাহানিকর। সঙ্গে সঙ্গে যে সম্পদ সৃষ্টি হবে তার প্রতি একটা আন্তরিক দরদ থাকবে এবং বুঝতেপারবে তার ও তার সন্তান-সন্ততির উন্নতির জন্য এগুলি হল এক একটি ধাপ।

বর্ধমান জেলার গ্রামোন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি ধারা বিবরণী দেবার লক্ষ্য এই রচনাটিতে নেই। মোটামুটি ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ এই বছর পনেরোর মধ্যে জেলার ২৫৭০টি মৌজাতে গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত অল্প কিছু বিষয়ের ওপর সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে। ১৯৭৮ সাল গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যে একটি 'জল বিভাজিকা' তা বহু আলোচিত। উন্নয়ন বলতে গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের কাছেও যে তা পৌঁছানো দরকার তার বাস্তবায়ন প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই শুরু হয়। গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে কোনও কিছু আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের ভূমিকা বার বারই আসবে। বিগত ২০ বছরে গ্রামের পরিবর্তন যা দেখা যাচ্ছে তা যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত মারফৎ গ্রামোন্নয়নের দৃঢ় প্রয়াসের ফল এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রামের কথা বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের স্মৃতি উদিত হতে পারে কিংবা পুতুল নাচের ইতিকথায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্করুণ বর্ণনা, 'স্ফূর্তি নয়—আনন্দ, শান্তি, স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য, ওরা প্রত্যেকে রুগ্ণ অনুভূতির আড়ত....।' যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা এখন আর নেই কিন্তু বুঝতে ভুল হয় না সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য বাংলায় কি অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। অন্য জায়গার মতো বর্ধমানও ব্যতিক্রম ছিল না। বর্গীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত বারে বারে বন্যায় বিধ্বস্ত এই জেলার মানুষ প্রতিকূলতার মুখোমুখী হয়েছে নিজের উদ্যমে। জেলার, পশ্চিমাংশে রুক্ষ মাটিতে শিল্প গড়ে উঠেছে, পূর্বাংশে দামোদরের জল ভূগর্ভস্থ জল সেচের এলাকা বাড়িয়ে নতুন দিনের সূচনা করেছে। উচ্চফলনশীল ধান, আলু, নানাবিধ সব্জির চাষ চাষীর অবস্থা সহজতর করেছে। জেলায় গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার অবস্থা, তাদের অনুপাত ও দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যার একটা হিসেব নীচের সারণি—১-এ দেওয়া হল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারদের সম্পর্কে যে সমীক্ষা জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (ডি আর ডি এ) চালিয়েছিলেন (১৯৯২) তাকেই দেখান হল বিকল্প কোনও তথ্য না থাকাতে।

গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটা লক্ষণ ওপরে পরিস্ফুট। এর থেকে গ্রামের মানুষের শহরে আসার

সারণি—১

সাল	মোট জনসংখ্যা	গ্রামের জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা	গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার অনুপাত	দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার সংখ্যা
১৯৭১	৩৯,১৬,১৭৪	৩০,২৪,১৮৪	৮,৯১,৯৯০	৭৭ : ২৩	—
১৯৮১	৪৮,৩৫,৩৮৮	৩৪,১৪,২১৯	১৪,২১,১৬৯	৭১ : ২৯	—
১৯৯১	৬০,৫০,৬০৫	৩৯,২৭,৬১৩	২১,২২,৯৯২	৬৫ : ৩৫	—
১৯৯২					৩,৭৬,৮৮১ মোট গ্রামীণ পরিবারের ৪৩%

তথ্য উৎস: জেলা পরিসংখ্যান হ্যাণ্ডবই, ১৯৭১, ১৯৮১-৮৯, ১৯৯৪ সংস্করণ।

সারণি - ২

মার্চ '৯৫ অবধি

বণ্টন উপযোগী কৃষিযোগ্য খাসজমির এলাকা হেক্টার	বণ্টিত জমির মোট এলাকা হেক্টার	পাট্টা প্রাপকের মোট সংখ্যা	নথীভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা		বাস্তু জমি অধিগ্রহণ আইনানুযায়ী উপভোক্তার সংখ্যা				
			তফঃজাতি	আদিবাসী	তফঃজাতি	আদিবাসী	অন্যান্য	মোট হেক্টার	মোট জমি
৩২,৯৪৭	১৭,৭০৯	১৭,৪১৯	৪২,২৭৩	১৬,০৭০	২৮,৩৩১	১৬,২৭৫	১২,৮৯০	৫৭,৪৯৬	২০২১.৮৯

তথ্য উৎস: জেলা পরিকল্পনা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত "ব্লক প্রোফাইল" পুস্তিকা ১৯৯৫

প্রবণতাই সূচিত হয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসমীচীন। বেশ কিছু গ্রামীণ এলাকা এই সময়ের মধ্যে নগর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে যার দরুন শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর শহরে বসতি যাঁরা স্থাপন করেছেন তাঁরা যে সবাই এই জেলার গ্রামবাসী তাও নয়। তবে নগরায়ন যে হচ্ছে, গ্রাম ও শহরের পার্থক্য, খুব ধীরে ধীরে হলেও, যে কমছে তা সুস্পষ্ট।

গ্রামোন্নয়নের প্রথম হাতিয়ার যদি পঞ্চায়েত হয় তবে তার অন্যতম লক্ষ্য হল দারিদ্রের বিরুদ্ধে আঘাত। সে লক্ষ পূরণে, স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম অভিযান হল ভূমিসংস্কার। গ্রামের ভূমিহীন, নেহাৎ অল্পজমির মালিকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত বা খাসজমি বণ্টন, বর্গাদারি স্বত্ব জোরদার করা, ভাগচাষীর ফসলের ন্যায্য ভাগ লাভে পাশে দাঁড়ানো, কৃষি-মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি সবই ভূমিসংস্কার অভিযানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সরকারি প্রয়াসের সঙ্গে রাজনৈতিক উদ্যম থাকায় কাজটি দ্রুতলয়ে এগোতে থাকে। সারণি-২-তে ভূমিসংস্কার প্রক্রিয়ার কিছু সংখ্যাতথ্যের হিসেব রাখা হল।

ভূমি সংস্কারের প্রত্যক্ষ ও প্রথম প্রভাব পড়ার কথা কৃষি উৎপাদনের ওপরে। শুধু ভূমি-বণ্টনই শেষ কথা হতে পারে না। চাষের জন্য জল, কৃষিঋণ, বীজ, শস্য সংরক্ষণ ও তার শস্যকে উপযুক্ত দরে বাজারে বিক্রয় করতে পারা এগুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আপাতত চাষবাসের কিছু তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক :

আউস বা আমন ধান বা আলু চাষের এলাকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পেলেও বোরো চাষের এলাকা বৃদ্ধি হয়েছে বিগত ১২/১৩ বছরে প্রায় পাঁচগুণ। প্রত্যেকটি ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার ক্রমবৃদ্ধি সহজেই বোঝা যায়। ফসল-আবৃত্তি (Cropping Intensity)-র হারও ক্রমবর্ধমান এবং একে ২০০% এ পরিণত করার লক্ষ ও ঘোষিত[১] হয়েছে। এখন এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে ভূমিসংস্কারের যোগসাধন করায় সোজাসুজি কোনও গাণিতিক সম্পর্ক নির্ণয় করা না গেলেও পরোক্ষ সম্পর্কটা অনুমান করাটা অযৌক্তিক নয়। বিশেষ করে যেখানে চাষাবাদের মোট জমি বৃদ্ধি খুব বেশি নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির যে উপকরণগুলির কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে যেগুলি সরকারি প্রয়াসে তা যে গ্রামের গরিব বা দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের জমির ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে কারণ ঋণ বা উপভোক্তা

সারণি - ৩

সাল	মোট কত জমিতে চাষ হয়েছিল হাজার হেক্টারে				উৎপাদনশীলতা (প্রতি কেজি / হেক্টারে)				ফসল-আবৃত্তি Cropping-intensity
	আউস	আমন	বোরো	আলু	আউস	আমন	বোরো	আলু	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৮১-৮২	২৩.৮	৪৩৫.৩	৩৩.৯	২৬.৯	১৮২৪	১৩৪৪	২৩৭১	২০,৯৯৩	পাওয়া যায়নি
১৯৮৬-৮৭	২৫.৪	৩৯২.৯	১০৫.৭	৩০.৬	১৮৫৪	২১৪৩	২৮৬৫	২১,৭৬৮	১৪৮%
১৯৯০-৯৪	৩৩.৯	৪১৬.৯	১৫৮.৮	৩১.৯	২৫২২	২৫৩৬	৩২০৭	২৮,৫৭৭	১৬৫%

তথ্য উৎস : স্তম্ভ ১ থেকে ৯ জেলা পরিসংখ্যান হাতবই। স্তম্ভ-১০ : জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশিত পুস্তিকা।

সারণি - ৪

সাল	গভীর নলকূপের সংখ্যা (সরকারি)	নদী-জলোত্তলন সেচ-ব্যবস্থা (সরকারি)	অগভীর নলকূপ (সরকারি-বেসরকারি)	বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপের সংখ্যা	কৃষি ও জলত্তোলনে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ হাজার কিঃ ওয়াট ঘঃ
১৯৮১-৮২	৩৬২	২৩৮	১৫,৮০৮	২২৯৮	১৫,০০০ (১৯৭৯-৮০)
১৯৮৯-৯০	৩৯৮	২৬৫	৩৭,০৪৭	৩১৩০	৪৫,১৪৪ (১৯৮৮-৮৯)
১৯৯৩-৯৪	৫৪৩	২৬৫		১০,১৫৮**	৯৮,২৫৪ (১৯৯৪-৯৫)

তথ্য উৎস : জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর। বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎপর্ষদ, জেলা পরিসংখ্যান হাতবই।

নির্বাচন ইত্যাদি পঞ্চায়েতের দায়িত্ব এবং এই শ্রেণীর চাষীরাই যাতে বেশি পরিমাণে সুযোগ পান তা সরকারি নির্দেশে ছিল।

সেচ-ব্যবস্থার বিশেষত ক্ষুদ্র-সেচ ব্যবস্থার একটার ত্বরিত-উন্নতি আলোচ্য সময়ের একটা বৈশিষ্ট্য। বোরো ধানের উন্নত মানের বীজ, সার ইত্যাদির সহজলভ্যতার দরুন উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল তাও স্বীকার্য। সরকারি উদ্যমের মধ্যে কৃষি-সেচ, কৃষি-যান্ত্রিক দপ্তর, ক্ষুদ্র সেচ নিগমের প্রয়াসের সঙ্গে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, তথা জাতি ও মঙ্গল দপ্তর, সমবায় সমিতিগুলি ক্ষুদ্র সেচ প্রসারে যুক্ত হয়েছিল। ব্যক্তিগত প্রয়াসে ক্ষুদ্র-সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে তো জোয়ার দেখা দিয়েছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ যাচাই না করে নির্বিচারে ও উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন পাম্প মেশিন বসানোর ক্ষতিকারক ফল দেখা দিতে শুরু করেছে। একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। সেচের প্রসারে বিদ্যুতের লভ্যতা যেখানে সহজতর হয়েছে সেখানে তার পূর্ণ শুধু নয় অধিকতর ব্যবহারের প্রবণতায় নানারকম সংকট দেখা দিচ্ছে। অনেক উদ্যমী চাষীরা বিদ্যুৎ পর্ষদ সরবরাহীকৃত বিদ্যুতের ওপর নির্ভর না করে ডিজেল ব্যবহার করে সেচের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ নিয়ে যে কিছু তথ্য সংকলন করা হয়েছে তার জন্য নীচের সারণি-৪-এ পেশ করা হল।

* জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর অতি সম্প্রতি তাঁদের শুমারির কাজ শেষ করেছেন এবং প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করছেন। দপ্তরের আধিকারিকদের মতে ১৯৮৯-৯০-এর তুলনায় অগভীর নলকূপের সংখ্যা কমপক্ষে ১৫% ভাগ বেশি হবে।

** তথ্যটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ১৯৯৪-৯৫ বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত। সারা রাজ্যের কৃষিতে যত বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে তার ১২.৬% ভাগ এই জেলায় অবস্থিত।

উল্লেখযোগ্য যে গড় হিসেবে প্রতি গভীর নলকূপে ৬০ হেক্টার ও অগভীর নলকূপে ৪ হেক্টার চাষ হবে ধরা হয়।

কৃষির প্রসারে বর্ধমান জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সহায়ক ভূমিকা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। উৎপাদনের জন্য গরিব, প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার কিংবা পাট্টাদারকে মহাজনের হাত থেকে বাঁচাতে কৃষি-ঋণদানের উপযুক্ত সংবেদনশীল ও জোরালো ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরকারি আইন মারফৎ সমবায় সমিতিতে পাট্টাদার, বর্গাদারদের সদস্য-ভুক্তি সহজতর হয়েছে। কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা ও তার আদায়ে এই সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল। অনেক জায়গাতে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ করেছেন। এই ব্যাঙ্কের ভূমিকায় কিছু সংখ্যাতথ্যের হিসাব সারণি-৫-এ দেখানো হল।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে বৃদ্ধির হার অন্যান্যদের তুলনায় বেশ কম। তবে ১৯৮৫-৮৬-র পর ১৯৯০-৯১-এর মধ্যে বৃদ্ধির হার যে বেড়েছে তা লক্ষণীয়।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তথা গ্রামোন্নয়নের পক্ষে যে অভিযান তার বিবরণীতে জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থাকে এবার প্রসঙ্গে আনতে হয়। সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচির (আই আর ডি পি) অন্তর্নিহিত ভাবনা (concept) হল সরকারের গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির সমন্বিত প্রয়াসকে গ্রামের দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া যাতে এই পরিবারগুলির জীবনধারণের জন্য কিছু অর্থাগম নিশ্চিত হয় ও জীবনযাপনের মানে (বাসস্থান, জনস্বাস্থ্য) পরিবর্তন আসে। এর অন্তর্গত কয়েকটি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান (Wage Employment) ও এর সাহায্যে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি। সময়ের সঙ্গে এই ধরনের প্রকল্পগুলির নাম পালটেছে যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি (NREP), জওহর রোজগার যোজনা (JRY) বা ইদানীংকার নিশ্চিত কর্মসংস্থান (E.A.S.) প্রকল্প। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েত বি-কেন্দ্রীত (decentralised) পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সুযোগ পেয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় এইসব প্রকল্প রূপায়ণে।

সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচি (সুগ্রাবিক) যা আই আর ডি পি নামেই সহজবোধ্য তা রূপায়িত করে জেলা গ্রামীণ উন্নয়নসংস্থা। দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলি যাতে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ছোট ছোট প্রকল্প মারফৎ নিজেদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আয় বাড়াতে পারে সেদিকে এই সংস্থা সচেষ্ট থাকে। গ্রামের দুর্বলতর অংশ অর্থাৎ নারী, তফসিলি জাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষভাবে

সারণি - ৫

সাল	সর্বজনীন-সদস্য পদের ভিত্তিতে কৃষিঋণ প্রাপক				ঋণের পরিমাণ কোটি টাকায়
	তফঃ জাতি	আদিবাসী	অন্যান্য	মোট	
১৯৮০-৮১	৫,৭৮৫	৬৭৯	৩৪,৬১২	৪১,০৭৬	৪.২৩৪
১৯৮৫-৮৬	৮,৭৯২	১,৬৭৮	৫৩,৯৯৫	৬৪,৪৬৫	৭.৩৮৪
১৯৯০-৯১	১৭,২২২	৬,৮৯৫	৯৮,৩১৭	১,২২,৪৩৪	২৪.৮০৫

তথ্য উৎস : বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

নজর দিতে হয়। এই বাবদ প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ সরকারি অনুদান (মোটা হিসেবে ব্যাঙ্ক ঋণ ও অনুদানের হার হল ৬০ : ৪০)। মোটামুটি এই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণে ব্যাপৃত আছে পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি জাতি ও আদিবাসী বিত্ত নিগম। এরা প্রান্তিক ঋণও মঞ্জুর করতে পারে। শুধু গ্রাম নয় শহর এলাকাতেও এরা কাজ করতে পারে। পরিকাঠামো নির্মাণেও জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা অংশগ্রহণ করতে পারে প্রকল্প রূপায়ণ সফল করতে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনাও এই সংস্থা করে থাকে।

উপরোক্ত বিবরণী থেকে এটা পরিষ্কার যে এই দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে ব্যাঙ্কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৮-এর পর থেকে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারের একটা অন্যতম কারণ হল দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিকে জোরদার করার চেষ্টা। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার, আই আর ডি পি মারফৎ স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প সম্পর্কে কিছু তথ্য সারণি ৬-এ বিবৃত হল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ জাতীয় স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পগুলির দৌলতে ঠিক কত শতাংশ গ্রামবাসী দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে আসছে বা সেখানে স্থিতিশীল থাকছে সে সম্পর্কে জেলাভিত্তিক ব্যাপক পেশাদারিভাবে সমীক্ষিত তথ্য হাতে নেই যদিও বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রয়োজনীয়। সরাসরি সমীক্ষালব্ধ ফল না থাকায় কয়েকটি বিষয়কে নির্বাচন করে সে সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে অবধারণ করলে কিছু ধারণা অবশ্যই করা যাবে। সর্বক্ষেত্রে শুধু গ্রামের জন্য প্রযোজ্য এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। সারা জেলাকেই একসঙ্গে দেখাতে হয়েছে। আবার গ্রামের সবল ও দুর্বলতর মানুষের মধ্যে কিছু উপকরণে বা পরিষেবার বণ্টন যেভাবে হচ্ছে তথ্য সেভাবেও রাখা হয় না। সামগ্রিকভাবে একটা বস্তুগত, দৃষ্টিভঙ্গির, চেতনার পরিবর্তনের ইঙ্গিত অবশ্যই বোঝা যাবে।

পরপৃষ্ঠার তথ্যগুলি থেকে কিছু কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যায়। তা হল

১। সাক্ষরতার হার বেশ দ্রুতগতিতে বেড়েছে, বিশেষত সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের পর। শহরের চেয়ে গ্রামীণ নারীদের সাক্ষরতার বৃদ্ধি এর মধ্যে লক্ষণীয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম ভিত্তি সাক্ষরতার প্রসার।

২। পঞ্চম শ্রেণী অবধি পাঠরত ছাত্রীদের হার মোটামুটি স্থিতিশীল এবং ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে তা বোঝা যায়। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রায় মোট জনসংখ্যার ২৬% হল ৫ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক। মোট জনসংখ্যার মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী অবধি পাঠরত ছাত্রছাত্রীর হার ১৯৯৩-৯৪ সালে আনুমানিক ১০%। অর্থাৎ এই জায়গাতে বেশ কিছুটা ঘাটতি আছে।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তেমনভাবে না বাড়লে ও ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ওপর চাপ বাড়ছে। তফসিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা মাধ্যমিকস্তরেও ধীরে ধীরে বাড়ছে।

৪। গৃহস্থালির কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। শহর ও গ্রামের পরিমাণ পৃথকভাবে দেখানো সম্ভব না হলেও বৃদ্ধি যে ঘটেছে তা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত।

সারণি - ৬

সাল	মোট ব্যাঙ্ক সংখ্যা সমবায় ব্যাঙ্ক সমেত	ব্যাঙ্ক-পিছু জনসংখ্যা	গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক শাখার সংখ্যা	ঋণ ও আমানতের অনুপাত	আই আর ডি পি			
					সময়-কাল	মোট উপভোক্তার সংখ্যা	অর্থ মঞ্জুর লক্ষ টাকায়	
							ব্যাঙ্ক ঋণ	অনুদান
১৯৮২	২২২	২১,৭৮১	১৫১	২৮.৭%	১৯৮০-৮৫ (মার্চ '৮৫ অবধি)	৬৫,৭১৮	৮৩৩.৪০	৫৩৩.৯৭
১৯৮৭	৩৪৬	১৩,৯৭৫	২৫১	২৯.৩%	১৯৮৫-৯০ (মার্চ '৯০ অবধি)	১,৬৪,৬৩৬	৪৭৬৫.৭৯	২৪১০.৮৩
১৯৯৬ (জুন)	৩৯৬	১৫,২৩৯	২৯৪	৩৪.৪%	১৯৯০-৯৬ (মার্চ '৯৬ অবধি)	১,২৯,৯১২	৪৮৪০.৩৫	২৭৭৫.২১

তথ্য উৎস: লিড ব্যাঙ্ক অফিস্ ও জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা। সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (পূর্বতন ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক) বর্তমানে মোট শাখা ৪টি বা এর সঙ্গে যোগ করতে হবে।

সারণি - ৭

সাল	গৃহে বিদ্যুতের ব্যবহার হাজার কিঃ ওয়াট ঘন্টা (সারা জেলার)	ট্র্যাক্টর ও ট্রেলারের সংখ্যা (সারা জেলার)	জ্বালানি চালিত দ্বি-চক্রযান (সারা জেলার)	স্বল্পসঞ্চয় (হাজার টাকায়) (কেবল গ্রামীণ এলাকায়)
১৯৮১-৮২	১৭,৫৪০ (১৯৭৯-৮০)	১,৫৫৪	১৯,৩৭৮	৯৫,৮১০
১৯৮৯-৯০	৬৫,২৪৩ (১৯৮৮-৮৯)	৩,২৪০	১৮,৪৫০	৩,৭৯,২১০
১৯৯৩-৯৪	১,৮৭,২৬৯ (১৯৯৪-৯৫)	৪,৬৭৭ (১৯৯২-৯৩)	৯,৩৩৪ (১৯৯২-৯৩)	৭,০৬,৬৬২

তথ্য উৎস: (১) জেলা পরিসংখ্যান হাতবই, উপ-অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয় বর্ধমান ও দুর্গাপুর, (২) অধীক্ষক ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, (৩) জেলা পরিসংখ্যান হাতবই ১৯৯৪।

প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত কিছু তথ্য (সারা জেলার জন্য)

সারণি - ৮

সাল	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	মোট ছাত্রীসংখ্যা	ছাত্রীদের শতকরা হার	পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী অবধি তফঃ জাতি/আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা	
					তফঃ জাতি	তফঃ আদিবাসী
১৯৮১-৯২	৩৩৯০	৪,৬৪,৮৮১	২,০৫,৬১৪	৪৪	পাওয়া	যায়নি
১৯৮৭-৮৮	৩৭৭৫	৫,৩৪,৮৬৪	২,৪৪,৪০৭	৪৬	২৯,৩৬২	৪,৯০১
১৯৯৩-৯৪	৩৭৭৫	৬,৫৩,৮৯১	২,৯৪,৮০৭	৪৫	৩৮,০০০ (প্রায়)	৬,০০০ (প্রায়)

তথ্য উৎস: (১) জেলা পরিসংখ্যান হাতবই, (২) জেলা পরিকল্পনা কমিটি প্রকাশিত পুস্তিকা, (৩) তফঃ জাতি / আদিবাসী মঙ্গল দপ্তর। তফঃ জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য বই কেনা বাবদ ব্যয়িত অর্থের ভিত্তিতে সাক্ষরতা সংকলিত।

সারণি - ৯

সাল	গ্রামীণ সাক্ষরতার হার		সমগ্র জেলার হার		জেলার সামগ্রিক হার
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	
১৯৭১	১৯.৯	৩৭.৫	২৪.৭	৪২.৯	৩৪.৪
১৯৮১	২৭.৪	৫৪.৩	২৯.২	৫৫.৬	৪২.৭
১৯৯১	৬১.৯	৭৮.২	৫১.৫	৭১.১	৬১.৯

তথ্য উৎস: জেলা পরিসংখ্যান হাতবই ১৯৭১ ও ১৯৯৪ সংস্করণ

৫। কৃষিযন্ত্রের মধ্যে ট্র্যাক্টরের ব্যবহার সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকেরাই করে থাকেন। তবে অনেকে আবার ভাড়া করে ট্র্যাক্টর চাষের কাজে লাগান। পাওয়ার টিলারের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। পাম্পমেশিন তো আছেই। অর্থাৎ কৃষিতে যান্ত্রিক উপকরণের প্রয়োগ বেশিমাত্রায় হচ্ছে। পাশাপাশি বর্তমানে ক্ষেতমজুরির দৈনিক হার দাঁড়িয়েছে টাকার অঙ্কে প্রায় ৩৮/৪০ টাকা (২২টা/২৪টা নগদ, ২ কেজি চাল)। ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের অনেকেই দরাদরির ক্ষেত্রে সবল অবস্থানে থাকেন।

৬। স্কুটার, মোটর সাইকেল জাতীয় ছোট দু-চাকার যানের সংখ্যা যে দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। হৃতদরিদ্রদের বঞ্চিত করেই যে এই সমৃদ্ধি তা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

৭। স্বল্প-সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও জেলার মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। অতি সাধারণ মানুষও যখন সঞ্চয়ের কথা ভাবেন তখন তা তার উদ্যম ও উদ্বৃত্ত অর্থ-দুটিরই পরিচয় দেয়।

৮। উপরোক্ত তথ্যগুলির সবই যে গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা গ্রামের সব মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য তা নয়। তবুও গ্রামে যখন এই জেলার প্রায় ৭০ জন লোক থাকেন, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, সরকারি স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তখন স্বচ্ছন্দে বলা যায় গ্রাম সমৃদ্ধির মুখ দেখছে। গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে এই সমৃদ্ধির পরিমাণগত (Quantified) তথ্য পেশ করতে পারলে তা আরও ভাল হত।

উন্নয়নের ফল গ্রামের নারীদের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা না করলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকবে। কিছু কিছু তথ্যে নারীদের বিষয় (সাক্ষরতা, ছাত্রীসংখ্যা) নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইনিব্যবস্থার মাধ্যমে মোট[৩] ২২০৫ জন নারী পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ-কেউ প্রধান, কেউ-কেউ কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কৃষি-মজুরিতে নারী-পুরুষে বৈষম্যের খবর বিরল এই জেলাতে। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে গ্রামীণ নারী ও শিশু বিকাশ কর্ম নিয়ে (Development of Women and Children in Rural Areas—সংক্ষেপে DWCRA) প্রকল্প ১৯৯১-৯২ সাল থেকে প্রচলিত হয়েছে। দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাসকারী নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা, সমাজ ও পরিবেশে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এদের উদ্যমী সচেষ্ট করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। ১০ থেকে ১৫ জনকে নিয়ে দল গঠন, সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করা, অর্থকরী কাজে লিপ্ত হওয়া, প্রশিক্ষণ দেওয়া। কাজের ঘর তৈরি করা ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ায় জড়িত। সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ অবধি ২১৫৭ জন সদস্যা নিয়ে ১৫৫টি দল গঠিত হয়েছে। গোটা সমস্যার তুলনায় এই প্রয়াস সিন্ধুতে বারিবিন্দুর তুল্য। তবুও এই কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে কেমন নেতিবাচক, পুরুষের উদ্ধত কর্তৃত্ববোধ মনোভাব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে জেলার গ্রামে গ্রামে। গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে নারীর অব্যবহৃত শক্তিকে যে কাজে লাগানো একান্ত দরকার সে চেতনা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

গ্রামোন্নয়নের সম্পর্কে যা আলোচনা করা হল তা নিঃসন্দেহে একটি খণ্ডিত অংশ। উচ্চশিক্ষা, পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ইচ্ছে করেই এখানে বাদ রাখা হল। মহাজনী ঋণের বর্তমান অবস্থা কেমন বা দেনার দায়ে জমি বিক্রি করার অবস্থাটা কেমন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করতে পারলে আর একটি বিষয় যোগ করা যেত। একই কালের বিভিন্ন বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের অভাব যে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিগত ২০ বছরে গ্রামোন্নয়নের রথের চাকাকে কাদা রাস্তা থেকে তুলে পাকা রাস্তার অনেকটা কাছাকাছি আনা গেছে। পাকা রাস্তাটাও যে মসৃণ এমন নয়। পঞ্চায়েতের কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনার জন্য, গ্রামের মানুষকে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন ক্রিয়াকর্মে আরও বেশি অংশগ্রহণের জন্য নানারকম আইনি ব্যবস্থাপনাও করা হয়েছে। নির্বাচনে যে রকম সক্রিয়তা দেখা যায় সে রকম উদ্দীপনা, আবেগ বা চাহিদাপূরণে সংগঠিত উদ্যম তেমন দেখা যাচ্ছে না। একরকম পরমুখাপেক্ষী নিষ্ক্রিয়তা সাধারণের জন্য কাজকর্মে লক্ষ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই কাজে অংশ নিতে পারে। উদ্যম, চাহিদা ইত্যাদি সংগঠিত করে পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করতে পারে প্রবলভাবে। এর দরুন গ্রামোন্নয়নের প্রয়াসে কাজে মাতোয়ারা আসবে যে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করে গেছেন অনেকদিন আগে, 'অতএব কেবল মাতিয়া উঠিলেই হইবে না; সেই মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার, সেই মত্ততা সমস্ত জাতির শিরায় মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার ক্ষমতা সঞ্চয় করা চাই। একটি স্থায়ী আনন্দের ভাব সমস্ত জাতির হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল হওয়া চাই।'[৪]

টীকা ও অন্যান্য তথ্য উৎস

১। দারিদ্র্যসীমা: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ধরা হয়েছিল গ্রামে যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ১১,০০০ টাকার কম তারাই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

২। জেলা পরিকল্পনা সমিতি প্রকাশিত পুস্তিকা ১৯৯৫-৯৬ অনুযায়ী।

৩। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের দপ্তর থেকে সংগৃহীত।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ১৮, কৃতজ্ঞতা স্বীকার: (ক) শ্রীপ্রশান্ত মৈত্র—মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, (২) শ্রীভূমিরাম দাস, উপ-অধিকর্তা, স্বল্প সঞ্চয়, অধিকার, বর্ধমান, (৩) শ্রীদীপঙ্কর সাহা, অধীক্ষক ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, (৪) শ্রী পি কে মজুমদার ও তপন রায়—জনসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর, বর্ধমান।

বর্ধমান জেলার সমবায় আন্দোলন—রূপ ও সম্ভাবনা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

বর্ধমান জেলার সমবায় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে সারা ভারত তথ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেই তাকে অনুধাবন করতে হবে; কারণ সমবায় একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন সমবায়ের জন্মভূমি ইংল্যান্ডের ন্যায় শ্রমিকশ্রেণীর বাঁচার তাগিদে, শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী ইংরেজ নিজেদের শাসন ও শোষণকে বজায় রাখার জন্য সমবায়কে চাপিয়ে দিয়েছিল জনগণের ওপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ব্রিটিশ শাসনে মহাজনী শোষণ কৃষকদের চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলেছিল। পত্তনিদার প্রথা চালু হওয়ায় ভোগদখল স্বত্ব যায় পত্তনিদারদের হাতে—শোষণ হয় আরও তীব্র। আর পত্তনি প্রথার গোড়াপত্তন করেন বর্ধমানেরই মহারাজা।[১] কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে সারা ভারতবর্ষে। মহাজনী শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকরাও বিদ্রোহ শুরু করেন। ১৮৭৫ সালে পুনা ও আহ্‌মদনগরের কৃষক বিদ্রোহকে সেনা নামিয়ে দমন করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে। কৃষকদের রিলিফ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসক কয়েকটি ঋণ দাদন আইনও তৈরি করেন। তাতেও বিশেষ লাভ

না হওয়ায় ১৯০১ সালে ব্রিটিশ শাসক নিয়োজিত স্যার এডওয়ার্ড ল কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি অনুযায়ী রাইফাসেন লাইনে ১৯০৪ সালে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস্ অ্যাক্ট, ১৯০৪' গৃহীত হয়ও ভারতে সমবায় আন্দোলন শুরু হয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। এই চরিত্রগত পার্থক্য নিয়েই ইংল্যান্ড ও ভারতে সমবায় আন্দোলনের জন্ম। ফলে ভারতের সমবায় আন্দোলন কখনই আত্মনির্ভর হতে পারেনি। এমনকি স্বাধীনতার পরেও প্রকৃত অর্থে জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা আত্মনির্ভর স্বাধীন সমবায় গড়ে তুলতে চায়নি শাসকশ্রেণী ও কংগ্রেস সরকার। নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থে একে ব্যবহার করেছে। ১৯৪৯ সালে পেশ করা 'কংগ্রেস অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্মস্' কমিটির রিপোর্টে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল ভূমিসংস্কার ও কৃষিতে সমবায় নীতির প্রয়োগের উপর। কিন্তু জমিদারদের অপসারণের পর জোতদার শ্রেণী উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। কর প্রদান প্রথা, জমির উর্ধ্বসীমা প্রভৃতি সংক্রান্ত ভূমিসংস্কার এবং সমবায় পদ্ধতি এই শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল। এই শ্রেণীর দেওয়া বাধার দরুনই ভূমিসংস্কার ও সমবায় আন্দোলন কার্যকরী হয়নি।[২]

এই পটভূমিতে বর্ধমান জেলায় সমবায় গড়ে উঠলেও—জেলার সমবায় আন্দোলন শুরু থেকেই একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

জেলায় সমবায় আন্দোলন ও তার পটভূমি

বর্ধমান জেলায় সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। বর্ধমান জেলায় সমবায় আন্দোলন শুরু হয় সোভিয়েত বিপ্লবের বছরে ১৯১৭ সালের ২৬ জানুয়ারি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটিডের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই বছরেই ৫ মার্চ কার্যকরী কমিটির সভায় ১৭টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও ৫১ জন ব্যক্তি সদস্য নিয়ে তৎকালীন জেলা বোর্ডের (অধুনা জেলা পরিষদ) পশ্চিমের বারান্দায় দুটি ঘর নিয়ে শুরু হয় ব্যাঙ্কের কাজ। এর আগে পশ্চিমবঙ্গে যে ৩টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয়েছিল যেমন—মেদিনীপুরের জেলার বলরামপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, চাঁচল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক (মালদহ জেলা) তাঁর সবকটিই অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বিগত ৭৯ বছর ধরে শুধু টিকেই থাকেনি তার অগ্রগতি ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেষ্ঠ সমবায় ব্যাঙ্ক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও সারা ভারতে ৩৬১টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে ৩১তম স্থানে নিজের স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়াও ১৯১৭ সালে তৎকালীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা জেলা বোর্ডকে নিয়ে যার যাত্রা শুরু আজও জেলা পরিষদের সহযোগী অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে তার কার্যক্রমকে জনগণের স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। এখানে উল্লেখ্য বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ১৯১৮ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় মহাসঙ্ঘ লিমিটেড নামে নিবন্ধীকৃত হয়ে ওই বছর ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে।

বর্ধমান জেলার সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে: (১) প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব; (২) ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পর্ব; (৩) ১৯৭৭ পরবর্তী বাম আন্দোলন পর্ব।

(১) প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব:

বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আগে বর্ধমানে ৪টি 'গ্রামীণ সমবায় সমাজের' অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে করন্দা ও ধাত্রীগ্রামের সমাজ দুটি বেশ বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। এই শেষোক্ত দুটি সম্বন্ধে বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রথম সভার অভিমত হল: "এত বৃদ্ধি হয়েছে যে যোগ্যতাসহকারে সমিতি পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।[৩] বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরে ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক—যাও একটি ব্যতিক্রম। ১৯১৮ সাল থেকে আজও অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি হয়েও তার অগ্রগতি অব্যাহত—জাপানে অনুষ্ঠিত সমীক্ষায় এই সমিতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিরূপে নির্ধারিত। এই সমিতিটি গড়ে উঠেছে সরকারি সাহায্য ছাড়াই জনগণের উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে; কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় নীতির বারবার পরিবর্তন হলেও সরকার কখনও সেই নীতি এই সমিতির ওপর প্রয়োগ করেনি বা এর কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেনি—যা আজকে অর্থনীতিবিদদের অনেকের অভিমত: "The problems of the Co-operative movement in India have arisen because it did not grow in a natural way on the basis of felt needs and initiative shown by the local leadership. It has grown as a government programme propped up by number of concessions and subsidies. Over the years it has grown in size but has no acouired its internal financial and managerial strength and self reliance. As a result, this sector has become over-administered and regimented system."[৪]

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সমবায়গুলির বেশিরভাগই ছিল উচ্চবিত্তের অর্থ উপার্জনের সংস্থা, দুর্নীতির আখড়া। জেলার সমবায় আন্দোলনে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল "নিষিদ্ধ।" গণতন্ত্র ছিল এর থেকে বহুদূরে। সমবায়গুলি ছিল রাজা মহারাজা জমিদার জোতদারদের বৈঠকখানা। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রথম নির্বাচিত পরিচালকমন্ডলীর নিম্নলিখিত সদস্যদের সামাজিক অবস্থান লক্ষ করলেই সমবায়গুলির চরিত্র বোঝা যাবে: জেলাশাসক, রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর, রাজা মনিলাল সিংহরায়, রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু, রায় বাহাদুর বনয়ারীলাল হাটি প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য

পরিচালকমণ্ডলীর ১৫ জন সদস্যের মধ্যে প্রাথমিক সমিতি থেকে ছিল ৬ জন: সমিতিগুলি হল ধাত্রীগ্রাম, সালকুনি, পিলসুয়া, অষ্টগ্রাম, ভৈটা, করন্দা।[৪]

(২) ১৯৭৭ সন পর্যন্ত কংগ্রেস পর্ব :

স্বাধীনতার পরেও দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। জোতদার, জমিদার, মহাজন ও ধনী কৃষকদের কবলেই ছিল সমবায় আন্দোলন। গরীব, প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জন্য সমবায়ের দরজা ছিল বন্ধ। ১৯৫৪ সালের অল ইণ্ডিয়া রুরাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটির রিপোর্ট অনুসারে 'ভারতের সমবায় আন্দোলনের খতিয়ান—অকৃতকার্যকারিতার খতিয়ান (ব্যানার্জি : ৩৩৮)।' ওই রিপোর্টেই স্বীকৃত হয় যে সমবায় ঋণ মহাজনদের হাত ঘুরে গরিব কৃষকদের হাতে গিয়ে শোষণের হাতিয়ার হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে গঠিত রিজার্ভ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার স্টাডি টিমের রিপোর্টে সমবায় আন্দোলনের দুর্দশারই ছবি ফুটে ওঠে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ছবি পাওয়া যাবে নীচের তথ্য থেকে :

(তিন) ১৯৭৭ পরবর্তী বামফ্রন্ট পর্ব :

১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই বাম আন্দোলন ভিন্ন পদ্ধতিতে সমবায় গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে। ''উদাহরণস্বরূপ কৃষক সভার নেতৃত্বে ১৯৪৮-৪৯ সালের 'বলগোনা প্রচেষ্টার' কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমবায় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই সময় কৃষকরা বলগোনা, সড্যা প্রভৃতি গ্রামে তাদের জমির আল তুলে দিয়ে সমবায় প্রথায় চাষ শুরু করেন। এটিকে বর্ধমান জেলার সর্বপ্রথম 'কমিউনি উৎপাদন' (Commune farming) বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই ব্যবস্থাটি ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল, (কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের কৃষি আয়কর প্রদান নীতির ফলে—লেখক) কিন্তু এর আদর্শ পরবর্তীকালে জেলার সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতিতে এক অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। শ্রমিকদের মধ্যেও সমবায় গড়ে উঠেছে।'''[৬] ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও কৃষক আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। সমবায় আন্দোলনেও তার প্রভাব পড়তে থাকে। গণআন্দোলনের কর্মীরাও সমবায় আন্দোলনে যুক্ত হতে থাকেন।

সাল	সমিতির মোট সংখ্যা	কৃষি সমিতিগুলির সংগৃহীত মোট সদস্য সংখ্যা (লক্ষ)	সার্বজনীন সদস্য (লক্ষ)	ঋণ দাদন কোটি)	ঋণ (%)
১৯৪৭	৪৩২	—	চালু হয়নি	০.০৭	—
১৯৭৭	৯৮১	২.০৩	—	৯.৮৫	৭৬.৪
১৯৮৭	১২৯২	২.৯৭	.২৮	৩০.২৯	৬০
১৯৯৬	১৫৮০	৪.৯৩	১.৫৯	১০১.০৫	৯৭

সাল	আমানত (কোটি)	কার্যকরী মূলধন (কোটি)	লাভ (লক্ষ)
১৯৪৭	০.৪৩	৫.৯	১.৭১
১৯৭৭	৭.০২	১৪.২৬	১৫.৮৩
১৯৮৭	৩৮.৯৪	৫৫.৬৩	৪.০১
১৯৯৬	৯৬৪.৯২	২০২.৫৫	৩৪৯.৩১

উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সালে সমবায় আন্দোলনের যে অগ্রগতি ঘটেছে, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সালের অগ্রগতির সঙ্গে তা কোনও রকমেই তুলনীয় নয়। তাছাড়া উপরোক্ত তথ্য থেকে এও পরিষ্কার যে ১৯৮৫ সালের বামফ্রন্ট সমর্থিত গণআন্দোলনের নেতৃত্বের দ্বারা গঠিত পরিচালকমণ্ডলী কার্যভার গ্রহণ করার পর আন্দোলনের গতি ৪/৫ গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৬৯ সালের বিখ্যাত দুর্গাপুর ইস্পাত শ্রমিক ধর্মঘট ও তার থেকে গড়ে ওঠা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সমবায় ঋণদান সমিতি একটি জলন্ত নিদর্শন। ১৯৬৭ সাল ও তৎপরবর্তী ভূমিসংস্কারের আন্দোলন সমবায় আন্দোলনের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে।

''১৯৭৭ সন পরবর্তী পর্বে জেলার সমবায় আন্দোলন এক সম্পূর্ণ নতুন পর্যায়ে যাত্রা শুরু করে। প্রাক্ ১৯৭৭ ও ১৯৭৭ পরবর্তী পর্যায়ের পার্থক্য মৌলিক। ১৯৭৭-সন পরবর্তী পর্বের জেলার সমবায় আন্দোলন সবদিক থেকে নতুনত্ব দাবি করে উদ্দেশ্য, নেতৃত্ব ও পদ্ধতিতে। সমবায় আন্দোলনের নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব, নতুন উদ্দেশ্যে আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং নতুন পদ্ধতিতে জনগণকে, বিশেষ করে গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সমবায় আন্দোলনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।'''[৭] বামফ্রন্ট সরকারের 'সার্বজনীন সদস্যপদ'

সৃষ্টি এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। কায়েমী স্বার্থবাজদের দেওয়া সমবায়ের দেয়ালটা ভেঙে পড়ে। সমবায় এই প্রথম আন্দোলনের রূপ নিতে থাকে। সার্বজনীন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর কায়েমী স্বার্থবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে।

কারণ এই কায়েমী স্বার্থবাজরা সমবায়ে সার্বজনীন সদস্যপদ গ্রহণের বিরোধিতা করতে থাকে—মেমারীর দলুই বাজার, আমাদপুর প্রভৃতি সমিতিতে সার্বজনীন সদস্যপদ গ্রহণের জন্য কৃষক আন্দোলন উল্লেখ্য। শ্রমিকশ্রেণীও এগিয়ে আসে। বিভিন্ন অফিসে, বিদ্যালয়ে, কারখানায়, কোলিয়ারিতে কর্মচারী ঋণদান সমিতি, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও শ্রমিক সমবায় গড়ে তুলতে থাকেন। শিল্প সমবায়, মহিলা শিল্প সমবায়, মহিলা ব্যাংক গড়ে ওঠে। তাঁত শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। হোসিয়ারি সমবায়, কাগজকল সমবায়, ছোট ছোট শিল্প সমবায়, হিমঘর সমবায়, বাজার সমবায় প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সমবায় গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সদস্য সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা, সদস্যদের চেতনা বৃদ্ধির জন্য সমবায় শিক্ষার ওপরও জোর দেওয়া হয়। অন্য রাজ্যের আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের আন্দোলনের একটা চরিত্রগত পরিবর্তন হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্নাটকে যেখানে সমবায় আন্দোলন মূলত কায়েমী স্বার্থের দখলে, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে সমবায় কৃষিঋণের শতকরা ৮০ ভাগই পায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। ওই সকল রাজ্যে কৃষি ঋণের শতকরা ১৮ থেকে ২১ ভাগ পায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা। গবেষকরা মনে করেন এই চরিত্রগত পরিবর্তন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফল।

কৃষি বিকাশের আন্দোলন ও সমবায় :

বর্ধমান জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে কৃষি বিকাশের আন্দোলনও গতি লাভ করেছে—সমবায় আন্দোলনও সেক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট ৬০ লক্ষ ৩৪ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ৪৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৬৯ জন গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। জেলার জনসংখ্যার ৭৪.১৬ শতাংশ আজও গ্রামের বাসিন্দা। মোট ২৬৭৯ গ্রামের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ ৬০ হাজার একর। এর একটি বড় অংশ সেচসেবিত। ক্ষুদ্র সেঁচের বৃদ্ধির জন্য বর্ধমানের সমবায় আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে জেলা পরিষদসহ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহায়তায়। ৪০০০ মিনি ডিপটিউবওয়েলের জন্য ১০ কোটি টাকা ঋণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জেলা পরিষদ অনুদান অনুমোদন করেছে ১০ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত ৩০০০ টিউবওয়েলের কাজ শেষ হয়েছে। ৬৪০০০ হাজার হেক্টর জমি সেচ সেবিত হবে। উপকৃত হবেন৬১৩০০ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। এর মধ্যে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে উপকৃতের সংখ্যা ৩০ শতাংশ। বিভিন্ন ব্লকভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯২ সালের জেলার শস্য আবর্তনের গড় ১৬৯ শতাংশ থেকে বর্তমান বৃদ্ধির হার ভাল। পূর্বস্থলী-১ এবং ২, কালনা-১ এবং ২, জামালপুর, গলসী-২ ব্লকগুলিতে শস্য আবর্তনের গড় প্রায় ২৭৫ শতাংশ। এর মধ্যে পূর্বস্থলী ব্লকের গড় ৩০০ শতাংশেরও বেশি। আগামী পাঁচ বছরে সারা জেলায় শস্য আবর্তনের গড় ২২৫ করার লক্ষ্যে জেলার কৃষি বিকাশের আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। সেচের এলাকাবৃদ্ধির জন্য উপরিতলের জল ধরে রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে সমবায় আন্দোলন। সেচের সুযোগ, কৃষি ঋণ দাদনের পরিমাণ, সার বীজ ওষুধ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কৃষি বিকাশে সমবায় আন্দোলনও তার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি বিকাশের আন্দোলনের ফলে সমবায় আন্দোলনও উপকৃত হয়েছে। সারা রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলার কৃষি সমবায় সমিতিগুলির তুলনামূলক পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল যা থেকে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির ছবি পাওয়া যাবে।

সমিতির বিবরণ	রাজ্যে সমিতির সংখ্যা	রাজ্যে মোট সমিতির মধ্যে শতকরা হার	বর্ধমান জেলায় সমিতির সংখ্যা	জেলায় মোট সমিতির মধ্যে শতকরা হার
স্বাবলম্বী (ভায়াবল)	৪৭০২	৬২.৩৮	৩৯৮	৭০.৮১
স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনাযুক্ত (পোটেন্সিয়াল)	১৯৩৩	২৫.৬৫	১৪২	২৫.২৭
নির্জীব (ডরম্যান্ট)	৮১৩			
		১১.৯৭	২২	৩.৯২
বন্ধ (ডিফাংক্ট)	৮৯			
মোট	৭৫৩৭	১০০	৫৬২	১০০

কৃষি বিকাশের স্বার্থে গ্রামীণ সমবায়গুলিকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও আমানত সংগ্রহের কাজ চলে। সারা রাজ্যে ১১৪৯টি প্রাথমিক ঋণদান সমিতি যেখানে ৭৩.৩৭ কোটি টাকা মিনি ব্যাংক চালু করে আমানত সংগ্রহ করেছে, সেখানে বর্ধমান জেলার ২১৪টি সমিতি আমানত সংগ্রহ করেছে ২৮.২৮ কোটি টাকা যা রাজ্যে মোট আমানত সংগ্রহের শতকরা ৩৮.৫ ভাগ।

রাজ্য সমবায় ব্যাংক : ১৭টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক : তুলনামূলক আলোচনা :

নীচে রাজ্য সমবায় ব্যাংক ও রাজ্যের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি ও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ৯৪-৯৫

সালের কার্যাবলীর একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে দেয়া হল :

(কোটি টাকায়)

	রাজ্য সমবায় ব্যাংক	রাজ্যের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি	বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	রাজ্যের মধ্যে শতকরা হার
আমানত	৪৮১.৯৬	৪৫৮.৮৮	১৩৪.১৪	২৯.২৩
স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ দাদন		১৫৬.২৭	৩৫.০০ (নিজস্ব তহবিল)	২২.৪০
ক্ষুদ্র সেচ	১.৬০	৮.৭০	৬.০০	৬৮.৯৭
কর্মচারী ঋণদাদন	১৪.৭৫	পাওয়া যায়নি	২৯.০২	—
তাঁতশিল্প	৬২.৪৫ (তন্তুজসহ)	৩৬.৪৫	১২.০৩	৩৩.০০
কারিগরি ও শ্রম সমবায়		৮.৬৫	৩.৯৮	৪৬.০১
ভোগ্যপণ্য	৫.৮০	—	২.৮২	—
হিমঘর	০.৫০	—	৬.৪৩	—
মোট দাদন	৩৫৬.২৯	৩০৩.২৪	১৭৯.৯২	৫৯.৩৩

আমানত ও ঋণ দাদন : সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক :

বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির তুলনায় আমানত ও ঋণ দাদনের অনুপাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর ১৯৯৫-৯৬ সালের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হল :[৮]

ব্যাংক	আমানত	মোট ঋণ দাদন (কোটি টাকায়)	ঋণ দাদন ও আমানতের শতকরা হার (সি.ডি.রেসিও)
বাণিজ্যিক ব্যাংক (১৮টি)	১৯৮১.৬২	৫২২.৬৫	২৬.২
গ্রামীণ ব্যাংক	৭৫.২৬	৩৩.১৬	৪৪.০৭
বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	১৬৩.১৭	১০১.০৫	৬১.৯৩

উপরোক্ত তথ্য সি ডি রেসিওর ক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকের তুলনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের দুর্বল অবস্থানই তুলে ধরছে।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঋণ দাদন : সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক :

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঋণ দাদনে বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকের তুলনামূলক ভূমিকা নিম্নের ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যাবে।[৮] এখানেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির চেয়ে সমবায় ব্যাংক অনেক এগিয়ে :

ব্যাংক	ঋণ দাদন (কোটি টাকায়)	ঋণ দাদন ও আমানতের শতকরা হার
বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৩.১৮	৩৬.২
গ্রামীণ ব্যাংক	১.৭৪	২.৭
বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	৩৬.৭৮	৫৭.৩
কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন সমবায় ব্যাংক	২.৪৩	৩.৮
মোট	৬৪.১৩	১০০

ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ দাদন : সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক :

ক্ষুদ্রশিল্পে সমবায় ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও ১৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৫-৯৬-এর ঋণ দাদনের নীচের তুলনামূলক পরিসংখ্যানও সমবায় ব্যাংকের ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।[৮]

ব্যাংক	ঋণ দাদন (কোটি টাকায়)	ঋণ দাদম ও আমানতের শতকরা হার
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৬.২৯	৩৯.৪
রাজ্য অর্থ নিগম	৩.৩৫	৮.১
গ্রামীণ ব্যাংক	১.৫১	৩.৭
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	২০.১৮	৪৮.৮
মোট	৪১.৩৩	১০০

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার যে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর কতটা নির্ভরশীল। কংগ্রেস আমল থেকে বামফ্রন্ট আমলে শুধুমাত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণই বাড়েনি ; মহাজনদের কবল থেকে গরিব, প্রান্তিক, মাঝারি কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারিদের রক্ষা করার জন্য সমবায়গুলির পরিচালকমণ্ডলী ঋণ দাদন ব্যবসা বাড়িয়েছে ২৩ লক্ষ ৮৪ হাজার থেকে ২০৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকায়।

সার্বজনীন সদস্য ও তাঁদের উন্নয়ন :

১৯৭৭ সালের আগের সমবায় আন্দোলন ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, পাট্টাদার, গরিব, প্রান্তিক কৃষক প্রভৃতি আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণীর উন্নয়নের কথা ভাবেনি। বামফ্রন্ট আসার পরই ১৯৭৭ সালে সার্বজনীন সদস্যগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া

হয়। সেচ এলাকায় ২ $\frac{১}{২}$ একর ও অসেচ এলাকায় ৫ একর জমির মালিক বা ভূমিহীন তাঁরা যে জাতিই হোন না কেন মাসিক আয় ৩০০০ টাকার বেশি না হলেই তাঁরা দুটাকা ভর্তি ফি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিতে সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে সরকার ৫টি শেয়ারের মূল্য ৫০ টাকা দেবেন ও ওই আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন ও সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। বর্ধমান জেলায় এখন সার্বজনীন সদস্য ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০০ জন। এ ছাড়াও ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, পাট্টাদার, প্রান্তিক ও গরিব চাষী সাধারণ সদস্য রয়েছেন অনেক। সমবায় আন্দোলন এতদিন এমনকি আজও এঁদের আর্থিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা নিতে পারেনি—যা সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষ দুর্বলতা। এখন সারা রাজ্যেই ভাবনা-চিন্তা ও এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। মূলত এতদিন জমির মালিকদের (ক্ষুদ্র-প্রান্তিক মালিকসহ) স্বার্থের দিকে নজর রেখেই আন্দোলন এগিয়েছে। যদিও বর্ধমান জেলা এ কাজে আগেই হাত লাগিয়েছে কিন্তু অগ্রগতি সম্ভাবনা অনুরূপ হয়নি। এ পর্যন্ত পশুপালনে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ও বাসন বন্ধকীতে ৮৩টি সমিতি মারফৎ ৬৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও আই আর ডি পিতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলা সমবায় আন্দোলনে এ কাজে এখন সংগঠিত উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায়। এই উদ্দেশ্যে ৪০টি পরিকল্পনা চিহ্নিত করে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ শুরু করেছে ও পুস্তিকা আকারে প্রচার করছে। পরিকল্পনাগুলি মূলত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজ ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর যেমন—উন্নতমানের হাঁস, মুরগি, ছাগল, শূকর, গরু, মোষ, মৌমাছি পালন, উন্নতমানের পাতিলেবু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে প্রভৃতি ফলের চাষ, সব্জি চাষ, ছাতু চাষ, মৎস্য চাষ, ডিম পোনা উৎপাদন, উলবোনা ও সেলাই, বিড়ি, ঠোঙা, নাইলন দড়ি তৈরি, গরুর গাড়ির চাকা ও গাড়ি তৈরি, বাঁশের ঝুড়ি, শোলার কাজ, মাদুর তৈরি, কুটি ভানা, মুড়ি ভাজা, বড়ি তৈরি, সাইকেল রিকশা, সব্জি বিক্রি প্রভৃতি। এর সঙ্গে জেনেটিক চেঞ্জ (জিন পরিবর্তন)-এর বিষয়টিকেও যুক্ত করা হয়েছে। উন্নতমানের পুরুষ শূকর, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির সঙ্গে দেশি স্ত্রী শূকর, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির যৌন সংঘর্ষ ঘটিয়ে উৎপন্ন শংকর জাতের শূকর, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির সাধারণ পশুপালনের ন্যায় পশুপালনের চেষ্টা শুরু হয়েছে—উৎপন্ন মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি বেশি পরিমাণে হচ্ছে—উন্নতমানের পশুপালনের বেশি খরচ ও অন্যান্য অসুবিধা দূর হচ্ছে—চাষীরও লাভ হচ্ছে। উন্নতমানের মুরগির বাচ্চা সরবরাহের জন্য বর্ধমান শহরে

আলোচ্য ৩টি ঐতিহাসিক পর্বে সমিতিগুলির অগ্রগতির তুলনামূলক পর্যালোচনা :

সমিতির রকম	সমিতির সংখ্যা			সদস্য সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)			ঋণ সমেত অর্থে ব্যবসার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		
	১৯৪৭	১৯৭৭	১৯৯৬	১৯৪৭	১৯৭৭	১৯৯৬	১৯৪৭	১৯৭৭	১৯৯৬
কৃষি ঋণদান সমিতি									
সমিতি	৭৮৮	৬০৮	৫৯৭	০.৬৭	২.২৭	৪.৯৫	০.৪২	১২.২১	৮১.২০
বিপণন সমিতি	২	২৩	২৩	০.০৬	০.৪২	০.৪৪	০.১৭	৪.১০	২০.৫০
ভোগ্যপণ্য	—	২৮	২৮	—	০.০৬	০.০৮	—	২.২০	৪.৭০
সরবরাহ সমিতি									
তাঁত সমিতি	৪	১৪৫	১৭৯	০.০০৩	০.১৫	০.২৮	০.০৫	৩.১৮	৩৬.৮০
হিমঘর সমিতি	—	১	১০	—	০.০৫	০.২৬	—	০.৫০	৬.২০
ও অন্যান্য হিমঘর									
চালকল সমিতি	—	২	২	—	০.০৩	০.০৩	—	০.২০	০.৫০
পশুপালন ও দুগ্ধ সমিতি	—	—	৩৯	—	—	০.০৯	—	—	০.৭০
মৎস্য সমিতি	—	৫	১২	—	০.০১	০.০৩	—	০.০২	০.০৮
ক্ষুদ্রশিল্প সমিতি	২	১৩	৭৮	০.০০১	০.০৩	০.০৮	০.০১	০.০৫	০.৪০
কর্মচারী ঋণদান ও শহর ব্যাংক	২৭	১১৪	৬৪৭	০.০৪	০.২৮	১.০৮	০.১২	১.০৬	৪০.২৫
বেকার ইঞ্জিনিয়ার ও লেবার কনট্রাক্ট সমিতি	—	১৭	২৪২	—	০.০২	০.২৫	—	০.৩২	১৭.৪০
আবাসন সমবায়	—	২৮	১৯৮	—	০.০৩	০.০৮	—	—	—
ল্যাম্পস	—	—	৬	—	—	০.০৭	—	—	০.২৫
	৮২৩	৯৮৪	২০৬১	০.৭৭৪	৩.০৫	৭.৭২	০.৭৭	২৩.৮৪	২০৮.৯৮

'এগ্রোটেক' নামে একটি পোল্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সমবায় সমিতি করা হয়েছে। এই সমবায় হ্যাচারি শুধু বর্ধমান জেলাতেই নয়, রাজ্যের বাইরেও তাদের কৃৎ-কৌশল সরবরাহ করছে। এ ছাড়া স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পঞ্চায়েত ও সমবায় যৌথভাবে মুরগির হ্যাচারি তৈরি করেছে ওড়গ্রামে—তার কাজও ভাল। এই এন ও-টির মাধ্যমে মুরগি পালনে উন্নত কৃৎকৌশল প্রয়োগের পঞ্চায়েত ও সমবায়ের যৌথ প্রচেষ্টার সফলতা বিভিন্ন মানুষের প্রশংসা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য 'পশু ও পাখী পালন সমবায়' ও 'ক্ষুদ্রশিল্প সমবায়' রেজিস্ট্রেশনের একটি বিশেষ বাধা সরকারি নিয়ম। এখন এই সমবায়ের রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার মালিক কলকাতায় অবস্থিত ক্ষুদ্রশিল্প ডাইরেক্টরেট ও প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে রাজ্য দুগ্ধ ফেডারেশন। অবিলম্বে জেলায় অবস্থিত জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারকে ও প্রাণী বিকাশ দপ্তরের জেলা আধিকারিককে সমবায় সহ-নিয়ামকের ক্ষমতা দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা না করলে এ বিষয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা কম। সমবায় আইনের মধ্যে থেকেই এ ব্যবস্থা করা সম্ভব।

মহিলা সমবায় :

মহিলাদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে বর্ধমানে ৩টি মহিলা ঋণদান সমিতি ও ৮টি মহিলা শিল্প সমবায় গড়ে উঠেছে। মহিলা ব্যাংকগুলি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৯ ভাগ। দুর্গাপুরের মহিলা শিল্প সমবায়টি ৫৬ জন দুঃস্থ মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। মহিলা সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আজও প্রকট। জেলার সমবায় আন্দোলন এই দুর্বলতাকে কাটানোর উদ্দেশ্যে ব্লকে মহিলা শিল্প সমবায় গড়া ও আরও মহিলা ব্যাংক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

সমবায় শিক্ষা :

রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বর্ধমান জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতায় এখন শিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলার বড়শুলে এই সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র বছরে ৩০০ জনের ষাণ্মাসিক কোর্সে শিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়াও বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা নেয়। গত বছর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক "ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনায়" জন্য ৬০ জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। শিল্প বাণিজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে পেশাদারি পরিচালন-দক্ষতার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। সমবায়ের পক্ষে ব্যক্তি পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতার চড়া মূল্য পেশাদারি-দক্ষতা কেনা সম্ভব নয়। সমবায় শিক্ষণকে সেইজন্য শক্তিশালী ও আধুনিক করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সমবায়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

সমবায়ে গণতন্ত্র :

সমবায়ের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমবায় পরিচালনার ওপর। নিয়মিত সাধারণ সভা ও নির্বাচন করে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সবধরনের সমবায় সমিতিগুলি সমবায়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রেখেছে ও সদস্যদের সমবায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকে কায়েমী স্বার্থবাজ পরিচালকমণ্ডলী ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ১০ বছর কোনও নির্বাচন করেনি। ১৯৮৫ সালে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে পরিচালকমণ্ডলীতে আসার পর প্রতি বছর সাধারণ সভা ও নির্বাচন হয়। ২টি থানা বিপণন সমিতি ছাড়া সবকটি কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্বাচিত বোর্ড রয়েছে। প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিতে নির্বাচিত বোর্ড রয়েছে শতকরা ৮১.৬৩ ভাগ সমিতিতে—প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি ছাড়া বাকি সমিতিগুলিতে নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী রয়েছে শতকরা ৯৮ ভাগ সমিতিতে। দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক যাতে সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের আগে বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এলাকায় এলাকায় সান্ধ্য বৈঠক করে, বর্ধিত সভা ডেকে সদস্যদের সমিতি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিয়ে সমিতিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে যা সমিতিগুলির উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে।

সমাজ ও সমবায় :

সমবায় শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়—সামাজিক প্রতিষ্ঠানও। আর্থিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রেও সমবায় পঞ্চায়েতের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। দুর্বলতর শ্রেণীর আর্থিক বিকাশে জেলা সমবায় আন্দোলন যেমন ভূমিকা পালন করেছে তেমনই তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই-এর জন্য পঞ্চায়েতের সহায়তায় বিনা লাভে বাসস্থান তৈরির জন্য ঋণদান করেছে। প্রথম পর্যায়ে ৪০০টি গৃহের মধ্যে ৩৮৮টি তৈরি করেছে ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫০০ গৃহের মধ্যে ২০০টি তৈরি করেছে ও বাকিগুলির কাজ চলছে। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য ২১.০৩ লক্ষ টাকার তহবিল এর মধ্যেই তৈরি করেছে ও প্রতি বছর লাভের শতকরা ২ ভাগ এই তহবিলে জমা করছে। দুর্গতদের পাশেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে ও করছে সমবায় আন্দোলন। জেলার সমবায়গুলি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। সাক্ষরতা আন্দোলনে শুধুমাত্র অংশগ্রহণই করেনি, অনুদান দিয়েছে ২ লক্ষ-৩৪ হাজার টাকা। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ছাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দান করেছে ৫০ হাজার টাকা। শিশুউদ্যান তৈরিতে ব্যয় করেছে ২৫ হাজার টাকা। কুষ্ঠর মতো ভয়াবহ ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত ও রক্ষা করায় সংগ্রামকে শক্তিশালী

করার জন্য ১০ হাজার টাকার অনুদান দিয়ে কুষ্ঠ রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে সমবায় আন্দোলন। রক্তদান শিবির সংগঠিত করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে জেলার সমবায় আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রে তার সাধ্যমত ভূমিকা পালন করে চলেছে যা সমবায় আন্দোলনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটায়।

আন্দোলনের দুর্বলতা ও প্রতিকার :

আন্দোলনের সবলতার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতার দিকগুলির আলোচনা না করলে জেলার সমবায় আন্দোলনের পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দুটি প্রধান দুর্বলতার বিষয়, সার্বজনীন সদস্য ও ভূমিহীন কৃষক ও অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণীর আর্থিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও মহিলা সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার দুর্বলতা ও তার প্রতিকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আগেই আলোচনা হয়েছে। সমবায়কে প্রতিটি পরিবারের দরজায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দুর্বলতা রয়ে গেছে। জেলার গ্রামীণ এলাকায় শতকরা ১০০টি পরিবারের মধ্যে আমরা সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছি ৫৬.৮ ভাগ পরিবার থেকে প্রতি পরিবারে একজন করে সদস্য করে। আমানত সংগ্রহের বৃদ্ধির শতকরা হার ২২.১৬ হলেও সমবায়সহ সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত যেখানে ২২২১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, সেখানে সমবায় ব্যাংকের আমানত ১৬৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা যা মোট সংগৃহীত আমানতের মাত্র শতকরা ৭ $\frac{১}{২}$ ভাগ যদিও মোট আমানতের শতকরা ২৬.২ ভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি জেলায় বিনিয়োগ করে যেখানে সমবায় ব্যাংকের বিনিয়োগ শতকরা ৬১.৯৩ ভাগ। যদি সমবায় সমিতিগুলির ৭ কোটি ৭২ লক্ষ সদস্য মাত্র ৫০০ টাকা করে সমবায় সমিতিগুলিতে আমানত রাখে তাহলে সমবায় সমিতিগুলির আমানত দাঁড়ায় ৩৮৬ কোটি টাকায়। সমবায় আন্দোলন উপরের দুটি বিষয়ে দুর্বলতা কাটানোর জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু করলেও আশানুরূপ সফলতা পাবে না যদি না অন্যান্য গণ-আন্দোলন এই উদ্যোগের পাশে দাঁড়ায়। শিল্প সংস্থাপনে ও শিক্ষা প্রসারে সমবায় আন্দোলন আজও দুর্বল যদিও তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন পরিকল্পনা করে এই দুর্বলতা কাটানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় আগামী ১৯৯৬-৯৭ সালে শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য জেলায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে জেলায় কোনও কোনও শিল্পের সম্ভাবনা আছে সেই সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সমবায় আন্দোলনের দুর্বলতম স্থানগুলির অন্যতম হচ্ছে বিপণন ব্যবস্থা। বিপণন সমবায় সমিতিগুলির অন্যতম লক্ষ্য প্রাথমিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ও চাষীর উৎপন্ন ফসলের বিক্রির ব্যবস্থা করা। বিপণন সমিতিগুলি আজ পথভ্রষ্ট হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক অভাব, অতিরিক্ত কর্মচারি, শীর্ষ সমবায় সমিতি (বেনফেড)-এর সঠিক ভূমিকা পালন না এর অন্যতম কারণ। সরকারের সমবায় দপ্তরের এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া জরুরি। জেলার সমবায় আন্দোলনের আর একটি দুর্বল স্থান শহর ঋণদান সমবায় আন্দোলন। বর্ধমান জেলায় ৯টি পৌরসভা, একটি পৌর কর্পোরেশন ও একটি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি থাকা সত্ত্বেও মাত্র আসানসোল কর্পোরেশনে ও কালনা শহরে সমবায় ব্যাংক আছে। এই পৌরসভাগুলিতে শহর সমবায় ব্যাংক তৈরি করে বেকার যুবক ও শহরে গরিবদের পাশে দাঁড়াতে পারে সমবায় আন্দোলন।

সম্ভাবনা :

দামোদর-অজয়-গঙ্গা দিয়ে ঘেরা বর্ধমান জেলার একদিকে রয়েছে বিশাল কৃষি অঞ্চল—অন্যদিকে বিশাল শিল্পাঞ্চল—রয়েছে বনভূমি। ফলে বর্ধমান জেলায় সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির সম্ভাবনা প্রচুর যদি বিশাল জনশক্তি, জলসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু সঠিক নেতৃত্ব, শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির সুষম ব্যবহার, ঋণদাদনের সঙ্গে উন্নত কৃৎকৌশলের সুসামঞ্জস্য প্রয়োগ, বিপণন ব্যবস্থা থেকে উন্নয়নের কাজ শুরু করা অর্থাৎ বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমবায়ের কাজের বহুমুখীকরণ, সমবায়কে দুর্বলতর শ্রেণীর কাছে পৌঁছে দেওয়া, সর্বোপরি গণসদস্য করে সমবায় আন্দোলনে সেই সদস্যদের অংশগ্রহণ করিয়ে, তাঁদের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যকরীকরণ করে, 'সমবায় সমিতি আমার সমিতি' এই উপলব্ধি সৃষ্টি না করা যায় তাহলে সমবায় আন্দোলনের ঈপ্সিত অগ্রগতি হওয়া কঠিন।

তথ্যসূত্র :

১। বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন (প্রথম অংশ)—সুগত বসু, পৃষ্ঠা-৩১।
২। ভারতের কৃষি অর্থনীতি—অশোক রুদ্র, পৃষ্ঠা-১২৮।
৩। বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের প্রথম সভার কার্যবিবরণী।
৪। ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ১৮ মে ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১১৮৭।
৫। স্মারক পত্রিকা: দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড—হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪২।
৬। বর্ধমান জেলার সমবায় আন্দোলনের বর্তমান রূপ ও তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা—অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য—নতুন চিঠি, ১২-১১-৯৪ বিশেষ ক্রোড়পত্র: সমবায় সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃষ্ঠা-৪।
৭। ঐ।
৮। ৩-৭-৯৬-এর বর্ধমান ডি এল সি সি-এর রিভিউ কমিটির সভায় লিড্ ব্যাংকের পেশ করা তথ্য।
৯। স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান—নাবার্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট স্ট্রাকচার, পশ্চিমবঙ্গ, ৯২-৯৩ থেকে ৯৬-৯৭।

বর্ধমান জেলায় মৎস্যচাষের অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা

কল্যাণ ঘোষ

গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশে 'মৎস্যচাষের' ভূমিকা এখন আর উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের প্রথম চারটি পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালেও (১৯৭৪ পর্যন্ত) পরিকল্পনা প্রণেতারা এই গুরুত্ব অনুধাবনে হয় ব্যর্থ হয়েছেন অথবা একে আদৌ কোনও আমল দেননি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক যোজনা থেকে মৎস্য চাষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে—কিন্তু ততদিনে বিভিন্ন কারণে জলসম্পদের ব্যাপক অবলুপ্তি ঘটে গেছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন ও কৃষি জমির চাহিদা মেটাতে জলাভূমিতে টান পড়েছে—এর উপর রয়েছে স্বাভাবিক ভূমিক্ষয়। একবার নজর বুলিয়ে নেওয়া যাক বর্ধমান জেলার বর্তমান জলসম্পদের উপর :

চাষযোগ্য জলাশয়	:	২০,৬১৯ হেক্টর
অর্ধপতিত ,,	:	৭,৩৮৬ ,,
পতিত ,,	:	৩,১৮৯ ,,
বিল/বাওড়	:	১,৯৪০ ,,
নদী/খাল	:	১৭,৩০৮ ,,

আগেই উল্লেখ করেছি যে 'প্রকৃত মৎস্যচাষ' শুরু হয়েছে অনেক দেরিতে। গতানুগতিক ধারার বাইরে মাছ চাষের প্রথম নজর কাড়া অগ্রগতি ঘটে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। 'নিবিড় মৎস্যচাষ' পদ্ধতি একটা রূপালী বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হল ওই সময় থেকে। আমাদের দেশি

জাত মাছ রুই, কাতলা, মৃগেলের সঙ্গে চীন দেশের মাছ সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও কমন কাপ একত্রে চাষ করে উৎপাদন রাতারাতি দ্বিগুণ করা সম্ভব হল। মৎস্যচাষীদের আগ্রহকে কাজে লাগাতে পঞ্চম পরিকল্পনা কালের শেষদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'মৎস্যচাষ'কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শুরুতেই বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা নিয়ে অন্যান্য জেলার সঙ্গে বর্ধমানেও তৈরি হয় 'মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা'—তার থেকেই সম্ভব হল মৎস্য উৎপাদনের ব্যাপক উন্নতি। গত দেড় দশকের অগ্রগতির কিছু নিদর্শন তুলে ধরছি:

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য প্রাথমিক মূল উপাদান হচ্ছে উন্নত জাতের মৎস্যবীজ। গঙ্গানদীতে মৎস্যবীজের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস চলছিল। আটের দশকের প্রথম দিকেই এই প্রয়াস সফল হল।

মৎস্য দপ্তরের অনুদান মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগ-ক্ষেত্রে জেলায় প্রায় এক কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১৬টি 'ইকো হ্যাচারি' তৈরি হল। এছাড়াও 'রাজ্য মৎস্যবীজ উন্নয়ন নিগম' ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আউসগ্রাম-২নং ব্লকে তৈরি করলেন দেশের বৃহত্তম 'ইকো হ্যাচারি'। বর্তমানে আমাদের জেলার ৩০টি 'ইকো হ্যাচারি' থেকে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি মৎস্যবীজ উৎপাদিত হচ্ছে। কেবলমাত্র মৎস্যবীজ উৎপাদন ও বিপণন মারফত বিপুল সংখ্যক উৎপাদক ও মৎস্যজীবী জীবিকার পাথেয় খুঁজে পেয়েছেন। জেলার চাহিদা মিটিয়েও আমাদের জেলা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে মৎস্যবীজের চাহিদা অনেকটাই মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

'মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থার' মাধ্যমে বর্ধমান জেলার ১০ হাজার হেক্টর জলাশয়কে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই মোট ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ ও অনুদান হিসাবে মৎস্যচাষীদের সংস্থান করা হয়েছে। বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয় যার সিংহভাগই 'মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা'র' আওতাভুক্ত প্রশিক্ষিত চাষীদের উৎপাদিত ফসল। দেড়-দশক সময়ের মধ্যে এই সাফল্যলাভ অভূতপূর্ব না হলেও যথেষ্টই উল্লেখনীয়।

সাম্প্রতিককালে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রকল্প, সুসংহত (ইন্টিগ্রেটেড) মৎস্যচাষ প্রকল্প আদিবাসী কল্যাণে বিশেষ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমেও জেলায় মৎস্যচাষের প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বর্ধমান জেলায় ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিয়াল্লিশটি জলাশয়কে সংস্কার করে সহস্রাধিক আদিবাসী মৎস্যচাষীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। উক্ত পরিবারগুলি নিয়মিত মাছচাষে নিয়োজিত রয়েছেন এবং উল্লেখযোগ্যভাবে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আট-এর দশকে গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে আমাদের জেলায় মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে ৩৬.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৩ হেক্টর পতিত জলাভূমি সংস্কার সাধন করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই জলাশয়গুলিতে বর্তমানে বছরে গড়ে হেক্টর প্রতি ২ টন হিসাবে মাছ উৎপাদিত হচ্ছে।

বর্ধমান জেলায় ১ লক্ষেরও বেশি মৎস্যজীবী রয়েছেন যাঁদের মধ্যে বৃহত্তম অংশই নদীতে বা অনুরূপ বহতা জলাশয়ে মাছ ধরে জীবনযাপন করেন। নদী দূষণ ও বিভিন্ন কারণে নদীতে মাছের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গা ও দামোদরকে আবার মৎস্যসমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে 'মৎস্যসঞ্চার প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। আমাদের দেশে এটি একটি অভিনব প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ উন্নত জাতের চারাপোনা গঙ্গা ও দামোদরে ছাড়া হয়েছে। আশার কথা, গঙ্গানদীতে আবার যথেষ্ট পরিমাণে ডিমপোনা উৎপাদিত হচ্ছে এবং মাছের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—উপকৃত হচ্ছেন গরিব মৎস্যজীবীরা।

বর্ধমান জেলায় ২৯টি সক্রিয় 'মৎস্যজীবী প্রাথমিক সমবায় সমিতি' রয়েছে যার মধ্যে ২১টি সমিতির সদস্যরা নদী বা অন্যান্য বহতা জলাশয়ে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করেন এবং ৮টি সমবায় সমিতির হাতে চাষযোগ্য জলা রয়েছে। এই সমস্ত সমবায় সমিতিগুলিকে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য জলাশয় সৃষ্টি করে অর্পণ করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। গত এক দশকে জেলার ৪টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি মিলনগৃহ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' প্রকল্পে ৩২.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৫০টি আবাসগৃহ নির্মাণ করে সমসংখ্যক মৎস্যজীবী পরিবারকে অর্পণ করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকার মৎস্যজীবী পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোরাম রাস্তা, কালভার্ট ও সেতু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি জেলা শহরে অবস্থিত 'কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যানে' ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে একটি বৃহদায়তন মীনাধার (Aquarium)। 'জলাভূমির সংরক্ষণ' মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা তথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত করতে গত এক দশক ধরে আমরা সারা রাজ্যের সঙ্গে এ জেলাতেও সেমিনার, সভা ইত্যাদির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার রেখে চলেছি। সঙ্গে সঙ্গে 'ইনল্যান্ড ফিসারিজ অ্যাক্ট'-এর প্রয়োগ মাধ্যমে চাষযোগ্য অব্যবহৃত জলাভূমির 'পরিচালন' ব্যবস্থা দপ্তরের হাতে তুলে নেওয়ার ফলে জলাভূমিকে পতিত রাখার প্রবণতাও অনেকাংশে খর্ব করা সম্ভব হয়েছে। সকল অংশের মানুষ এই প্রয়াসে সামিল হওয়ার ফলে জলসম্পদ বিনাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে।

১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছর থেকে 'সমাজের প্রতি অবদানের' স্বীকৃতি হিসাবে অক্ষম বৃদ্ধ মৎস্যজীবীদের বার্ধক্য ভাতা প্রদানের প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। প্রতি বছর জেলার ১০০ জন নির্বাচিত

মৎস্যজীবীকে মাসিক ১০০ (একশত) টাকা হিসাবে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

মাছ ধরার কাজে পেশাগত বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে নিহত মৎস্যজীবীদের পরিবারের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের জেলায় সব কটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের 'মৎস্যজীবী জীবনবীমা প্রকল্প'-এর আওতায় আনা হয়েছে। বীমার প্রয়োজনীয় প্রিমিয়ামের প্রদেয় সমস্ত অর্থই মৎস্য দপ্তরই বহন করেন। সাম্প্রতিককালে দুর্ঘটনায় নিহত অনুরূপ কয়েকটি অসহায় পরিবারের হাতে আমরা ১.৬৫ লক্ষ টাকা অর্পণ করেছি।

জেলার মৎস্যজীবী মহিলাদের জাল-বোনার কাজে পারদর্শী করে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই এই জেলায় ৫০০ মহিলা মৎস্যজীবীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এর জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা ইত্যাদি বাবদ ২.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আটের দশকের প্রথম থেকেই আমরা মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করি। মৎস্য দপ্তরের প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি মৎস্যচাষীকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া আবশ্যিক করা হয় আটের দশকের গোড়া থেকেই। গত দেড় দশকে ব্লক, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে জেলার ১৫,০০০ এরও বেশি মৎস্যচাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ও এ বাবদ ৪০.৬৫ লক্ষ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য জেলা সদরে ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৯০ সালে 'প্রশাসনিক ভবন তথা জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত প্রশিক্ষিত চাষী অর্থকরীভাবে মাছ চাষে নিয়োজিত রয়েছেন।

বর্তমানে আমাদের জেলার জন্য প্রয়োজন বছরে ৬০ হাজার টন মাছ। আমরা উৎপাদন করছি ৫০ হাজার টন। অর্থাৎ ঘাটতি রয়ে গেছে ১০ হাজার টনের। এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে নবম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় বর্ধমান জেলায় অতিরিক্ত ১ হাজার হেক্টর জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার উত্তরাংশের কয়লাখনি অঞ্চলে পরিত্যক্ত 'খোলা মুখ' খনিতে (ওপেন কাস্ট মাইন্স্) ৫০০ হেক্টর জলাভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত করে উক্ত জলাভূমিগুলিকে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি অথবা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মাধ্যমে 'গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি' ভুক্ত করে অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর পতিত/অর্ধপতিত জলাভূমির সংস্কার সাধন করে কৃষি সেচের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য চাষেরও ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে যথা— আউসগ্রাম ১নং ও ২নং, কাঁকসা, ভাতার (একাংশ)-এ বহুসংখ্যক ছোট ছোট ডোবা রয়েছে যেগুলিতে বছরে ৫-৬ মাসের বেশি জল থাকে না। অনুরূপ ৫০টি পুকুরে ১৯৯৫-'৯৬ সালে 'আফ্রিকান জাত মাগুরের' চাষ করে অত্যন্ত আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। নবম পরিকল্পনায় প্রতি বছর অনুরূপ ৫০০টি করে ডোবায় মাগুর চাষের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এর ফলে একদিকে দরিদ্র তফসিলি জাতি/উপজাতির মানুষ যেমন উপকৃত হবেন অন্যদিকে জেলায় মাছের উৎপাদনও প্রায় ৩০ টন করে বাড়বে।

মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নবম পরিকল্পনাকালে জেলার বহতা জলায় যথা খাল, নদী—যেখানে বারো মাস জল থাকে—'পেন' (pen) ও খাঁচায় (cage) মাছ চাষের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এতেও বহুসংখ্যক মানুষের রুজি-রোজগারের সংস্থান হবে।

দপ্তরের কার্যক্রমের ব্যাপ্ত পরিধির কথা মাথায় রেখে নবম যোজনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে জেলা সদরে ১০ মেট্রিক টনের একটি বরফ কল, যমুনাদিঘিতে একটি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি, ওড়গ্রামে মিনি ফিড প্ল্যান্ট ও খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের প্রতিপালন খামার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য আনুমানিক ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। বিভাগীয় প্রকল্প ও জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের সংস্থান রাখা হয়েছে।

সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি কিছু সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। গত ২ বছর ধরে জেলার সেচসেবিত এলাকার বাইরেও জেলার কৃষিজীবীরা রবিখন্দে বোরো ধানের চাষ করছেন। এই চাষ করতে গিয়ে সেচের জলের জন্যেও প্রথমেই হাত পড়ছে এলাকার পুকুরগুলিতে। এর ফলে ফেব্রুয়ারি-মার্চে যখন মাছের বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট সময়—বহু মাছ চাষের পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মাছ চাষী এবং ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। রবিখন্দে ফসল বিন্যাসে (Crop Pattern) পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান না করা গেলে আগামী দিনে জেলার একটা বড় অংশে মৎস্য চাষ গভীরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। আশার কথা, জেলার পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে এ সমস্যার বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট মানুষদের ইতিমধ্যেই অবহিত করতে পেরেছি।

বর্ধমান জেলায় আমাদের দপ্তরের সমস্ত কর্মকাণ্ডই সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সার্বিক সহায়তায় রূপায়িত হয়। সর্বস্তরের পঞ্চায়েতের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে গত দেড় দশকে বর্ধমান জেলায় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে ও মৎস্যজীবীদের কল্যাণে সরকার-প্রদত্ত মঞ্জুরীকৃত অর্থ ১০০ শতাংশই ব্যয়িত হয়েছে এবং দপ্তরের কাজকর্ম জনসমাদৃত হয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে আগামী ৫ বছরে এই জেলাকে মৎস্য-উৎপাদনে উদ্বৃত্ত করে তোলার রূপালী সম্ভাবনা সফল করে তোলা সম্ভব হবে।

বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

ক্ষুদ্র পত্রিকা ক্ষুদ্র পুঁজির পত্রিকা। বোধহয় এইভাবেই তার প্রাথমিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা সঙ্গত। সংবাদ কিংবা সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান তথা সংস্কৃতির যে কোনও শাখা বা ধারাকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্র পুঁজির ক্ষুদ্র উদ্যোগে ক্ষুদ্র পত্রিকার জন্ম হয়। উদ্যোগী যেখানে মূলত এক ব্যক্তি, সেখানে তিনিই লেখেন বা লেখা সংগ্রহ করেন, তিনিই সম্পাদক-প্রকাশক-মুদ্রক-স্বত্বাধিকারী সব কিছুই। তিনিই আবার অনেক ক্ষেত্রে ছাপাখানারও মালিক। পত্রিকা ও প্রেস একে অপরের ক্ষতি পূরণ করে। পত্রিকাতে তাঁরই মানসিকতা প্রতিফলিত হয়, তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার পরিসীমার মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত উদ্যোগের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কোনও গোষ্ঠীর বিশেষ চিন্তা, মনন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তা বহন করে। বৃহৎ পত্রিকাগুলির পিছনে রয়েছে বৃহৎ পুঁজির বৃহৎ সংগঠিত উদ্যোগ। প্রাতিষ্ঠানিকরূপে সেগুলি সমাজের উপর সংস্থাপিত। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকার পিছনে নানা ব্যক্তি ও ছোট ছোট গোষ্ঠীর যে অজস্র উদ্যোগ, তা যেন সমাজের ভিতর থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় সমাজের বহু বিচিত্র রূপ ও তার অ-প্রাতিষ্ঠানিক মনন-বৈচিত্র্যকেই প্রতিবিম্বিত করে।

ক্ষুদ্র পুঁজির পত্রিকা বলেই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রযুক্তি আদিম, পরিকাঠামো দরিদ্র, সংগঠন দুর্বল, বিপণন অব্যবস্থিত, প্রচার অতি সীমিত। বিনিময় যখন আছে তখন বাণিজ্যও আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশের পিছনে বাণিজ্যিক তাড়না থেকে অন্তর্তাড়নাই প্রবল। বাণিজ্য সাধারণত অস্তিত্ব রক্ষার উপায়, অস্তিত্বের লক্ষ্য নয়। বৃহৎ পত্র-পত্রিকার সম্ভার পণ্যের সম্ভার, পাঠক তাদের কাছে ভোক্তা, স্থিতাবস্থা রক্ষা ও আপন প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থরক্ষাই তাদের মূল লক্ষ্য, মুনাফা তাদের উপাস্য দেবতা; কর্মিবাহিনীকে কার্যত পুঁজির দাসত্বে আবদ্ধ করে পত্রিকার স্বাধীনতার নামে একমাত্র তাদের মালিকরাই স্বাধীন, নিরপেক্ষতার অমায়িক ভণিতাকে আশ্রয় করে ও তথ্যের অপরিমেয় শক্তিকে হাতিয়ার করে মানুষের চেতনাকে স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পুঁজির দাসত্ব নেই, বৃহৎ মুনাফা অর্জনের তাড়না নেই, কোনও কায়েমি স্বার্থের সেবায় বাধ্যবাধকতা নেই, স্বাধীনতা তার কাছে অনেক বেশি বাস্তব, তার লেখকদের কেবল বাঁচার জন্যই লিখতে হয় না বলে লেখারই জন্য বাঁচার সুযোগ আছে, পক্ষপাতিত্ব তার অস্তিত্বের শর্ত বলে নিরপেক্ষতার মুখোশে তার প্রয়োজন নেই। বৃহৎ পত্র-পত্রিকার আঙিনার মধ্যে গিয়ে তাদেরই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তার নিজের ক্ষেত্রটি আলাদা, প্রেক্ষিত ভিন্নতর। বৃহৎ পত্রিকার অবস্থান সমাজের উপরে, সমাজের গভীরে তার কোনও শিকড় নেই। মফস্বল শহরে বা গ্রামে তার বেতনভুক সাংবাদিক হয়তো থাকেন, কিন্তু সেই সাংবাদিকের দায়বদ্ধতা সমাজের কাছে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর পত্রিকার কর্তার কাছে। কর্তারা যেমন খবর বা যেমন লেখা চান, তেমন খবরই তিনি করেন, তেমন লেখাই লেখেন—সে অভিজ্ঞতার ভিতরেই হোক বা স্বকপোলকল্পিতই হোক। লেখাটাও সেখানে পণ্যের বেশি কিছু নয়। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র পত্রিকার শিকড় থাকে সমাজের গভীরে, মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি তার অবস্থান। ক্ষুদ্র পত্রিকার সুবৃহৎ আঙিনা বিস্তৃত হয়ে আছে সমাজের তৃণমূলে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন ও জীবন-সংগ্রামের মাঝখানে। সেখান থেকেই তার উদ্ভব, সেখানেই তার অবস্থান, সেখানকার বার্তারই সে বাহক। সমাজের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা, তার বিবর্তন-রূপান্তর, অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অজস্র ঘটনা প্রতিনিয়ত তাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত, সেগুলি তারা তুলে ধরতে পারে। চিন্তা ও মনন, শিল্প ও সাহিত্যের যে বিপুল ঐশ্বর্য খনিগর্ভে আবদ্ধ সম্পদের মতো লোকচক্ষুর অগোচরে পড়ে আছে, তাকে তুলে এনে বৃহত্তর সমাজক্ষেত্র ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে পারে, সংস্কৃতির জগৎকে সমৃদ্ধ করে তার উপর মুষ্টিমেয়ের আড়ৎদারিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। জনগণের ইচ্ছার সঠিক প্রতিফলন ঘটিয়ে, তাদের মধ্যেকার অবাঞ্ছনীয় মানসিকতাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে, বাঞ্ছিত মানসিকতা এবং প্রকৃত মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখে, সেই মূল্যবোধের নিরিখে প্রয়োজনে প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক মানুষের স্বার্থে সমাজ পরিবর্তনের অগ্রপথিক হওয়া ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার পক্ষেই সবচেয়ে বেশি সম্ভব। সেই সঙ্গে বৃহৎ পত্র-পত্রিকাগুলির দ্বারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত অসত্য, অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য বা তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, জনগণের বন্ধু, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক এবং জনমত সংগঠক হিসাবে তারাই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিপুল তরঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতা হয়তো তাদের নেই, কিন্তু অজস্র ছোট ছোট তরঙ্গ দিয়ে যে বিপুল তরঙ্গমালা তারা সৃষ্টি করতে পারে, তার সামগ্রিক অভিঘাত মোটেই ছোট নয়। সমাজের যে মাইক্রোস্তরে তাদের স্বরাজ্য, সেখানেই তারা স্বরাট হতে পারে। কোনও বৃহৎ পত্রিকার পক্ষেই সেখানে নেমে এসে সাধারণ মানুষের জীবনের শরিক হওয়া সম্ভব নয়।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বৃহৎ পত্র-পত্রিকার কোনও সদর্থক ভূমিকা নেই, তাদের কাছে শিক্ষণীয় কিছু নেই। এর অর্থ এও নয় যে, ক্ষুদ্র পত্রিকামাত্রই সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং বাণিজ্যলোভহীন নৈতিকতার প্রতিমূর্তি। বৃহৎ পত্র-পত্রিকাগুলিকেও ন্যূনতম কিছু আচরণবিধি ও মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় কখনই তারা দেয় না তা নয়, যদিও বাণিজ্য-স্বার্থকে বিপন্ন করে নয়। তাদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার ফলে অনেক তথ্য, উচ্চমানের লেখা ও বিশ্লেষণে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি। তাদের পেশাদারি দক্ষতার বহু কিছুই তো শিক্ষণীয় ও অনুশীলনযোগ্য। অনেক ক্ষুদ্র পত্রিকারই অঙ্গে অঙ্গে পেশাদারি দক্ষতা ও নান্দনিকবোধের অভাব এবং রুচিহীনতা ও অযোগ্য সম্পাদনার ছাপ এমনই প্রকট যে তাদের পাঠক হবার কল্পনা করাও কষ্ট। কেউ কেউ আবার মানসিকতার ক্ষুদ্রত্বে নিজের আকারকেও লজ্জা দেয়। এমন পত্রিকাও আছে যারা হলুদ সাংবাদিকতাকে পণ্য করে বাজার মাতাতে চায়। বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা আদায়ের জন্য প্রচারসংখ্যা নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে ও মূল্যবোধের সঙ্গে যে কোনও আপসে প্রস্তুত থাকে। পত্রিকাকে ধনার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে এমনকি ব্ল্যাকমেইলিংয়ের সাহায্যে নজরানা আদায় করতেও কুণ্ঠিত হয় না। বৃহৎ পত্রিকাগুলির কোনও কোনও স্থানীয় সাংবাদিকের সঙ্গে বর্ধমানের স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকার প্রতিনিধিরাও থানা থেকে নিয়মিত মাসিক ভাতা নিয়ে থাকেন—এমন অভিযোগও সম্প্রতি উঠেছে, যার মধ্যে সত্যতা কিছু আছে বলেই মনে হয়। ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে এইসব নানারকমের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা আছে। তেমনই বৃহত্ত্বও আছে, যা অনেক বৃহৎ পত্রিকাকেও ক্ষুদ্র করে দেয়। এইসব ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিয়েই পত্রিকা। বৃহত্ত্বের জন্য গর্ব করা অবশ্যই চলে, কিন্তু ক্ষুদ্রত্ব জয়ের জন্য যা

আবশ্যক তা হল এক বৃহৎ দিগন্ত এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দিগন্তাভিসার। সেইখানেই ক্ষুদ্র পত্রিকার অস্তিত্বের সার্থকতা। বলতে দ্বিধা নেই, অনেক সংবাদপত্রের তুলনায় ক্ষুদ্রতর জীবন সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্কৃতি-বিষয়ক সাময়িকীগুলিই ক্ষুদ্র পত্রিকার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণে অনেক বেশি সার্থক—'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' অভিধাটি মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠেছে মূলত তাদেরই অবদানে। আর ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির যে শ্রেষ্ঠত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে, সে ঐতিহ্য খুব কম সংবাদপত্রই ধরে রাখতে পারছে, বিশেষত এই বাজার-দেবতার উপাসনার কালে।

❒

এই পূর্বালোচনার আলোকে বর্ধমান জেলা থেকে এতাবৎকাল প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার একটি কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

বর্ধমান জেলা থেকে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা হিসাবে 'সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' (১৮৪৯)-র উল্লেখ করা যায়। ওই বছরই প্রকাশিত হয় 'বর্ধমান চন্দ্রোদয়' নামে অপর একটি সাপ্তাহিক। উনবিংশ শতাব্দীর বাকি ৫০ বছরে প্রকাশিত আরও ১১টি পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। মোট ১৩টির মধ্যে ৬টি মাসিক, ৭টি সাপ্তাহিক *(সারণি-১ দ্রষ্টব্য)*। এগুলির মধ্যে ১৮৯৭ (মতান্তরে ১৮৯৬) সালে কালনা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'পল্লীবাসী' শতবর্ষ পূর্ণ করে জীবিত প্রাচীনতম পত্রিকা হিসাবে এখনও টিকে আছে—আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত জেনারেশন গ্যাপ নিয়েই টিকে আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, অর্থাৎ মূলত জাতীয় আন্দোলনের কালে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে ৩১টির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ১৫টি সাপ্তাহিক, ১টি দ্বিসাপ্তাহিক, ৬টি মাসিক, বাকি ৯টির পর্যাবৃত্তি স্পষ্ট নয়। *(সারণি—২, দ্রষ্টব্য)*। 'সাম্য', 'সংবাদ', 'ছাত্র' পত্রিকাগুলির চরিত্র ছিল বামপন্থী।

সারণি - ১
উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাল	পত্রিকা
১৮৪৯ —	সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী (সাপ্তাহিক) বর্ধমান চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক)
১৮৫০ —	সংবাদ বর্ধমান (সাপ্তাহিক) (বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায়)
১৮৬৬ —	বর্ধমান মাসিক পত্রিকা
১৮৭০ —	প্রচারিকা (মাসিক, পরে পাক্ষিক ও ১৮৭৪-এ সাপ্তাহিক)
১৮৭৬ —	ভারতভাতি (মাসিক) দিবাকর (মাসিক) বিশ্বসুহৃৎ (সাপ্তাহিক)
১৮৭৭ —	জ্ঞানদীপিকা (মাসিক) আর্যপ্রতিভা (মাসিক)
১৮৭৮ —	কালনা প্রকাশ (সাপ্তাহিক) বর্ধমান সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক) (ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র)
১৮৯৭ —	পল্লীবাসী (সাপ্তাহিক) (পত্রিকার উত্তরাধিকারীদের মতে ১৮৯৬, সম্প্রতি শতবর্ষ পালিত)

॥ মোট ১৩টি ॥

সারণি - ২
বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাল	পত্রিকা
১৯০০ —	কালিকাপুর গেজেট (মাসিক) তরুণ (দ্বিসাপ্তাহিক)
১৯০৩ —	প্রসূন (কাটোয়া থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা)
১৯০৯-১০—	রত্নাকর
১৯১৯ —	নবারুণ (মাসিক)
১৯২২ —	বর্ধমান (সাপ্তাহিক)
১৯২৩ —	শক্তি (সাপ্তাহিক)
১৯২৪-২৫—	আসানসোল সমাচার (এই অঞ্চলের প্রথম পত্রিকা)
১৯২৭ —	বর্ধমান বাণী (সাপ্তাহিক) ভীমরুল (সাপ্তাহিক)
১৯৩১ —	আসানসোল হিতৈষী (সাপ্তাহিক)
১৯৩২ —	সাম্য (সাপ্তাহিক)
১৯৩৪ —	দেশপ্রিয় (সাপ্তাহিক) শান্তিজল (মাসিক)
১৯৩৬ —	সংবাদ (সাপ্তাহিক) দামোদর (সাপ্তাহিক)
১৯৩৮ —	বর্ধমানবার্তা (সাপ্তাহিক)
১৯৩৯ —	ছাত্র (মাসিক)
১৯৪০ —	পল্লীর কথা (সাপ্তাহিক)
১৯৪১ —	শ্রী (মাসিক)
১৯৪৪ —	দৃষ্টি (সাপ্তাহিক)
১৯৪৬ —	আর্য্যপত্রিকা (সাপ্তাহিক)
১৯৪৮ —	বর্ধমান (সাপ্তাহিক)
১৯৪৯ —	বর্ধমানের ডাক (সাপ্তাহিক)

এ ছাড়াও উপায় (মাসিক), আজান, বিদ্রোহী, অভিযাত্রী, চাবুক, অভিযান ও যুগশঙ্খ নামক কয়েকটি পত্রিকারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

॥ মোট ৩১টি ॥

প্রথম দুটির সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে সরোজ মুখোপাধ্যায় ও ভুজঙ্গভূষণ সেন, আর 'ছাত্র' পত্রিকাটি ছিল জেলা ছাত্র ফেডারেশনের মুখপাত্র। 'শক্তি' পত্রিকাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। সরকারি দমন এড়াতে 'দামোদর', 'বর্ধমান বার্তা', 'পল্লীর কথা' ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেন জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক দাশরথি তা। বর্ধমানের ক্যানেল কর-বিরোধী আন্দোলনকালে 'বর্ধমান বার্তা'-র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অন্যান্য পত্রিকাগুলির মধ্যে 'বর্ধমান বাণী', 'শ্রী', 'আর্য্যপত্রিকা', বর্ধমান (১৯৪৮) প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। প্রেস দমন আইনে বেশ কটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য কারণেও কিছু বন্ধ হয়। কয়েকটি পত্রিকা এখনও টিকে আছে, যেমন 'বর্ধমান বাণী', 'দামোদর', 'আসানসোল হিতৈষী', 'বর্ধমান' (১৯৪৮), 'বর্ধমানের ডাক'।

১৯৫০-এর দশক, অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দশকটিতে পত্রিকা প্রকাশে বেশ ভাটা লক্ষ করা যায়। এই সময়কালে মাত্র ১৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার মধ্যে 'শিক্ষা সমাচার' ব্যতীত আর একটি পত্রিকাও বোধহয় জীবিত নেই *(সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)*। ৬০-এর দশকে প্রকাশিত হয় ৩১টি পত্রিকা, তার মধ্যে ১৫টিই এখন মৃত *(সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)*। ৭০-এর দশকে পত্রিকা প্রকাশে প্রথম জোয়ার লক্ষ করা যায়। মোট ৮৪টি *(সারণি-৫ দ্রষ্টব্য)*। এই প্রথম দুটি দৈনিক প্রকাশিত হয়: 'দৈনিক স্বীকৃতি' ও 'দৈনিক দামোদর'। প্রকাশিত হয় প্রচুর সংখ্যক সাপ্তাহিক, যাদের মধ্যে হিন্দি ও ইংরেজি

সারণি - ৩

১৯৫০-এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাপ্তাহিক : সর্বোদয়, জি টি রোড, সীমা (হিন্দি), একতা (বাংলা-হিন্দি-উর্দু)।
পাক্ষিক : যুগচক্র।
মাসিক : মৈত্রী, শিক্ষা সমাচার, শ্রীলেখা, পথের সন্ধানে।
দ্বিমাসিক : সঞ্জীবপত্র।
অন্যান্য : বঙ্গবাণী, উদয়ন, শান্তি, নবাঙ্কুর।

॥ মোট ১৪টি ॥

সারণি - ৪

১৯৬০-এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

সাপ্তাহিক : মেহনতী, ধরিত্রী, আসানসোল বাণী, অঙ্গার, খোলাকথা, কোলফিল্ড ট্রিবিউন (ইংরেজি), দুর্গাপুরবাণী, পর্যবেক্ষক, আসানসোল সমাচার, স্পষ্টকথা, বর্ধমানবার্তা, বীক্ষণ, সাপ্তাহিক কাটোয়া, ভেদিয়াবার্তা, উদয় অভিযান, বর্ধমান শ্রমিক, নূতন পত্রিকা।
পাক্ষিক : পক্ষান্তর, চলমান, আলিকালি পত্রিকা, বিকাশ।
ত্রৈমাসিক : স্বগত, লোকভারতী, সাহিত্য সানাই, লোকায়ত, আলাপী।
বাৎসরিক : বর্ধমান সংস্কৃতি সম্মেলন।
অন্যান্য : স্বীকৃতি, লোকবার্তা, জয়ধ্বনি, রাঙামাটি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র)।

॥ মোট ৩১টি ॥

সারণি - ৫

১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

দৈনিক : স্বীকৃতি, দৈনিক দামোদর।
সাপ্তাহিক : পূর্বক্ষণ, বর্ধমানজ্যোতি, বিজয়তোরণ, স্বীকৃতি, মুক্তি চাই, বর্ধমান এক্সপ্রেস, ধ্বনি, বর্ধমান নিরন্তর, বর্ধমান মজদুর, বর্ধমান লোকাল, বর্ধমান রিপোর্টার, বর্ধমান শ্রুতি, বর্ধমান দর্পণ, পল্লী বর্ধমান, গোলাপবাগ, উখড়া দর্পণ, নন্দনঘাট সংবাদ, অভীক, জনচিন্তা, গণচিন্তা, কথা বলো, খণ্ডঘোষ সমাচার, বর্ধমান-দুর্গাপুর হেরাল্ড (ইংরাজি), পিপলস্ উইকলি (ইংরাজি), দুর্গাপুর সংবাদ, কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, কোলফিল্ড টাইমস্, পানাগড় বার্তা, আসানসোল কথা (বাংলা), আসানসোল কথা (হিন্দি), কুনুরিকা (ইংরাজি), দুঃসাহস (হিন্দি), আসানসোল অবজারভার, সুইট ইন্ডিয়া, কাটোয়া হিতৈষী, কাটোয়া দর্পণ, কাটোয়া জোয়ার, কাটোয়ার কলম, নতুন চিঠি।
পাক্ষিক : সমিৎ, গরীবের রাস্তা, ভাবনাচিন্তা, সময়ের ভীড়, বর্ধমানের বিজয়বার্তা, দাঁইহাট বিচিত্রা, বর্ধমানের খেলাধুলা, আঞ্চলিক সংহতি, যুগভেড়ী, বর্ধমান ডায়েরী, কবুতর, চাষ-আবাদ, সংস্কৃতি-সংবাদ, গ্রাম্য সমাচার, কুলটিবার্তা, জামুড়িয়া দর্পণ, মেয়েদের বার্তা, কৃষি সমবায় পত্রিকা, সত্যবাক্, প্রতিনিয়ত।
মাসিক : প্রচেষ্টা, ছোটদের কথা, মফস্বলের বার্তা, দীপায়ণ।
দ্বিমাসিক : বোবাযুদ্ধ, অভিযান সাময়িকী।
ত্রৈমাসিক : রোদ্দুর, সীমায়ন, আকরিক, চিত্রকূট, সঙ্গীত শিল্পতীর্থ, বাল্মীকি, নানান কথা, বোধ, কোমল দূর্বা, প্রয়াস ও প্রতীতি।
ষাণ্মাসিক : চিন্তা।
অন্যান্য : বাইরে দূরে, তাপ-উত্তাপ, নগ্ন তাপস, মাতৃকা, রাষ্ট্র দর্পণ, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ (ইংরাজি)।

॥ মোট ৮৪টি ॥

ভাষার সাপ্তাহিকও আছে। কালক্রমে অবশ্য ২০টির মতো পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ৭০-এর দশক পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমান জেলায়, যুক্তফ্রন্টের পতন, নকশালবাদ ও ফ্যাসিবাদী কায়দার সন্ত্রাস ও বীভৎসতা, এবং একতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্টের উদ্ভব ও ক্ষমতালাভের দশক। এইসময় সন্ত্রাসের নায়কদেরও কেউ কেউ পত্রিকা-সম্পাদক হয়ে বসে। সন্ত্রাসের মুখে জেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বামপন্থী সংবাদ-সাপ্তাহিক 'নূতন পত্রিকা' বন্ধ হয়ে যায়। 'পর্যবেক্ষক', 'কাটোয়ার কলম', 'খণ্ডঘোষ সমাচার'-এর মতো কয়েকটি বামপন্থী পত্রিকা কোনরকমে টিকে যায়। ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'ছোটদের কথা' এইসময় শুধু বর্ধমান জেলা নয়, জেলার বাইরেও উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে। অবশেষে বামফ্রন্টের বিজয়লাভের পর ১৯৭৭-এর নভেম্বরে 'নূতন পত্রিকা'-র উত্তরসূরী হিসাবে আবির্ভাব ঘটে জেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বামপন্থী সংবাদ-সাপ্তাহিক 'নতুন চিঠি'-র। এই সময় থেকে বহু নতুন নতুন সংবাদপত্র ও সংস্কৃতি-সাময়িকীও প্রকাশিত হয়। একটি বিশেষ সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'স্বাস্থ্য ও মানুষ'। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনও কোনও পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন ঘটে। এই দশকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির বেশ কয়েকটিই এখনও ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে তাদের ধারাবাহিকতা ও প্রাধান্য বজায় রেখে চলেছে।

১৯৮০-র দশক জুড়ে ও ৯০-এর দশকের বিগত বছরগুলিতে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে অবিরাম, আমাদের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে। ১৯৮০ থেকে এখন পর্যন্ত অন্যূনপক্ষে ১৫৪টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা আছে (*সারণি-৬ দ্রষ্টব্য*)। ১৮৪৯ সালে জেলার প্রথম পত্রিকা থেকে যদি হিসাব ধরা যায়, তাহলে এতাবৎকাল প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২৬। কত পত্রিকার জন্ম-সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত থেকে গেছে তা বলা মুশকিল,

সারণি - ৬

১৯৮০ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রকাশিত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

(তালিকা অসম্পূর্ণ হতে পারে)

দৈনিক : দৈনিক মুক্তবাংলা, দৈনিক লিপি, দৈনিক পূর্বক্ষণ (সান্ধ্য), আসানসোল পরিক্রমা (সান্ধ্য), দৈনিক মহাজাতি (হিন্দি), জাতীয় পত্রিকা, দৈনিক বঙ্গ পত্রিকা, খবর সেতু (হিন্দি)।

সাপ্তাহিক : জাতীয় সংবাদ, ট্রান্সমিটার, শিল্প পরিক্রমা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গান, তথ্য দর্পণ, দিগন্তিকা, খনি ও ইস্পাত, এজাহার, অজয় পাড়ে, দুর্গাপুর পার্সপেকটেড, সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা, দুর্গাপুর জনজীবন, হালচাল রাজনৈতিক, নিউজ কেনট্রন, দুর্গাপুর কথা ও কাহিনী, নয়া চিন্তা, অজানা পথিক, বর্ধমান সমাচার, সাপ্তাহিক প্রফুল্ল, মুক্ত কলম, সাপ্তাহিক কাটোয়া, এক টুকরো বাঁশ, প্রান্তভূমি, কোলফিল্ড পোস্ট, বর্ধমান লোকাল, উত্তর বর্ধমান, রানীগঞ্জ দর্পণ, বর্ধমানের স্বর্ণশিল্পী বার্তা, সোচ্চার, টেলি টাইম্‌স।

পাক্ষিক : যুবজোয়ার, পবিত্র বাণী, চিন্তাভাবনা, মঙ্গলকোট বার্তা, তোমাদের কথা, ভোর, সংবাদের শিরোনাম, হোত্রী, ধুলামন্দির, দেশমাতৃকা, মহিলামহল, আগামী আওয়াজ, কালনা সমাচার, কামদুঘা, সহানুভূতি, রোদবৃষ্টি, বার্তাঝুলি, ভাগ্যের সন্ধানে, জিরো পয়েন্ট, রসুলপুর বার্তা, মেমারী সংবাদ, ম্যাসেঞ্জার, কলকল্লোল, ভূমিপূজা, সাম্প্রতিক, অস্বকণ্ঠ, অম্বিকা সমাচার, সংবাদ পল্লীচিত্র, কথার কথা, গোপন তথ্য, দুর্গাপুর জনসমাচার, ইস্পাতবলয়, প্রীতি ও সংহতি, শতাব্দীর সংবাদ, বর্ধমান ঐকতান, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর, কৃষি সমবায় পত্রিকা, পরিবহণ সমাচার, সাহিত্য সম্মেলন বার্তা, দক্ষিণ দামোদর প্রকাশনী পত্রিকা, কিশোর জগৎ।

মাসিক : সেবিকা, জবাভবা ভবঘুরে, শুভলিপিকা, অনুবর্তন, ঝলমলে ঝিলমিল, বয়রামুক্তি, এক জাতি একতা, কাঁচামিঠা, প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা, শিল্প-সাহিত্য গবেষণা।

ত্রৈমাসিক : প্রমিথিউস, সময়ের কথা, ধন্যভূমি, শুধু শব্দ নয়, জলপ্রপাত সাহিত্য, কয়লাগুঁড়ির দেশ, বযুসান, রাঢ়বঙ্গ, প্রতিভাস, আমাদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলি, মনীষা, নৈরঞ্জনা, উত্তরণ, স্বাস্থ্য ও মানুষ, সাহিত্য সানাই, র‍্যাডার, নভস্পৃক্‌, কন্দমের মুখ, ভোরের তারা, ক্রমান্বয়, বিভাস, ইস্পাতের চিঠি, প্রতিশ্রুতি, বাংলা গল্প আকাদেমি, দিগন্ত সাহিত্য সম্মেলন, মানবেন্দ্র রায়ের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, শিল্পনগর মধ্যনগর।

ষাণ্মাসিক : এষণা, পৌর দিশারী, শুভ মহুয়া, দুর্গাপুরের আনন্দধারা, প্রতিভার সন্ধানে, ছোটদের শিল্প ও সাহিত্য, আসানসোল মাস-মিডিয়া।

অন্যান্য : কৃষ্ণমৃত্তিকা, প্রান্তছায়া, সূত্রপাত, সরেজমিনে, ত্রিপিটক, ঋত্বিক, নতুন মুখ, প্রথমত, এবং অন্য, অঙ্গন, কবিতা সম্প্রতি, দ্বান্দ্বিক, সাহিত্য সংবাদক, মাধুকরী, অকপট, যোধন, দীধিতি, বাল্মীকি, সুচেতনা, অভিযান সাময়িকী, অর্ণব, কুরুক্ষেত্র, দিগন্ত, একলব্য, নতুন দিগন্ত, টেলিটাইম্‌স, দুর্গাপুর হেরাল্ড, স্ফুলিঙ্গ।

॥ মোট ১৫৪টি

তাই হিসাবে আসেনি। মৃত্যু-সংবাদও তাই। তবে এ-বছরের সরকার-অনুমোদিত ১২৩টি পত্র-পত্রিকা *(সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)* ও সেই সঙ্গে যদি আনুমানিক আরও ২৭টি অনিয়মিত কিন্তু জীবিত পত্রপত্রিকাকে হিসেবে ধরি তাহলেও মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৬, অর্থাৎ প্রায় ৫৪ শতাংশ। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রিকা মৃত্যুর পরোয়া করে না। ফিনিক্স পাখির মতো নিজের ছাই থেকেও আবার সে নতুন জন্ম নিতে পারে। জন্মধারা তাই অব্যাহতই আছে। ১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৬-৯৭—এই চার বছরে জেলার সরকার-অনুমোদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৮২, ১০৫, ১১০ ও ১২৩। অর্থাৎ মাত্র এই চার বছরেই পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ৪১ অর্থাৎ ৫০ শতাংশ *(সারণি-৯ দ্রষ্টব্য)*। সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে দুর্গাপুর মহকুমায় (১৩০%), তারপরেই আছে যথাক্রমে বর্ধমান সদর (৫৪%), কাটোয়া (৩৭.৫%), আসানসোল (২০%) ও কালনা (১৭%)। সন্দেহ নেই, বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকার জগৎ ওভার পপুলেশনের সবকটি লক্ষণেই আক্রান্ত। সত্যের খাতিরে অপ্রিয় হলেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতেই হয়। অনুমোদিত পত্র-পত্রিকাগুলির একটি বড় অংশেরই অস্তিত্ব জেলা তথ্য দপ্তরের ফাইলে যতটা সমুপস্থিত, পাঠকসমক্ষে ততটা নয়—প্রচারসংখ্যার আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট যা-ই বলুক না কেন!

সারণি ৮ ও ৯-এ চলতি বছরের অনুমোদিত পত্রিকাগুলির প্রচারসংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ক) প্রচারসংখ্যার সরকারি অনুমোদনের জন্য মুদ্রকের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট বিবেচনা করায় এবং অন্য কোনভাবে তা যাচাই করার ব্যবস্থা না থাকায় এ নিয়ে অসদাচার এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। জেলার অনুমোদিত পত্রিকাগুলির মোট প্রচারসংখ্যা নাকি ৬,০৭,৬২৯! জেলার মোট জনসংখ্যা ৬০ লক্ষের কিছু বেশি, সুতরাং ১০ জন পিছু একটি পত্রিকা। পত্রিকাপাঠে সক্ষমতার মানদণ্ডে হিসাব করলে প্রায় পরিবারপিছু একটি কাগজ। রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের পত্র-পত্রিকাগুলির প্রবেশপথ আর থাকে কি তাহলে? দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে কেবল হিন্দিভাষার পত্রিকাই নাকি চলে ৭৯,৬১৪টি। হিন্দিভাষী প্রতিটি পরিবারই কি তাহলে এগুলির পাঠক? একটি সাঁওতালি ত্রৈমাসিকও নিজের প্রচারসংখ্যাকে ২১০০-র নীচে নামাতে রাজি হয়নি।

(খ) প্রচারসংখ্যা দিয়ে বিচার করতে গেলে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির একটা বড় অংশই আর ক্ষুদ্র থাকতে রাজি নয়। শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটি ১৯৮০ সালে বলেছিল, শতকরা ৭৬ ভাগ পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ২১০ থেকে ৫০০ এবং ১২ শতাংশ পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ২০০১-৫০০০।

সারণি - ৭

১৯৯৬-৯৭ সালে সরকার অনুমোদিত ও বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা ও তাদের প্রচার সংখ্যা

		বর্ধমান সদর		কালনা		কাটোয়া		দুর্গাপুর		আসানসোল		মোট	
পত্রিকার পর্যাবৃত্তি	ভাষা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা
দৈনিক	বাংলা	২	১৪,৫১৭	—	—	—	—	১	১৫,৮০০	২	৫৩,৫১৯	৫	৮৩,৮৩৬
	হিন্দি	—	—	—	—	—	—	১	১৬,৪৫৪	—	—	১	১৬,৪৫৪
সাপ্তাহিক	বাংলা	১৯	৮৯,২১৫	১	৫১২	৬	১২,৪২৬	৫	৫১,৪৬৫	৭	৪৪,৯০১	৩৮	১,৯৮,৫১৯
	হিন্দি	—	—	—	—	—	—	২	৪৪,৭৬০	১	১৮,৪০০	৩	৬৩,১৬০
	ইংরাজি	—	—	—	—	—	—	১	৯,৫০০	—	—	১	৯,৫০০
পাক্ষিক	বাংলা	২৮	১,০১,৩০৬	৬	১২,৮৮৫	৫	১৪,৩৫০	৬	৩৪,৬৩৯	৪	১৮,১০০	৪৯	১,৮১,২৮০
মাসিক	বাংলা	২	২,৬৩৭	২	২,৯০০	—	—	১	২,৩০০	১	১,০০০	৬	৮,৮৩৭
ত্রৈমাসিক	বাংলা	৬	২০,৫৪০	৩	৩,৯৩৩	—	—	৩	৪,৮৪৩	২	২,৭১৭	১৪	৩২,০৩৩
	সাঁওতালি	—	—	—	—	—	—	১	২,১৫০	—	—	১	২,১৫০
ষান্মাসিক	বাংলা	—	—	২	৩,০৫৫	—	—	২	৬,৩০০	১	২,৫০৫	৫	১১,৮৬০
মোট		৫৭	২,২৮,২১৫	১৪	২৩,২৮৫	১১	২৬,৭৭৬	২৩	১,৮৮,২১১	১৮	১,৪১,১৪২	১২৩	৬,০৭,৬২৯

সারণি - ৮

প্রচার সংখ্যার ক্রমানুসারে ১৯৯৬-৯৭ সালে সরকার অনুমোদিত ও বিজ্ঞাপন তালিকাভুক্ত বর্ধমান জেলার পত্র-পত্রিকা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	পত্রিকার নাম	পর্যাবৃত্তি	প্রকাশ স্থান
১	৩২,৮৪৪	জাতীয় পত্রিকা	দৈনিক	আসানসোল
২	৩১,০১০	বিষাণ (হিন্দি)	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
৩	২০,৬৭৫	দৈনিক লিপি	দৈনিক	আসানসোল
৪	১৮,৪০০	ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গান (হিন্দি)	সাপ্তাহিক	আসানসোল
৫	১৬,৪৫৪	খবর সেতু (হিন্দি)	দৈনিক	দুর্গাপুর
৬	১৫,৮০০	দৈনিক বঙ্গ পত্রিকা	দৈনিক	দুর্গাপুর
৭	১৫,০০০	ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গান (বাংলা)	সাপ্তাহিক	আসানসোল
৮	১৩,৭৫০	হালচাল রাজনৈতিক (হিন্দি)	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
৯	১৩,৭১৫	কোলফিল্ড পোস্ট	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
১০	১২,৩০০	দুর্গাপুর জনজীবন	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
১১	১২,০০০	পানাগড় বার্তা	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
১২	১০,৭৬৫	দুর্গাপুর জনসমাচার	পাক্ষিক	দুর্গাপুর
১৩	১০,১৫০	কুলটি বার্তা	পাক্ষিক	আসানসোল
১৪	১০,১১০	সোচ্চার	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
১৫	৯,৫০০	বর্ধমান দুর্গাপুর হেরাল্ড (ইংরাজি)	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
১৬	৯,৫০০	প্রীতি ও সংহতি	পাক্ষিক	দুর্গাপুর
১৭	৯,৩৬৭	দৈনিক মুক্তবাংলা	দৈনিক	বর্ধমান
১৮	৮,৭৩০	বর্ধমান সমাচার	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
১৯	৮,৩০০	দুর্গাপুর সংবাদ	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
২০	৮,২৭০	খনি ও ইস্পাত	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
২১	৮,২০০	পূর্বক্ষণ	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
২২	৮,০৩৫	বর্ধমান দর্পণ	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
২৩	৮,০৩০	সময়ের ভিড়	পাক্ষিক	বর্ধমান
২৪	৭,১২০	ইস্পাত বলয়	পাক্ষিক	দুর্গাপুর
২৫	৭,০০০	প্রান্তভূমি	সাপ্তাহিক	আসানসোল
২৬	৫,৬০০	আলিকালি পত্রিকা	পাক্ষিক	বর্ধমান
২৭	৫,৪১১	জিরো পয়েন্ট	পাক্ষিক	বর্ধমান
২৮	৫,৪০০	সাপ্তাহিক মুক্তবাংলা	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
২৯	৫,৩০০	সাহিত্য সানাই	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
৩০	৫,৩০০	র‍্যাডার	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
৩১	৫,২০০	স্বীকৃতি	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৩২	৫,২০০	সংস্কৃতি সংবাদ	পাক্ষিক	বর্ধমান
৩৩	৫,২০০	ক্রীড়াক্ষেত্র	পাক্ষিক	বর্ধমান
৩৪	৫,২০০	ভাগ্যের সন্ধানে	পাক্ষিক	বর্ধমান
৩৫	৫,২০০	মেমারী সংবাদ	পাক্ষিক	বর্ধমান
৩৬	৫,১৫০	দৈনিক স্বীকৃতি	দৈনিক	বর্ধমান
৩৭	৫,১৫০	খোলাকথা	সাপ্তাহিক	দুর্গাপুর
৩৮	৫,১৩৩	কামদুঘা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৩৯	৫,১০০	বর্ধমান শ্রুতি	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৪০	৫,১০০	পরিবহণ সমাচার	পাক্ষিক	বর্ধমান
৪১	৫,১০০	চাষ-আবাদ	পাক্ষিক	বর্ধমান

ক্রমিক সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	পত্রিকার নাম	পর্যাবৃত্তি	প্রকাশ স্থান
৪২	৫,০৯১	সাপ্তাহিক প্রফুল্ল	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৪৩	৫,০৫০	আসানসোল অবজারভার	সাপ্তাহিক	আসানসোল
৪৪	৫,০২৩	সহানুভূতি	পাক্ষিক	বর্ধমান
৪৫	৫,০২০	সত্যবাক্	পাক্ষিক	বর্ধমান
৪৬	৫,০২০	সময়ের কথা	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
৪৭	৫,০১৪	দামোদর	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৪৮	৪,৮৫০	মুক্ত কলম	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৪৯	৪,৫৩১	আসানসোল বাণী	সাপ্তাহিক	আসানসোল
৫০	৪,৩৮৯	শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	পাক্ষিক	দুর্গাপুর
৫১	৪,২০০	ছোটদের শিক্ষা ও সাহিত্য	ষান্মাসিক	দুর্গাপুর
৫২	৪,১০০	গোপন তথ্য	পাক্ষিক	কাটোয়া
৫৩	৩,৬০০	পবিত্র বাণী	পাক্ষিক	বর্ধমান
৫৪	৩,২৫০	তথ্য দর্পণ	পাক্ষিক	কাটোয়া
৫৫	৩,১০০	কৃষি সমবায় পত্রিকা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৫৬	৩,০১৮	গণচিন্তা	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৫৭	৩,০০০	আসানসোল হিতৈষী	সাপ্তাহিক	আসানসোল
৫৮	৩,০০০	গ্রামাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের খবর	পাক্ষিক	আসানসোল
৫৯	২,৯৫০	বিজয় তোরণ	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৬০	২,৯০০	চিন্তাভাবনা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৬১	২,৮৫০	অজানা পথিক	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৬২	২,৮৫০	কাটোয়ার জোয়ার	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
৬৩	২,৮০০	রসুলপুর বার্তা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৬৪	২,৬৫০	আঞ্চলিক সংহতি	পাক্ষিক	আসানসোল
৬৫	২,৬২৫	আর্য্য পত্রিকা	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৬৬	২,৬১৭	বর্ধমান জ্যোতি	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৬৭	২,৫০৫	প্রতিভার সন্ধানে	ষান্মাসিক	আসানসোল
৬৮	২,৪৮০	নতুন চিঠি	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৬৯	২,৪৪৫	পল্লী বর্ধমান	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৭০	২,৪০০	মুক্তি চাই	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৭১	২,৪০০	বর্ধমান মজদুর	পাক্ষিক	বর্ধমান
৭২	২,৪০০	তোমাদের কথা	পাক্ষিক	কাটোয়া
৭৩	২,৩৫৬	কাটোয়ার কলম	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
৭৪	২,৩০০	ধুলামন্দির	পাক্ষিক	কাটোয়া
৭৫	২,৩০০	কথার কথা	পাক্ষিক	কাটোয়া
৭৬	২,৩০০	যুগভেরী	পাক্ষিক	বর্ধমান
৭৭	২,৩০০	জামুড়িয়া দর্পণ	পাক্ষিক	আসানসোল
৭৮	২,৩০০	শিল্প-সাহিত্য গবেষণা	মাসিক	দুর্গাপুর
৭৯	২,২৪৩	ইস্পাতের চিঠি	ত্রৈমাসিক	দুর্গাপুর
৮০	২,২৩০	এক টুকরো বাঁশ	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
৮১	২,২২৮	সাম্প্রতিক	পাক্ষিক	কালনা
৮২	২,২২০	হোত্রী	পাক্ষিক	কালনা
৮৩	২,২১৭	দিগন্ত সাহিত্য সংকলন	ত্রৈমাসিক	আসানসোল
৮৪	২,২১০	ধন্যভূমি	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
৮৫	২,২০০	গ্রাম্য সমাচার	পাক্ষিক	বর্ধমান

ক্রমিক সংখ্যা	প্রচার সংখ্যা	পত্রিকার নাম	পর্যাবৃত্তি	প্রকাশ স্থান
৮৬	২,২০০	দক্ষিণ দামোদর প্রকাশনী পত্রিকা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৮৭	২,২০০	ম্যাসেঞ্জার	পাক্ষিক	বর্ধমান
৮৮	২,১৫০	রোদবৃষ্টি	পাক্ষিক	বর্ধমান
৮৯	২,১৫০	অম্বিকা সমাচার	পাক্ষিক	কালনা
৯০	২,১৫০	সিবিল সাঁদেশ (সাঁওতালি)	ত্রৈমাসিক	দুর্গাপুর
৯১	২,১৩০	সীমায়ন	ত্রৈমাসিক	কালনা
৯২	২,১২০	বর্ধমান বাণী	পাক্ষিক	বর্ধমান
৯৩	২,১২০	পাক্ষিক দেশমাতৃকা	পাক্ষিক	কালনা
৯৪	২,১২০	ক্রমান্বয়	ত্রৈমাসিক	কালনা
৯৫	২,১১৭	অম্বুকণ্ঠ	পাক্ষিক	কালনা
৯৬	২,১০০	ধ্বনি	সাপ্তাহিক	বর্ধমান
৯৭	২,১০০	সাহিত্য সম্মেলন বার্তা	পাক্ষিক	বর্ধমান
৯৮	২,১০০	দুর্গাপুরের আনন্দধারা	ষাণ্মাসিক	দুর্গাপুর
৯৯	২,১০০	বর্ধমান ঐকতান	পাক্ষিক	বর্ধমান
১০০	২,০৬৪	ভাবনাচিন্তা	পাক্ষিক	বর্ধমান
১০১	২,০৫০	সংবাদ পল্লীচিত্র	পাক্ষিক	কালনা
১০২	২,০৫০	ষান্মাসিক পৌর দিশারী	ষাণ্মাসিক	কালনা
১০৩	২,০৫০	পর্যবেক্ষক	সাপ্তাহিক	আসানসোল
১০৪	২,০২০	কাটোয়া দর্পণ	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
১০৫	২,০০০	কাঁচামিঠা	মাসিক	বর্ধমান
১০৬	১,৯০০	দীপায়ন	মাসিক	কালনা
১০৭	১,৮৫৫	কলকল্লোল	পাক্ষিক	বর্ধমান
১০৮	১,৮০০	কলমের মুখ	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
১০৯	১,৬৫০	কাটোয়া হিতৈষী	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
১১০	১,৫০০	বিভাস	ত্রৈমাসিক	দুর্গাপুর
১১১	১,৩২০	সাপ্তাহিক কাটোয়া	সাপ্তাহিক	কাটোয়া
১১২	১,২০০	বার্তাঝুলি	পাক্ষিক	বর্ধমান
১১৩	১,১০০	প্রতিশ্রুতি	ত্রৈমাসিক	দুর্গাপুর
১১৪	১,০০৫	শুভ মহুয়া	ষাণ্মাসিক	কালনা
১১৫	১,০০০	প্রাথমিক শিক্ষক পত্রিকা	মাসিক	কালনা
১১৬	১,০০০	আজকের যোধন	মাসিক	আসানসোল
১১৭	৯১০	নভস্পৃক্	ত্রৈমাসিক	বর্ধমান
১১৮	৯০০	ভূমিপূজা	পাক্ষিক	বর্ধমান
১১৯	৭৬৫	শতাব্দীর সংবাদ	পাক্ষিক	দুর্গাপুর
১২০	৬৩৭	স্বাস্থ্য ও মানুষ	মাসিক	বর্ধমান
১২১	৫৮৩	ভোরের তারা	ত্রৈমাসিক	কালনা
১২২	৫১২	পল্লীবাসী	সাপ্তাহিক	কালনা
১২৩	৫০০	বাংলা গল্প আকাদেমী	ত্রৈমাসিক	আসানসোল

সারণি - ৯

১৯৯৩-৯৪ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় সরকার-অনুমোদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি

	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	চার বছরে বৃদ্ধি
বর্ধমান সদর	৩৭	৪৩	৪৮	৫৭	২০ (৫৪%)
কালনা	১২	১৩	১৫	১৪	২ (১৭%)
কাটোয়া	৮	১২	১৩	১১	৩ (৩৭.৫%)
দুর্গাপুর	১০	১৯	১৯	২৩	১৩ (১৩০%)
আসানসোল	১৫	১৮	১৫	১৮	৩ (২০%)
মোট	৮২	১০৫	১১০	১২৩	৪১ (৫০%)

তিনি আজ জানলে খুশি হতেন যে বর্ধমানের ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলি এখন এতটাই সমৃদ্ধ হয়েছে ছবিটা পুরো উলটে গেছে। এখন এখানে ন্যূনতম প্রচার ৫০০ এবং ৫০১ থেকে ২০০০-এর মধ্যে আছে মোট ১২৩টির মধ্যে মাত্র ১৯টি অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১৫টি পত্রিকা। অপরপক্ষে ১০৪টি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগেরই প্রচার ২০০০-এর উপর। এর মধ্যে ২০০১ থেকে ৫০০০-এর মধ্যে ৫৭টি (৪৬%), ৫০০১ থেকে ১০,০০০-এর মধ্যে ৩৩টি (প্রায় ২৭%), ১০,০০১ থেকে ২০,০০০-এর মধ্যে ১১টি (প্রায় ৯%), এবং ২০,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৩২,৮৪৪-এর মধ্যে ৩টি পত্রিকা আছে। 'জাতীয় পত্রিকা', 'দৈনিক লিপি' ও দৈনিক বঙ্গ'কে অবশ্য ক্ষুদ্র পত্রিকার গোত্রভুক্ত করা সমীচীন নয়।

(গ) স্বল্পজ্ঞাত কোনও একটি পত্রিকাও বুকের পাটা থাকলে সোচ্চারে ৮-১০ হাজার প্রচারের সমাচার ঘোষণা করতে পারে, আর সত্য প্রচারসংখ্যা কবুল করার পাপে প্রকৃতপক্ষেই বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলি অধোবদনে তালিকার নীচে স্থান করে নিতে পারে।

(ঘ) 'একটুকরো বাঁশ'-ও দ্বিসহস্রাধিক জনের পাঠযোগ্য একটি অনুমোদিত পত্রিকার নাম হতে পারে। 'আলিকালি' শব্দের অর্থবোধে অক্ষম হয়েও প্রায় ছয় হাজার পাঠক তার প্রতি অনুরক্ত থাকে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

এসব সত্ত্বেও, বর্ধমান জেলার সংবাদপত্র ও সংস্কৃতি-বিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলি নিয়ে গর্ব করবার মতো অনেক বিষয়ই আছে। 'দামোদর' পত্রিকাটির ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত—যদিও এখন তা টিকে থাকার সংগ্রামের মধ্যে আছে। 'দৈনিক মুক্তবাংলা'-কে একটি অতি উল্লেখযোগ্য দৈনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার অকালপ্রয়াত সম্পাদক পুরুষোত্তম সামন্ত। 'স্বীকৃতি' পত্রিকাটি দৈনিক হিসাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারলেও সাপ্তাহিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। 'বর্ধমান সমাচার' বর্ধমানের প্রথম অফসেট-মুদ্রিত পত্রিকায় পরিণত হলেও আবার লেটারপ্রেসে ফিরে এসেছে। 'নতুন চিঠি' পত্রিকাটি এখন নিয়মিত অফসেটে ছাপা হচ্ছে, তার শারদসংখ্যাটি বহুদিন যাবৎই সারা পশ্চিমবঙ্গে সমাদৃত। এটি একটি ভিন্ন গোত্রের বামপন্থী পত্রিকা। 'পূর্বক্ষণ'-এর সান্ধ্য দৈনিক হবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাপ্তাহিক হিসাবেই চলছে এখন। আসানসোলের 'পর্যবেক্ষক' পত্রিকাটির সুদীর্ঘ বামপন্থী ঐতিহ্য আছে। সাংবাদিক কর্মশালা ইত্যাদি সংগঠিত করে বৃহত্তর পেশাগত দায়িত্ব পালনেও পত্রিকাটি তৎপর। 'কাটোয়ার কলম' জেলার একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকায় পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া 'আসানসোল অবজারভার', 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গান', 'কোলফিল্ড পোস্ট', 'কোলফিল্ড টাইমস', আঞ্চলিক সংহতি ইত্যাদি পত্রিকাগুলি এবং বর্ধমান শহরে প্রকাশিত একগুচ্ছ সংবাদপত্র ক্ষুদ্র পত্রিকার ভাল-মন্দ নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়মিত হাজির হচ্ছে। অন্যদিকে সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিষয়ক বেশ কয়েকটি পত্রিকা উল্লেখ করার মতো, যদিও সবকটি নিয়মিত নয়। 'নতুন চিঠি'-র সাময়িকী 'প্রমিথিউস' অনিয়মিত হলেও একটি নজর-কাড়া পত্রিকা। 'মানবেন্দু রায়ের ত্রৈমাসিক' উচ্চমানের। 'ভাবনা-চিন্তা' একটি মনন-সমৃদ্ধ পাক্ষিক। 'অভিযান সাময়িকী' বিশেষত্বের দাবি রাখে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য 'শিল্পনগর মধ্যনগর', 'আজকের যোধন', 'ইস্পাতের চিঠি', 'মাধুকরী', 'নতুন দিগন্ত', 'দীধিতি' প্রভৃতি সাময়িকীগুলি।

বর্তমান যুগে তথ্যই শক্তি, গণজ্ঞাপন এক অতি উন্নত হাতিয়ার। এই হাতিয়ারটির উপর জাতীয় ও বহুজাতিক পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটিয়ে পৃথিবীর গোটাকয়েক দেশের অতিজাতিক ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি আবিশ্ব বিস্তৃত করেছে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম তথা টেলিভিশনের মায়াজাল। সারা পৃথিবীর আকাশ তাদের দখলে, গৃহস্থের ড্রইংরুম থেকে শোবার ঘর তাদের দূরনিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ, মানুষের জীবনবৃত্তের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের করায়ত্ত। তথ্য ও বিনোদন, বাস্তব ও অবাস্তবকে একাকার করে দিয়ে মানুষের মনোজগতের উপর তারা উপনিবেশ বিস্তার করে চলেছে। এরই নাম তথ্যসাম্রাজ্যবাদ—সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিকতম মোহন রূপ।

দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের এই বিপুল চ্যালেঞ্জের মুখে পত্র-পত্রিকার জগতে সংকটের ছায়া ঘন হচ্ছে। পত্র-পত্রিকার

আপন মূলত সাক্ষর মানুষের কাছে, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের মতো তা সার্বক্ষণিক বা সর্বত্রগামী নয়। তবু তার গুরুত্বও কম নয়। একটি পত্রিকা যে তথ্য ও মনন-সম্পদ দিতে পারে, এবং সেখানে পাঠকের যে সচেতন প্রয়াস থাকে, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে ততটা সম্ভব নয়। পত্রপত্রিকার জগতেও তাই অতিজাতিক ও বহুজাতিক হাঙর কুমিরের দাপট বাড়ছে। দেশীয় ধনপতিদের কায়েমি দখলদারি তো আছেই। বড় মাছ এখন ছোটমাছকে গিলছে। এবং এই মাৎস্যন্যায়ই যেখানে ন্যায়ের একমাত্র ফরমান, বৃহৎ পত্র-পত্রিকাগুলিই যেখানে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, সেখানে ক্ষুদ্র পত্রিকার টিকে থাকবার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদ্র পত্রিকার অস্তিত্বের প্রকৃত সার্থকতা কোথায় তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু অস্তিত্বের সার্থকতা অর্জনের জন্যও অস্তিত্বটা টিকিয়ে রাখা জরুরি। ক্ষুদ্র পত্রিকার বেঁচে থাকার লড়াইটা সত্যিই তীব্র। বিক্রয়লব্ধ অর্থে বাঁচা যায় না। শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটি তার রিপোর্টে দেখিয়েছে, একটি ছ-পাতার সাপ্তাহিকের প্রচারসংখ্যা যদি দু-হাজারও হয়, তাহলেও তার আর্থিক ঘাটতি হয় ৮০ শতাংশ। সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক সাময়িকীগুলির প্রচার যেমন তুলনায় কম, প্রকাশ-ব্যয় তেমনই বেশি; তাদের ঘাটতিও তাই আরও বেশি। প্রকাশনা-সংক্রান্ত সমস্ত উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে। পত্রিকা ও ছাপাখানার মালিকানা এক হলে কিছুটা অক্সিজেন মেলে, কিন্তু তাও বাঁচার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড় বিজ্ঞাপনে তাদের অধিকার নেই, কষ্টার্জিত স্বল্পমূল্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘাটতি পূরণ হয় না। প্রকাশ নিয়মিত হলেও সরকারি অনুমোদন পাওয়া গেলে যৎসামান্য বিজ্ঞাপন যদিও বা ভাগে জোটে, অনিয়মিত হলে সেটুকুও জোটে না। অনেক পত্রিকাই অনিয়মিত, বিশেষ করে সাময়িকীগুলি। একদিকে পত্রিকার সংখ্যা-বিস্ফোরণ ও অন্যদিকে বিজ্ঞাপন-বাবদ জেলাগত সরকারি বরাদ্দে হ্রাস ঘটা কিংবা আনুপাতিক বৃদ্ধি না ঘটার ফলে পত্রিকাপিছু বিজ্ঞাপনের ভাগটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠছে ক্রমশ। চলতি বছর নিয়ে বিগত চার বছরে পত্রিকার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন-বাবদ জেলার বরাদ্দ নিম্নরূপ:

	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
পত্রিকার সংখ্যা	৮২	১০৫	১১০	১২৩
বিজ্ঞাপন বরাদ্দ	২,৭৫,০০০ টাকা	২,০০,০০০ টাকা	৩,২০,০০০ টাকা	এখনও বরাদ্দ হয়নি
পত্রিকাপিছু বিজ্ঞাপন	৩৩৫৩ টাকা	১৯০৫ টাকা	২৯০৯ টাকা	—

(১৯৯৫-৯৬০-এ বকেয়া মেটানোর জন্য একটি বিশেষ বরাদ্দ ছিল বলে অঙ্কটা বেশি। চলতি বছরে এ পর্যন্ত কোনও পত্রিকাই কোনও বিজ্ঞাপন পায়নি।) রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ডি এ ভি পি-র বিজ্ঞাপনও অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞাপনের মাংসখণ্ডের জন্য তাই লড়াইও বাড়ছে। একদিকে উচ্চতর রেট পাবার জন্য প্রচারসংখ্যাকে নির্লজ্জভাবে ফুলিয়ে দেখানো, সেই ফোলানো প্রচারসংখ্যা দেখিয়ে অন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে বিজ্ঞাপন আদায়, এবং অন্যদিকে বিষয়বস্তু একটু উলটে-পালটে স্বনামে-বেনামে একাধিক পত্রিকা বের করা—ইত্যাকার কাণ্ডকারখানা চলছে। এ ব্যাপারে সততা মানেই লোকসান। তবুও অনেক পত্রিকা লোকসানকেই মেনে নিয়েছে।

এ কথা ঠিক, শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন-নির্ভর হয়ে কোনও পত্রিকা বাঁচতে পারে না, এমনভাবে বাঁচার কোনও মানেও হয় না। কিছু কিছু পত্রিকার চেহারায়, ভাষায়, চিন্তায় ও সম্পাদনায়—সর্বক্ষেত্রেই এমন দারিদ্র্য যে তাদের কাছে প্রত্যাশার কিছু থাকে না। একটি ক্ষুদ্র পত্রিকার যেমন সততা, সুবুদ্ধি, কর্তব্যপরায়ণতা জাতীয় কতকগুলি মূল্যবোধকে মেনে চলা উচিত, তেমনই কিছু পেশাদারি দক্ষতা অবশ্যই তাকে অর্জন

করতে হবে। নিজে অনৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত থেকে অন্যের নৈতিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে যাওয়া হাস্যকর। নিজের নৈতিক অবস্থানটিকে ঠিক রেখে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে। বৃহৎ পত্রিকার মতো পণ্যের মনোহারিত্ব দিয়ে পাঠকের হৃদয় জয় করা তার পক্ষে সম্ভব না হলেও পত্রিকাকে অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন ও সুখপাঠ্য করে তোলা যায়। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সুদক্ষ সম্পাদনা ও লে-আউটের সৌকর্য দিয়ে পত্রিকাকে মনোগ্রাহী করে তোলা যায়। আজকের পাঠক যে-কোনও পত্রিকাকেই হাতে তুলে নিতে মোটেই রাজি নয়। তার চোখকে খুশি করতে না পারলে মন খুশি হবে না।

ক্ষুদ্র পত্রিকাকে যেমন নিজের কোমরের জোরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে, তেমনই বিজ্ঞাপন দান ছাড়াও সরকারকে আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে শশাঙ্কশেখর সান্যাল কমিটির কতকগুলি সুপারিশ ছিল। যেমন, গ্রামীণ সংবাদ সংস্থা গঠন, ক্ষুদ্র সংবাদপত্র বিকাশ নিগমের প্রতিষ্ঠা, সস্তায় ও প্রয়োজনীয় সাইজে নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ ও কিস্তিতে তোলার সুযোগ, সরকারি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে অগ্রাধিকার, প্রচার-বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়ব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি, মানোন্নয়নে উৎসাহ দিতে পুরস্কারের ব্যবস্থা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগকে এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। সাংবাদিক প্রশিক্ষণের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। কিন্তু সান্যাল কমিটির সুপারিশগুলি সামান্যই কার্যকর হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও বাজার-সার্বভৌমত্বের এই যুগে বড়োরই বাড়বাড়ন্ত ঘটছে। কিন্তু এটা তথ্যশক্তিরও যুগ। গণতন্ত্রের শক্তির উৎস তার তৃণমূলে, আর এই তৃণমূলেই ক্ষুদ্র পত্রিকার অবস্থান। তাদের গুরুত্ব অবহেলিত হলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে গণতন্ত্র।

তথ্যসূত্র :

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িকপত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

২। কবিতা মুখোপাধ্যায়—বর্ধমান জেলায় প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাপঞ্জীর বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা : ১৯৬০-৮৫।

৩। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক হতে গেলে।

৪। বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

৫। বর্ধমান জিলা পরিষদ

বর্ধমান জেলার ভ্রমণ পর্যটন

শফিরুল হক

আমি একদিন না দেখিলাম তারে/ঘরের কাছে আরশিনগর'—হ্যাঁ, ঘর থেকে শুধু দু-পা ফেলে এখনও যে স্থান চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি, সেই বর্ধমান শহর তথা জেলার ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, সমাধির সঙ্গে মন্দির-মসজিদ-গির্জার স্থাপত্যশিল্প আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অতীত ঐতিহ্য আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলির পাশাপাশি গাছ-গাছালি ও পাখির কলতানে মুখরিত বনাঞ্চল ও নদীতীরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিও কম আকর্ষণীয় নয়। বর্ধমান জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ও আসানসোলের কথা বাদ দিলে শুধুমাত্র বর্ধমান শহরেই অসংখ্য দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। আছে সম্প্রতি নির্মিত তারামণ্ডল, বিজ্ঞান কেন্দ্র, মৃগদাব ও কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কাননের মতো মনোরম স্থান। আর সারা জেলা জুড়ে মনীষী-কবি- সাহিত্যিকদের জন্মস্থানগুলিও না দেখলেই নয়। এ-সব নিয়েই বর্ধমান জেলার ভ্রমণ পর্যটন।

প্রতিবেদনের প্রথমে বর্ধমান শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দ্রষ্টব্য স্থান ও আকর্ষণীয় বস্তুগুলি নিয়ে আলোচনা করব। পরে অন্যান্য মহকুমাগুলি পরিক্রমা করে সেখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বর্ধমান শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দ্রষ্টব্য স্থান

শের আফগান ও কুতুবউদ্দিনের সমাধিক

ভারত-ইতিহাসের মুঘলযুগের এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয় বর্ধমান শহরের পীরবাহ্‌রাম এলাকায়। মুঘল সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধাভাজন সুফি পীরবাহ্‌রাম সাক্কার নামানুসারে স্থানটির এই নামকরণ। বীরশ্রেষ্ঠ শের আফগান এখানেই তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে বাস করতেন। মেহেরউন্নিসাই পরবর্তীকালে নূরজাহান নামে ভারত-ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্রে উন্নীত হন। মেহেরউন্নিসা শের আফগানের স্ত্রী হিসেবে এখানে অবস্থানকালে জাহাঙ্গীর তাঁর পূর্ব প্রণয়বশত তাঁর সম্পর্কিত ভ্রাতা (Foster brother) কুতুবউদ্দিনকে বর্ধমানে পাঠান তাঁকে বন্দী করে আনতে। উদ্দেশ্য মেহেরউন্নিসাকে লাভ করা। উল্লেখ করা যায় যে আকবর জীবদ্দশায় যুবরাজ সেলিম ও মেহেরউন্নিসার প্রেমকে স্বীকৃতি দেননি। শের আফগানকে বন্দি করতে গেলে উভয়ের মধ্যে যে তুমুল লড়াই হয় তাতে এই দুই যোদ্ধাই প্রাণ হারান। তারিখ ছিল ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে। সমাধির ওপর ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ খোদিত আছে যা ইতিহাস সমর্থিত নয়। এই সমাধিক্ষেত্রের অদূরে হজরত পীর বাহ্‌রাম সাক্কার সমাধিও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবরস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত যোগী জয়পালের সমাধি। গাছ-গাছালি আর নাম-না-জানা অজস্র পাখির কলতানে মুখর সমগ্র সমাধিক্ষেত্রটি মনে অদ্ভুত রোমাঞ্চ বয়ে আনে। সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং বিকেল ৩টে থেকে ৬টা পর্যন্ত সমাধিক্ষেত্রের তালা খোলা থাকে।

খাজা আনোয়ার বেড় নবাববাড়ি

শহরের দক্ষিণভাগে মুঘল আমলের দুই যোদ্ধা খাজা আনোয়ার ও খাজা আবুল কাসেমের স্মৃতিসৌধ এখানে অবস্থিত। বীর শহিদ খাজা আনোয়ারের নামানুসারে স্থানটি পরিচিতি লাভ করেছে। নবাববাড়ি নামেও অনেকে অভিহিত করে থাকেন স্থানটিকে। নবাববাড়ি সন্নিহিত এলাকাটিতে বিশাল উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছাড়াও রয়েছে দুই বীর শহিদের তিন গম্বুজযুক্ত স্মৃতিসৌধ, হাওয়া মহল, একটি মসজিদ এবং চতুষ্কোণ একটি জলাশয়। জলাশয়ের মাঝে 'হাওয়া মহল'টি আজও মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তদানীন্তন দিল্লির শাহেনশা অস্তমিত মুঘল সাম্রাজ্যের অখ্যাত সম্রাট ফারুখশিয়রের আমলে এই স্মৃতিসৌধ (১৭১৫ খ্রিঃ) ও নবাববাড়ি নির্মিত হয়।

ফারুখশিয়র তাঁর দুই বিশ্বস্ত যোদ্ধা খাজা আনোয়ার ও আবুল কাসেমকে বর্ধমানে পাঠান রহিম খাঁ ও শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ দমন করতে। রহিম খাঁর কূটকৌশলে গুপ্তঘাতকের হাতে এই দুই বীর যোদ্ধা প্রাণ হারান। তাঁদের বংশের আরও অনেকে যুদ্ধে শহিদ হয়ে যান। স্মৃতিসৌধ চত্বরে তাই অসংখ্য সমাধি লক্ষ করা যায়। প্রতি বছর ১ মাঘ এখানে যে মেলা বসে তাতে পুণ্যার্থী ও দর্শক সমাগমে স্থানটি নতুন মাত্রা লাভ করে।

বর্ধমান রাজবাড়ি

বর্ধমান রাজপরিবারের সুরম্য ও সুবিস্তৃত প্রাসাদটির নাম 'মহতাব মঞ্জিল'। মহারাজ মহতাবচাঁদ কর্তৃক ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। ব্রিটিশ স্থাপত্য অনুসরণে কলকাতার বার্ন কোম্পানি এটি তৈরি করে। মহতাবচাঁদের শেষ বয়সে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বনবিহারী কাপুরই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সেই বনবিহারীর আবক্ষ মূর্তি পেরিয়ে রাজবাড়ির প্রবেশদ্বার। রাজবাড়িটিতে বেশ কয়েকটি মহল ছিল। প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে নীচে বসত নহবৎখানা। আর বর্তমানে যেখানে ভূমি ও ভূমিসংস্কার কার্যালয়, সেখানে সেরেস্তার কাজকর্ম পরিচালিত হত। এই কার্যালয়ের মাথার উপর চারমুখবিশিষ্ট বিশাল ঘড়িটি এখনও রাজবাড়ির ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আছে। তবে যে ঘড়ির সুমধুর আওয়াজে এককালে শহরবাসীর দৈনন্দিন কাজকর্মের গতি নির্ধারিত হত তা আজ বিকল হয়ে গেছে। রাজবাড়ির রানীমহলটিতে আজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চলে। উল্লেখ করা যায় যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরিত করার অনেক আগেই রাজপরিবার কলকাতায় চলে যান।

রুচিশীল শৌখিন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন বর্ধমান রাজপরিবার। এখানকার দরবার হলে বেশ কিছু মূল্যবান তৈলচিত্র এখনও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে স্তূপীকৃত অবস্থায় বহু মূল্যবান ছবি পড়ে আছে। অন্যদিকে বর্ধমান রাজপরিবার প্রতীকরূপে রেখে গেছেন সমরচিহ্ন যাতে অঙ্কিত আছে একটি ঘোড়ার মুখ এবং নীচে দু-পাশে পা তুলে আছে দুটি ঘোড়া—মাঝে ঢাল ও দুটি তলোয়ার। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত রাজপরিবারের যোদ্ধা রূপটি সমরচিহ্নে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্ধমান রাজবাড়ির অধীন গোলাপবাগে আছে 'দারুল বাহার।' সুরম্য এই অট্টালিকাটিও দর্শকচিত্তকে সম্মোহিত করে। তবে এটির এখন প্রায় জীর্ণ দশা। গোলাপবাগে আগে রাজার চিড়িয়াখানা ছিল। বর্তমানে এর সন্নিহিত রমনাবাগানে গড়ে উঠেছে ডিয়ার পার্ক।

কার্জন গেট

১৯০৪ সালে বর্ধমান শহরে লর্ড কার্জনের আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে সুউচ্চ কার্জন গেট নির্মিত হয়। শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে চিহ্নিত এই বিশাল তোরণ নির্মাণ করেন মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব। তোরণের মাথায় অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত তিন নারীমূর্তি খুবই দৃষ্টিনন্দন। মূর্তি তিনটিতে ইউরোপীয় শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। বর্তমানে তোরণটি 'বিজয়তোরণ' নামে পরিচিত।

খক্কর শাহের সমাধি ও জুম্মা মসজিদ

সমাধি প্রাঙ্গণ ছেড়ে উত্তরদিকে হেঁটে এলে প্রথমেই পড়ে শেরশাহ-নির্মিত কালো মসজিদ। সেটি পেরিয়ে রাজবাড়ির পেছনে অবস্থিত ঐতিহাসিক জুম্মা মসজিদ ও পীর হজরত খক্কর শাহের সমাধি। একটি সরু সুড়ঙ্গ পথ ধরে পীরসাহেবের মাজারে পৌঁছানো

যায়। হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সকলের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। এমনকি বর্ধমানরাজের আদিপুরুষ আবু রায় থেকে শুরু করে সর্বশেষ উদয়চাঁদ মহতাব পর্যন্ত কোনও কাজ শুরু করার আগে তাঁর মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। আস্তানা থেকে একটু পশ্চিমে এগিয়েই পায়রাখানায় বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ। এটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দৌহিত্র আজিম উস সানের অনন্য কীর্তি। শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ দমন করতে তাঁকে বর্ধমান পাঠানো হয়েছিল।

সর্বমঙ্গলা মন্দির

বাঁকা নদীর উত্তরে শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা মন্দির শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। ভক্তসমাবেশে মন্দির চত্বরটি সবসময় গম্‌গম্ করতে থাকে। অষ্টাদশভুজা কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী মূর্তির পদতলে মহিষ এবং নিকটে অসুরের অবস্থান। মাতা নিজে সিংহাসনে উপবিষ্টা। শূলের আঘাতে অসুর নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করছেন। সর্বমঙ্গলা দেবী মন্দিরে একটি সূর্যমূর্তিও আছে। বলা হয়ে থাকে—

রাঢ় মধ্যে পুণ্য নাম হল বর্ধমান
সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে যার যশোগান।

বাস্তবিক রাঢ়ের উল্লেখযোগ্য এই দেবীমূর্তিটি এবং সর্বমঙ্গলা ঠাকুরবাড়ি যেন প্রতিদিনের তীর্থক্ষেত্র। কথিত আছে যে সতীমায়ের নাভিটি নাকি এই মন্দিরের কাছাকাছি পড়েছিল। আজও দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কাছে অবস্থিত কামান দাগা হয় বলির ক্ষণ প্রচারের জন্য।

কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির

স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে কাঞ্চননগরে অবস্থিত কঙ্কালেশ্বরী মূর্তি ও মন্দির অবশ্যই দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেবী কঙ্কালেশ্বরী, মূর্তিটি প্রকৃতপক্ষে পাথরে নির্মিত একটি অষ্টভুজা চামুণ্ডা মূর্তি। মূর্তিটি উচ্চতায় ৬ ফুট। মন্দিরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। মূর্তিটি নাকি সুদীর্ঘকাল ধরে দামোদর নদের বালির গর্ভে পড়ে ছিল। সামনের দিকটা বালিতে পুঁতে থাকায় এটি যে দেবীমূর্তি তা সকলের অজ্ঞাত ছিল। এমনকি স্থানীয় ধোপারা এটিকে সাধারণ মূর্তি ভেবে এর উপর কাপড় কাচত। এটি যে একটি দেবীমূর্তি তা সর্বপ্রথম এক রাজকর্মচারীর নজরে আসে। বাংলা ১৩২৩ সালে স্বামী কমলানন্দ পরিব্রাজক মূর্তিটিকে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুতপক্ষে নিকষ কালো পাথরের উপর ভাস্কর্যশিল্পের জীবন্ত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে কঙ্কালেশ্বরী মূর্তিটিতে। পাথরে তৈরি দেবীমূর্তির নির্মাতা যে শারীর বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তা মূর্তিটির দেহের শিরা-উপশিরা-ধমনী থেকেই স্পষ্ট হয়। মূর্তিটির মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুতন্ত্রের সমন্বয় রূপটিই প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরে জোরবাংলো পদ্ধতির অলঙ্করণ ও কারুকার্য মন্দিরের প্রাচীনত্বের দিকটিকে তুলে ধরে।

বারোদুয়ারী

নাম শুনেই বোঝা যায় এককালে এখানে ১২টি তোরণ ছিল। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া তোরণগুলির মধ্যে আজ আর একটিই অবশিষ্ট আছে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ কীর্তিচাঁদের যুদ্ধজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে কাঞ্চননগরে নির্মিত হয়েছিল সুবিশাল এই তোরণরাজি।

১০৮ শিবমন্দির

বর্ধমান স্টেশন থেকে ৩ কিমি পশ্চিমে নবাবহাটে অবস্থিত ১০৮ শিবমন্দির। তবে প্রকৃতপক্ষে এখানে ১০৯টি শিবের মন্দির আছে। দুশো বছরের বেশি সুপ্রাচীন সারিবদ্ধ এই মন্দিরগুলির নির্মাতা হিসেবে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৭৮৯ সালে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরগুলি তিনি নির্মাণ করান। মন্দিরগুলির মাঝে দুটি পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট, বেল ও আম্রকাননের ছায়াঘন পরিবেশ দর্শকদের সহজেই আকৃষ্ট করে। শিবরাত্রির সময় এখানে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে। ১০৮ শিবমন্দিরের দুশো বছর পূর্তিতে এখানে একটি যাত্রীনিবাস তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বহিরাগত পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের থাকার সুবন্দোবস্ত করা গেছে।

নিকটবর্তী তালিতগড় দুর্গে বর্গি হাঙ্গামার সময় বর্ধমান রাজ পরিবার আশ্রয় নিতেন। দু-মাইল এলাকা জুড়ে গড়টি বিস্তৃত ছিল।

কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কানন

আমূল সংস্কারের পর কৃষ্ণসায়রের নতুন নাম হয়েছে কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কানন। ১৯৯২ সালে এই নন্দন কাননের দ্বার জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কৃষ্ণসায়রের ৩৩ একর জলাশয় জুড়ে নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। ডলফিন, শুশুক, নীল তিমি, রাজহংস প্রভৃতি বোটে প্যাডেল করতে করতে নিশ্চিন্তে জলাশয়ের বুকে ঘোরা এক মনোরম অভিজ্ঞতা। আর দেশি-বিদেশি ফুলের সমারোহে 'হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।' ফায়ার বল, রঙ্গনা, গোলাপ, মর্নিং গ্লোরি, অ্যাপ্লেলা, খুরুশ, টেকোমা, পাউডার পাফ, ভুমানিয়া এবং আরও নাম-না-জানা বিচিত্র ফুলেরা যেন সকলকে হাসিমুখে স্বাগত জানায়। এখানে সর্পোদ্যানে শঙ্খচূড়, গোখরো, কেউটে, শাঁখামুটি, ময়াল, অজগর প্রভৃতি সাপ দেখেও আনন্দ পাওয়া যায়। পার্কে প্রবেশমূল্য এক টাকা হলেও সর্পোদ্যান দেখতে অতিরিক্ত ৫০ পয়সা দর্শনী লাগে। অবশ্য বোটিংয়ের জন্য মাথাপিছু ৫ টাকা হারে প্রতিটিতে চারজনের নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে।

রমনাবাগান মৃগদাব

বর্ধমান ডিয়ার পার্কের পোশাকি নাম এটি। রমনাবাগান মৃগদাবের বিশেষ আকর্ষণ অবশ্যই এর হরিণগুলি। তবে বছরখানেক আগে এখানে দুটি চিতাবাঘ আনা হয়েছে। এগুলিই এখন ডিয়ার পার্কের বাড়তি আকর্ষণ। ১৯৭৯ সালে উদ্বোধনের সময় এখানে মোট ২২টি হরিণ ছিল। সংখ্যাবৃদ্ধি হতে হতে আজ

তা পঞ্চাশের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। মৃগদাবের কৃষ্ণসার হরিণটিকে বছর দুয়েক আগে বোলপুরের বল্লভপুর মৃগ উদ্যানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পুরুষ হরিণটির কোনও সঙ্গিনী খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে মৃগদাব কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নেন। পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ঘেরা এই উদ্যানে কিছুক্ষণ হাসিমুখেই কাটানো যায়। স্বর্ণমৃগ ও চিতল হরিণের সান্নিধ্যে ছোটরা ভীষণ আনন্দ খুঁজে পায়। মৃগদাবে দর্শনী লাগে ১ টাকা।

মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল

১৯৯৪ সালের ৯ জানুয়ারি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে অত্যাধুনিক এই তারামণ্ডলের উদ্বোধন হয়। তারামণ্ডলের মূল যন্ত্রটি 'জি এস' ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেম জাপান সরকার একটি সাংস্কৃতিক অনুদানের চুক্তি অনুযায়ী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে। মোট ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রতিষ্ঠান মনোরঞ্জনের পাশাপাশি জেলার মানুষের বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। মানুষ ও মহাবিশ্ব, ডাইনোসরের পৃথিবী প্রদর্শনীর পর এখানে 'ঐ অসংখ্য সূর্য' শোটি দেখানো হচ্ছে। শীঘ্রই নতুন অন্য একটি প্রদর্শনী চালু হওয়ার অপেক্ষায়। তারামণ্ডলে আসনসংখ্যা ৯০। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সরকারিভাবে তারামণ্ডলের মালিক হলেও গো টো অপটিক্যাল (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান চালানোর দায়িত্বে আছেন। তারামণ্ডলে প্রদর্শনীর মূল্য সাধারণের জন্য ১০ টাকা ধার্য আছে। তবে তিন থেকে দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে এবং ছাত্রছাত্রীরা অগ্রিম বুকিংয়ের ভিত্তিতে ৫ টাকার বিনিময়ে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পায়। এখানে প্রতিদিন মোট ৮টি শোয়ের ব্যবস্থা আছে।

বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র

রমনাবাগানে ৫ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে বর্ধমান বিজ্ঞানকেন্দ্র। মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডলের সঙ্গে একই দিনে (৯ জানুয়ারি, ১৯৯৪) এটির উদ্বোধন হয়। এখানে রঙবেরঙের ফুল, প্রাণী ছাড়াও রয়েছে মজার প্রতিযোগিতা—জীবন্ত কঙ্কালের সঙ্গে সাইকেল প্রতিযোগিতা। আর আছে অজস্র বলের খেলা—এরা নানাভাবে খেলে চলে। খেলতে খেলতে এরা যেমন ঘণ্টা বাজায় তেমনই আবার সুরও ভেঁজে চলে। আর মহাশূন্যে ভেসে থাকা—তা-ও আছে। কম্পিউটার, ভিডিও-র যুগে যে এসব থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আরও মজার ব্যাপারের মধ্যে ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বের হওয়া, বহুরূপীর রঙ বদলের দৃশ্য, কীভাবে দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম হয় তা-ও এখানে প্রত্যক্ষ করা হয়। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন এমনকি রবিবার ও ছুটির দিনেও এই কেন্দ্র দর্শকদের জন্য খোলা থাকে। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত দেখার ব্যবস্থা। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য (কমপক্ষে দশজনের গ্রুপ) এখানে কোনও প্রদর্শনী মূল্য লাগে না। সাধারণের জন্য দর্শনী একটাকা মাত্র।

সংস্কৃতি

বর্ধমান কোর্ট কম্পাউন্ডে অবস্থিত অত্যাধুনিক এই প্রেক্ষাগৃহটির উদ্বোধন হয় ১৯৯৩ সালের ৭ নভেম্বর। কলকাতার 'নন্দন'-এর আদলে এই প্রেক্ষাগৃহটি নির্মাণে মোট ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। হলটিতে ১৪০০ আসন আছে।

কৃষক সেতু

দামোদর নদের উপর সদরঘাটে নির্মিত এই সেতু শহর তথা জেলার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে পরিগণিত। সেতুটির অলঙ্করণ ও কারুকার্য অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাস্কর রামকিংকর বেইজের এক ছাত্র সেতুটির অলঙ্করণ করেন। আদিবাসী কৃষক দম্পতি ও বাউলের মূর্তি সহজেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শীতে দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচরে চড়ুইভাতি করার আনন্দ, দূর-দূরান্ত থেকে আসা তরুণ-তরুণীদের উল্লাস জায়গাটির গুরুত্ব অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। নদীর বুকে ভাসমান নৌকায় এ সময় নৌকাবিহারও সেরে নেওয়া যায়। মাঝিদের কিছু প্রণামী দিলে তারা হাসিমুখেই এই প্রমোদ ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়।

শহর ছাড়িয়ে আরও কয়েকটি পিকনিক স্পটের পরিচয়

পাল্লা রোড

বর্ধমান-হাওড়া কর্ড লাইনে শক্তিগড়ের পরের স্টেশন পাল্লা রোড। দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচরে এখানে চড়ুইভাতির আনন্দই আলাদা। দামোদরের বাঁক এখানে স্থানটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। সেচ বিভাগের ডাকবাংলো আছে, তবে সেখানে থাকতে গেলে বর্ধমান থেকে বুকিং করতে হয়। বেশ কিছু বাংলা ছবির শুটিং হয়েছে মনোরম এই স্থানটিতে।

ওরগ্রাম

বর্ধমান-সিউড়ি বাসরুটে গুসকরার আগে পড়ে ওরগ্রাম। তবে এটি ভাতাড় থানার অধীন। বাস, লরি বা জিপে পৌঁছাতে লাগে বড়জোর ৫০ মিনিট। রোদ ছায়ায় মাখামাখি শাল, সুবাবুল, শিশু, পলাশ প্রভৃতি গাছের সবুজ হাতছানি এবং অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখর এই স্থানে শীতের চড়ুইভাতি লেগেই থাকে। এখানে বনবিভাগের রেস্ট হাউসও আছে।

আদুরিয়া

জঙ্গলমহল এলাকায় অবস্থিত অন্য একটি চড়ুইভাতির স্থান। শাল, সেগুন, পলাশ, হরিতকী, পিয়াল, মহুয়া গাছের ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশ স্থানটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। বনভোজনের সময় অনতিদূরে প্রবহমান অজয় নদের তীরে ঘোরাও এক মনোরম অভিজ্ঞতা। আদুরিয়া ফরেস্টে পৌঁছাতে গেলে পানাগড় থেকে ইলামবাজারের দিকে যে রোডটি গুসকরা গেছে সেটি ধরতে হবে। জঙ্গলমহল এলাকাতেই গৌরাঙ্গপুরে আছে ইছাই ঘোষের দেউল। গোপ রাজাদের স্মৃতিকেই এটি জাগিয়ে তোলে। বর্ধমান শহর ও মহকুমা ছাড়িয়ে এবার জেলার অন্যান্য মহকুমা শহরগুলি

পরিক্রমা করা যাক। প্রথমেই আসি কালনা শহরে। বর্ধমানের বাদামতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে কালনাগামী বাস পাওয়া যায়। এই শহরের অসংখ্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে বিশেষ কয়েকটির উল্লেখ করছি।

কালনা

১০৮ শিবমন্দির

বর্ধমানের নবাবহাটের মতো কালনা শহরেও সমসংখ্যক শিবমন্দির আছে। বর্ধমান মহারাজাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনার নিদর্শন মেলে মন্দিরগুলিতে। কালনা রাজবাড়ির কাছাকাছি এই মন্দিরগুলি বৃত্তাকারে অবস্থিত। প্রথম বৃত্তের মাঝে আরও একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের অবস্থান। প্রথম বৃত্তস্থিত মন্দিরগুলির শিবলিঙ্গগুলি একটি কালো ও অন্যটি সাদা রঙের। দ্বিতীয় বৃত্তের মধ্যে প্রতিটি মন্দিরের শিবই শুভ্র বর্ণ।

ফিরোজ শাহের মসজিদ

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহের আমলে এই বিশাল মসজিদটি নির্মিত হয়। প্রায় ৫০০ বছর আগে কালনার এই এলাকায় মুসলিম প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। তার নিদর্শন শহরের মসজিদ ও সমাধির স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

এটি ছাড়া দাঁতনকাটিতলায় মজলিশ সাহেবের মসজিদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। এখানে মোট তিনটি মসজিদের মধ্যে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন হাবসি রাজাদের তৈরি দুটি এবং নসরৎ শাহের আমলের অন্য একটি মসজিদ কালনার মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। মজলিশ সাহেবের মসজিদের খিলান এবং স্থাপত্য শিল্পের সূক্ষ্ম কাজগুলি সত্যিই দেখার মতো। মজলিশ সাহেবের দিঘির পাড়ে ১ মাঘ উত্তরায়ণের বার্ষিক মেলা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির রূপরেখাটিকেই উজ্জ্বল করে।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

বর্ধমান মহারাজ চিত্রসেন রায় ১৬৭৬ শকাব্দে এই মন্দির তৈরি করেন। সিদ্ধেশ্বরী মাতা হলেন কালনার জাগ্রত দেবী। চার চালবিশিষ্ট মন্দিরটির গঠনশৈলী খুবই সুন্দর। দেবীর দারু বিগ্রহ। মা সিদ্ধেশ্বরী চতুর্ভুজা কালীমূর্তি।

লালজি মন্দির ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্দির

লালজি মন্দিরের টেরাকোটার কাজ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। লালজি প্রথমে এক সাধক ফকিরের শিষ্য ছিলেন। তিনি লালজিকে ভোগ হিসেবে পোড়া রুটি দিতেন। প্রথানুযায়ী আজও লালজিকে ভোগের সঙ্গে পোড়া রুটি নিবেদন করা হয়। লালজির মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে। দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা লীলা কাহিনী পঞ্চগুঁড়ির সাহায্যে এখানে অঙ্কন করা হয়। এর নাম সাজি। বৃন্দাবনধাম ছাড়া অন্য কোথাও এ ধরনের চিত্রমালা দেখা যায় না।
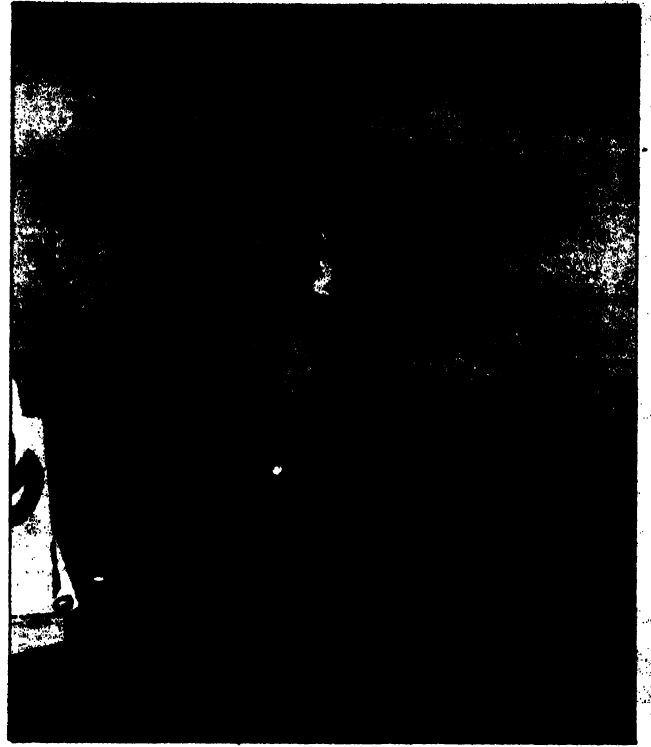
কৃষ্ণসায়র

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্দির

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ১১৫৯ বঙ্গাব্দে। ২৫ চূড়াবিশিষ্ট এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজও দর্শকদের মুগ্ধ করে। কালনা শহরে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে আছে—(১) সাধক কমলাকান্তের সাধন-ভজনের আসন, (২) মহিষমর্দিনী মাতার মন্দির, (৩) রামসীতা মন্দির, (৪) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন (তেঁতুলতলায়), (৫) শ্রীশ্রীগোপাল জিউ ও অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, (৬) সিদ্ধান্ত কালী মন্দির, (৭) শ্মশান কালী মন্দির, (৮) দোলমঞ্চ প্রভৃতি।

কাটোয়া মহকুমা

কাটোয়া

গঙ্গা ও অজয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত কাটোয়া বর্ধমানের এক মহকুমা শহর। মুসলমান শাসকদের আমলে এই শহর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। সে সময় এখানে যে দুর্গ ছিল তা থেকে নবাব আলিবর্দি বর্গি আক্রমণ প্রতিহত করেন। পরে লর্ড ক্লাইভ তা দখল করেন। প্রচলিত ধারণা এই, এখানে বসেই পলাশি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন ক্লাইভ। এখানকার গঙ্গাতীরবর্তী আমবাগানটি 'সাহেব বাগান' নামে ক্লাইভের স্মৃতিই বহন করে চলেছে। উইলিয়ম কেরির পুত্রের সমাধিও অবস্থিত এখানে। তবে মন্দির-মসজিদের স্থাপত্যশিল্প নিয়ে কাটোয়া শহর যে পর্যটকদের হাতছানি দেয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান হিসেবে এটি বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়েছে।

এ ছাড়া বড় প্রভুর আখড়া, সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির এখান অবস্থিত। শহরের শাহী মসজিদটিও শেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

শাহী মসজিদ

জাহান্দার শাহের উজির সৈয়দ শাহ আলম খান ফারুখশিয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রচুর ধনরত্ন-সহ সুদূর বাংলা মুলুকে পালিয়ে আসেন। কাটোয়ার গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থলটি মনপসন্দ হওয়ায় ১৭১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হুজরা (গোপন প্রার্থনা কক্ষ) সহ শাহী মসজিদটি নির্মাণ করেন। মুঘল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন মসজিদটিতে চোখে পড়ে। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির চার কোণে চারটি নাতিদীর্ঘ টিলা আছে। মসজিদের পশ্চিম গায়ে ফার্সি ভাষায় কালো পাথরে একটি ফলক আছে। সেটি থেকে জানা যায় ১১৪৭ হিজরিতে এর প্রতিষ্ঠা। এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন আবদুল ওয়ালি। উল্লেখ করা যায় যে শাহ আলম খানের মৃত্যুর পর মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে কানাডা প্রবাসী এক নিষ্ঠাবান মুসলমান বহু অর্থ ব্যয়ে মসজিদটির সংস্কার করেছেন।

মঙ্গলকোট

কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। আবুল ফজল রচিত 'আকবরনামা'য় মঙ্গলকোটে মোগল-পাঠান যুদ্ধও একটি দুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় গুপ্ত, পাল ও সেন আমলে মঙ্গলকোট ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী। বখতিয়ার খলজি রাজনগর অধিকার করে অজয় নদী পার হয়ে যান এবং মঙ্গলকোটের হিন্দু রাজাকে দমন করে নদিয়া অভিযান করেন। ১৮ আউলিয়ার পীঠস্থান হিসেবেও মঙ্গলকোট বিখ্যাত।

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের গুরু দানেশ মন্দের সমাধি এখানে অবস্থিত। দানেশ মন্দ নির্মিত মসজিদের অংশবিশেষ ও শিলালিপির নিদর্শন আজও এখানে দেখা যায়। এখানকার তেলিপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাধক হজরত আবদুল হামিদ বাঙালির সমাধি অবস্থিত। এ ছাড়া মঙ্গলকোটে হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ প্রতিষ্ঠিত (১৫২৪) দুটি মসজিদও বর্তমান। এক দশক আগে এখানকার কারিগর পাড়ায় ইরাকের বাগদাদ থেকে আগত এক সুফি পীরের বংশধর কর্তৃক দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক অত্যাধুনিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কবি কাদের নওয়াজের স্মৃতিধন্য বাসস্থানটিও এখানে অবস্থিত। অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির মধ্যে বিক্রমাদিত্যের ভিটে, গজনবি গাজির সমাধি, বাঁধা পুকুর, হামামখানা প্রভৃতি এখানে অবস্থিত।

কাটোয়ার অদূরে 'অজয় নদের বাঁকে' পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসস্থান আজও চোখে পড়ে। কোগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কড়ুই কবি কালিদাস রায়ের জন্মস্থান। অন্যদিকে মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস কাটোয়ার নিকটবর্তী সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাটোয়ার উত্তরে ঝামটপুর গ্রামে 'চৈতন্য চরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার পর্যটন পরিক্রমা

মাইথন

বরাকর নদের উপর মাইথন জলাধারটি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। বরাকর নদ এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে বিভাজন করেছে। মাইথন ড্যামটির উচ্চতা ১৩৬ ফুট এবং এটি ১৫,৭১২ ফুট চওড়া। বিকেলের ম্লান আলোয় নৌকাবিহার ছাড়াও জলাধারের উপর থেকে বরাকর নদের দৃশ্য অপরূপ সুন্দর লাগে। কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে এখানকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটিও পরিদর্শন করা যায়।

মাইথন বাঁধের প্রবেশ পথে পড়ে কল্যাণেশ্বরী গ্রাম। এখানকার কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের মহিমা লোকমুখে ফেরে। এ ছাড়া বরাকরের দেউলটিও দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

দুর্গাপুর

আধুনিক ভারতের 'রূঢ়' নামে পরিচিত দুর্গাপুর শিল্পনগরী। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ডি ভি সি-র অধীনস্থ দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শুরু হলে এর গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় অরণ্যাঞ্চল শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে ১৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে তৈরি হয় অত্যাধুনিক ইস্পাত কারখানা। এটি পরিদর্শনের জন্য পি আর ও, ডি এস পি-র অনুমতি লাগে। তবে ডি ভি সি ব্যারেজটি এখানে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে পরিগণিত। ব্যারেজের কাছে পর্যটন দপ্তরের লজ আছে। যুব আবাসেও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়।

রানীগঞ্জ

বর্ধমানের আর একটি বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জ মূলত কয়লা উত্তোলনের জন্য বিখ্যাত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ রেলপথটি চালু হয়। রানীগঞ্জের গির্জাটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়েছিল। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে সত্যনারায়ণ মন্দিরে সত্যনারায়ণ বিগ্রহ এবং সীতারাম মন্দিরে রাম, সীতা ও মহাবীর অবস্থান করছেন। ফরাসি পর্যটক ভিক্টর জকমোর বর্ণনা থেকে এই শহর সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়। তিনি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে রানীগঞ্জে এসেছিলেন।

আসানসোল

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অর্থনীতিতে আসানসোল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানের

মধ্যে বেশ কিছু মন্দির ও গির্জা আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দির, ছিন্নমস্তা মন্দির, শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্মশানকালী মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির প্রভৃতি বিখ্যাত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী রেল কর্মীদের জন্য এখানে একটি গির্জা নির্মিত হয়।

আসানসোল থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান চুরুলিয়ার দূরত্ব মাত্র ১১ কিমি। কাজেই এখান থেকে চুরুলিয়ায় কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুলের সমাধি এবং কবির ব্যবহৃত স্মারক দ্রব্যসংবলিত মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখা যায়। চুরুলিয়ার ৫/৬ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ চোখে পড়ে। রাজা নরোত্তমের দুর্গ বলে এটি পরিচিত। সম্ভবত মুসলিম বিজয়ের আগেই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল।

আসানসোল মহকুমার পাণ্ডবেশ্বরে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসে ছিলেন বলে প্রচলিত ধারণা। বিশাল দিঘি ছাড়াও এখানে মোট ৬টি শিবমন্দির আছে। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে অজয় নদী। পাণ্ডবেশ্বরে তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অণ্ডাল স্টেশন থেকে ১০ মাইল দূরে গোঁসাইখণ্ডের কাছে পাণ্ডুরাজের ঢিবি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

বর্ধমান জেলার আরও কিছু ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

বর্ধমান শহর : বিজয়ানন্দ বিহার, কমলাকান্ত কালীবাড়ি, বাবা বর্ধমানেশ্বর শিব।

শহর থেকে দূরে : চান্না গ্রামে শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী মন্দির, সাধক কমলাকান্তের সিদ্ধিলাভের স্থান এবং নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম।

ক্ষীরগ্রাম-সাত যোগাদ্যা দেবী মন্দির।
মশাগ্রাম-সাত দেউল যার একটিই আজ অবশিষ্ট।
মল্লসারুল-মল্লেশ্বর শিব, মল্লসারুল তাম্রপটে শ্রীবর্ধমানভুক্তির বিশেষণ আছে 'সতত ধর্মক্রিয়া বর্ধমান'।
বোরো বলরাম- বলরামের মূর্তি ভারতে অদ্বিতীয়।
কুসুমগ্রাম-চারমিনার বিশিষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মসজিদ, সঙ্গীতশিল্পী কে মল্লিকের জন্মস্থান।
দামুন্যা-কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান।
তোড়কোণা-স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী ঘোষের জন্মস্থান।
কুলীনগ্রাম-'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচয়িতা মালাধর বসুর জন্মস্থান।

বাকুলিয়া-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।
গঙ্গাটিকুরি-রসসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : 'অমৃতকণ্ঠ' বিশেষ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৯৬। 'বর্ধমান সমাচার' পত্রিকা। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি-যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী।

বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র

বর্ধমান জেলায় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের কার্যাবলী

সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্তর দশকের প্রথমার্ধে যখন পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং যুব সমাজ এই ঝড়ের মত্ততার হয়ে কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই সময় যুবকল্যাণ বিভাগের জন্ম হয়।

গঠনমূলক কাজে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ তথা সামিল করাই ছিল এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। যদিও সূচনা হয়েছিল সাদামাটাভাবেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে সারা রাজ্যে ৪০টি ব্লক যুবকেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং ৪০টি যুবকেন্দ্রে তদারকির দায়িত্বে ছিল পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত ৫টি নেহরু যুবকেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সাল থেকে বিভাগের ক্রমাগ্রগতি শুরু হয় এবং ১৯৮০ সালের মধ্যেই সারা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে এই বিভাগের বিস্তার ঘটে। ১৯৮০ সালের শেষ ভাগে নেহরু যুবকেন্দ্রের প্রশাসনিক তদারকির অবসান ঘটে এবং প্রতিটি জেলায় একজন যথোপযুক্ত প্রধান প্রশাসনিক সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নেতৃত্বে জেলা যুব অফিসগুলি খোলা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বর্ধমান জেলা তার সঠিক ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সমস্ত প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ণের কাজে সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুবসমাজের প্রতিভার প্রকৃষ্ঠ প্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়।

১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে এই জেলাতেই এ পর্যন্ত ৮৩টি খেলার মাঠের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে এবং এর সবগুলিই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। এই উন্নয়নের কাজে অর্থ জোগানো থেকে শুরু করে তদারকির সমস্ত কাজই সম্পন্ন করেছে এই অফিস।

এই সময়কালের মধ্যেই ২৩টি মুক্তমঞ্চ, যার বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, তৈরি হয়েছে এই জেলায়। উপরোক্ত দুটি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ব্যয়িত অর্থের সিংহভাগ দিয়েছে এই বিভাগ এবং সামান্য অংশ দিয়েছে স্থানীয় প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনসাধারণ। প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে সরাসরি যুক্ত করে একে গড়ে তোলা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোপরি প্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার যাতে নিয়মিত হয় তা সুনিশ্চিত করতেই জনসাধারণকে অংশভাগী করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই মুক্তমঞ্চের মধ্যে ১২টিকে কমিউনিটি হলে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। শহরের সঙ্গে তুলনায় এই প্রকল্পগুলি সর্বসুবিধাযুক্ত বলে মনে না হলেও গ্রামাঞ্চলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো জোগাতে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

আজ থেকে ২০ বছর আগেও যুবসমাজের সামনে সঠিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিগত করা কিংবা কোন ধরনের পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করলে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে সে সম্বন্ধে যথাযথ সার্বিক তথ্য উপলব্ধ হওয়া বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রায় অসম্ভব ছিল। এই অসুবিধাকে মাথায় রেখে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি ব্লকে ১টি করে ক্যারিয়ার ইনফরমেশন সেন্টার খোলা হয়। সেখান থেকে যুবসমাজকে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।

শুরুতে বর্ধমানে ১৯৮১ সালে ২৬টি ক্যারিয়ার ইনফরমেশন সেন্টার খোলা হয়েছিল এবং ১৯৮৮-৮৯ সালের মধ্যে শেষ হয়ে আজকে বর্ধমানের সমস্ত ব্লক এবং তিনটি পৌর এলাকায় এই কেন্দ্রগুলি সক্রিয় রয়েছে যা শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অচলায়তনের দূরধিগম্য বাধাকে সফলভাবে অতিক্রম করতে সাহায্য করছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ আর একটি জনপ্রিয় প্রকল্প। যে প্রকল্পের অধীনে ১৯৮১ সাল থেকে ১৩১টি স্কুলের প্রায় ৫,০০০ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে এবং গ্রামজীবনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জাতীয় জীবনধারার বৈচিত্র্যের সঙ্গে একাত্ম ও পরিচিত হতে সাহায্য করেছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে বহু যুবকের সামনে শুধুমাত্র নতুন নতুন বৃত্তির সম্ভাবনার দ্বারই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়নি, নতুনতরভাবে এমন একটি অঞ্চলে মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে যেখানে এর প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রতিটির সময়সীমা ৬ মাসের এবং বিগত ১৫ বৎসর ধরে ১০৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্তত ২,১০০ জন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র চিরাচরিত প্রকল্প যেমন জামাকাপড় তৈরি, ছুতোরের কাজ বা উল বোনা থেকে শুরু করে আজকের গৃহ-ব্যবহার্য ইলেকট্রিক দ্রব্যসামগ্রী মেরামতির মত জটিল প্রকল্প পর্যন্ত বিস্তারিত এই কার্যক্রমে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা খুঁজে পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষাদান বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতায় কমিউনিটি পলিটেকনিক স্কিমের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ কেন্দ্র খোলার বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে ভরতুকি দিয়ে প্রাথমিকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ যার মাধ্যমে গরিব অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক-যুবতীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখাই যথেষ্ট নয়, খেলাধুলার প্রতি যুবসমাজের স্বাভাবিক, সহজাত, প্রকৃতিগত ভালবাসার কথা মনে রেখে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতিটি ব্লকে ২টি করে ভিন্ন ভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ৮০-এর দশকের শেষ ভাগে তিনটি বৎসর এই প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি সর্বজনবিদিত অর্থনৈতিক অসুবিধার কারণে। বিগত ১৫ বছরে কমপক্ষে ১৫,০০০ গ্রামীণ এলাকার যুবক যুবতী এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও প্রতি বছর এই ব্লকভিত্তি খেলাধুলার প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি থেকে বাছাই করা প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে নিবিড় আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির চালানো হয়েছে জেলা স্তরে। নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি চালাতে পারলে দক্ষতার শীর্ষে পৌঁছনোর যে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করা যেত অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সেই পরিমাণ ফল লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির বহু শিক্ষার্থীই উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য 'সাই'-এর পরিচালিত বিদ্যালয়ে মনোনীত হয়ে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সাফল্যের সূচককেই নির্দেশিত করছে।

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ফুটবল ভলিবল এবং জিমন্যাস্টিকসের সাজসরঞ্জাম বিতরণ প্রতি বছরই নিয়মিত হয়ে থাকে যার বিস্তারিত বিবরণ এই ছোট পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে জেলার এমন কোনও প্রত্যন্ত প্রান্ত নেই যেখানে এই প্রকল্পের সুবিধা প্রসারিত হয়নি। যদিও চাহিদা প্রতি বৎসরই আকাশচুম্বি হচ্ছে।

বিজ্ঞান-চিন্তায় প্রসার, বিজ্ঞান প্রতিভার অন্বেষণ এবং স্ফুরণ ঘটাতে এই বিভাগ অন্য দপ্তরকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই করে আসছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের সহযোগিতায় প্রতি বৎসর বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ব্লক এবং পৌর এলাকায় শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই প্রতি বৎসর অন্তত ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনামূলক এই প্রতিযোগিতা বিজ্ঞানচিন্তার প্রসারে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং উল্লেখযোগ্য হল এই জেলার প্রতিযোগীরা রাজ্য স্তরে বহুবারই সফলকাম হয়েছে

এবং জাতীয় স্তরেও কোনও কোনও বার সফল হওয়ার কথাও সবিশেষ বিরল নয়।

আর একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হল প্রতি বৎসর বিজ্ঞান মেলা সংগঠন করা, যেখানে মাধ্যমিক স্তর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এবং বিজ্ঞান ক্লাবগুলি তাদের বিজ্ঞান মডেলগুলি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এই বিজ্ঞান মেলাকে আরও ব্যাপক এবং আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে আর্থিক সীমাবদ্ধতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সামান্য বস্তুগুলিই নতুন চিন্তাভাবনা এবং প্রয়োগের গুণে অসামান্য প্রতিভাত হয়ে থাকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নব-উন্মেষকারী প্রতিভার স্ফুরণ তথা বিকাশ ঘটায়। এই মডেলগুলির বেশ কিছু রাজ্য এবং পূর্ব ভারত বিজ্ঞান মেলায় প্রায়ই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে এবং জাতীয় স্তরেও অনেক সময় সফল হওয়ার ঘটনা কম নয়।

বিজ্ঞান এবং খেলাধুলাকে ছেড়ে এবার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আসা যাক। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল বার্ষিক ছাত্র-যুব উৎসব। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্র-যুব উৎসবের পরিধি বা ব্যাপ্তি বেড়েছে বহুগুণ। এই উৎসবকে সর্বতোভাবে সফল করে তুলতে অন্যান্য জেলার মত বর্ধমান জেলাও উল্লেখযোগ্য উদ্যম ও উৎসাহ বরাবর দেখিয়ে এসেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ৮৬ সাল এবং ১৯৯৪ থেকে বর্তমান সাল অবধি বার্ষিক এই উৎসব ব্লক এবং পৌর স্তরে শুরু হয়ে জেলা এবং রাজ্য স্তর পার হয়ে সাম্প্রতিককালে জাতীয় স্তর অবধি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বর্ধমান জেলার প্রতিযোগীরা রাজ্য স্তর অবধি বিশেষ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি এই বিভাগের কাজকর্মের ব্যাপারে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তসার। প্রতি বছরই অন্যান্য বহু অনুষ্ঠান সংগঠিত করা হয়, যেগুলি চরিত্রগত দিক থেকে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক। এগুলির মধ্যে রয়েছে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আবৃত্তি, বহু ধরনের বার্ষিক উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ইত্যাদি। যে কোনও ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠনের ক্ষেত্রে জেলা এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সরকারি দপ্তরগুলি, বেসরকারি সংগঠন, জেলা স্তরের খেলাধুলার জগতের বিভিন্ন সংগঠন, প্রশিক্ষক, বিভিন্ন যুব ও ছাত্র সংগঠন, পৌর প্রতিষ্ঠান, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অতি উৎসাহজনকভাবে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতার হাত অনুষ্ঠানগুলিকে সার্থক ও অর্থবহ করে তুলতে এ যাবৎকাল বাড়িয়ে দিয়ে এসেছে যা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞতায় সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত থাকলেও আশা-আশ্বাস, বিশ্বাস ও আনন্দের পরিসর অনেক বেশি।

ভবিষ্যৎ যেন আরও সুন্দর, সার্থক, অর্থবহ ও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে এই আশা নিয়ে শেষ করছি।

বর্ধমানের অগ্রগতিতে রাজপরিবারের ভূমিকা

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান অতি প্রাচীন নগর। অভিলেখের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্ধমান নামক 'ভুক্তি' বা প্রদেশের প্রশাসন কেন্দ্র ও প্রধান নগর ছিল বর্ধমান। যদি জৈন 'কল্পসূত্রে' উল্লেখিত মহাবীরের অস্থায়ী বাসস্থান অস্থিক গ্রামের পূর্ব নাম বর্ধমান হয়, তবে এই নগরীর প্রাচীনত্ব খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। মধ্যযুগে বাংলা সুবা বিভক্ত ছিল সরকার মহল ও পরগনায়। আকবরের আমলে সরকার সরিফাবাদের সদর কার্যালয় ছিল বর্ধমান। অবশ্য বর্তমান বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল সরিফাবাদ ছাড়াও সুলেমানাবাদের অধিকাংশ এবং মান্দারন ও সাতগাঁওয়ের কতকাংশ। ঔরঙ্গজেবের সময় বাংলা সুবা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে 'বর্ধমান চাকলা'-র অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান জেলা, হাওড়া-হুগলির অধিকাংশ, বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ, পাঞ্চেৎ রাজ্য, মেদিনীপুরের উত্তরাংশ এবং বীরভূম জেলার এক-তৃতীয়াংশ। এই চাকলাটি ৬১টি পরগনা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বর্ধমানের রাজপরিবার ছিলেন 'চাকলা বর্ধমান'-এর জমিদার। কেমন করে তাঁরা এত বিশাল জমিদারি লাভ করে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, তা আজ ইতিহাস।

বর্ধমান রাজবংশের আদিপুরুষ সঙ্গম রায় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে কোনও এক সময়ে ব্যবসায়-উপলক্ষে

পাঞ্জাব থেকে এসে বর্ধমান শহরের ১০ কিমি পূর্বে রাইপুর-বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। বল্লুকা নদীর তীরে বৈকুণ্ঠপুর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারীও ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহানের 'ফরমান'-বলে বঙ্কুবিহারীর পুত্র আবু রায় সরকার সরিফাবাদের ফৌজদারের অধীনে রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহিমপুরের রাজস্ব-আদায়কারী চৌধুরী ও নগর-কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন। আবু রায় বৈকুণ্ঠপুর থেকে চলে আসেন এবং বর্ধমানে স্থায়ীভাবে বসতি করতে শুরু করেন। আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় বর্ধমান পরগনা-সহ আরও তিনটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করেন। বাবু রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় এবং তৎস্য পুত্র কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-৯৬)।

কৃষ্ণরাম রায় আগ্রাসন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর সামরিক বলের সাহায্যে ছোট ছোট জমিদারিগুলি কুক্ষিগত করতে থাকেন। তা ছাড়া ঔরঙ্গজেবের একটি 'ফরমান'-(১৬৯৪ সাল) বলে কৃষ্ণরাম আইনত অনেকগুলি পরগনার রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। এইভাবে তাঁর জমিদারি কাঁসাই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কৃষ্ণরামের আগ্রাসন নীতিতে ভীত হয়ে বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার তালুকদার রঘুনাথ সিংহ ও ওড়িশার পাঠান শাসনকর্তা রহিম খাঁ চেতুয়া-বরদার তালুকদার শোভা সিংহের নেতৃত্বে ১৬৯৭ সালে বর্ধমান রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন। তাঁর পুত্র জগৎরাম ছদ্মবেশে বর্ধমান থেকে পালিয়ে গিয়ে ঢাকায় বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর নিকট বিদ্রোহের খবর দেন। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে শোভা সিংহ বর্ধমানে নিহত হন। কথিত আছে, তিনি কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত হলে নিহত হন। যাই হোক, ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁর পৌত্র আজিম-উস্-সান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে বর্ধমানে এসে সামরিক শিবির স্থাপন করেন। সেই সময় মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে রহিম খাঁ বর্ধমানেই নিহত হন। এইভাবে বিদ্রোহ দমিত হলে চাকলা বর্ধমানে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায় (১৬৯৯-১৭০২) তিন বছর পরে পৈতৃক জমিদারি পুনরায় প্রাপ্ত হন। সুবাদার আজিম-উস্-সানের সুপারিশক্রমে ঔরঙ্গজেব ১৬৯৯ সালে যে 'ফরমান' প্রদান করেন, তার বলে জগৎরাম রায় ৪৫টি মহল বা পরগনার রাজস্ব-আদায়কারী চৌধুরী ও জমিদাররূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

জগৎরামের জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্তিচাঁদ (১৭০২-৪০) ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত সনদ (১৭০৩ খ্রিঃ) বলে ৪৯টি মহলের জমিদারি ও চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার নবাব হলে তাঁর আনুকূল্য নিয়ে কীর্তিচাঁদ তাঁর পিতামহের আমলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে একে একে অভিযান চালিয়ে তাঁদের জমিদারি অধিকার করে নেন। বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, বরদা, চিতুয়া ও মনোহরশাহী পরগনা তাঁর অধীনস্থ হয়েছিল। ৫৭টি পরগনা নিয়ে গঠিত কীর্তিচাঁদের জমিদারি একটি রাজ্যের রূপ ধারণ করেছিল। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার সঙ্গে সন্ধি করে নবাব আলিবর্দির পক্ষে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

কীর্তিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪) সম্রাট মহম্মদ শাহ-প্রদত্ত 'ফরমান' দ্বারা ১৭৪০ সালে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। এই 'ফরমান' থেকে জানা যায়, তিনি গোপভূম পরগনার অধিকার পেয়েছিলেন। আবার, নবাব আলিবর্দি খাঁর 'ফরমান'-বলে আরসা পরগনা চিত্রসেনের জমিদারিভুক্ত হয়। জমিদারি সুরক্ষার জন্য চিত্রসেন রাজগড় ও সেনপাহাড়ীতে দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৭৪২ সালে বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার সময় তিনি প্রজাদের নিরাপত্তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে তালিতগড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটি গড় তৈরি করা হয়েছিল।

অপুত্রক চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত-পুত্র (কীর্তিচাঁদের ভ্রাতা মিত্রসেন রায়ের পুত্র) ত্রিলোকচাঁদ (১৭৪৪-৭০) বর্ধমানের জমিদার হন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদ্ভাব ছিল না। তবে মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তাতে ত্রিলোকচাঁদ খোঁচা দেননি। মীরজাফর বাংলার নবাবী পেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নদিয়া-সহ চাকলা বর্ধমানের রাজস্ব হস্তান্তর করেন (১৭৫৮)। অবশ্য কোম্পানির পক্ষে বর্ধমানের জমিদারির রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী নবাব মীরকাশিম এক সনদের দ্বারা চাকলা বর্ধমান-সহ মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানিকে দান করেন। এর ফলে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে নবাব মীরকাশিম ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ চরমে পৌঁছেছিল। ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও হলওয়েলের গভর্নর পদে নিয়োগের পর থেকে ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তবে ক্লাইভের দ্বিতীয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ত্রিলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কের ক্রমশ উন্নতি ঘটে। ১৭৬৪ সালে বাদশাহ শাহ্ আলমের এক 'ফরমান'-বলে ত্রিলোকচাঁদ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। আবার ১৭৬৮ সালে ত্রিলোকচাঁদ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি-সহ পাঁচহাজার পদাতিক ও তিনহাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি পান। কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব নীতি, দ্বৈতশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে ত্রিলোকচাঁদের রাজকোষ শূন্য হয়েছিল।

ত্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র তেজচন্দ্র রায়ের (১৭৭০-১৮৩২) অভিভাবকরূপে তাঁর মাতা মহারানী বিষনকুমারী দেবী জমিদারি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। মহারানীর প্রার্থনা অনুসারে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম তেজচন্দ্রকে 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি-সহ পাঁচহাজার পদাতিক, তিনহাজার অশ্বারোহী, কামান, সামরিক বাদ্য, ঝালরদার পাল্কি ও পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন। ১৭৭৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়ে ত্রিলোকচাঁদের আমলের

দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ব্রজকিশোর রায়কে নিযুক্ত করেন। এতে বিষনকুমারী ক্ষুব্ধ হন। ১৭৭৫ সালেই কাউন্সিলের আদেশে ব্রজকিশোরকে বরখাস্ত করে মহারানীর হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজস্ব আদায়ের নানা সমস্যা দেখা দিলে তেজচন্দ্র ও বিষনকুমারী পৃথকভাবে জমিদারি পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন। ১৭৯৮ পর্যন্ত এই বন্দোবস্ত চলেছিল। ইতিমধ্যে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। ১৭৯৯ সালে কোম্পানির নিষেধ সত্ত্বেও তেজচন্দ্র 'পত্তনিপ্রথা' প্রচলন করেন এবং ১৮১৯ সালে 'পত্তনি আইন' বিধিবদ্ধ হয়। পত্তনিপ্রথা প্রচলনের ফলে বর্ধমান জমিদারির সুদিন আবার ফিরে আসে। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বঙ্গদেশের সর্বাধিক ধনী জমিদাররূপে স্বীকৃত হন।

তেজচন্দ্রের ষষ্ঠ পত্নী নানকীকুমারীর পুত্র ছিলেন প্রতাপচাঁদ, যাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৯১ সালে। জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় প্রতাপচাঁদ তাঁর পিতামহী বিষনকুমারীর নিকট প্রতিপালিত হন। মৃত্যুকালে বিষনকুমারী তাঁর পরিচালনাধীন জমিদারি আট বছর বয়স্ক প্রতাপচাঁদের নামে উইল করে দিয়ে যান। তেজচন্দ্র এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী কাশীনাথ কাপুরের কন্যা কমলকুমারীকে বিবাহ করে কাশীনাথের পুত্র পরাণচাঁদকে তেজচন্দ্র দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এরপর থেকে তেজচন্দ্র কমলকুমারী ও পরাণচাঁদের নির্দেশে পরিচালিত হন। কমলকুমারীর চক্রান্তে ১৮২০ সালে প্রতাপচাঁদ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরের বছর তাঁর মৃত্যুর গুজব রটনা করা হয়। ১৮২৭ সালে তেজচন্দ্র পরাণচাঁদের কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এর পর পরাণচাঁদ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র চুনীলালকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করার জন্য তেজচন্দ্রকে প্রভাবিত করতে থাকেন। কিছুকাল পুত্র প্রতাপচাঁদের প্রত্যাবর্তনের আশায় থেকে অবশেষে মৃত্যুর পূর্বে তেজচন্দ্র চুনীলালকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। চুনীলাল বর্ধমান জমিদারের মালিক হয়ে মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর নামে পরিচিত হন। ১৮৩৩ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কমলকুমারীর অভিভাবকত্বে মহতাবচাঁদকে বর্ধমানের জমিদাররূপে স্বীকৃতি দান করেন। প্রতাপচাঁদ তাঁর অন্তর্ধানের ১৪ বছর পরে ১৮৩৫ সালে সন্ন্যাসীর বেশে বর্ধমানে ফিরে আসেন। তাঁকে ঘিরে শুরু হয় 'জাল প্রতাপচাঁদ মামলা'। পরাণচাঁদ কাপুরের চেষ্টায় প্রতাপচাঁদ তাঁর জমিদারির অধিকার ফিরে পাননি। ১৮৫৬ সালে প্রতাপচাঁদের মৃত্যু হলে সঙ্গম রায় প্রতিষ্ঠিত বংশের বিলুপ্তি ঘটে।

তেজচাঁদের দত্তক পুত্র মহতাবচাঁদ (১৮৩২-৭৯) পত্তনী তালুক ও কোলিয়ারি ইজারা করে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। ১৮১৯ সালে পত্তনিপ্রথা আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল এবং সেই আইনের বলে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তনিদার ও চৌপত্তনিদার নামে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়েছিল। এই শ্রেণী রাজানুগ্রহ লাভ, প্রজাশোষণ এবং গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু জনহিতকর কাজ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। বর্ধমান রাজের অধীনস্থ পত্তনিদার ছিল ২৪৪৬ জন, দরপত্তনিদার ৮১৭ জন, সেপত্তনিদার ৪৪ জন ও চৌপত্তনিদার ৫ জন।

বর্ধমানরাজ ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা করেনি। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় বর্ধমানরাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশের সহায়তা করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে মহতাবচাঁদ ব্যবস্থাপক সভার সভাপদ লাভ করেন। ১৮৭৭ সালে দিল্লির দরবারে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতসম্রাজ্ঞী'রূপে ঘোষণার সময় মহতাবচাঁদ ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে নামের আগে 'His Highnass' ব্যবহার ও ১৩টি কামান রাখার অধিকার দেওয়া হয়।

মহতাবচাঁদ পাঞ্জাব নিবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। উক্ত কেদারনাথের পুত্র ছিলেন বংশগোপাল নন্দে এবং তদীয় পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে ১৮৬৬ সালে মহতাবচাঁদ দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মপ্রসাদ মহারাজ আফতাবচাঁদ মহতাব (১৮৭৯-৮৫) নাম নিয়ে বর্ধমান জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আফতাবচাঁদের আমলে নলবিহারী কাপুর জমিদারি পরিচালনা করতেন। বনবিহারী ছিলেন তেজচাঁদের দেওয়ান পরাণচাঁদের এক পুত্র রাসবিহারীর দত্তক পুত্র। অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর সময় আফতাবচাঁদ মহতাব বনবিহারীর পুত্র বিজনবিহারীকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে যান।

আফতাবচাঁদের দত্তক পুত্র বিজনবিহারী বিজয়চাঁদ মহতাব (১৮৮৭-১৯৪১) নাম নিয়ে বর্ধমান রাজপদে আসীন হন। 'কোর্ট অব ওয়ার্ডসের' তত্ত্বাবধানে নাবালক বিজয়চাঁদের অভিভাবকরূপে বনবিহারী ম্যানেজারের পদলাভ করেন এবং ১৮৯৩ সালে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০২ সালে বিজয়চাঁদ জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে বিজয়চাঁদ দিল্লির দরবারে

'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। একই বছর লেফটেনান্ট গভর্নর বোর্ডিলিয়ন বিজয়চাঁদের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৪ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে বর্ধমানে আসেন এবং তাঁর সম্মানে শহরের প্রবেশপথে 'স্টার অব ইন্ডিয়া' ('কার্জন গেট') নামে তোরণ নির্মিত হয়। ১৯০৮ সালে বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিজয়চাঁদ 'কে সি আই ই' উপাধি লাভ করেন। ১৯০৮ সাল থেকে বর্ধমান রাজবংশ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধিটি বংশানুক্রমে ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে। ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-সহ পনেরোজন সদস্যের একটি কমিশন ভূমি রাজস্ব ও সংস্কারের জন্য গঠিত হয়। বিজয়চাঁদ মহতাব 'ফ্লাউড কমিশন'-এর বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

বিজয়চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ মহতাব (১৯৪১-৫৫) বর্ধমানের জমিদারি উত্তরাধিকারসূত্রে পান। ১৯৫৩ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন' অনুযায়ী বর্ধমান-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়। জমিদারি প্রথা বিলোপের পর উদয়চাঁদ বর্ধমানের বিপুল সম্পত্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করেন। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সালে 'মহতাব মঞ্জিল'-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদয়চাঁদ তাঁর পিতার নির্মিত কলকাতার 'বিজয় মঞ্জিল'-এ বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর সহধর্মিণী রাধারাণী দেবী কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৪ সালে ১০ অক্টোবর বর্ধমানরাজের শেষ প্রতিনিধি উদয়চাঁদের জীবন অবসান হয়, অবশ্য তাঁর বংশধরেরা এখনও বর্তমান। বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে রাজা-অনুগ্রহে লব্ধ জমিদারির ক্রমবিস্তারের ইতিহাস। প্রথমে মোগল বাদশাহ, পরে বাংলার নবাব ও ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহে জমিদারি যেমন বিস্তৃত ও কায়েম হয়েছে, তেমনই রাজস্ব আদায়কারী 'চৌধুরী' থেকে বর্ধমান জমিদারেরা হয়েছেন 'মহারাজাধিরাজ'। অবশ্য, জনহিতকর কাজও তাঁরা করেছেন। সেই কাজের ফল বর্ধমান শহরবাসী যতখানি পেয়েছেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ ততখানি পেয়েছেন কিনা, সন্দেহ থাকতে পারে।

বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষ আবু রায় সর্বপ্রথম বৈকুণ্ঠপুরের বাস ত্যাগ করে বর্ধমানে এসে বসবাস শুরু করেন। রাজবংশের বসতির ফলে বর্ধমানে জনবসতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং আধুনিক বর্ধমান নগরীর গোড়াপত্তন হয়। আবু রায়ের পৌত্র ঘনশ্যাম রায় বিখ্যাত সরোবর শ্যামসায়র খনন করান (১৬৭৪ খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় কৃষ্ণসায়র খনন করান (১৬৯১ খ্রিঃ) মহতাব চাঁদের আমলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান রাজপ্রাসাদ (রাজবাটি) 'মহতাব মঞ্জিল' নির্মিত হয়। চারিদিকে পরিখা-বেষ্টিত সুপ্রসিদ্ধ 'গোলাপবাগ' নামক রমণীয় উদ্যান তাঁর কীর্তি। বিজয়চাঁদের সময়ে গোলাপবাগের বিপরীত দিকে সুরম্য 'বিজয়ানন্দ বিহার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে দিঘি-সরোবর, প্রাসাদ ও রমণীয় উদ্যানের দ্বারা বর্ধমান নগরী সুসজ্জিত হয়ে মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধিশালী রাজধানীর রূপ ধারণ করেছিল।

দেবায়তন প্রতিষ্ঠা বর্ধমান রাজবংশের উল্লেখনীয় কীর্তি। কীর্তিচাঁদের সময় থেকে বিজয়চাঁদের আমল পর্যন্ত বর্ধমান, কাঞ্চননগর, বৈকুণ্ঠপুর, দাঁইহাট, কালনা, ক্ষীরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শিব, বিষ্ণু ও শক্তির নানা নাম ও রূপের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ৪৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তিচাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ও বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির, মহারানী বিষনকুমারীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত বর্ধমানের ১০৯ শিবমন্দির, তেজচাঁদের আমলে কালনায় প্রতিষ্ঠিত ১০৯ শিবমন্দির এবং বিজয়চাঁদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষীরগ্রামের ক্ষীরেশ্বর মন্দির। 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা'-য় এইসব দেবায়তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজও স্বীকৃত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বর্ধমানের সাধারণ মানুষ যেমন সমসাময়িক সরকার বাহাদুর তেমনই বর্ধমানরাজের দিকে সহায়তার জন্য হাত পেতেছে, এ কথা মনে করা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দামোদরের বন্যা (১৭৬৯-৭০, ১৭৮৭, ১৭৯৪, ১৮২৩, ১৮৫৫, ১৯০৫, ১৯১৩-১৪, ১৯১৬-১৮, ১৯২১, ১৯২৮, ১৯৩৩, ১৯৪৩), অনাবৃষ্টি (১৭৬৮-৬৯, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৭৪, ১৮৮৫-৮৬, ১৮৯৪, ১৯০৪, ১৯০৭, ১৯১৮-১৯, ১৯৩২, ১৯৩৪-৩৬, ১৯৪০), ঘূর্ণিঝড় (১৯৪২, ১৯৫০), ভূমিকম্প (১৮৯৪, ১৯৩৪), দুর্ভিক্ষ (১৭৭০-৭১, ১৮৬৬, ১৮৭৪, ১৯০৭, ১৯৩২, ১৯৩৫) ইত্যাদি দুর্যোগ বারবার দেখা দিয়েছে। এইসব দুর্যোগের সময়ে বর্ধমানের রাজারা প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন নিশ্চয়ই। তা না হলে বর্ধমানের জমিদারির স্বাচ্ছল্য বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

বর্ধমানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে বর্ধমানের রাজারা উদার হস্তে দান করতেন। মহতাবচন্দের সময় বর্ধমান পৌরসভার প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি বর্ধমানবাসী দরিদ্র জনসাধারণের জন্য শ্যামসায়রের তীরে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। তাঁর সময়ে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত Anglo-Vernacular Schoolটিকে বর্ধমানরাজ স্কুলে রূপান্তরিত করা হয় ১৮৫৩ সালে। আফতাবচাঁদ আশি হাজার টাকা ব্যয়ে ওই বিদ্যালয়টিকে ১৮৮১ সালে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন এবং বিনা বেতনে এল এ পর্যন্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। ওই বছর বর্ধমানবাসীর জলকষ্ট দূর করার জন্য জলের কল নির্মাণকল্পে আফতাবচাঁদ বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানকে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করেন। মহারাজ বিজয়চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ধমান ফ্রেজার হাসপাতাল (বর্তমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল), টেকনিকাল স্কুল, বন্যা থেকে রক্ষার জন্য দামোদরের বাঁধ, মেডিকেল স্কুল, সাহিত্য পরিষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। বিজয়চাঁদের সহধর্মিণী রাধারাণী দেবীর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা যেতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে নব-জাগরণের ঢেউ উঠেছিল, তার

প্রভাব বিজয়চাঁদের সময়ে বর্ধমানেও অনুভূত হয়েছিল। বর্তমান রাজকলেজ প্রাসাদ, মহিলা মহাবিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মহারাজ উদয়চাঁদের প্রচেষ্টায় ও দানে গঠিত হয়।

বর্ধমানরাজারা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কীর্তিচাঁদ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি দক্ষিণ দামোদরের কৈয়ড় নিবাসী ঘনরাম চক্রবর্তী, 'বাঁশুলি মঙ্গল' রচয়িতা মণ্ডলঘাট পরগনার আখুড়িয়া গ্রামের অধিবাসী কবি মুকুন্দ মিশ্র, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত আটঘরা-শ্রীরামপুর নিবাসী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা অকিঞ্চন চক্রবর্তী ও বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রাম নিবাসী 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবি নরসিংহ বসু। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কীর্তিচাঁদের কাছ থেকে বিস্তর নিষ্কর জমি দান হিসাবে গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংস্কৃত শ্লোকে কীর্তিচাঁদের প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। পরবর্তী জমিদার চিত্রসেন রায়ের কীর্তিকথা জানা যায় গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর রচিত 'চিত্রচম্পূ' কাব্যে এবং 'চন্দ্রাভিষেক' নামে একখানি সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায়। তেজচাঁদের সময়ে সভাকবি ও রাজগুরু ছিলেন বিখ্যাত শ্যামাসংগীত রচয়িতা সাধক কবি কমলকান্ত। তাঁর দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুর রচনা করেন 'হরিহরমঙ্গল' কাব্য। মহারাজ মহতাবচাঁদ রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ এবং চাহার দরবেশ, সেকেন্দরনামা, মসনবী আলাও প্রভৃতি ফারসি ও উর্দু আখ্যায়িকার অনুবাদ করিয়ে বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি শক্তিপদ ও কয়েকখানি সংগীতবিষয়ক পুস্তক রচনা করেছিলেন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত বহু প্রথিতযশা পণ্ডিতকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদের কাজে নিযুক্ত করা হয়। মহতাবচাঁদের সময়ে এই অনুবাদের কাজ শুরু হয় ও আফতাবচাঁদের সময় শেষ হয়। মহারাজ বিজয়চাঁদ স্বয়ং সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'ইউরোপ ভ্রমণ', 'ত্রয়োদশী', 'গায়ত্রী', 'বিজয়গীতিকা', 'Impression', 'Meditations', 'The Indian Horizon', 'Studies' প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। বিজয়চাঁদের চেষ্টায় ও বদান্যতায় বঙ্গীয় ১৩২১ সালে বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধমানরাজের প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে উৎকীর্ণ দেখা যায় Deo Credito Justician Colito, অর্থাৎ 'সুপ্রশংসিত-সুবিবেচক-সুপ্রজাপালক'। এই বিশেষণত্রয়ের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন বর্ধমানের রাজারা। বর্ধমানের অধিবাসীদের প্রগতিতে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা পালন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের কর্মকেন্দ্র অবশ্যই ছিল বর্ধমাননগরী। কলকাতার অগ্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গের যদি উন্নতি সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে বর্ধমাননগরীর অগ্রগতিতে চাকলা বর্ধমানের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

নির্বাচিত প্রমাণ-পঞ্জীর আকর

১। J. C. K. Peterson, Bengal District Gazetteers, Burdwan, Calcutta, 1910

২। রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান রাজবংশানুচরিত, বর্ধমান, ১৩২১।

৩। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯১।

৪। বিনয় ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৬।

৫। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণী, বর্ধমান, ১৩২১।

৬। বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, বর্ধমান ১৯৬৫।

৭। অশোক মিত্র (সঃ), পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ৫ম খণ্ড, নিউ দিল্লি, ১৯৭২।

৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫।

রাজ স্কুল
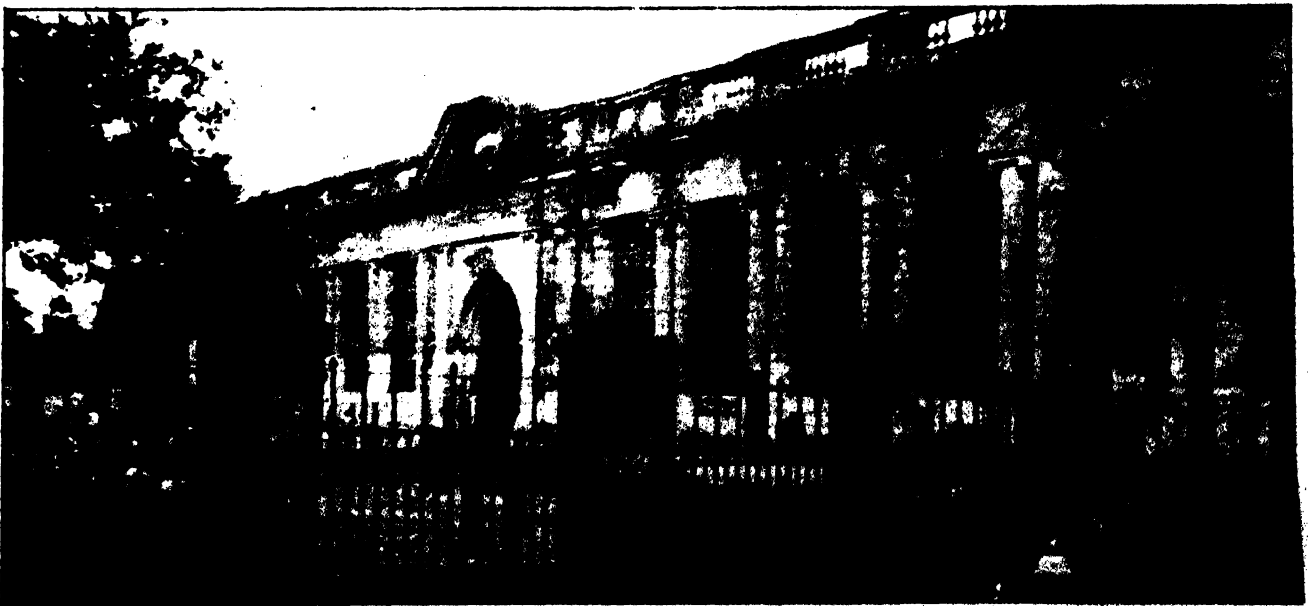
বর্ধমান জেলার শিক্ষাজগৎ

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুই সামাজিক পরিষেবার সঙ্গে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই বলতে গেলে প্রায় অস্তিত্বই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোনও সামাজিক মানুষকেই প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে কোনও-না-কোনভাবে যুক্ত হয়ে পড়তেই হয়। পঞ্চাশতম স্বাধীনতা দিবস মোটামুটি সমারোহের সঙ্গেই সারা দেশে উদযাপিত হল। এর পর এই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা বছর সারাদেশে হয়ত নানা অনুষ্ঠান লেগেই থাকবে। সঙ্গত কারণেই অনুমান করে নেওয়া যায়, জাতির জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তে সাধারণ মানুষ কিছু বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন তুলবেনই, সমীক্ষা চাইবেনই আমরা কী চেয়েছিলাম এবং এই পঞ্চাশ বছরে আমরা কী করতে পারলাম। সব থেকে বেশি করে আঙুল উঁচিয়ে মানুষ বুঝি দেখতে বা দেখাতে চাইবে এই শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য এবং ব্যর্থতার দিকগুলি। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সরাসরি এখানে আলোচনার কোনও অবকাশ নেই, এটা তার ক্ষেত্র নয়, এমনি কথায়-কথায় প্রসঙ্গটি চলে এল। আমাদের এখানে বিষয় হচ্ছে শিক্ষা এবং এই বর্ধমান জেলার শিক্ষাচিত্রটি স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসি প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে।

মূলত কৃষিভিত্তিক দেশ এই ভারতকে আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও এক গরিব দেশ বলেই অভিহিত করতে

পারি। এই অবস্থার তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের এই মন্থর গতির অনেক কারণ, আমরা সেগুলি বিশ্লেষণেও যাচ্ছি না, কিন্তু শিশুদের জন্য এই পঞ্চাশ বছরেও ন্যূনতম মানেরও প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের যে ব্যর্থতা তার সঠিক ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সারা দেশে প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষাখাতে গড় ব্যয়বরাদ্দ বা বিনিয়োগ মোট আয়ের ১৫ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা প্রায় ২৭ শতাংশ, সেখানে এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। যদিও ১৯৭৬ সালের এক আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়টি যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কথা এবং কাজের মধ্যে বরাবরই বিস্তর ফারাক থেকে যাওয়ায় উন্নয়নের ব্যাপারটি দীর্ঘকাল ধরেই গতি-মন্থরতায় ভুগছে। আমরা জানি-না, এই বিরাট গণতান্ত্রিক দেশের বিপুল সংখ্যক শিশুর অন্তত ৯০ ভাগ কতদিনে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভে সক্ষম হবে। যাই হোক, সারা দেশের কথা এখন বাদ দিয়ে আমাদের রাজ্যের দিকে একটু ফিরে তাকাই। ঠিক এই মুহূর্তে এটা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নই। এই রাজ্যের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত একজন মানুষ হিসাবে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক বিচারে এক শুভ এবং আশাপ্রদ আভাস-ইঙ্গিত সর্বত্রই লক্ষ করতে পারছি। যদিও প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতার প্রশ্নে বহু আর্থ-সামাজিক বিষয় জড়িয়ে আছে, তবু আরও বেশি সংখ্যক শিশুর অত্যাবশ্যকীয় মানের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশি আশাবাদী হয়ে ওঠার কারণ ঘটছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ এবং মানোন্নয়নের প্রশ্নে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যেই আমাদের এই আশা এবং বিশ্বাসের জন্ম।

স্বাধীনতার পর প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এক ধরনের শিক্ষাক্রম বা পাঠক্রম চালু ছিল। তা কোন দিক থেকে খারাপ ছিল, কোন দিক থেকে ভাল ছিল, সে আলোচনায় এখন যাচ্ছি না। কিন্তু তারপর যুগের প্রয়োজনে এবং পরিবর্তিত সমাজ জীবনের তাগিদ ও চাহিদার পটভূমিকায় রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োগসাধ্য প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক পাঠক্রম ১৯৮১ সাল থেকে চালু হল এই রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি এবং উপসমিতিগুলি তাদের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় এবং সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষ, সংগঠন, সংস্থা ইত্যাদির পরামর্শের ভিত্তিতে শিশুর সার্বিক বিকাশের সহায়ক এই অত্যন্ত সময়োপযোগী নতুন পাঠক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করে এবং রাজ্য সরকারের আন্তরিক উদ্যোগেই তা প্রবর্তিত হয় ১৯৮১ সাল থেকেই।

সুখের কথা, ১৫-১৬ বছর পর সেই উদ্যোগের সাফল্য এবং সার্থক রূপায়ণ এখন আমরা চোখের সামনে বহুলাংশেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি। নতুন এই পাঠক্রমের মাধ্যমে (যে পাঠক্রম নিয়ে এখনও কিছু মানুষ বিতর্ক তোলেন, মূলত হয়তো বা রাজনৈতিক কারণেই) পড়াশোনা-করে-আসা আমাদের বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা রেকর্ড নাম্বার পেয়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে। সামাজিক কোনও কর্মকাণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য পেতে গেলে সময় কিছুটা লাগে। কিন্তু আমাদের পথ-চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনা যে সঠিক তা 'প্রমাণিত' হতে দেখে আমরা খুশিও।

শিক্ষার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে, অনেক কথাই চলে আসে, এখন সে সব প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। এখন আসুন আমরা প্রথমে এই বর্ধমান জেলার প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান চিত্রটির উপর সংক্ষেপে চোখ বুলিয়ে নিই। এই প্রসঙ্গে অবতারণা শুধু কিছু শুকনো সংখ্যা, আকার-প্রকার বা পরিমাণগত তথ্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বিষয়াদির গুণগত মান এবং আরও কিছু আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক কথাবার্তাও এই আলোচনায় চলে আসাটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে।

বর্ধমান জেলার বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাচিত্র : মার্চ '৯৬-এর তথ্যাদির ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত কিছু পরিসংখ্যান।

জেলার মোট শিক্ষাচক্র (সার্কেল) : ৫৫টি।

জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীনে মোট প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৩৭৪১টি (গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ৩৪৬২ এবং শহরাঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ২৭৯)। এছাড়া জেলার কিছু পৌরসভা বা কর্পোরেশন দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত আরও বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই জেলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমে ক্রমে বহু গ্রামাঞ্চল বিজ্ঞাপিত এলাকায় বা পৌর এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যেমন বিগত বছরেই এই জেলায় নতুন দুটি পৌরসভা গঠিত হল, তার একটি মেমারী এবং অন্যটি জামুরিয়া।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের এবং জেলা শিক্ষাধিকরণের (জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়ের করণ) নিজস্ব ভবন রয়েছে, যদিও এই বিরাট জেলায় সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে এই ভবনগুলির আরও সম্প্রসারণের খুবই প্রয়োজন রয়েছে।

পরিসংখ্যান : বিদ্যালয় (জেলা সংসদের অধীনস্থ) সংক্রান্ত

	গ্রাম	শহর	মোট
১। দুই শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬১৩	৪৫	৬৫৮
২। তিন শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৫০৬	৪৭	১৫৫৩
৩। চার শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১০৪৬	৭৪	১১২০
৪। চার-এর অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৯৭	১১৩	৪১০
সর্বমোট	৩৪৬২	২৭৯	৩৭৪১

বিদ্যালয় ভবন সংক্রান্ত বিষয়ে বলা যায় যে জেলা স্তরের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেল, যদিও এখনও বিদ্যালয় কক্ষ নির্মাণ, সম্প্রসারণ, সংযোজন এবং সংস্কারের কাজ অনেক বাকি। তবু জেলার প্রায় ৮৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের কর্মোপযোগী অন্তত দুই কক্ষ বিশিষ্ট পাকা বা আধা-পাকা বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে—এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

এই প্রয়াসেরই অঙ্গ হিসাবে সাংসদের বিশেষ তহবিল থেকে এই জেলায় (এম পি কোটা) প্রায় সিংহভাগ অর্থই নতুন বিদ্যালয় ভবন, সংযোজন এবং সংস্কারের নিমিত্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিগত বছরে ৭০টি বিদ্যালয়কে অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণের জন্য ৭৫,০০০ হাজার টাকা এবং মেরামতির জন্য ৬০টি বিদ্যালয়কে ১০,০০০ হাজার টাকা করে সরকারি অর্থ জেলা পরিষদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং তার কাজ চলছে।

শহরাঞ্চলের মোট ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া জেলার আর সব বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন রয়েছে।

পরিসংখ্যান : শিক্ষক-শিক্ষিকা সংক্রান্ত

মোট শিক্ষক পদের সংখ্যা—১৪,১৬৩

কর্মরত মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা—১৩,৪৭৯

কর্মরত মোট শিক্ষক-১০,১৩৭ মোট শিক্ষিকা-৩,৩৪২

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা (ট্রেন্ড)	প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা (আনট্রেন্ড)
১১,২২২	২২৫৭
পুরুষ-৮৩৩১	পুরুষ-১৮০৬
মহিলা-২৮৯১	মহিলা-৪৫১
তফঃ জাতিভুক্ত-৬০৮	তফঃ জাতিভুক্ত-২৫৩
তফঃ উপজাতিভুক্ত-১০২	তফঃ উপজাতিভুক্ত-৭২

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ :

শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা আন্দোলন সফল করে তুলতে সমাজের সর্বস্তরের শিশুর বাস্তবসম্মত এবং চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করে তোলার জন্য ইচ্ছুক, উৎসাহী, আন্তরিক এবং অনুপ্রাণিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

পরিসংখ্যান : ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত (মার্চ '৯৬)

শ্রেণী	তফসিলি জাতি		তফসিলি উপজাতি		অন্যান্য/সাধারণ		মোট		সর্বমোট
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	
১ম	৩৩,৪০৬	২৮,১০৫	১০,০৭০	৭৯৩৮	৯৫,৩৬৭	৮১,৮৮৯	১,৩৮,৮৪৩	১,১৭,৯৩২	২,৫৬,৭৭৫
২য়	১৬,৩০২	১৪,৪৪২	৫১২৩	৪৩০৬	৬০,৪০৫	৫৩,৭৩৭	৮১,৮৩০	৭২,৪৮৫	১,৫৪,৩১৫
৩য়	১৩,১০৬	৮৫৯৮	৪৩০৬	২৮৪৩	৫৮,০৭০	৪৮,৩৬৩	৭৫,৪৮২	৫৯,৮০৪	১,৩৫২,৮৬
৪র্থ	৮১০৫	৫০৯২	৩০০৬	২১০৮	৫৩,৭৬৫	৪৭৬৬১	৬৪,৮৭৬	৫৪,৮৬১	১,১৯,৭৩৭
৫ম	১৫৬২	১১৪৩	৪৯৮	২০৯	৬৪৮৩	৩৬০৪	৬৭৪৩	৪৯৫৬	১১,৬৯৯
মোট	৭২,৪৮১	৫৭,৩৮০	২৩,০০৩	১৭,৪০৪	২,৭২,২৯০	২,৩৫,২৫৪	৩,৬৭,৭৭৪	৩,১০,০৩৮	৬,৭৭,৮১২

অনেক বিদ্যালয়েই শিশুশ্রেণী রয়েছে হয়তো বা, কিন্তু বিদ্যালয়ে আসা সেইসব শিশুদের এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়নি।

যে-সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী যুক্ত আছে, ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এখানের হিসাবে শুধু তাদেরই ধরা হয়েছে।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে কোনও-না-কোনও কারণে যথার্থ অর্থেই বিদ্যালয় পরিত্যাগকারী (ড্রপ আউট) শিশুদের সংখ্যার গড় হার এই জেলায় প্রায় ১১ শতাংশ এবং ৫ থেকে ১১ বছরের বিদ্যালয়ে আদৌ না আসা শিশুদের এলাকাভিত্তিক সংখ্যার গড় হার প্রায় ১০.৫ শতাংশ।

ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষকতার পেশায় যাঁরা আসেন তাঁদেরও যেমন উচিত দ্রুত নিজেদের তৈরি করে নেওয়া, তেমনই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্যদেরও যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-কৌশলকে সমকালীন পর্যায়ে নিয়ে আসার সুযোগ পান, তাঁদের দক্ষতা-নৈপুণ্য ইত্যাদি গুণাবলীর যথার্থ আধুনিকীকরণ ঘটাতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিকতা না গড়ে ওঠে তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশা কোনদিনই বাস্তবায়িত হতে পারে না।

এই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে, বিগত প্রায় পনেরো বছর ধরে নানা স্তরে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যেমন একদিকে বিভিন্ন ধরনের এই সব কর্মসূচির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে কর্মসূচিগুলির ধারাবাহিক সফলতা সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আকাঙ্ক্ষিত মৌলিক পরিবর্তন বহুলাংশে নিশ্চিত করেছে এবং গতিশীল শিক্ষা চিন্তা-ভাবনায় বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করতে পেরেছে। রাজ্য বা জাতীয় স্তরের সার্বিক অভিমুখীকরণ কর্মসূচিগুলির পাশাপাশি জেলা স্তরের নিজস্ব কর্মসূচিগুলিও রয়েছে। এটা পরীক্ষিত সত্য এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাও—এই ধরনের ধারাবাহিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচিগুলির প্রভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনোজগতে তাঁদের কর্মপদ্ধতিতে এবং বিদ্যালয় পরিবেশের বাস্তব দুনিয়ায় কাম্য পরিবর্তন সুস্পষ্ট—কিছু কিছু আভাস অতি সহজেই চোখে পড়ে।

এটা সকলেই জানেন, ডিগ্রিধারী মানুষ মাত্রই যে ভাল শিক্ষক হবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই তাই স্বাভাবিক কারণেই বলা হয়ে থাকে, শিক্ষক জন্মায় না, শিক্ষক হতে হয়। শিক্ষার স্বার্থে এই জেলায় তাই সঙ্গত কারণেই নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিযুক্তির পরই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসারে সঠিক প্রশিক্ষণ বা অভিমুখীকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই জেলায় এটি এখন আর বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, শিক্ষার যথাযথ মানোন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণকে এক সুষ্ঠু এবং সমন্বিত ধারাবাহিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পর্ষদ নির্দেশিত কর্মসূচি অনুসারে একধারে যেমন অভিমুখীকরণ চলছে, তেমনই আবার গত এপ্রিল '৯৬ থেকে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় জেলার সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিশেষ অভিমুখীকরণ কর্মসূচি (এস ও পি টি) রূপায়ণের কাজ সারা জেলায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন প্রকৌশল কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের পথেও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় মালদহ, বীরভূম, হুগলি, বর্ধমান জেলার তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণ এই জেলায় কাটোয়াতে গত ১৫-৭-৯৬ থেকে ২০-৭-৯৬ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণ চলে সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখ থেকে প্রায় সারা মাস এবং তারপর গত ৩-১০-৯৬ তারিখ থেকে নিবিড়ভাবে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে এই প্রকৌশলের সার্থক প্রয়োগের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়। ক্রমে ক্রমে তারপর সারা জেলায় এই কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ এবং সফল প্রয়োগ সম্ভব হবে বলে আমরা দৃঢ় আশা রাখি। প্রাথমিক শিক্ষার সঠিক মানোন্নয়নে এই কার্যক্রমকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবেই এই জেলায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নের উপর জেলা স্তরেই আলাদাভাবে পুস্তিকা ছাপিয়ে (পর্ষদের নির্দেশিকা অনুসারে) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। সারা বছরের পঠন-পাঠন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট পন্থা পদ্ধতিতে পরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে চলে এবং বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা যাতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয় সেই সঙ্গে 'পরীক্ষা আছে এবং আরও ব্যাপক ও বহুভাবে আছে'— এই চেতনাও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে ঠিকভাবে সঞ্চারিত করার জন্য বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা গেছে।

এই জেলায় বিদ্যালয়গুলির বাহ্যিক ন্যূনতম চাহিদার বিষয়টি

এই জেলায় সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের আন্তরিক এবং সর্বাত্মক সহযোগিতায় জেলা সাক্ষরতা সমিতির নেতৃত্বে সাক্ষরতা কর্মকাণ্ডেই সাফল্য শুধু সীমিত থাকেনি। এই সমিতির কর্মতৎপরতায় বহু বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়েছে, তাদের মেরামতি হয়েছে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে যথাযোগ্য শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সেখানে পঠন-পাঠনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হয়েছে। জেলা পরিষদ তথা অন্যান্য সূত্র থেকেও যদি কোনও বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে তো সেখানে বাস্তব ক্ষেত্রে ষাট-সত্তর হাজার টাকার কাজ হয়েছে। যদিও এখনও বিদ্যালয়কক্ষের সংখ্যা বাড়ানো, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু কাজ করার আছে, তবু জনসাধারণের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত এই সামাজিক অংশগ্রহণের বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে না উল্লেখ করলে সত্যিই এক ধরনের অপরাধও হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

এই বিদ্যালয় পরিদর্শন বিষয়টি এক বিশেষ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বিভিন্ন মহলে। হওয়াটাই স্বাভাবিক, বহু মানুষের মনেই এখন বদ্ধমূল ধারণা, ঠিক যথাযথভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিষয়টি বহু ক্ষেত্রেই যেন উপেক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য অনেকেই অনেক রকমের ধ্যান-ধারণা পোষণ

করেন এ ব্যাপারে। অনেকেই মনে করেন, পরিদর্শনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যেন কোনকালেই শিক্ষার কোনও স্তরেই ঠিকভাবে গড়ে ওঠেনি। বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল ছিলেন এবং আছেনও কিন্তু আগের দিনের বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা বা বোধ আমাদের অনেকের মধ্যেই কাজ করে। কিন্তু আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগের সেই পন্থা-পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কতটা সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন অনেকে এবং বিতর্কও আছে। সে যাই হোক, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক দিশা, প্রয়োজনানুগ উদ্যোগ, বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উপযুক্ত পরিকাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যথার্থ পরিদর্শন ব্যবস্থার আবশ্যিকতা সম্পর্কে আমরা কেউই দ্বিমত নই।

মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কলেজ বা আরও উচ্চশিক্ষা স্তরে এই পরিদর্শন ব্যবস্থা যে অনেকটাই অ-কার্যকর অবস্থায় রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ সত্যিই কম। তবে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপর যে অন্যবিধ বিপুল কাজের বোঝা রয়েছে, যে জন্যে তাঁদের এখন বিদ্যালয় পরিদর্শক না বলে শিক্ষা ব্যবস্থাপক বললেই বুঝি ভাল হয়। এই অবস্থা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়েছে, সে-কথা বলা মোটেই ঠিক নয়। এই বর্ধমান জেলা সম্পর্কে বলতে পারি, বহু দায়ভার থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিদর্শক যাঁদের আমরা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বা সাব-ইন্সপেক্টর অব স্কুল বলি, তাঁরা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন, সামগ্রিক বিষয়ে প্রতিবেদন জমাও দেন এবং সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে এই জেলা সংসদ বা জেলা শিক্ষাধিকরণ উপযুক্ত ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করে থাকে। সব পরিদর্শক যে সমান দক্ষতা এবং আন্তরিকতা নিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করেন বা করতে পারেন, কারও পক্ষেই সেই দাবি তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এখানে এই বিষয়টির উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়, বিভিন্ন তথ্যাদি এবং প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ এবং বিবেচনার উপর পিছিয়ে-থাকা বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য যেমন উপদেশাত্মক এবং সতর্কতাসূচক পত্রাদি দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনই ভাল বিদ্যালয়গুলিকেও সামগ্রিক বিচারে তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং আরও প্রেরণা জোগানোর জন্য প্রশংসাসূচক পত্রও দেওয়া হয়। আসলে বিষয়টিকে সুসমন্বিত এবং এক ধারাবাহিক রূপ দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস এখানে রয়েছে।

এই প্রয়াসের অঙ্গস্বরূপ ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রচেষ্টার পাশাপাশি জেলায় 'বিশেষ পরিদর্শন ব্যবস্থা' গড়ে তোলা হয়েছে। এই বিশেষ পরিদর্শক দলে থাকেন (১) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা বিজ্ঞাপিত এলাকার ভাইস-চেয়ারম্যান, (২) সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অথবা পৌর কিংবা বিজ্ঞাপিত এলাকার শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, (৩) সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষার কর্মাধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কমিশনার, (৪) অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, (৫) এলাকার কোনও উচ্চবিদ্যালয়ের একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক অথবা সহকারী শিক্ষক অথবা একজন অবসরপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষক, (৬) নির্দিষ্ট চক্র এলাকায় বা নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সদস্য।

এই ব্যবস্থাপনা বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কম-বেশি সক্রিয়। এই বিশেষ পরিদর্শক দলের সদস্যগণ বিদ্যালয়ের সুনির্দিষ্ট কোনও বিশেষ সমস্যা সমাধানেই শুধু সচেষ্ট থাকেন না, সামগ্রিকভাবে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নেও অত্যন্ত সদর্থক এবং কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপক কর্মসূচি (২২-২৭ আগস্ট, ১৯৯৬) সাফল্য সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল নজির। প্রাথমিক স্তরে এই কাজের মধ্যে কিছুটা ঢিলেমি জড়তা এবং সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তী পর্যায়ে যত্নশীল মনোভাব এবং সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেই এই কর্মসূচি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলতে সক্ষম হন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে এই কর্মসূচি আরও সফল কার্যকর এবং এক মসৃণ ধারাবাহিক রূপ পেতে পারবে—এ সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।

বিদ্যালয় স্তরে নিয়মিত খেলাধুলা এবং অন্যান্য স্তরে আন্তঃ বিদ্যালয় খেলাধুলা সংগঠন—খেলাধুলা এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যথার্থ অভিমুখীকরণের এক মস্ত সাফল্য, পঞ্চাশোর্ধ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলায় নাচ-গানে মেতে ওঠেন, তখন খেলার মাধ্যমে-আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে দেখি। বিদ্যালয় স্তর থেকে একেবারে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এখন এক বিশেষ সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে কোন কর্মকাণ্ড কতখানি সফল এবং সার্থক হয়ে উঠতে পারে এটিও তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সীমিত সরকারি অনুদানের অপেক্ষায় না থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্তরের খেলাধুলাকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

জেলা থেকে যে-সব প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যায়, বর্ধমান জেলা পরিষদের

উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় জেলা এবং রাজ্যান্তরের সুযোগ্য প্রশিক্ষকদের দ্বারা তাদের জন্য অন্তত ২০-২৫ দিনের এক নিবিড় এবং অত্যন্ত কার্যকর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় প্রতি বছরই।

আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমেই আমরা শিশুদের সার্বিক বিকাশে সফল হব যদি আমরা সকলে গৃহীত কর্মসূচিগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারি এবং বৃহত্তর সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে এই কর্মসূচিগুলির সাফল্য তুলে ধরতে পারি।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছরই কিছু না কিছু বিদ্যালয় বেড়েছে। এই আর্থিক বছরেই আমাদের জেলায় নতুন দুটি বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, ৩০টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। যদিও এ কথা স্বীকার করাটা উচিত যে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আরও বিদ্যালয়ের যুক্তিসঙ্গত দাবি আছে, কিন্তু সব দাবি একসঙ্গে পূরণ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি রাজ্য সরকারের নেই, যদিও শিক্ষা প্রসারের প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিকতার কোনও ঘাটতি নেই। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন করা সঙ্গত কিনা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা উচ্চশিক্ষা লাভে অন্তরায় হোক—এটা নিশ্চয়ই কেউ চাইবেন না।

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের জেলায় কিছু কিছু দায়িত্বশীল শিক্ষক সংগঠন শিক্ষার মানোন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। শিক্ষকদের আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলতে, এক অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলেই উদ্যোগী হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে একটি দুর্বলতার কথাও বলা দরকার, শিক্ষকদের মানোন্নয়নের স্বার্থে গত কয়েক বছর আগে যে অভিমুখীকরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

যে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি সত্তরের দশকে সামগ্রিক নৈরাজ্য ও রক্তপাতের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করেছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে—যার থেকে বর্ধমান জেলাও মুক্ত ছিল না, সরকারের সচেতন প্রয়াস এবং শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই অবস্থা থেকে বিদ্যালয়গুলি আজ মুক্ত। বিদ্যালয়গুলিতে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, নিয়মিত পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ—মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। এই অবস্থা বজায় রাখতে বর্ধমানের সচেতন, শিক্ষানুরাগী মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন কোনও দ্বীপ নয়। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তার সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়। বর্ধমান জেলাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, তার প্রশাসনিক এলাকা অবশ্য হুগলি, বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলাতে প্রসারিত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তারই জমিতে এবং তারই কর্তৃত্বাধীনে গড়ে উঠেছে বর্ধমান শহরে কৃষ্ণসায়র পরিবেশ কানন, জাপানি সহযোগিতায় সমৃদ্ধ প্ল্যানেটোরিয়াম, সায়েন্স মিউজিয়াম ও সায়েন্স সেন্টার। গড়ে উঠতে চলেছে একটি আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়াম কমপ্লেক্স। এগুলি একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বগত প্রক্রিয়াকে ও সংস্কৃতিকে উন্নত করছে।

উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও বাণিজ্য করেসপন্ডেন্স কোর্স চালু করা হয়। প্রাথমিক নানা অসুবিধাকে অতিক্রম করে এই কঠিন কাজকে সম্ভব করা হয়। প্রথম দুই বছরে যথাক্রমে ৯ হাজার ও ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সুযোগ গ্রহণ করে।

আকাদেমিক স্টাফ কলেজ ধারাবাহিকভাবে রিফ্রেশার ও ওরিয়েন্টেশন কোর্স অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৫০টি রিফ্রেশার ও ১৮টি ওরিয়েন্টেশন কোর্সে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

স্নাতক স্তরের পরীক্ষার সুসংবদ্ধ নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে। পার্ট-টু পরীক্ষাকে পার্ট-ওয়ান থেকে বিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষা গ্রহণে ও ফল প্রকাশে অনিবার্য বিলম্ব দূর করা যায়। কলেজগুলির পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা, জরুরি পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে ভিজিটিং টিম প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে পরীক্ষা গ্রহণ সুশৃঙ্খল হয়েছে।

এই জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মোট ২৬টি কলেজ আছে, মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সমেত। ১৫টি ডিগ্রি কলেজে এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের সাম্মানিক কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। সুখের বিষয়, ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার চাপে এই আর্থিক বছর থেকে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে এবং বর্ধমান শহরের সন্নিকটে গ্রাম এলাকায় হাটগোবিন্দপুরে একটি ডিগ্রি কলেজ চালু হয়েছে। এ ছাড়া জেলার ১৫টি কলেজে নতুন সাম্মানিক বিষয় ও পাঠক্রম চালু হয়েছে। কলেজগুলি হল: খাঁন্দরা কলেজ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান, শ্যামসুন্দর কলেজ, চন্দ্রপুর কলেজ, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, কাটোয়া কলেজ,

মেমারী কলেজ, রানীগঞ্জ কলেজ, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ, কালনা কলেজ, টি ডি বি কলেজ, রানীগঞ্জ, বর্ধমান রাজ কলেজ, আসানসোল গার্লস কলেজ, চিত্তরঞ্জন কলেজ।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাসগুলির অন্যতম। পঠন-পাঠনের পরিবেশ গর্ব করার মতো, যদিও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কাটিয়ে শিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বজায় রাখতে বর্ধমানের সচেতন মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই জেলার শিক্ষার ছবিটি পরিপূর্ণ হবে না, সাক্ষরতার কথা বাদ দিয়ে। তাই সাক্ষরতা অভিযানের ধারাবাহিক স্তরগুলি আমাদের উল্লেখ করতেই হবে।

অভিযানের মূল পর্যায়

১৯৯০ সাল ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উদ্‌যাপনকেই সামনে রেখে '৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ধমান জেলায় শুরু হয় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান। অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ২৬ সেপ্টেম্বর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে।

সাক্ষরতা অভিযান শুরুর আগে জেলায় মোট নিরক্ষরের সংখ্যা নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, সারা জেলায় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় একদিনে এই সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

সমীক্ষার বয়সভিত্তিতে নিরক্ষরের যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হল নিম্নরূপ :

৬ – ৯ বছরের নিরক্ষর	১,৫২,৮৩৬ জন
৯ – ১৪ বছরের নিরক্ষর	১,৭১,০০৩ জন
১৫ – ৫০ বছরের নিরক্ষর	১০,২৯,১৪০ জন
মোট নিরক্ষর	১৩,৫২,৯৭৯ জন

এই ১৩,৫২,৭৯৭ জনের মধ্যে যাদের বয়স ৬-৯ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১,৫২,৮৩৬ জন ছেলে-মেয়েকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আর ৯-১৫ বছরের নিরক্ষরদের জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত আই পি সি এল পদ্ধতির মাধ্যমে ৫ মাসের মধ্যে সকলকে সাক্ষর করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জেলার অধিবাসীদের সহযোগিতায় প্রশাসনের সর্বস্তরের এবং পঞ্চায়েতের কর্মিগণ এই অভিযানকে সফল করার জন্য নিযুক্ত হয়।

সারা জেলায় প্রায় ৪২ হাজার সাক্ষরতা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। প্রায় ১ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক পড়ানোর কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার এই এক লক্ষ প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার স্টেট রিসোর্স সেন্টারের সহযোগিতায় অত্যন্ত দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে।

এই অভিযানে পড়ুয়াদের মধ্যে মহিলাদের উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলা, হিন্দি, উর্দু এই তিনটি ভাষাতে বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতা অভিযান চলেছিল।

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যেহেতু অভিযান শুরু হয়েছিল, ১৯৯১ সালে, ফেব্রুয়ারি মাসে তা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু জানুয়ারি মাসে বিশেষজ্ঞরা একটি অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন করে অভিযানকে আরও দুমাস চালানোর পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতেই বর্ধমানে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান চলে ১৯৯১ সালের মে মাস পর্যন্ত।

অভিযানের শেষে পড়ুয়াদের একটি অন্তর্মূল্যায়ন এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা একটি বহির্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। মূল্যায়নে দেখা যায় অভিযানে অংশগ্রহণকারী ১১,৮১,৫২৭ জন নিরক্ষরের মধ্যে ৯,৮৬,৮২৪ জন জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত মান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ যাদের নিয়ে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়েছিল তাদের মধ্যে ৮২.২ শতাংশ সাক্ষর হয়েছে।

বর্ধমানের সাক্ষরতার এই সাফল্যের ভিত্তিতেই ১৯৯১ সালের ২৪ আগস্ট ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় শংকরদয়াল শর্মা বর্ধমানকে পূর্ণ সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষণা করেন। সেই সময় বর্ধমান ছিল ভারতের দ্বিতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পূর্ণ সাক্ষর জেলা।

ব্রিজ কোর্স : ২৪ আগস্ট '৯১ মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি বর্ধমানকে পূর্ণসাক্ষর জেলা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরোত্তর অভিযানেরও উদ্বোধন করেন। শুরু হয় সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের প্রথম ধাপ বা ব্রিজ কোর্স।

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে যে ব্রিজ কোর্স শুরু হয় তার উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি তিনটি।

(ক) যারা সাক্ষর হয়েছে তাদের সাক্ষরতার মানকে দৃঢ় করা অর্থাৎ পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করা।

(খ) পড়ুয়াদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

(গ) যারা নিরক্ষর রয়ে গেছে বা অল্প শিখে পড়া ছেড়ে দিয়েছে তাদের সাক্ষরতা কেন্দ্রে ফিরিয়ে এনে সাক্ষর করে তোলা।

সাক্ষরোত্তর প্রকল্প

ব্রিজ কোর্সের পরেও সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি অনুভব করে এবং বিশেষজ্ঞরাও একই অভিমত পোষণ করেন। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপ।

ব্রিজ কোর্স শেষ হওয়ার পরে জেলায় সাধারণত তিন ধরনের পড়ুয়ার সৃষ্টি হয়।

(ক) যারা স্বনির্ভর সাক্ষর।
(খ) যারা সাক্ষর কিন্তু স্বনির্ভর নয়।
(গ) যারা স্বল্প সাক্ষর বা নিরক্ষর।

পড়ুয়াদের এই বৈচিত্র্যের জন্য সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রগুলি বিন্যাস নতুনভাবে করা হয়। কেন্দ্রগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি লাইব্রেরী অংশ আর একটি আগের মতো সাক্ষরতা কেন্দ্র অংশ। বলা হল, যারা স্বনির্ভর সাক্ষর তারা লাইব্রেরি থেকে পছন্দমত বই নিয়ে নিজে নিজে লেখাপড়া করবে। আর যারা স্বনির্ভর নয় বা নিরক্ষর তারা 'সাক্ষরতা কেন্দ্র' অংশে আগের মতো স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষকের সাহায্যে লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

সাক্ষরোত্তর প্রকল্পে দ্বিতীয় ধাপের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য অভিযানকে যুক্ত করা। এই সময় থেকেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকেও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাতে অনেক প্রশাসনিক জটিলতা দূর হয়। এর বিশেষ সুফলও পাওয়া যায়। জেলায় প্রতি বছর গড়ে যেখানে ৮০-৯০ হাজার ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হত, ১৯৯১-৯২ সালে সংখ্যাটা হয় ২ লক্ষ ৫ হাজার। ১৯৯২-৯৩ সালে এই সংখ্যাটা দাঁড়াল ২ লক্ষ ৬০ হাজার মতো। এবং মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দেওয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

এই অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তির ফলে প্রাথমিক সশক্ষা পরিকাঠামোর উপর একটা বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়। জেলা সাক্ষরতা সমিতি থেকে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। জেলায় প্রায় ২০৫টি গৃহহীন স্কুলের নতুন গৃহ নির্মাণ, ৩১৬টি স্কুল গৃহের সংস্কার এবং ৭৩৭টি স্কুলের অতিরিক্ত একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুলকে প্রায় ৪ হাজার টাকা করে বইপত্র, পঠন-পাঠন উপকরণ, বসার জায়গা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। গঠন করা হয় গ্রাম এবং শহর শিক্ষা সমিতি।

সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে এই সমস্ত কাজ জেলা সাক্ষরতা সমিতি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ যৌথভাবে করে।

অনুরূপভাবে, স্বাস্থ্য অভিযানের ক্ষেত্রেও জেলায় বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ে ভিডিও ক্যাসেট তৈরি এবং সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে তা প্রদর্শন, জেলা সম্পদ কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যবিষয়ক বই, পুস্তিকা, চার্ট এবং পোস্টার প্রকাশ এবং সাক্ষরোত্তর কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আই সি ডি এস কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সাক্ষরতা কেন্দ্রের যোগাযোগ নিবিড় করা হয়। এর ফলে জেলায় স্বাস্থ্য অভিযানের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা আসে। টিকাকরণ, পরিবার কল্যাণ, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম সাফল্য আসে এবং এনকেফ্যালাইটিস ও আন্ত্রিক রোগে জেলায় আক্রান্ত এবং মৃতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

১৯৯৩ সালের মে মাসে সাক্ষরোত্তর প্রকল্পে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়।

জনশিক্ষণ নিলয়মের ধাঁচে ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্প

১৯৯৩ সালের মে মাসের পরেও বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতা অভিযান থমকে যায়নি। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও দেখা গেল বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। পাশাপাশি দেখা গেল জেলায় এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সাক্ষরোত্তর প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যেতে চান। তাই বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি নতুন একটা প্রকল্প রচনা করে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠায়।

ভারত সরকার বর্ধমান জেলার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্য এবং জেলা সাক্ষরতা সমিতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণ করে রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে বর্ধমান জেলাকে পরীক্ষামূলকভাবে জনশিক্ষণ নিলয়মের ধাঁচে এক ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন দেয়। বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি দু-বছরের জন্য এই প্রকল্পের অনুমোদন পায়।

১৯৯৪ সালের ৩০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সারা জেলায় ২ হাজার জনশিক্ষা নিলয়ম গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

জনশিক্ষণ নিলয়মের মূল উদ্দেশ্য হল

(ক) নব-সাক্ষরদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
(খ) অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে পড়ুয়ারা যাতে তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া।
(গ) ধারাবাহিক শিক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
(ঘ) জনশিক্ষণ নিলয়মগুলিতে নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চার এবং খেলাধুলা চর্চার মাধ্যমে পড়ুয়াদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা এবং জেলায় একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করা।

এই লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি থেকে বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক জনশিক্ষণ নিলয়মে লাইব্রেরির বই, চার্ট-পোস্টার, ম্যাপ,

অন্যান্য পঠন-পাঠন সামগ্রী, আলমারি, শতরঞ্জি হ্যারিকেন, খেলাধুলা এবং গান-বাজনার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

জনশিক্ষণ নিলয়ম প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাক্ষরতার কাজ-কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে যুক্তিবাদী, স্বনির্ভর, পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে জেলা সাক্ষরতা সমিতি সারা জেলাজুড়ে কতকগুলি অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। যেমন, ১৯৯৫ সালে ২৪ অক্টোবর যে সূর্যগ্রহণ হয় সেই উদ্দেশ্যে 'সূর্যগ্রহণ' '৯৫ এক বিশেষ বিজ্ঞান সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া নবসাক্ষর পড়ুয়াদের থিয়েটার গ্রুপগুলির মান উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মহকুমা স্তর এবং জেলা স্তরের নাট্য-প্রশিক্ষণের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পড়ুয়াদের ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। যেমন, ভলিবল খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ব্লকস্তরে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার সাক্ষরতার প্রথম পর্যায় হতে গ্রামস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত পড়ুয়াদের একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এখন এই প্রতিযোগিতা রাজ্যস্তর পর্যন্ত হয়। বর্ধমান জেলাতেই প্রথম পড়ুয়াদের নিয়ে এই ধরনের প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

জনশিক্ষণ নিলয়ম প্রকল্পে নিলয়মগুলিকে তথ্য বিতরণের জানালা হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যেমন—মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা, স্বল্প সঞ্চয়, একশো দিন কাজের গ্যারান্টি, আইনের সাহায্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পুস্তিকা জেলা সম্পদ কেন্দ্র থেকে প্রকাশ করে নিলয়মে পৌঁছে দেওয়া এবং তা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া স্থানীয় সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯০ সাল থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে সাক্ষরতা অভিযান চলছে তা চালাতে গিয়ে বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অনেকে স্থানীয়ভাবে নিজেদের কৌশলে এই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন। অনেকে এই পথে সফল হয়েছেন, অনেকে হননি। কিন্তু সমস্যা দূরীকরণের এই সফলতা ও বিফলতার অভিজ্ঞতা জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়নি, তৈরি হয়নি কোনও সাধারণ সূত্র। সাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জেলার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা দূরীকরণের সাধারণ সূত্রের জন্য রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর একটি সেমিনার আহ্বান করে। এই সেমিনারের ব্যবস্থাপক ছিল বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি। এই সেমিনারে জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের মন্ত্রী, অধিকর্তা, সাক্ষরতার কাজ চলছে এমন জেলাগুলির সভাধিপতি, জেলাশাসক এবং সাক্ষরতার কাজে ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত বর্ধমানে নিলয়ণ প্রকল্প একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প। তাই কখনও জেলাগতভাবে, কখনও স্থানীয়ভাবে নানা ধরনের এবং নানা বিষয়ের পরীক্ষামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে এর সময়সীমা শেষ হয়।

নতুন ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রকল্প

জনশিক্ষণ নিলয়মের ধাঁচে ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হলেও সমাজে এর চাহিদা থেকেই যায়। বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি শিক্ষার ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভব করে। তাই বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি পাঁচ বছরের জন্য নবপর্যায়ে একটি 'ধারাবাহিক শিক্ষা' প্রকল্প চালু করতে চলেছে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর '৯৬, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস থেকে এই প্রকল্পে শুভ সূচনা হবে বলে আশা করা যায়। গত ১৪ জুলাই এই উপলক্ষে বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং অধিকর্তার উপস্থিতিতে জেলার প্রশাসন, পঞ্চায়েত এবং পৌরকর্মীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

এই আলোচনাসভায় ঠিক হয় জনশিক্ষণ নিলয়ম প্রকল্পের অধিকাংশ ধারণা এই নতুন প্রকল্পেও গ্রহণ করা হবে এবং এর সঙ্গে আরও কতকগুলি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এখানে যুক্ত হবে। যেমন আগে জনশিক্ষণ নিলয়মের সঙ্গে কেবলমাত্র নবসাক্ষর পড়ুয়ারাই যুক্ত ছিলেন কিন্তু বর্তমানের এই ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে নবসাক্ষর পড়ুয়া, যারা স্কুলে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছে বা লেখা পড়া শেষ করেছে বা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি যারা লেখাপড়া করতে চান তারা ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্রে যুক্ত হতে পারবে।

জনশিক্ষণ নিলয়ম প্রকল্পে অধিকাংশ কর্মসূচি জেলা সাক্ষরতা সমিতি থেকে নেওয়া হত। কিন্তু 'ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে' তৃণমূলস্তর থেকেও প্রকল্প রচনার সুযোগ থাকবে।

ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পে দুই ধরনের শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। একহাজার শিক্ষণ কেন্দ্র অনেকটা জনশিক্ষণ নিলয়মের ধাঁচেই চলবে। অবশ্য এই কেন্দ্রগুলিতে আরও অনেক বইপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম জোগান দেওয়া হবে। এই কেন্দ্রগুলির নাম হবে 'ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্র।' এছাড়া একশো পঁচিশটি শিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে অনেকটা উচ্চমানের। এই কেন্দ্রগুলির নাম হবে 'মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্র।' 'মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্র'গুলিতে সাধারণ ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির

চেয়ে বেশি সংখ্যক বইপত্র পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চার সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। একটি মুখ্য ধারাবাহিক কেন্দ্রের অধীনে মোটামুটিভাবে আটটি সাধারণ ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে। এই সাধারণ শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি গঠনগতভাবে এবং সাংগঠনিক দিক থেকে মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

এই নতুন ধারাবাহিক শিক্ষা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল পড়ুয়ারা যাতে শিক্ষার ধারাবাহিকতার সঙ্গে অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিজেদের সমর্থ করে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

একনজরে বর্ধমান

✱ মোট জনসংখ্যা	৬০,৫০,৬০৫ জন
✱ গ্রামীণ জনসংখ্যা	৩৭,২৭,৬১৩ জন
✱ পুরুষ	২৫,৪৮,৬০৩ জন
✱ মহিলা	২২,৮৬,৭৮৫ জন
✱ ভৌগোলিক আয়তন	৭,০২৪ বর্গ কিমি
✱ গ্রাম পঞ্চায়েত	২৭৮টি
✱ পঞ্চায়েত সমিতি	৩১টি
✱ পুরসভা	৮টি
✱ কর্পোরেশন	১টি
✱ সাক্ষরতার হার	৮২.২ শতাংশ
✱ ব্যাঙ্ক (রাষ্ট্রীয়)	২৯২টি
✱ ব্যাঙ্ক শাখা	৭১টি
✱ সমবায়	৩০টি
✱ বিজ্ঞান কেন্দ্র	১টি
✱ তারামণ্ডল	১টি
✱ বিশ্ববিদ্যালয়	১টি
✱ কলেজ	২৫টি
✱ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	১২৮টি + ৫টি
✱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪০০টি + ৩০টি
✱ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৪১টি
✱ মাদ্রাসা (উচ্চ)	১১টি
✱ মাদ্রাসা (জুনিয়ার)	১৪টি
✱ মোট সংবাদপত্র	১১১টি
✱ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	১৮টি (কেন্দ্রীয়-১৪ ও রাজ্য-৪)
✱ মৃৎ শিল্প	১৮৮৯টি
✱ হিমঘর	৬৯টি
✱ চালকল	১৭০টি
✱ কৃষিজমি	৭,৯২,৭৪৪ হেক্টর
✱ শস্যভূমি	৪,৬৪,৪৯৪ হেক্টর
✱ বনভূমি	৩১,০০০ হেক্টর
✱ জেলা গ্রন্থাগার	২টি
✱ গ্রামীণ গ্রন্থাগার	২৩৪টি
✱ সরকারি পাঠাগার	৩টি

মেঘনাথ সাহা তারামণ্ডল

বর্ধমান জেলার মেলা

গোপীকান্ত কোঙার

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলভুক্ত বর্ধমান জেলার মেলাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে জেলাটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। জেলার ইতিহাস; নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক কাঠামো—এক পারস্পরিক নির্ভরশীল সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এর সামগ্রিক ইতিহাস বা ঐতিহ্যকে তুলে ধরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রায় অসম্ভব হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে।

পশ্চিমবাংলার মালভূমি ও সমতলভূমির মিলনস্থল হিসাবে উত্তরে বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ও অজয় নদ, পূর্বে নদিয়া জেলা ও ভাগীরথী নদী, পশ্চিমে বিহারের পার্বত্য অঞ্চল ও বরাকর নদ দিয়ে ঘেরা এই জেলাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার ; আবার জেলার পশ্চিম দিকটি আসানসোল মহকুমায় এটি প্রস্থে গড়ে প্রায় ২০ কিলোমিটার মাত্র।

জেলার নাম নিয়ে যেমন বহু কাহিনী ও প্রবাদ প্রচলিত, তেমনই ইতিহাসের বহু নিদর্শন জেলার বিভিন্ন অংশে সুপ্রচুরভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিক নিয়মে বহু নিদর্শন আজ অবলুপ্তির পথে গেলেও কিছু কিছু উল্লেখের দাবি রাখে। জামালপুর থানায় মশাগ্রামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের মুদ্রা, গলসির কাছে মল্লসারুল গ্রামে আবিষ্কৃত রাজা বিজয়সেনের পট্টশাসন, অজয় নদের তীরে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' নামক স্থানে প্রাপ্ত

মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার সভ্যতার সমসাময়িক নিদর্শন, মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর নিদর্শন ইত্যাদি উল্লেখের দাবি রাখে। তা ছাড়া বর্ধমানের ইতিহাসযুক্ত হয়েছে মুসলমান রাজত্বকালে ও ইংরেজ শাসনকালে বহু সুলতান, মোগলরাজ ও বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে। আবার জেলার বিভিন্ন স্থানে দেবদেবীর মন্দির, মসজিদ, পুষ্করিণী, শিল্পকীর্তি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে জেলার ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির নিদর্শন জড়িয়ে রয়েছে। জেলার পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গড় (দুর্গ) যেমন সমুদ্রগড়, সিমলাগড়, সাঁকটিগড় (শক্তিগড়), তেলিয়াগড় (তালিতগড়), অমরারগড়, পানাগড়, রাজগড়, রানীগঞ্জের কাছে শেরগড়, দিসেরগড় ইত্যাদি এবং নরপালগড় (কামারকিতার কাছে), গড় সোনারডাঙা, কুলীন গ্রামের গড়, কালনার গড় ইত্যাদি নামগুলি জেলার ঐতিহাসিক দিকটিতে বিশেষ উপাদন জোগায়। বর্ধমান শহর এলাকার রানীগঞ্জ, কেশবগঞ্জ, আদমগঞ্জ, নতুনগঞ্জ ইত্যাদি গঞ্জ, জোড়হাট, টিকারহাট, নবাবহাট, কোটালহাট ইত্যাদি হাট, লাকুড্ডি, কাঞ্চননগর ইত্যাদি নামগুলি দামোদর ও বল্লুকা বেষ্টিত সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাণিজ্য ইতিহাসের ইঙ্গিত বহন করছে।

জেলার পূর্বাঞ্চলের সামাজিক কাঠামো ও সভ্যতা মূলত গ্রাম ও পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এবং সেখানে ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে বর্তমানের ভাবধারা স্বল্প পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হলেও সনাতন সংস্কারভিত্তিক ব্যবস্থা আজও অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক জীবন নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বলা যায় না। অপরদিকে শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষদের সামাজিক জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিল্পপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক জীবন এক মিশ্র সমাজনীতির পরিচয় দেয়। এককথায় পল্লী ও নগরজীবনের দ্বৈত রূপের সন্ধান এখানে মেলে।

জাতিগত বৈচিত্র্যও জেলাটিতে প্রচুর। হিন্দু, অহিন্দু, অর্ধহিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদির একত্র বসবাস ও মিশ্রণ, সংহতি ও সমন্বয় এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের সন্ধান দেয়। বহিরাগতদের পাশাপাশি নতুন নতুন জাতির সৃষ্টি, বিজিত জাতির প্রাধান্য, জাতির পরিবর্তন, স্থানান্তরে গমন ও বসবাস, আবার ভ্রষ্ট হওয়া বা শুদ্ধ আচার গ্রহণ করা, অসবর্ণ বিবাহ, মুক্ত-বিবাহ প্রথার প্রসার ইত্যাদি লক্ষণীয়। এককথায় সংমিশ্রণ, সংহতি, সমন্বয় ও সহাবস্থান এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে বাঙালি ও অবাঙালি সম্প্রদায়ের সহাবস্থানে এক মিশ্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। মালিক শ্রেণীর জীবনে রয়েছে আর্থিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগবিলাসের আধিক্য; অপরদিকে শ্রমিকশ্রেণী অনাড়ম্বর, আমোদ ও উত্তেজনাবহুল, অপরিণামদর্শী, সুরাসক্ত জীবনে অভ্যস্ত। এ ছাড়া ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক জীবন প্রবাহিত হয় শান্তিপূর্ণভাবে, হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিবেচনা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। অপরদিকে জেলার পূর্বাঞ্চলে যার সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক তার সভ্যতা মূলত গ্রাম বা পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই সমাজে দুটি শ্রেণী—জমির মালিক এবং ভূমিহীন কৃষিজীবী। এ ছাড়া স্বল্প জমির মালিক রয়েছেন যাঁরা জীবন- সংগ্রামে চাকুরি বা ব্যবসায় নিযুক্ত। এককথায় পল্লীজীবনে মধ্যবিত্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে থাকলেও গ্রাম্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বলা চলে না।

নদনদী বেষ্টিত ও বিধৌত আলোচ্য জেলাটির সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ এক বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলন, মিশ্রণ ও সমন্বয় (Cultural Synthesis) অনেকাংশে সম্ভব করেছে। জেলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্নতা, বিশিষ্টতা, ঐক্য এবং ঐতিহ্য সৃষ্টির ইতিহাসে উপাদান জুগিয়েছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সহনশীল মানুষের বিভিন্ন কালের জীবনযাত্রা, ধ্যানধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মশাসন ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে, দেবদেবীকে কেন্দ্র করে (ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যাদেবী, জামালপুরে বুড়োরাজ ইত্যাদি) এক বিশেষ সাংস্কৃতিক মণ্ডল গড়ে তুলেছিল। এককথায় পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ধর্মগত ও শ্রেণীগত বা গোষ্ঠীগত পার্থক্য যতই থাক না কেন এগুলির মধ্যে দিয়ে পরমতসহিষ্ণুতা জাগানো বা লৌকিক আবেদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণে পরিবর্তনের আবশ্যকতায় সামাজিক কাঠামো এবং তজ্জনিত মানসিকতার পরিবর্তনে তাদের সংস্কৃতির ধারাটি উত্থান-পতন, জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তনের পথে গতিশীলতা লাভ করেছে।

ধর্মের বিভিন্নতায় জেলাটিতে একদিকে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, আদিবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষ, অপরদিকে আর্য-অনার্য, দেশি-বিদেশি ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে অনেকাংশে প্রয়াস পেয়েছে, কেউ কাউকে গ্রাস করতে পারেনি।

ধর্মপ্রাণ বাঙালির সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, আনন্দ-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত দিকই অনেকাংশে ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃজিত হয়েছে, পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বহু উৎসব ও মেলা মূলত পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়কে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং এদের লৌকিক আবেদন কম নয়। মানুষের বিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাসের ভিত্তিতে যেমন বহু বিচিত্রধর্মী দেবদেবীর ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল, আবার তেমনই সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি সংঘাত, সংমিশ্রণ, সমন্বয় ও সহাবস্থান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আদি-আর্য-অনার্য, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, শৈব-শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য, বাঙালি-অবাঙালি, এমন কী হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মিশ্র রূপটি বিরল নয়।

উৎসবপ্রিয় বাঙালির উৎসব 'বারোমাসে তেরো' নয়—বহু। জেলায় গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই কোনও-না-কোনও দেবদেবী (অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ বা লৌকিক দেবদেবী), কোনও মহাপুরুষ বা সিদ্ধপুরুষের কাহিনী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বছরের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট দিনে বা তিথিতে উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় এবং এরই সূত্র ধরে ছোটবড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উৎসব ও মেলাগুলির উৎপত্তি এবং ইতিহাস সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিরূপণ করা আজ প্রায় অসম্ভব। লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ ও বিশ্বাস এবং উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এবং স্থানীয়ভাবে ধ্বংসোন্মুখ স্থাপত্যের উপর ভিত্তি করে এটি অনুমানসাপেক্ষ। প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্য ও ভয়জনিত প্রভাবে বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন স্থানে কোথাও গ্রাম্য দেবদেবী বা লৌকিক দেবদেবীরূপে পূজা পেয়ে আসছেন। গ্রাম্য দেবদেবী প্রতিষ্ঠার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস। ব্রাহ্মণদের পূজা পাওয়ার জন্য এদের অপেক্ষা করতে হয়নি, সনাতন ধর্মের ব্রাহ্মণগণ অনেক ক্ষেত্রে তাদের যজমানের দল বাড়াবার উদ্দেশ্যে বা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিংবা উদারতাবশত লৌকিক দেবতা ও ধর্মবিশ্বাসকে নিজেদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলাগুলির প্রধান উপলক্ষ পূজাপার্বণ ও লৌকিক দেবদেবীর আচার-অনুষ্ঠানে উপাস্য প্রতিমা ও মূর্তির বৈচিত্র্য, বিশেষ ধরনের জাতিগত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য, প্রধান অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায় কর্তৃক উৎসব সংঘটনের বিষয়, উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান ও মেলা পরিচালনায় প্রতিটি অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়ের ভূমিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সুপ্রচুর। একই সঙ্গে সন্ধান মিলবে সংঘাত ও সংহতি বা সমন্বয়ের। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অবতীর্ণ না হয়ে সাধারণভাবে বলা যায় ধর্মপূজা, বিশ্বাস ও ভক্তিই পরবর্তীকালে শিবপূজা, কালীপূজা ও শক্তিপূজার অভ্যাস ও ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রেই গড়ে তুলেছিল এবং হিন্দু মেলা ও উৎসবের দ্বারা তা স্থানচ্যুত হয়েছে। পুরোহিতরা শিব, ধর্ম ও মনসা পূজা পৌরোহিত্য করে আত্মসম্প্রদায়ের পরিচয় অক্ষুন্ন রেখেছে। মনসা ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর উৎসবগুলি হিন্দুপূজা ও উৎসবগুলির প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে নিজেদের অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রেখেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুপূজা ও উৎসবকে তাদের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য করেছে। আদি-বৈষ্ণবীয় প্রেরণা অনুযায়ী উৎসবগুলি পরবর্তীকালে বা বর্তমানে তাদের উৎসব ও মেলাতে ধর্মবিশ্বাস, জাতি ও অন্যান্য সম্পর্ক-নির্বিশেষে সর্বাধিক সংখ্যক অংশগ্রহণের জন্য সকলকে মিলিত করতে চেষ্টা করেছে। আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলাগুলি অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করেছে। বিশেষ তিথিতে স্নান বা পুণ্যস্নানের মেলাগুলি এবং বর্তমানকালে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত মেলাগুলি একটি সর্বজনের পাত্র হিসাবে গড়ে ওঠায় প্রবৃত্ত। অপরদিকে আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলাগুলি এখনও অনেকাংশে বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ন, পুরোহিতদের ভূমিকা, পূজা-পদ্ধতি, পারস্পরিক সম্পর্কও স্বাতন্ত্র্য, আত্মনির্ভরতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা, সহাবস্থান ইত্যাদির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন।

জেলার মেলাগুলির উপলক্ষ্য বা বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে যে রূপটি পাওয়া যায় তা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষিত হল :

(ক)	শিবপূজা, শিবরাত্রি, শিবের গাজন বা চড়ক উপলক্ষে প্রায়	:	৬০টি মেলা
(খ)	কালী ও শক্তিদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রায়	:	৭৫টি মেলা
(গ)	ধর্মরাজের পূজা ও গাজন উপলক্ষে প্রায়	:	৩০টি মেলা
(ঘ)	লৌকিক ও গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা ও উৎসব উপলক্ষে প্রায়	:	৫০টি মেলা
(ঙ)	মনসাপূজা ও মনসার ঝাঁপান উপলক্ষে প্রায়	:	৫০টি মেলা
(চ)	রাধাকৃষ্ণ, দোল, ঝুলন, মহাপ্রভু উৎসব ইত্যাদি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায়	:	১০০টি মেলা
(ছ)	তিথিঘটিত বা পুণ্যস্নান উপলক্ষে প্রায়	:	৩০টি মেলা
(জ)	পীর, ফকির ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবভিত্তিক প্রায়	:	৫০টি মেলা
(ঝ)	অন্যান্য উৎসব ও জন্মতিথি পালন, বড়দিন, যুব-উৎসব ইত্যাদি প্রায়	:	২৫টি মেলা
	মোট প্রায়	:	৪৭০টি মেলা

আবার উপরিউক্ত উৎসবগুলি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সময় বা একটি নিয়ম রয়েছে বলা যায়। যেমন শিবপূজার মেলাগুলি মূলত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, ধর্মরাজ পূজার মেলাগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, কালী, যোগাদ্যা, সিদ্ধেশ্বরী, গঙ্গাপূজা ইত্যাদি শক্তিপূজা-বিষয়ক মেলাগুলি মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে, মনসাপূজার মেলাগুলি মূলত জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথি বা ভাদ্র-সংক্রান্তি পর্যন্ত ; ক্ষেত্রপাল, শীতলা, পঞ্চানন, চণ্ডী ইত্যাদি গ্রাম্য ও লৌকিক দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলাগুলি মাঘ মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত ; পুণ্যস্নানের মেলাগুলি পৌষ-সংক্রান্তি বা ১ মাঘ ; মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলাগুলি মূলত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেলাগুলি প্রায় সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সুতরাং উৎসব ও মেলাগুলি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে মরসুম বা ঋতুগত দিকটিও পর্যালোচনার দাবি রাখে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে উৎসব ও মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হলেও এগুলি শুরু হয় মূলত হেমন্তের ফসল ঘরে তোলার পর। জেলার প্রধান ফসল ধান ঘরে তোলার পরেই মানুষের হাতে যে অর্থাগম হয় তার কিছুটা অংশ দিয়ে তারা তাদের জীবনের একঘেয়েমি ও অবসাদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা

করে। এ সময়েই শুরু হয় ধর্মানুষ্ঠান, উৎসব পালন, তীর্থদর্শন, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। আবার কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে কৃষি-উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় স্থানীয়ভাবে বহু দেবদেবীর পূজা-উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জামালপুরে বুড়োরাজ, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর পূজা ইত্যাদি উৎসব-অনুষ্ঠান বক্তব্যের প্রমাণ জোগায়। আবার চাষের কাজ শুরু হওয়ার আগে বা সংশ্লিষ্ট মরসুমে সর্পের দেবী মনসার পূজা-উৎসব দেবীকে ভয়ে বা ভক্তিতে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয় বলা যায়। তাই জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা থেকে শুরু করে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত মনসাপূজা উপলক্ষে বহু উৎসব-অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। টুশগ্রাম, মণ্ডলগ্রাম, নারকেলডাঙা, ঝাঁপানডাঙা, সাতগাছিয়া ইত্যাদি স্থানের কথা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

মরশুমি বা ঋতুগত দিকটি ছাড়াও মেলার উপলক্ষ্য বা উৎসব-অনুষ্ঠানের বিষয়গুলির আঞ্চলিক দিকটিও উল্লেখযোগ্য। যেমন শিবপূজা উপলক্ষে মেলাগুলির আধিক্য রয়েছে বর্ধমান সদর, মেমারি, মন্তেশ্বর, কালনা, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, আউসগ্রাম, অণ্ডাল, কুলটি ইত্যাদি থানা অঞ্চলে। ধর্মপূজা উপলক্ষে মেলাগুলির আধিক্য রয়েছে মেমারি, মন্তেশ্বর, ভাতার, পূর্বস্থলি প্রভৃতি থানা এলাকায়। শক্তিদেবীর পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হলেও রায়না ও জামালপুর থানার উল্লেখযোগ্য আধিক্য রয়েছে এবং ভাতার ও কেতুগ্রাম থানায় আংশিক প্রাধান্য রয়েছে। মনসাপূজা উপলক্ষে মেলাগুলির আধিক্য রয়েছে ভাগীরথী নদী তীরবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ কালনা, কাটোয়া, মেমারি ইত্যাদি স্থানে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলাগুলির আধিক্য রয়েছে অজয় ও ভাগীরথী নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, অর্থাৎ কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলি, কালনা ইত্যাদি থানা এলাকায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মেলাগুলি বর্ধমান সদর, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, ভাতার, কালনা, মেমারি ইত্যাদি স্থানে বেশি অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেলেও কাঁকসা, রানিগঞ্জ, আসানসোল, রায়না ইত্যাদি স্থানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উৎসব ও মেলাগুলি জেলার অন্যান্য অংশে অনুষ্ঠিত হলেও জামুরিয়া, কুলটি, সালানপুর ইত্যাদি স্থানে এগুলির প্রাধান্য রয়েছে। গ্রাম্য ও লৌকিক দেব-দেবীর উৎসব-তিথিপালন বা মহাপুরুষের জন্মদিন জনিত উৎসবের মেলাগুলি জেলার প্রায় সর্বত্র কম-বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ঋতুগত বা মরশুমগত বিশ্লেষণে জেলার উৎসব ও মেলাগুলি সংঘটনের ঘনত্ব বিচার করা যেতে পারে। সমীক্ষিত মেলাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নীচে দেখানো হল।

(১)	উচ্চঋতুগত ঘনত্ব	ফাল্গুন - ৯০টি চৈত্র - ৬০টি	মোট - ১৫০টি
(২)	মধ্যঋতুগত ঘনত্ব	বৈশাখ - ২৯টি জ্যৈষ্ঠ - ৩৫টি আষাঢ় - ৫১টি	মোট - ১১৫টি
(৩)	ক্রমবর্ধমান মধ্যঋতুগত ঘনত্ব	পৌষ - ৩০টি মাঘ - ৭৯টি	মোট - ১০৯টি
(৪)	নিম্নঋতুগত ঘনত্ব	শ্রাবণ - ১৩টি কার্তিক - ১৭টি অগ্রহায়ণ - ৪টি	মোট - ৩৪টি
(৫)	ক্রমবর্ধমান নিম্নঋতুগত ঘনত্ব	ভাদ্র - ৩৭টি আশ্বিন - ১৭টি	মোট - ৫৪টি
			মোট - ৪৬২টি

জেলার মেলাগুলি সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব, জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির সংখ্যাধিক্য ইত্যাদির উপর মেলাগুলির বৈচিত্র্য বা সংঘটনের ক্ষেত্রে এক কেন্দ্রীভবন চরিত্র লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে জেলার মেলাগুলির আঞ্চলিক গুচ্ছথানার পরিভাষায় নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যেতে পারে।

(১) প্রথম প্রধান গুচ্ছ— ১৪টি থানা

(ক) প্রচণ্ড কেন্দ্রীভবনের অন্তরতম অংশ—৪টি থানা, বর্ধমান-৬৬, মেমারি ৫৩, জামালপুর-৪৭, কালনা ৩৮, মোট—১৮৪টি মেলা

(খ) অন্তরতম কেন্দ্রের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব পরিধি—৫টি থানা, ভাতার-৩৩, মন্তেশ্বর ২২, পূর্বস্থলি ২৬, কাটোয়া-১৯, কেতুগ্রাম ২২, মোট—১২২টি মেলা

(গ) অন্তরতম কেন্দ্রের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম পরিধি —৫টি থানা, মঙ্গলকোট ১৫, আউসগ্রাম-১১, গলসী-১৪, খণ্ডঘোষ ১৫, রায়না ১৮, মোট—৭৩টি মেলা

(২) মধ্যে অবস্থিত কম সংখ্যক মেলার অঞ্চল —৬টি থানা বুদবুদ-৪, কাঁকসা-৮, ফরিদপুর ২, কোক ওভেন-০, দুর্গাপুর-২, নিউ টাউনশিপ ১, মোট—১৭টি মেলা

(৩) মধ্যবর্তী কেন্দ্রীভবনের দ্বিতীয় প্রধান গুচ্ছ— ৭টি থানা জামুরিয়া ১৫, অণ্ডাল-১৩, আসানসোল-৯, কুলটি ৯, সালানপুর-৬, চিত্তরঞ্জন-২, হীরাপুর ৬, মোট—৬০টি মেলা

(৪) দ্বিতীয় প্রধান গুচ্ছের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি বরাবনি-৪, রানীগঞ্জ ২, মোট—৬টি মেলা
মোট থানা—২৯টি, মোট মেলা—৪৬২টি।

উপরের বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে বলা যেতে পারে প্রথম প্রধান গুচ্ছটিতে আনুপাতিক হারে প্রচণ্ড জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং তার জাতিগত, ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। মধ্যবর্তী অঞ্চলটি এবং দ্বিতীয় প্রধান গুচ্ছটিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব, জাতিগত ও ধর্মীয় বিভিন্নতায় বা বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ধর্মপ্রাণ বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি এবং তার শিক্ষা, সাহিত্য, আনন্দ-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনেকাংশে ধর্মকে কেন্দ্র করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একদিকে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে প্রয়াস চালিয়েছে, অপরদিকে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং শেষে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জেলার মেলাগুলির সমীক্ষায় দেখা যায় এমন মেলা প্রায় বিরল যেখানে বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ই অংশগ্রহণ করে। দধিয়া বৈরাগীতলার মেলা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় বৈষ্ণবদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও মেলায় বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। একইভাবে বড়ডাপার মেলায় শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রায় সমান উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আবার বড়বেলুনের কালী, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা, মন্তেশ্বরে চামুণ্ডা, জামালপুরে বুড়োরাজ, মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌরী ইত্যাদি পূজার মেলাগুলি ও উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখের দাবি রাখে। মঙ্গলকোটে পীর পঞ্চাননের মেলা বা কুসুমগ্রামের মেলায় আংশিকভাবে মুসলমানদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও এখানে হিন্দুদের উপস্থিতি কম নয়। আবার বোহার, নেড়োদিঘি, কৃষ্ণপুর, সুপতা, ইবিদপুর, শিবদা, রানীগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব-অনুষ্ঠান বা পীরকে কেন্দ্র করে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হলেও এগুলিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌরী বা মনসাপূজার মেলায় অহিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের উপস্থিতি উল্লেখের দাবি রাখে। জেলার পশ্চিমাঞ্চলে রানীগঞ্জ, দিসেরগড় ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবজনিত মেলায় হিন্দুদের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে বেশি বলা যায়। এমনকি পীর মনসা বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-বহির্ভূত লোকদেরও পূজা, মানত এমনকি বলি দিতে দেখা যায়। রাইগ্রামে ও ইবিদপুরে পীরের মেলায় হিন্দু মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠান পালন সমন্বয়ের দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরে। আবার ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর পূজায় ও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জাতির লোকদের নির্দিষ্ট অংশগ্রহণের ব্যবস্থা এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে যা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও অনুধাবনযোগ্য। ক্ষীরগ্রাম ও অন্যান্য পাশাপাশি গ্রামে ডোম, হাড়ি, বাগদি, কুম্ভকার, গোয়ালা, কর্মকার, নাপিত, মালাকার, শঙ্খকার, ব্রাহ্মণ, আগুরি প্রভৃতি জাতির লোকদের নিয়ে দেবীর যে 'পরিজন' উৎসব পরিচালনায় অংশীদার তা এক বিশেষ সংস্কৃতি সমন্বয়ের ইঙ্গিত দেয়। এক কথায় মেলার উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে বৈচিত্র্য, সমন্বয় ও সহাবস্থান লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে উদারতা বা সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে বিরোধ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে এবং মিলেমিশে আপসমূলক এক সমন্বয় ঘটিয়েছে।

মেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক আলোচনা, যাত্রাগান, থিয়েটার, কবিগান, আলকাপ, লেটোগান, লোকসংগীত ইত্যাদির সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম। বর্তমান কালে যুবমেলা বা সাংস্কৃতিক মেলা ইত্যাদি স্বতন্ত্র প্রকৃতির মেলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা উক্ত সাংস্কৃতিক দিকটির আবেদনকে প্রমাণ করে। দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনে ছেদ ঘটিয়ে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এনে দেওয়া এবং 'বিভেদের মাঝে মিলন' ঘটানোর সার্থক ভূমিকা পালন করে মেলাগুলি। সামাজিকভাবেও মেলাগুলির অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেলায় ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মিলন ঘটায় এক আচার-আচরণ, আহার-বিহার ও জীবনযাত্রায় পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে জনজীবনকে প্রভাবিত করে। পল্লীবাংলার শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে এই জন ও মনের মিলন আন্তরিক, অকৃত্রিম, অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পল্লী হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।' আবার জেলার সীমান্ত অঞ্চল বরাকর থেকে শুরু করে দুর্গাপুর পর্যন্ত শহর ও শিল্পাঞ্চলের মানুষের সম্পর্ক অনেকাংশে যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। এখানে একজনের সঙ্গে একজনের মিলন অনাবিল প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ না হলেও এবং জীবনসংগ্রামের তীব্রতাজনিত সময়ের অভাব, রুটিন-জীবন, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ পরিলক্ষিত হলেও মেলায় মিলনের আনন্দলাভে উৎসাহিত। তাই রানীগঞ্জ রোনাই রোডে পীরের মেলায়, শিয়ারশোলে রথের মেলায়, আসানসোলে কালীপূজার মেলায়, বরাকরের শিবের মেলায় ইত্যাদি স্থানে জনসমাগম দেখে অবাক হতে হয়। এককথায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত মেলাগুলি বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হলেও এগুলির সামাজিক আবেদন অনস্বীকার্য। মেলাগুলিতে গঙ্গাসাগর মেলার মতো সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকলেও আঞ্চলিকভাবে আমাদের ধর্ম, সভ্যতা ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। আর এই মেলার বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলনক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমাজকে দেখতে পাই। এখানে মিলন অনেকের সঙ্গে অনেকের, মানুষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনার। মেলায় সাধারণ মানুষ আসেন তাঁর একঘেয়ে জীবনের অবসান ঘটিয়ে আনন্দ পেতে, পুণ্যার্থীরা আসেন পুণ্যলাভের আশায়, ব্যবসাদারগণ আসেন লাভের আশায়, যাত্রাওয়ালা, কথক, গায়ক প্রমুখ শিল্পীরা আসেন আনন্দ দেওয়া ও অর্থোপার্জনের জন্য, কানা, খোঁড়া, দুস্থেরা আসেন সাহায্যের আশায়, সমাজসেবীরা সেবা করার সুযোগ পান, রাজনৈতিক নেতারা আসেন স্বীয় প্রচারের লোভে, অসামাজিক ব্যক্তিরা আসে তাদের স্বার্থসিদ্ধির লোভে—অর্থাৎ মেলা হল সমাজের আয়না—যার মধ্যে সমাজের সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে। সময়ের পরিবর্তনে এবং সামাজিক বিবর্তনে মেলাগুলির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ না হলেও মানুষের অমর ইচ্ছাশক্তি আজও সামাজিক ক্ষেত্রে এই ধারাটিকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই আজও উৎসব-অনুষ্ঠান বা মেলাগুলিকে কেন্দ্র করে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার

প্রয়াস অক্ষুন্ন রয়েছে। দধিয়া বৈরাগীতলার মেলা, জামালপুরে বুড়োরাজের মেলা, কুড়মুনে শিবের গাজনের মেলা, ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা পূজার মেলা, মণ্ডলগ্রামে জগৎগৌরী পূজার মেলা, চোৎখণ্ডের ঝাঁপান মেলা, কাটোয়ার কার্তিক পূজার মেলা ইত্যাদি মেলাগুলি বক্তব্যের প্রমাণ জোগায়।

জেলার সভ্যতা ও অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও শহর ও শিল্পাঞ্চলের দাবি সমভাবে প্রযোজ্য। গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকার মেলাগুলিতে জনসমাবেশ বা পুণ্যার্থী বাড়াবার জন্য একদিকে দেবদেবীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণের চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে ঔষধ দেওয়া বা অলৌকিক কোনও ক্ষমতা জুড়ে দেওয়া, বিভিন্ন প্রবাদ চালু রাখা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। আবার অন্যদিকে উৎসব ও পূজাপার্বণের মধ্য দিয়ে পুণ্যার্থীকে ক্রেতায় পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে। গ্রাম্য জীবনে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মেলাগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আঞ্চলিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির কেন্দ্র ছিল মূলত মেলাগুলি। উদাহরণ হিসাবে মণ্ডলগ্রাম ও শুশুনিয়ার মেলায় কাঁঠাল, চোৎখণ্ড ও শোনের হাট (পূর্বস্থলি) মেলায় চারাগাছ, দধিয়া বৈরাগীতলার মেলার গরুর গাড়ির চাকা, কুড়মুন, বোহার ইত্যাদি গ্রামের মেলায় কাঠের তৈরি দরজা-জানলা ইত্যাদি বিক্রির কথা উল্লেখের দাবি রাখে। তা ছাড়া গ্রামে উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী—টুকুই, বাঁশের ঝুড়ি, পেতে, মোড়া, মাঞ্জাল, মাটির হাঁড়ি, খেলনা, পুতুল ইত্যাদির কারিগররা বিক্রির সুযোগ পান। আবার শহরাঞ্চলে মেলার দোকানপাট আপাতদৃষ্টিতে জরুরি না হলেও বৈচিত্র্যের সুবাদে এর আবেদন কম নয়। তাই রানীগঞ্জের শিয়ারশোল ও রোনাই রোডের মেলায় খাদ্রসামগ্রী বিক্রি, আসানসোল ও বরাকরের মেলায় কাঠের জিনিস থেকে শুরু করে কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি দেখে অবাক হতে হয়।

মেলার যে আর্থিক আবেদন তা আর একটি দিক থেকে প্রণিধানযোগ্য। আঞ্চলিকভাবে আজও মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি কেনার জন্য সারা বছর ধরে মেলার অপেক্ষায় থাকেন। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে অনুষ্ঠিত মেলাগুলি থেকে কৃষির প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া গ্রাম্য জীবনে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু সংগ্রহ করার জন্য গ্রামের মেয়েরা আজও অনেক ক্ষেত্রে মেলার অপেক্ষায় থাকেন, এটি প্রায় অধিকাংশ মেলাতেই দেখা যায়।

আবার মেলার দোকানদাররা অনেকে এটিকে তাঁদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে পৌষ সংক্রান্তির স্নানের মেলা দিয়ে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস পর্যন্ত মনসাপূজা বা রথের মেলা পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস ধরে এক মেলা থেকে অন্য মেলায় ঘুরতে থাকেন। এটিকে তাঁদের জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় মেলাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র কেনাবেচা করে থাকেন। অর্থনৈতিক বিচারে এর মূল্য অপরিসীম। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না।

নির্দিষ্ট দোকানদারগণ মেলার দোকানে কেনাবেচাকে জীবিকা হিসাবে নিয়ে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়ান।

উদ্ধারণপুর, কোগ্রাম ইত্যাদি মকরস্নানের মেলা, জয়দেবের মেলা (বীরভূম জেলায়) (পৌষ-সংক্রান্তি)—১লা মাঘ, আসানসোল ঘাগরবুড়ির মেলা, দধিয়া বৈরাগীতলায় বৈষ্ণবদের মেলা (মাঘ মাসে মাকুরি সপ্তমী)—বাবলাডিহি, বিশ্বেশ্বর, নবাবহাট, আলমগঞ্জ, বরাকর, নিয়ামতপুর, জেমিহারী, রূপনারায়ণপুর ইত্যাদি মেলায় (ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি)—রানীগঞ্জ, কাইগ্রাম, কুসুমগ্রাম, নেড়োদিঘি, হটুদেওয়ান ইত্যাদি পীরের মেলায় (ফাল্গুন মাস)—বোহার, কৃষ্ণপুর, ভেলিয়া, মঙ্গলকোট, দিসেরগড় ইত্যাদি পীরের মেলায় (চৈত্রমাস)—আসানসোল, কাজোবাগ্রাম, কুড়মুন, পলাশী, পাঁড়ুই, কাটোয়া, নৈহাটি ইত্যাদি স্থানে শিবের গাজন (চৈত্র-সংক্রান্তি)—জামালপুর ও ইচুডাগরায় বুড়োরাজের গাজন মেলা (বৈশাখী পূর্ণিমা)—মন্তেশ্বরে চামুণ্ডা পূজার মেলা (বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী), রায় রায়রামচন্দ্রপুর ধর্মরাজের গাজন মেলা, দক্ষিণখণ্ড (অণ্ডাল), বাঁকুড়ায় ধর্মরাজের গাজন মেলা, ডামরা ধর্মরাজের গাজন মেলা (বৈশাখী পূর্ণিমায়) ইত্যাদি মেলায়—ক্ষীরগ্রাম, সড়া ইত্যাদি স্থানে যোগাদ্যা পূজার মেলা (বৈশাখী-সংক্রান্তি)—পাঁড়ুই, টুলগ্রাম, সাঁপাড়, সাতগাছিয়া ইত্যাদি স্থানে দশহরা তিথিতে মনসাপূজার মেলা, দিগনগর, দার্দপুর, মামদোতলা, আড়রা ইত্যাদি স্থানে ধর্মরাজের গাজন মেলা, ছোট মেইগাছি ক্ষেত্রপাল পূজার মেলা (জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা)—মণ্ডলগ্রাম, মুলো, নারকেলডাঙা ইত্যাদি স্থানে মনসাপূজার মেলা (আষাঢ় মাসে প্রথম পঞ্চমী তিথি)—রানীবন্দের চণ্ডীমেলা, হাটগোবিন্দপুরের পঞ্চাননের মেলা (আষাঢ় নবমী তিথি), কালনা, শ্রীধরপুর, বাঘনাপাড়া, দিগনগর, শিয়ারশোল, উখরা ইত্যাদি স্থানে রথের মেলা (আষাঢ় মাস)—কুবাজপুর, বামুনাড়া, কুড়ুম্বা ইত্যাদি স্থানে মনসাপূজার মেলা (শ্রাবণ মাসে পঞ্চমী তিথি) ইত্যাদি একটির পর আর একটি মেলায় দোকানদাররা ঘুরতে থাকেন। স্থানাভাবে আরও বহু মেলার নাম এখানে উল্লিখিত হল না।

মেলায় জনসমাবেশের সূত্র ধরে যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, সার্কাস, লটারি, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, লেটোগান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এটি জেলার গ্রাম ও শহর উভয় পরিবেশেই প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক লেনদেনের পাশাপাশি এ ধরনের অনুষ্ঠান মানুষের একঘেয়ে জীবনের ছেদ ঘটায়।

মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বে রাজা, জমিদার বা ধনীক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এ ক্ষেত্রে ধর্মের ভয়, পুণ্যলাভ বা সম্মানলাভের আশা অনেক সময় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেবদেবীর পুরোহিত বা সেবায়িত প্রচারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাজে ব্রতী

হয়েছিলেন। বর্তমানকালে মেলাগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কোনও ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদির উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে লাভক্ষতির হিসাবের প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রে জড়িয়ে থাকে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে মেলাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সামগ্রিক বিচারে নগর সভ্যতার ছোঁয়াচ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা যানবাহনের উন্নতি, মানুষের রুচির পরিবর্তন ও শহরমুখী মনোভাব, বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা বস্তুবাদী মনোভাব, দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে তীব্র কর্মব্যস্ততা, অবসর বিনোদনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ইত্যাদি মেলার কেবলমাত্র আকারগত রূপান্তর ঘটায়নি, মেলায় ধর্মীয় উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক মিলন, সাংস্কৃতিক সমন্বয় এমনকি পরিচালনগত দিকটিতেও রূপান্তর ঘটিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উৎসব রূপান্তরিত হয়েছে বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ অহমিকা প্রকাশের অঙ্গনে। আবার পরিবর্তনের ধারায় সংগতি রাখতে না পেরে বহু মেলা অবলুপ্ত হয়ে জন-স্মৃতির অতলে বিলীন হয়েছে। উৎসব ও পূজাপার্বণগুলি অনেক ক্ষেত্রে সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করায় বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। সুতরাং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের গতানুগতিক জীবন-পদ্ধতির পরিবর্তনে সমাজ-সচলতা প্রমাণ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য তার মোকাবিলায় প্রয়োজন উপযুক্ত মানসিকতা। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস বা সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ধর্ম ও সমাজসংস্কার বহু প্রচেষ্টা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারে নগর সভ্যতার উন্মেষ, ভারতীয় সংবিধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এবং শিক্ষা, অর্থ ও উপজীবিকাই বর্তমান সমাজে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড হলেও এবং জাতিগত কাঠামো-বৈচিত্র্যে কিছুটা শৈথিল্য দেখা দিলেও মানুষের মেলায় মিলনের আকাঙ্ক্ষা অকৃত্রিম, অনাদি ও অনন্ত। মানুষ চায় মানুষের সাহচর্য—এই সামাজিক সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানের কৃত্রিমতার মধ্যে সনাতনকে লোপ করার আভাস মিলেছে এবং আমাদের প্রবহমান বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি জীবনধারার গতিশীলতা ও তার বিবর্ধমান রূপটি বহু ক্ষেত্রে সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জেলার মেলাগুলির ভূমিকাও এই পরিবর্তনে লক্ষণীয়।

সর্বোপরি জেলার মেলাগুলির প্রকৃতিগত, আকৃতিগত বা পরিচালনার দিক থেকে পরিবর্তন সূচিত হলেও এ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানুষের প্রয়োজনের দিকটি অস্বীকার করা যাবে না। তাই আজও জেলার প্রত্যন্ত এলাকা দধিয়া বৈরাগীতলা বা জামালপুরের মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হতে দেখা যায়। বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত জেলার মেলাগুলিতে অগণিত মানুষ উপস্থিত হয়ে তার সমাজজীবনের সূত্রটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। বর্তমানে সংস্কৃতির নামে অনেক ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতি নিয়ে মাতামাতি, দোকানদারদের অনেক ক্ষেত্রে অতি-মুনাফার লোভ, মেলা পরিচালনায় উদাসীনতা বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং মুনাফা লাভের আশা মেলাগুলি সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে বড় অন্তরায় বলা যায়। স্বভাবতই মেলাগুলির ভবিষ্যৎ প্রকৃতি সমস্যাসংকুল ও অনিশ্চিয়তাপূর্ণ। এবং সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি মানুষের রুচি, মানসিকতা, সংস্কারগত ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, বিশ্বাস ইত্যাদির পরিবর্তনে জেলার জনজীবনের অপরিহার্য প্রাণকেন্দ্র মেলাগুলি সার্থকভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর দাবি যে অনস্বীকার্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না আজও জেলার মেলাগুলিতে হাজির হয়ে মেলার মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে।

বর্ধমান জেলার যুবসমাজ ও কর্মসংস্থান প্রকল্প

তাপস চট্টোপাধ্যায়
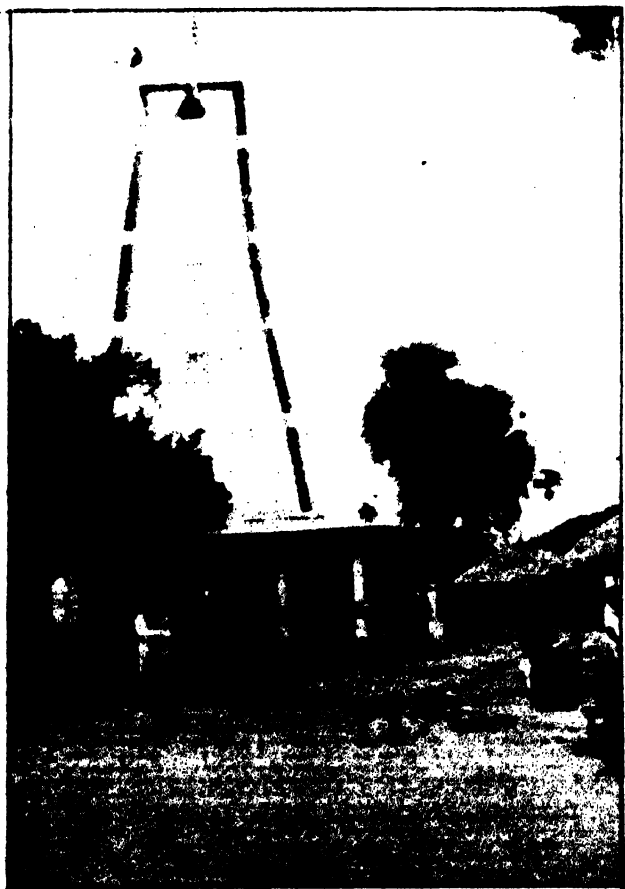
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা বর্ধমান। এই জেলার আয়তন প্রায় ৭০২৪ বর্গ কিঃ মিঃ। এর মধ্যে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৪,৬৪,৪৯৪ হেক্টর। জেলার দুটি নদী অজয় ও দামোদর প্রবাহিত হয়ে কৃষিক্ষেত্রকে করেছে উর্বর। জেলার পশ্চিমে বরাকর থেকে পানাগড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জেলার শিল্পাঞ্চল বলে পরিচিত। এরই ভিতর রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর, আসানসোল, রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের পরিচিত নাম দামোদর ও অজয়ের মধ্যবর্তী প্রায় দেড় হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড।

জেলার মোট জনসংখ্যা ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ৬০,৩৪,৭০৬ এর মধ্যে আনুমানিক ১৫-৪০ বছরের যুবক-যুবতীর সংখ্যা ৩৪,৩৯,৭৭৬ রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা আনুমানিক ৩,৪৩,৯০০।

সারা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যে ও জেলাতেও বেকার বাড়ছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশ শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ও বেকার সমস্যা সমাধানে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল তা করা হয়নি। দেশের সামন্ত প্রভু ও জমিদারদের কাছ থেকে যে জমি সরকারের অধিগ্রহণ করার কথা, ভূমিসংস্কারের স্বার্থে আইন করেও গুটিকয়েক রাজ্য ব্যতিরেকে সারা ভারতবর্ষে তা কার্যকরী করা হয়নি।

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে কিছু ভারী শিল্প ও বুনিয়াদী শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সারা দেশের সঙ্গে সেই সময় আমাদের জেলাতেও কয়েকটি ভারী শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন—দুর্গাপুর ইস্পাত শিল্প, মাইনিং অ্যান্ড অ্যালয়েড মেশিনারী কর্পোরেশন লিমিটেড, বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড কোঃ লিমিটেড, ফিলিপস কার্বন ব্লাক, অপথ্যালমিক গ্লাস ফ্যাক্টরি ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শিল্প ও অর্থনীতিতে দারুন সংকট দেখা দেয় এবং এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে শিল্পে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অভাবনীয় পরিবর্তন তাকে ব্যবহার করে শিল্প উৎপাদনের বিকাশ ঘটিয়ে শ্রম সংকোচন করে পুঁজিবাদী দুনিয়া তার সংকট মেটাতে উদ্যোগী হয়। আর এই আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহারের জন্য যে বিপুল পরিমাণের অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশের পুঁজিপতিদের পক্ষে জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে পুঁজি সমবেত করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এইভাবেই গড়ে ওঠে বহুজাতিক সংস্থা। এই বিপুল পরিমাণ পুঁজি ব্যবহার করে যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত শিল্প গড়ে উঠল তার উৎপাদনের জন্য বিরাট পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন সেটিও একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্য সমস্ত দেশ থেকে এই কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হল। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য যে সুবিশাল বাজারের দরকার তা একটি দেশে এত পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা সম্ভব নয়। তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের বাজারকে দখল করতে হবে এবং তারই প্রয়োজনে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে গ্লোবালাইজেশনের শ্লোগানকে কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই গ্যাট চুক্তির প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমাদের দেশেও শিল্পক্ষেত্রকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ আমাদের জেলাতেও এর প্রভাব পড়েছে। কর্মসংস্থানের বদলে কর্মসংকোচন হয়েছে। মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছে।

অপরদিকে ব্যক্তিমালিকানা ও বহুজাতিক নির্ভর অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যে সামান্য কয়েকটি শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে পুঁজি বেশি লাগলেও শ্রমিক বেশি লাগবে না। এই অবস্থায় আমাদের রাজ্যেও রাজ্য সরকার শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করেছে। যদিও ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। যেখানে আমরা স্বনির্ভর নই বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলিতে এই রাজ্যে ব্যক্তিমালিকানা ও বহুজাতিক সংস্থাকে দিয়ে শিল্প গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর তারই ফলশ্রুতিতে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে এই জেলাতে নতুন শিল্প হিসাবে ব্যাসমেটেলিক্স লিমিটেড, মাইথন অ্যালয় লিঃ, বার্ণপুর সিমেন্ট, খৈতান সিমেন্ট এবং অন্যান্য শিল্প তৈরির জন্য বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে এসেছেন।

এইসব শিল্পগুলি গড়ে উঠলে কর্মনিয়োগ হবে, কিন্তু তা দিয়ে সমগ্র যুবসমাজের বেকারি মোচন করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই বিকল্প পথের অনুসন্ধান আমাদের করতেই হবে। এই ক্ষেত্রে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কারণ স্বনিযুক্তি প্রকল্পের বাস্তব সম্ভাবনার ক্ষেত্র আমাদের রাজ্যে গড়ে উঠেছে। কারণ হিসাবে বলা যায় বিগত ২০ বছরে এই রাজ্যে সরকার ভূমিসংস্কার, কৃষি সেচকে সম্প্রসারিত করে বিশেষ করে ক্ষুদ্র সেচকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদনের বিপুল বিকাশ ঘটিয়েছে। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। বিগত ২০ বছরে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়েছে। ভারী শিল্পগুলির ডাউন স্ট্রিমে অনেক ছোট ছোট শিল্প যা স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

যদিও স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প শুধুমাত্র ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই কার্যকরী রূপ পায় তা নয়। কৃষিক্ষেত্রকে ব্যবহার করেও স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গড়ে তোলা যায় এবং যেহেতু আমাদের জেলা কৃষিপ্রধান তাই এই দিকটিতে বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে একজন যুবক অথবা যুবতী শুধুমাত্র নিজেরই কর্মসংস্থান করে নেয় না আরও অনেক যুবক/যুবতীর কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারে। এই প্রশ্নে যে সচেতনতা আমাদের রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন তার প্রচণ্ড অভাব আছে।

স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট আমাদের রাজ্যের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে যদিও তার কতকগুলি বাস্তব কারণ আছে।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিয়োজিত একজন যুবক যদি বেশি অর্থ আয় করে তাহলেও একজন কম আয়ের চাকুরে যুবক সমাজে বেশি মর্যাদা পায়। একজন মেয়ের বাবা মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য যখন পাত্র খোঁজে, তখন তিনিও বেশি আয়ের স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা যুবকের চাইতে কম আয়ের চাকুরে যুবককে বেছে নিতে দ্বিধা করেন না। আমরা প্রত্যেকেই নিরাপত্তা পেতে চাই, তাই ঝুঁকিপূর্ণ কোনও বিষয়কে সহজে গ্রহণ করতে পারি না। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে যতক্ষণ না লড়াইয়ে জয়যুক্ত হতে পারছি, ততক্ষণ স্বনিযুক্তি প্রকল্পের বাস্তবায়িত করা সহজ হবে না। তাই স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প শুধুমাত্র কর্মসংস্থানেরই বিকল্প ক্ষেত্র নয়— এটা একটা আন্দোলন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই একে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

যে বিষয়গুলি আমাদের ব্যবহার করতে হবে তার মধ্যে কৃষিপ্রধান এলাকায় যেখানে নিজস্ব জমি ও সেচের নিশ্চয়তা আছে সেখানে তরি ফসলের চাষ করে স্ব-নির্ভর হওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১০ কাঠা জমিতে সারা বছর তরি ফসলের

চাষ করে একজন বেকার যুবক বছরে ১০ হাজার টাকা রোজগার করতে পারে। আমাদের জেলায় যেখানে পতিত জমি আছে—সেখানে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে ফুল, ফল ও রাবার চাষের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমানে এইগুলি খুবই লাভজনক। আউসগ্রাম এলাকায় তসর চাষের কাজ শুরু হয়েছে একে বিকশিত করে শ্রম-মজুরদের যেমন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে—অন্যদিকে এই থেকে বিপুল অর্থ উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে।

ক্ষুদ্র জায়গার মধ্যে মাসরুম চাষ করা সম্ভব। বর্তমানে বিভিন্ন হোটেলে উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিবেষিত হয়। মাসরুম চাষের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে আমাদের জেলাতে।

আমাদের রাজ্যে ও জেলাতে বাইরে থেকে মাছ আমদানি না হলে বাঙালির পাতে মাছ-ভাত জোটা সম্ভব নয়। মাছ উৎপাদনে আমাদের রাজ্যের বিপুল সাফল্য থাকা সত্ত্বেও এখনও চাহিদা ও জোগানের মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। জেলার জলাশয়গুলিতে উন্নত প্রথায় মাছ চাষ করলে—একদিকে যেমন মাছের চাহিদা মেটানো যাবে, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক আয় হতে পারে। এই বিষয়ে মৎস্য বিভাগের সমস্ত সহযোগিতা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, চাষের জন্য আর্থিক অনুদান, ব্যাঙ্ক ঋণ সমস্ত কিছুর সুযোগ আছে।

এই রাজ্যে মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য বয়লার মুরগির পোলট্রি এবং ডিমের জন্য লেয়ার মুরগির পোলট্রি করা যেতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের জেলায় কয়েকটি সংস্থা কাজ করছে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে এবং এই ব্যাপারে সরকারি প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে।

শূকর পালনের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর সুযোগ আছে। বর্ধমান জেলা পরিষদের যে প্রকল্প আছে—তা থেকে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি জেলা মৎস্য ও পশু পালন বিভাগের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ছোট শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা ও ব্যবসা করার জন্য 'প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা', সেসরু, W.B.F.C, State Co-op, Dist.Co-op, খাদি বোর্ড, বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়ার সুযোগ আছে। এই বিষয়ে ডি আর ডি এ ও ডি আই সি থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

শিল্প ও ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কাঁচামালের সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার-ব্যবসার জন্য বিপণনের সুযোগ সঠিকভাবে আছে কিনা তা দেখে নেওয়া দরকার।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে—সে দিকটির প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

পাটজাত পণ্যের ব্যবসা যারা করতে চায় তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু হয়েছে। পাটজাত দ্রব্য থেকে রেডিমেড পোশাক, শপিং, ব্যাগ, সফট লাগেজ, পার্টিকল বোর্ড, পেপার গ্রেড জুট পাল্প বিভিন্ন সামগ্রীর বিরাট বাজার আছে।

এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন যদি জেলাভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা কী কী সম্ভাবনা আছে—তার উপর একটি সমীক্ষা করেন তাহলে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প বিষয়টি আরও সুনির্দিষ্টভাবে করা সম্ভব হবে।

শহরাঞ্চল যুবকদের ক্ষেত্রে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সুযোগ পূর্বে কিছু কম ছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প (শহর) পৃথক বিভাগ করেছে। ওই বিভাগের সঙ্গে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রকে যুক্ত করা হয়েছে। তাই আশা করা যায় শহরাঞ্চলের ছেলেদের জন্য এই প্রকল্পের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে এই রাজ্যের চাইতে এগিয়ে আছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ ওই রাজ্যে প্রশাসনের দিক থেকে যেভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে—এই রাজ্যে কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়ে গেছে। ব্যাঙ্ক যে হারে ওই রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগ করে—এই রাজ্যে ততটা করে না। ওই রাজ্যগুলিতে One window Policy অর্থাৎ একই জায়গা থেকে সমস্ত ব্যবস্থাগুলি করা চালু করা হয়েছে। স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের জন্য জমি, জল, বিদ্যুৎ, ঋণ, পরিবেশ-সংক্রান্ত ছাড়পত্র ও ডি আই সি থেকে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন দ্রুত করে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

এই রাজ্যে ও আমাদের জেলাতেও ব্যাঙ্ক ঋণ প্রথম এবং প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যৌথ উদ্যোগে Co-operative গঠন করার জন্য Registration পাবার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা আছে। এছাড়াও অসংখ্য বেকার যুবক স্কিম করতে না পারার জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়। জেলা প্রশাসন যদি এইসব বাধাগুলি দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—তাহলে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে।

আশার কথা রাজ্যসরকার এই ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসন স্তরে Self help Committee গঠন করেছে।

সে কমিটির আহ্বায়ক 'জেলা যুব আধিকারিক' ও চেয়ারম্যান হচ্ছেন জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ। জেলার জেলাশাসক ও সভাধিপতির একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন ও G.M.D.I.C, P. O, DRDA, Bank ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের বাধাগুলি দূর করাই হল এই কমিটির প্রধান কাজ।

তাই আগামী দিনে বর্ধমান জেলার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পকে ঘিরে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে ব্যবহার করতে পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ এই জেলায় অনেকটা বাড়বে।

বর্ধমান জেলার পৌর স্বশাসিত সংস্থা

সুরেন মণ্ডল
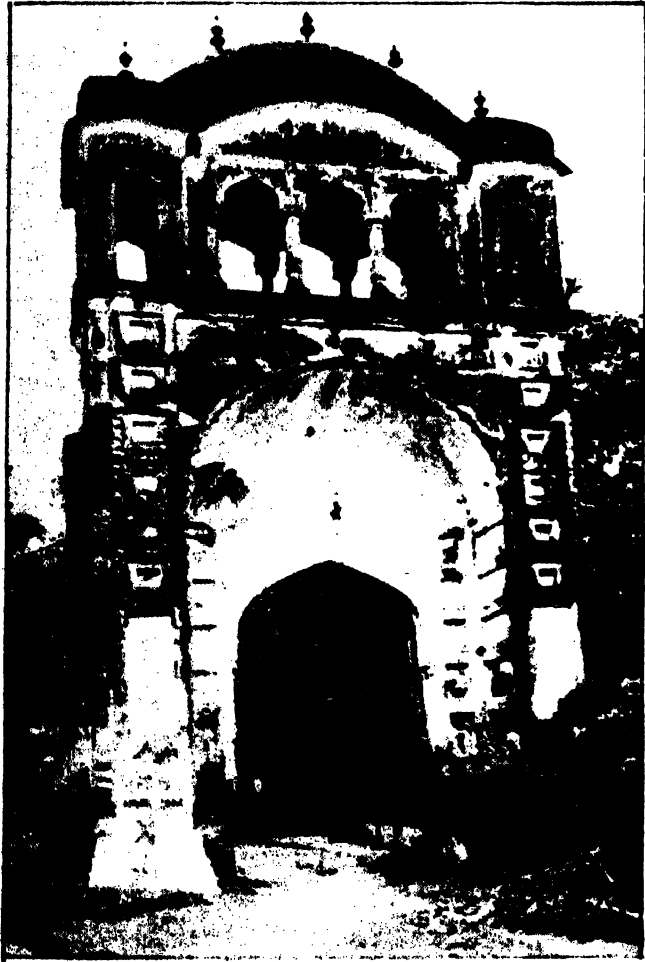
বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ভারতের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে গ্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। গ্রামগুলি অভিজ্ঞ পাঁচজন ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালিত হত। খুব সম্ভবত 'পাঁচজন' থেকে 'পঞ্চায়েত' কথার উদ্ভব হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাসে সভা ও সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে গ্রাম বা পঞ্চায়েত 'গণ' নামে অভিহিত হয়।

এরিয়ানদের (আর্য কথাটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমার ধারণা) আসার হাজার হাজার বছর আগে নগর সভার নিদর্শন পাওয়া গেছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে সমস্ত দিক থেকে পরিপূর্ণ পৌর শাসন ব্যবস্থা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে নালন্দা, রাজগীর ও তক্ষশীলা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেগাস্থিনিস ও বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ থেকে বহু শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য শহর পাটলিপুত্র। এখনকার মতো বোর্ডকে 'পরিষদ' বলা হত এবং পরিষদের সদস্যদের 'এস্টিনমি' বলা হত। 'স্থানিক' নামে কিছু আধিকারিকের দ্বারা বিভাজিত এলাকাগুলির কাজ নির্বাহিত হত। তাদের অধীনে 'গোপা' নামে একজন কর্মচারী থাকত। এখনকার মতো প্রধানকে 'পৌরপতি' বা পৌরপ্রধান বলা হত। এখনকার মতোই

সব কাজ পৌরসভা পরিচালনা করত। আমাদের রাজ্যে বৌদ্ধ যুগে 'তাম্রলিপ্ত' বা তমলুক শহর এই ভাবেই পরিচালিত হত।

মধ্যযুগে মুসলমানদের আসার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই ছিল। উত্তর ভারত জয় করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান শাসকরা আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশকে নতুনভাবে গঠন করার কাজে হাত দেয়। শের শাহ্, আকবর এবং ঔরঙ্গজেব বস্তুতপক্ষে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলেন। আজ যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো রয়েছে তা মুঘল শাসকদের দ্বারা গড়ে উঠে। আজ এ-কথা বলতেই হয়, প্রথম দিকে লুণ্ঠন করে স্বভূমিকে সম্পদে পুর্ণ করার কাজে তারা ব্রতী ছিল। কিন্তু পরে ভারত তাদের নিজ ভূমি হয়ে উঠে, আর তার সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধির কাজে তারা আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু (সুসভ্য)! ইংরেজ শোষণ আর লুণ্ঠন করে ভারতভূমিকে ছিবড়ে করে নিজ দেশের সমৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর যেটুকু পরিবর্তন তারা করেছে তা ভারতভূমির স্বার্থে নয়, তা তারা করেছে নিজেদের ও নিজ দেশের স্বার্থে।

ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে গ্রামাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ১৮১৩ সালে চৌকিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ১৮৪২ সালের দশম আইনে প্রথম পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে কোনও প্রভাব না পড়ায় ১৮৫০ খৃঃ ভারতীয় পৌর আইন গৃহীত হয়। ১৯৩২ সালের পৌর আইন গ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময়ে বহুবার পৌর আইন সংশোধন করা হয়েছে। ১৮৫০ সালের আইন মোতাবেক এলাকার বা শহরের জনগণ পৌর সুযোগ-সুবিধার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করত। সেই মতো ১৫টি শহর আবেদন করে।

বর্ধমান জেলার প্রথম আবেদন করে, রানীগঞ্জ শহরের নাগরিকবৃন্দ। এই সময় রানীগঞ্জ শহর বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছিল। ১৮৫০ সালের ২৯ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি এবং ২ নভেম্বর সরকারি গেজেটে রানীগঞ্জ ইউনিয়ন ঘোষিত হয়। কিন্তু ইউনিয়ন ঘোষিত হওয়ার অনেক পরে রানীগঞ্জ পৌরসভা গঠিত হয়। সেই সময় বাংলাদেশের চল্লিশটি শহরে 'ইউনিয়ন কমিটি' নামে আপাত পৌরসভা গঠিত হয়েছিল।

বর্ধমান জেলার প্রথম পৌরসভা বর্ধমান শহর। ১৮৫৬ সালের ২০ আইনের ২ ধারা মতে ১৮৫৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর বর্ধমান শহর হিসাবে ঘোষিত হয়। এদিলপুর, তেজগঞ্জ, ফকীরপুর, বালামহাট, দেওয়ানগঞ্জ, তরীব মহল্লা, আলিগঞ্জ, আলিমগঞ্জ, কাঠঘর মহল, বঙ্গপুর, ভাটশালা, গোলাহাট, খজানরবেড়, শাঁকুবি পুকুর, দামরাই, মাসারবেড়, জগৎবেড়, পারবীরহাট্টা, নীলপুর, ছোটনীলপুর, নিম্বকিনিবাজার, কানাই নাটশালা, বেনপাড়া, ইবলা বাজার, শেয়ালডাঙা, কালীবাজার, হাফিজুললার বেড়, রসিকপুর, বাহির সর্বমঙ্গলা, বাবুরবাগ, কেশবগঞ্জ চটী, গদা, কাজিরহাট, কাবরা পাট্টা পাহাড়পুর ও নাপুদ্দী—এই সব গ্রামগুলি বর্ধমান শহরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষিত হয়। পরে পৌরসভা গঠিত হয়।

১৮৫৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কাটোয়া ইউনিয়ন হিসাব ঘোষিত হয়। কাটোয়ার মধ্যে সংযুক্ত গ্রামগুলি হল— আটুহাট, দেওয়ানগঞ্জ, দাঁইহাট, বহুসিংহ, বাগাটিকরা ও পটাইহাট।

১৮৬০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কালনা ইউনিয়ন হিসাবে সংগঠিত হয়। সংযুক্ত গ্রামগুলি হল—কালনা, অম্বিকা, পুরোন কালনা, হাঁসপুর, গ্রাম কালনা, ধাইগ্রাম ও ভবানীপুর।

রানীগঞ্জ, বর্ধমান, কাটোয়া ও কালনা পরবর্তী সময়ে পৌরসভা হিসাবে সংগঠিত হয়।

আমাদের জেলায় প্রথম বর্ধমান শহর পৌরসভা হিসাবে সংগঠিত হয়। ১৮৬৪ সালের তিন আইনের ৩ ও ৪ ধারা অনুযায়ী ১৮৬৫ সালের ৩ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই বছরের ১ মে থেকে পৌরসভা হিসাবে কাজ করতে শুরু করে পূর্বে লিখিত এলাকাগুলি সহ মুরাদপুর, রানীগঞ্জ, শ্যামবাজার, এরাব মহল্লা নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। ৩ জন ইংরেজ-সহ ১১ জনকে কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হয়। মিঃ এইচ সি সদ্যারল্যান্ড কমিটির উপ-প্রধান নিযুক্ত হন।

১৮৬৯ সালের ৫ মার্চ দাঁইহাট শহর পৌরসভা হিসাবে ঘোষিত হয়। দাঁইহাট পূর্বে কাটোয়া ইউনিয়ন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৯ সালের ১২ ও ১৩ মার্চ যথাক্রমে কালনা ও কাটোয়া পৌরসভা সরকারিভাবে ঘোষিত হয়। ১ এপ্রিল থেকে কাজ শুরু হয়। ১৮৭১ সালের ৫ জুলাইয়ের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ওই সালের ১ আগস্ট থেকে রানীগঞ্জ (বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছিল) পৌরসভা হিসাবে সংগঠিত হয়। লিখিত পৌরসভাগুলির সীমানাও নির্দিষ্ট করে ঘোষিত হয়। ১৮৮৪ সালের পৌর আইন অনুযায়ী ১৮৮৫ সালের ২৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১ জুলাই আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়। কিন্তু কার্যকরী হয় ১৮৯৬ সালে। রেলপাড়া, ইংরাজ এলাকা, বুধডাঙা গ্রাম, বাস্টিন সাহেবের বাজার, পাকা বাজার, মুন্সী বাজার ও তালপুকুর চটি এলেকাগুলি নিয়ে আসানসোল পৌরসভা গঠিত হয়। জেলার উপরোক্ত পৌরসভাগুলির সীমানা স্থানাভাবে লিখিত হল না।

১৮৫০, ১৮৫৬, ১৮৬৪, ১৮৬৮ ও ১৮৭৩ সালে পৌর আইন সংশোধন ও সংযোজন হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের মনোনীত প্রতিনিধির হাতেই থেকে যায়। এমনকি রিপনের সংস্কারও কোনও পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য ১৮৮৫ সালের ১১ জুলাই গভর্নর জেনারেল একটি আইন অনুমোদন করেন। এই আইন 'বঙ্গদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত ১৮৮৫ সালের আইন' নামে খ্যাত। এই আইন দ্বারা জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড গঠিত হয়। অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলা বোর্ড, মহকুমা স্থানীয় বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়।

প্রথম ১৮৬৪ সালের আইন দ্বারা পৌরসভাগুলি নির্বাচন করার কথা বলা হয়। ১৮৭৩ সালের আইনে, যে-সব পৌরসভা নির্বাচন দাবি করবে, সে-সব পৌরসভায় নির্বাচন করার কথা

বলা হয়। ১৮৭৬ সালে বর্ধমান পৌরসভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

১৮৮৪ সালে 'বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন বলবৎ হয়। এই আইন দ্বারা পৌরসভাগুলির নির্বাচন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। করদাতা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, স্নাতক, ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, উকিল, মোক্তার ও কমপক্ষে ৫০ টাকা মাহিনার চাকুরে এইরূপ ব্যক্তিরা নির্বাচক ও নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন— এই নিয়ম ছিল। মেয়েদের কোনও অধিকার ছিল না। ভোট কেন্দ্রে হাত তুলে ভোট দিতে হবে। এইরূপ নিয়ম ছিল অর্থাৎ কোনও গোপনীয়তা ছিল না।

১৮৮৫ সালে আমাদের জেলার বর্ধমান কালনা, কাটোয়া, রানীগঞ্জ পৌরসভাগুলির নির্বাচন হয়। ওই সময় জনসংখ্যা, করদাতার সংখ্যা, ভোটারের সংখ্যা ও প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল।

জনসংখ্যা	করদাতার সংখা	ভোটারের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা
বর্ধমান-৩২,৬২৯	৬,২০০	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি
কালনা- ৯,৫৯৪	২,২৫০	৬৫৩	১৭১
কাটোয়া- ৬,৮২০	২,৩৩৭	৩৬০	৫১
রাণীগঞ্জ-১০,৭৯২	১,০৬১	৬০০	১৫৫
আসানসোল-১১,৭৩৭	১,৬৫৬	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি

(১৮৯১ সালের হিসাব)

১৮৮৫ সালে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাট পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন বর্ধমানে ৫টি ওয়ার্ড ও ১৫ জন প্রতিনিধি, কালনা ৩টি ওয়ার্ড, ১০ জন প্রতিনিধি, কাটোয়া ৩টি ওয়ার্ড ও ৮ জন প্রতিনিধি, দাঁইহাট ৩টি ওয়ার্ড ও ৮ জন প্রতিনিধি, আসানসোল পৌরসভা ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর গঠিত হয়। এর ৯ জন মনোনীত সদস্য ছিল।

জেলার পৌরসভাগুলি পূর্বে 'ইউনিয়ন' হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল, তাই ইউনিয়নগুলিতে চৌকিদার থাকুত। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত পৌরসভার ও চৌকিদার ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়। এটা কতটা সঠিক হয়েছে তা আলোচনার দাবি রাখে।

১৯৩২ সালে নূতন পৌর আইন প্রচলিত হয়। এই আইনে পৌর প্রধানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। কমিশনারদের হাতে বস্তুত কোন ক্ষমতা ছিল না। কমিশনারদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি কমিটি পৌর প্রধানকে পরামর্শ দিত।

১৯৩২ সালের পূর্বে পৌরসভা-সংক্রান্ত আইনগুলি ও ১৯৩২ সালের পৌর আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট, নর্দমা এই সব বিষয়গুলি পৌরসভাগুলি দেখত এবং এ সব সংক্রান্ত বিষয়ে পৌরসভার হাতে ক্ষমতা দেওয়া ছিল এবং এখনও আছে।

পৌরসভাগুলি চলত মূলত পৌরসভা কর্তৃক কর সংগ্রহণ ও নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করত না। শ্রমিক-কর্মচারিদের বেতন বাবদ বস্তুত কোনও দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ছিল না। উন্নয়নের জন্য টাকা পয়সা কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার দিত না বললেই চলে। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কর্মচারিদের মহার্ঘ ভাতার একটা অংশ ও অক্ট্রয়ের সামান্য কিছু টাকা পৌরসভাকে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকরী করেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই অবস্থাই চলতে থাকে। বেতন, অক্ট্রয়, প্রমোদকর প্রভৃতি সব মিলিয়ে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যসরকার নাগরিকপিছু মাত্র ১০ টাকার মতো দিত। ১৯৭৮ সালের পরবর্তী সময়ে সরকারি অনুদান আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে ক্ষমতা আসে। শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে নতুন অধ্যায়। ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ব্যক্তির পরিবর্তে রাজনৈতিক দল ও দলের প্রতীকে প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গ্রামাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থায় যারা আসীন ছিল, তারা এর বিরোধিতা করেছিল, ক্ষমতা চলে যাবার আতঙ্কে। ১৯৮১ সালে পৌর নির্বাচনেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনুরূপ নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। বি ডি ও বা ডি এমদের বদলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ করবে নির্বাচিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ পরিচালনাও করবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। একদিকে ভূমি সংস্কার, অন্যদিকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আজ নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলার সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার অনেকাংশে পরিবর্তন করেছে। পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম ১৮ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা ভোটাধিকার পায়। এখন ৩০ শতাংশ প্রতিনিধি হবে মহিলারা। এর সঙ্গে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাখাতে একটা বড় অংশ খরচ করছেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গ যখন এ সব কাজগুলিতে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে; তখন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বহু বছর পরে সংবিধানের ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংশোধন করা হয়।

১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১৯৩২ সালের পৌর আইন দ্বারা পৌর নির্বাচন ও পৌর ব্যবস্থা পরিচালিত হত। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন বহুদিন থেকেই সম্পূর্ণ নতুন একটি আইনের দাবি করে আসছিল। তা পূর্ণ হল ১৯৯৩ সালের সম্পূর্ণ

নতুন আইন বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করার ফলে। পঞ্চায়েতে যেমন মহিলা, তফসিলি জাতি, উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে; পৌরসভা ও পৌর করপোরেশনেও তা সুনিশ্চিত হয়েছে। ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ সালে করেছে। কিন্তু পৌরসভা ও করপোরেশনগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেছেন। পৌর শ্রমিক-কর্মচারিদের বেতনের কোনও মা-বাপ ছিল না। আজ পৌর সংস্থার কর্মচারিরা রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের প্রায় সমান বেতন পাচ্ছেন। উন্নয়নের জন্য টাকার ব্যবস্থাও রাজ্যসরকার করেছেন।

১৯৭৭ সালের আগে সব মিলিয়ে জনসংখ্যার মাথাপিছু বছরে ১০ টাকা দেওয়া হত। অবশ্যই কংগ্রেসের রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের ধরাধরি করার ক্ষমতা যে পৌরপ্রধানের বেশি সেই পৌরসভা বেশি টাকা পেত। তা সত্বেও মাথাপিছু ১০ টাকার বেশি নয়। এখন একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী বেতনের মহার্ঘভাতা ৮০ শতাংশ, বোনাসের অংশ, জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রবেশ ও প্রমোদ করের অংশ, উন্নয়নের জন্য অনুদান পৌরসভাগুলি পায়। এখন সব মিলিয়ে, নির্দিষ্ট স্কিম বাদে, মাথাপিছু ১৫০ টাকা থেকে ১৮০ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার অনুদান দেয়। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত অর্থ কমিশন রাজ্য বিধানসভায় রিপোর্ট দাখিল করেছেন। আরও বেশি অর্থের সংস্থান হবে বলে সকলেই আশা করছেন।

আমাদের জেলায় আসানসোল করপোরেশন-সহ কুলটি, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, গুসকরা, বর্ধমান, মেমারি, কালনা, কাটোয়া ও দাঁইহাট এই কয়টি পৌরসভা রয়েছে। এখন পর্যন্ত দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কাজ করছে। খুব শীঘ্রই দুর্গাপুর করপোরেশন হয়ে যাবে এবং নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে, মনে হয় ১৯৯৬ সালেই।

পশ্চিমবঙ্গে এখন সর্বত্র নির্বাচন। বামফ্রন্ট সরকার চায় সব সংস্থায়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্কুল, সমবায়, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা সবকিছুই পরিকল্পনা করুক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই পূর্ব শর্ত। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় ক্ষমতা বা অধিকার সকল মানুষ ভোগ করুক। পৌর করপোরেশনগুলিতে বরো কমিটির মাধ্যমে কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পৌর সভাগুলিতে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ড কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার কাজ বেনিফিসিয়ারি কমিটির মাধ্যমে করার কথা বলা হয়েছে। এর পরিণতিতে জনগণের অর্থের ভালভাবে ব্যবহার হবে। ইতিমধ্যেই এ কাজ শুরু হয়েছে আমাদের জেলায়। এতে নাগরিকরা উৎসাহিত হচ্ছেন।

গত ১৫ বছরে আমাদের জেলার পৌর এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। বর্ধমান জেলার পশ্চিমের পৌরসভাগুলির প্রধান দাবি ছিল পানীয় জল। আসানসোল, কুলটি, রানীগঞ্জ পৌর এলাকাতে জল সরবরাহ অনেক উন্নত হয়েছে। দুর্গাপুরের জল প্রকল্পের কাজ চলছে। জেলার অন্যান্য পৌর এলাকাতেও পানীয় জলকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা হচ্ছে। বর্ধমান জেলার কুলটি, দাঁইহাট ও দুর্গাপুর বাদে সব পৌর এলাকাই ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়ন (আই ডি এস এম টি) পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। কাটোয়ায় এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। রানীগঞ্জ, গুসকরা, মেমারি, কালনা গত বছর (১৯৯৫) থেকে শুরু হয়েছে। বর্ধমান আসানসোল ও জামুরিয়া এ বছর থেকে কাজ শুরু হবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে একদিকে পৌরসভাগুলির নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি পাবে; অন্যদিকে রাস্তা-ঘাট, নর্দমা প্রভৃতির উন্নতি হবে।

দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু আর্থিক অনুদান পাওয়া যাবে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে।

নগরায়ণ মানে শুধু মাত্র রাস্তা, ড্রেন, জল, পরিষ্কার নয়। গত ১৫ বছরে পূর্বের সংস্কার পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে। গ্রাম-শহরের জন্য জেলা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা বিনোদন প্রভৃতি নাগরিক জীবনের অঙ্গ। তাই পুরোন সবকটি পৌর এলাকার যে নামেই হোক না কমিউনিটি সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পৌর সভার মাধ্যমেই স্কুল গৃহ তৈরি, খেলাধূলা, সংগঠিত হচ্ছে। রাজ্য সরকারের যুব ও সংস্কৃতি দপ্তর এ কাজে পৌর সভাগুলিকে সাহায্য করছে। শিশুদের জন্য উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে অনেক পৌর এলাকাতে। বস্তিগুলি উন্নয়নের জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

আমাদের জেলার পৌর সভাগুলি সাক্ষরতা আন্দোলনও পরিচালনা করেছে। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে গরিব মানুষকে উৎসাহ দিয়েছে। প্রাথমিক স্কুলে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। পৌরসভাগুলি সাক্ষরদের নিয়ে 'ধারাবাহিক শিক্ষা' কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিশু শ্রমিকদের মান উন্নয়নেরও সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ পৌর সভাগুলিতে নেওয়া হয়েছে।

জেলা উন্নয়ন কমিটি পৌরসভা, পঞ্চায়েত ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলির কাজের সমন্বয় সাধন করে সামগ্রিকভাবে জেলা উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করে জেলা উন্নয়নের জন্য চেষ্টা শুরু করছে।

কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে জনগণের অংশগ্রহণের উপর। উন্নয়ন-সহ সব কিছুর সঙ্গে জনগণকে যুক্ত করতে হবে। আমরা আশা করতে পারি ' এ শতাব্দীর শেষ ও নতুন শতাব্দীর প্রথম'— এই স্বল্প সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করে নিতে পারবে বর্ধমান জেলার পৌর ও স্বশাসিত সংস্থাগুলি।

(তথ্যগুলি মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পৌর ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ' থেকে নেওয়া)

বর্ধমান জেলার সমাজকল্যাণ দপ্তরের গত ২০ বছরের কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা

বিমলকৃষ্ণ মজুমদার

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতিও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সীমিত আর্থিক বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও এই সব কল্যাণকর প্রয়াসকে প্রতিনিয়ত বহুমুখী করার প্রচেষ্টা চলেছে বিগত ২০ বছর ধরে। কতকগুলি মৌল মানবিক সমস্যার সমাধানকল্পে এবং সমাজের দরিদ্রতম, দুর্বলতম অংশের বিশেষত নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী অক্ষম ও অশক্তদের স্বার্থরক্ষা কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাবিধ সুযোগের কথা চিন্তা করে আসছে। সমাজকল্যাণ অধিকার, চক্রচর নিয়ামক অধিকার এবং জেলা সমাহর্তার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্রতম জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচি মোতাবেক প্রকল্পগুলি কার্যকর করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি হল :—

১। নারীকল্যাণ ২। শিশুকল্যাণ ৩। সুসংহত শিশুবিকাশ সেবাপ্রকল্প ৪। প্রতিবন্ধী কল্যাণ ৫। চক্রচর কল্যাণ ৬। বৃদ্ধ ও অশক্ত কল্যাণ ৭। বৃদ্ধদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান ৮। বৈধব্যদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান ৯। অক্ষমদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান ১০। দুঃস্থ অনাথ ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য আর্থিক সাহায্য

১১। প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে করা হচ্ছে। ১২। তাছাড়া জেলাতে যে সমস্ত বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের দ্বারা জনহিতকর কাজের জন্য জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে।

যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন এবং তাদের জনহিতকর কাজের জন্য প্রশংসার দাবি করতে পারেন তা হল :—

১। ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জি *(মূক ও বধির, বর্ধমান)*
২। স্বয়ম্ভর—গড়গড়াহাট *(বর্ধমান)*
৩। বিধানচন্দ্র প্রতিবন্ধী কল্যাণ কেন্দ্র, *(খান্দ্রা, বর্ধমান)*
৪। (H.O.P.E.) Handicapped Orientation Programme Education *(Durgapur- Burdwan)*
৫। শিক্ষানিকেতন *(কলানবগ্রাম, বর্ধমান)*
৬। রামকৃষ্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি *(বর্ধমান)*
৭। আনন্দম আসানসোল *(বর্ধমান)*
৮। পান্নাময়ী শিশুনিকেতন *(বামচণ্ডীপুর, বর্ধমান)*
৯। আনন্দনিকেতন *(কাটোয়া-বর্ধমান)*
১০। বর্ধমান ডিসাবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি *(বর্ধমান)*
১১। শারীরিক প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সমিতি *(দুর্গাপুর, বর্ধমান)*
১২। সিদ্ধু-কানু গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি *(মেমারী, বর্ধমান)*
১৩। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী *(সম্মিলনী, বর্ধমান)*

বর্ধমান জেলার সমাজকল্যাণ দপ্তরের কাজের বিগত ২০ বছরের অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১। নারীকল্যাণ :

সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় নারীকল্যাণ হতে পারে। আমাদের জেলাতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৪টি নারীকল্যাণ আবাসিক প্রকল্প চলছে।

২। শিশুকল্যাণে দুঃস্থাবাস :

এই আবাসে অনাথ-দুঃস্থ বা প্রতিপালনে অক্ষম মা-বাবার ছেলেমেয়েরা প্রতিপালিত হয়। এই আবাসিকদের লেখাপড়া ও তাদের হাতের কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের জেলাতে মোট ৩টি দুঃস্থাবাস আছে একটি সরকার পরিচালিত অন্য ২টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। (১টি পান্নাময়ী শিশুনিকেতন অন্যটি কালনা ডেস্টিটিউট হোম)

৩। সুসংহত শিশু বিকাশ সেবাপ্রকল্প :

শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল :—। ৫টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্প রচিত হয়েছে। যেমন—

(ক) অনধিক ৬ বছরের শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নত করা
(খ) শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের বুনিয়াদ তৈরি করা
(গ) শিশুমৃত্যু, শিশুর রোগপ্রবণতা ও শিশুর অপুষ্টি কমানো এবং শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার হ্রাস করা
(ঘ) প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং সমজাতীয় বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় সাধন করা
(ঙ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশু ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে যত্ন নিতে মায়েদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত করে তোলা।

শিশুদের সু-নাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়নের অন্তর্গত এই প্রকল্পের একান্তভাবে প্রয়োজন। গত ২০ বছরের মধ্যে আমাদের জেলাতে মোট ১৫টি শিশুবিকাশ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। আশা এবং বিশ্বাস রাখি আগামী ২/১ বছরের মধ্যে জেলার অন্তর্গত সমস্ত সমষ্টি উন্নয়নে এই প্রকল্প চালু হবে।

৪। প্রতিবন্ধী কল্যাণ :

সরকারের মাধ্যমে যেমন প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ করা সম্ভব তেমন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ করা সম্ভব। আমাদের জেলাতে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের কাজের অগ্রগতি মুখে বলে শেষ করা যায় না।

আমরা সরকারিভাবে প্রতি বছর প্রতিবন্ধী ভাইবোনেদের জন্য সহায়ক যন্ত্র এবং কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করে থাকি। যার সাহায্যে প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে সহজভাবে চলাফেরার সুযোগ পায়।

গত ১৯৯৫-৯৬ সালে আমরা সরকারিভাবে মোট ২০১ জন প্রতিবন্ধী ভাইবোনকে বিভিন্ন প্রকারের সহায়ক যন্ত্রাদি দিতে সক্ষম হয়েছি।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের নোটিফিকেশন নং ৪০৮০-এস ডব্লিউ তাং ২৭-৯-১৯৮৯ অনুসারে বর্ধমান জেলাতে মোট ১১,০০০ অভিজ্ঞানপত্র প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের দিতে সক্ষম হয়েছি। যাহাতে প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা বিমান, রেল ও সড়কপথে ভ্রমণের সুবিধা পেতে পারেন।

৫। প্রতিবন্ধীদের স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য :

প্রতি বছর আমরা প্রতিবন্ধীদের স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য আর্থিক সাহায্য

করে থাকি। গত ২০ বছরে আমাদের কাছ থেকে অনেকেই আর্থিক সাহায্য পেয়ে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে আমরা ২০ জন প্রতিবন্ধীকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছি।

৬। ছাত্রবৃত্তি :

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার জন্য ছাত্র বৃত্তি পেতে পারে সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে তার সু-ব্যবস্থা আছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট ২০৭ জনকে আমরা বাৎসরিক ৭২০ টাকা করে ছাত্র বৃত্তি দিতে সক্ষম হয়েছি।

৭। মাসিক ভাতা প্রকল্প :

সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত মাসিক ভাতা পাবার সু-ব্যবস্থা আছে। যেমন—

(ক) বার্ধক্যভাতা
(খ) বৈধব্যভাতা
(গ) অক্ষমভাতা
(ঘ) দুঃস্থ/অনাথ বালক-বালিকা শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের জন্য ভাতা

উপরোক্ত মাসিক ভাতা প্রকল্পের প্রাপক সংখ্যা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন—

বার্ধক্যভাতা

১৯৯৫-৯৬ সনের প্রাপক সংখ্যা	১৯৯৬-৯৭ সনের প্রাপক সংখ্যা
৩০৪৩ জন	৩১৬৯ জন

বৈধব্যভাতা :

১৯৯৫-৯৬ প্রাপক সংখ্যা	১৯৯৬-৯৭ প্রাপক সংখ্যা
৭৩৩ জন	৮০৫ জন

অক্ষম ভাতা :

১৯৯৫-৯৬ প্রাপক সংখ্যা	১৯৯৬-৯৭ প্রাপক সংখ্যা
৫২৫ জন	৬৪৬ জন

দুঃস্থ/অনাথ বালক-বালিকাদের শিক্ষা ও ভরণ-পোষণের জন্য ভাতা :

১৯৯৫-৯৬ প্রাপক সংখ্যা	১৯৯৬-৯৭ প্রাপক সংখ্যা
৪১৯ জন	৪১৯ জন

৮। কর্মরত মহিলাদের জন্য বাসস্থান :

মহিলাদের নিরাপদে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমাদের জেলাতে কর্মরত মহিলাদের জন্য ৩টি আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমরা আগামী বছরগুলিতে প্রতিটি মহকুমাতে ১টি করে কর্মরত মহিলা আবাসনের ব্যবস্থা করার চিন্তা-ভাবনা করছি।

৯। নারী নির্যাতন / বধূহত্যা :

নারী নির্যাতন / বধূহত্যা সমাজে একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের জেলাতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। আমাদের জেলাতে বিভিন্ন থানাতে Women cell গঠন করা হয়েছে। যাহাতে মহিলারা বিনা বাধায় থানাতে তাদের নির্যাতনের সংবাদ অবহিত করতে পারেন।

১০। প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :

বর্ধমান জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ১৯৮১ সন থেকে ওড়গ্রামে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে— (ক) সূচীশিল্প, (খ) বয়নশিল্প, (গ) দারুশিল্প, (ঘ) মৃৎশিল্প, (ঙ) খড় দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ছবি তৈরি ব্যবস্থা আছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা ১ বছর কেন্দ্রে থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে প্রশিক্ষণ শেষে জেলা পরিষদ থেকে প্রশংসাপত্র পেয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে স্ব-নির্ভর হবার সুযোগ পেয়ে থাকে প্রতি বছর এই কেন্দ্র থেকে ১০০ একশত জন প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। সমস্ত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ব্যয়ভার বর্ধমান জেলা পরিষদ বহন করে থাকে।

বর্ধমান জেলায় তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়নের রূপরেখা

বাসুদেব চক্রবর্তী

বর্ধমান জেলার মোট জনসংখ্যার ৬০,৫০,৬০৫ জনের মধ্যে ১৬,৬০,৪৯৩ জন তফসিলি জাতিভুক্ত (জেলার জনসংখ্যার ২৭.৪৪ শতাংশ) ও ৩,৭৬,০৩৩ জন আদিবাসী (জেলার জনসংখ্যার ৬.২১ শতাংশ)। তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবসী মানুষের বেশিরভাগ অংশই সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ; সামাজিক অবিচার, কুসংস্কার ইত্যাদির বাধা-নিষেধের নিগড়ে দীর্ঘকাল তারা বন্দী, যার রেশ এখনও আছে। বামফ্রন্ট সরকার তার দীর্ঘ ২০ বছরের শাসনে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাদের জন্যও পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার নথিভুক্তকরণ ও বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সুবিধা অর্জনের পাশাপাশি তারা আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বর্ধমান জেলার সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচিরও এ ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে।

তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবাসী জনগণকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই এই দপ্তর মূলত তিন দফা কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। (ক) শিক্ষা, (খ) পরিবারকেন্দ্রিক আর্থিক উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন, (গ) সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প কর্মসূচিসমূহ।

(ক) বিগত বছরে এই জেলাতে মাধ্যমিক স্তরে ৫০,৩০০ জন তফসিলিভুক্ত জাতি ও ৭,৭২০ জন পাঠরত ছিল। বিগত কয়েক বছরের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছর গড়ে শতকরা ৩ ভাগ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। অতীতে যে পরিমাণ ছাত্র বিদ্যালয় ত্যাগ করত (Drop out), আজ তার গতি শ্লথ হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন উৎসাহদানকারী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ভরণ-পোষণ ভাতা চালু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের জেলায় ৮,৮০০ জন তফসিলি জাতিভুক্ত ছাত্র এবং সমস্ত আদিবাসী ছাত্ররা এই ভরণ-পোষণ ভাতা পেয়ে থাকেন। এছাড়াও উচ্চ ও উচ্চতর শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ মেধা প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। ছাত্রাবাসে থাকলে মাসিক ৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়লে মসিক ৪০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরে যাদের বিদ্যালয়ে হাজিরার হার ৭৫ শতাংশের উপর তাদের জন্যও একটি প্রকল্প চালু হয়েছে। তফসিলিভুক্ত ও আদিবাসী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার অন্যান্য স্তরের তুলনায় অনেক কম। বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি নতুন প্রকল্প এই বছর থেকে চালু করেছে। এই জেলাতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ১০০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১২৫, নবম ও দশম শ্রেণীভুক্ত তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবাসী ছাত্রীদের মধ্যে ২৪০ জনকে উপরোক্ত হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ৩১৩ জন তফসিলিভুক্ত ও ৭৩৫ জন আদিবাসী ছাত্রাবাস বৃত্তি পেয়ে থাকেন।

এই জেলাতে সরকারি অনুদানে নির্মিত ছাত্রাবাসের সংখ্যা মোট ২৮টি। তার মধ্যে আশ্রম ছাত্রাবাস ১৩টি, মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ১৪টি এবং মহাবিদ্যালয় স্তরে ১টি ছাত্রাবাস আছে। আরও ৪টি আশ্রম ছাত্রাবাস নির্মীয়মান।

এ ছাড়াও বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার মাধ্যমিকোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এই জেলায় ৩টি ছাত্রাবাস নির্মাণ করছেন। তার মধ্যে বর্ধমান শহরে ছাত্রীনিবাসটি চালু হয়েছে। আসানসোলে ছাত্রীনিবাস এবং বর্ধমান শহরে ছাত্রাবাস নির্মীয়মান।

মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাধ্যমিকোত্তর স্তরে ছাত্রসংখ্যা উল্লেখনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বৎসরে ৪,৩৪৩ জন তফসিলি ছাত্র ও ৪০১ জন আদিবাসী ছাত্র এই স্তরে পড়েছেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে যথাক্রমে ২২ ও ৬ শতাংশ সংরক্ষণ নীতি চালু হয়েছে, যার ফলে তারা অনেক উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ে এরা ভর্তি হতে পারছেন।

(খ) পারিবারিক ও সমবায়ভিত্তিক আর্থিক উন্নয়ন।

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার সদা সচেষ্ট, বৃত্তি শিক্ষার লক্ষ্যে এই জেলাতে মোট ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, মেয়েদের জন্য জীবন শিক্ষা কেন্দ্র, ছেলেদের জন্য কাষ্ঠশিল্প, চট-বয়নশিল্প ও চর্মশিল্প শিক্ষণ তথা উৎপাদন কেন্দ্র আছে। সেখানে প্রতি বছরে মোট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ আছে। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় 'ট্রাইসেম' কেন্দ্র হিসাবে ওই সমস্ত কেন্দ্রকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যার ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে অসুবিধা দেখা দেবে না।

পরিবারকেন্দ্রিক আর্থিক উন্নয়নের বিষয়টি দেখার জন্য এই জেলায় 'তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' স্থাপিত হয়েছে। যে সমস্ত তফসিলি জাতিভুক্ত পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছেন, তাদের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছেন—

(ক) স্বনিযুক্তি অর্থকরী প্রকল্প রূপায়ণ সরকারি অনুদান, নিগমের প্রান্তিক ঋণ, ও ব্যাঙ্ক ঋণের সহযোগে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৯৭৫০টি তফসিলি জাতি ও ৩২০০টি আদিবাসী পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

(খ) ন্যাশনাল সিডিউল্ড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের (এন এস এফ ডি সি) মাধ্যমে যে-সব পরিবারের আয় গ্রামাঞ্চলে বাৎসরিক ২২,০০০ টাকা ও শহরাঞ্চলে বাৎসরিক ২৩,৮০০ টাকা, তারা এই সুযোগ পেতে পারে। প্রকল্পটির সর্বোচ্চ খরচ-১,০০,০০০ টাকা। এই প্রকল্পে সরকারি অনুদান নিগমের প্রান্তিক ঋণ ও ব্যাঙ্ক ঋণ যুক্ত আছে।

(গ) সাফাই কর্মী পুনর্বাসন প্রকল্প :

যে সমস্ত সাফাই কর্মী, সে যে-কোনও সম্প্রদায়েরই হোক না, যদি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা মাথায় করে মলমূত্র বহন করে জীবিকা অর্জন করে, তারা বা তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবার, পরিজন এই প্রকল্পের অধীনে আসতে পারে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ওই ধরনের বংশানুক্রমিক পেশা থেকে তাদের মুক্ত করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। ৫০,০০০ টাকা ব্যয় পর্যন্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য এক নিবিড় উন্নয়ন পরিকল্পনা আমাদের জেলায় নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আউসগ্রাম-১, আউসগ্রাম-২, কাঁকসা, দুর্গাপুর-ফরিদপুর, বারাবনী ও সালানপুর এই ৬টি পঞ্চায়েত সমিতিকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে যে-সব মৌজায় মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক আদিবাসী বাস করেন, সেই সমস্ত মৌজায় বিশেষ সহায়ক প্রকল্পে মাধ্যমে অধিক আর্থিক অনুদান দেওয়া ও সামাজিক প্রকল্প সমূহ রূপায়িত হয়। মোট ১৬৮টি মৌজা এর আওতাভুক্ত। এই এলাকাগুলিতে আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তফসিলি জাতিদের জন্য বিশেষ প্রকল্প স্পেশাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান (এস সি পি) এবং আদিবাসীদের জন্য বিশেষ সমন্বিত প্রকল্প ট্রাইব্যাল সাব-প্ল্যান (টি এস পি)-এর মাধ্যমে সামাজিক প্রকল্প সমূহ যথা, পানীয় জলের জন্য কূপ খনন, নলকূপ প্রতিষ্ঠা,

রাস্তা, সেতু নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়িত করা হচ্ছে। বিগত বছরে প্রায় ৫০টি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।

সর্বভারতীয় স্তরে সঙ্গতি রেখে আমাদের রাজ্যেও বিভিন্ন দপ্তরকে এস সি পি ও টি এস পি খাতে আলাদা করে অর্থ সংস্থান রাখার আদেশ রাজ্য সরকার দিয়েছেন। বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মতামত পরিকল্পনা রচনার বিভিন্ন স্তরে যাতে প্রাধান্য পায়, সে বিষয়টিও যথোচিতভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য জেলা মঙ্গল কমিটির সিদ্ধান্ত মত এস সি পি এবং টি এস পি-র জন্য বিভিন্ন বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থ মঞ্জুর করা হয়। জেলা মঙ্গল কমিটি এই বিষয়ে জেলা পরিকল্পনা কমিটির সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

এ ছাড়াও এই বিভাগ তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। হুল উৎসব পালনে অনুদান, ক্রীড়া উন্নয়নে জঙ্গল মহল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নাট্য প্রতিযোগিতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে।

তফসিলি জাতি, আদিবাসী এবং বর্তমানে অপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য শংসাপত্র দেওয়া হয়। ওই শংসাপত্র দেওয়ার ব্যাপারে এই বিভাগের ভূমিকা আছে। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমানে শংসাপত্র বিলি অনেক আশাপ্রদ।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা :

রাজ্যস্তরে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রশাসনিক পরিবর্তন বামফ্রন্ট সরকার করেছেন। ব্লকস্তরে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল কমিটি তৈরি হয়েছে। সেখানে পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবাসী প্রতিনিধিদের একটি কমিটি গঠন করেছেন, তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই জেলাস্তরে গঠিত তফসিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ কমিটি সামগ্রিক জেলার তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন কাজকর্মের পরিকল্পনা করে ও রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আগে জেলাতে দুইটি দপ্তর ছিল। বর্তমানে ওই দুইটি দপ্তরকে একীকরণ করা হয়েছে। নতুন দপ্তরের নাম প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মঙ্গলকরণ।

অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র থেকে উত্তরণের পথে বামফ্রন্ট সরকার নতুন পথের দিশারী। সমাজের পিছিয়ে-পড়া মানুষ সহ সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নে নিজেকে একাঙ্গীভূত করে যাত্রাই তার পথ। তফসিলি জাতিভুক্ত ও আদিবাসী ও বর্তমানে অপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণ করাই এই দপ্তরের লক্ষ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত সমস্যা তাদের যাতে বিপথে পরিচালিত করতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই এই বিভাগের কর্মতৎপরতায় সমাজের মূল স্রোতের ধারায় আমরা সবাই লিপ্ত, ঐক্যবদ্ধ। এই আহ্বানই গঙ্গা-অজয়-দামোদর বিধৌত বর্ধমান জেলার পথে-প্রান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে ধ্বনিত হোক—এই আশা ভরসা নিয়েই আমরা কর্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত।

বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতি

হিরণ্ময় নাথ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা হল বর্ধমান। এই জেলার বৈশিষ্ট্য হল পশ্চিমাঞ্চলে লোহা ও কয়লার প্রাচুর্য থাকায় এখানে গড়ে উঠেছে ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক, ইস্পাত শিল্প সিরামিক শিল্প ; পক্ষান্তরে জেলার পূর্বাঞ্চল কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ থাকায় গড়ে উঠেছে কৃষিভিত্তিক শিল্প। সুপ্রতুল রেল, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রামস্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত, গ্রামীণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অবস্থিতি খনিজ, কৃষিজ, প্রানিজ সম্পদে ভরপুর, এই জেলার শিল্পোদ্যোগীদের সামনে একটা বিরাট সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগকে আরও ভালভাবে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ '৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দুর্গাপুর-আসানসোল মহকুমা অঞ্চলের জন্য বর্ধমান জেলা শিল্প কেন্দ্র, দুর্গাপুর এবং বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা সাবডিভিশন অঞ্চলের জন্য বর্ধমান জেলা শিল্পকেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে।

এই জেলায় যে-সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে এলাকাভিত্তিক তা নিয়ে বর্ণিত হল।

ইঞ্জিনিয়ারিং : দুর্গাপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান, কাঁকসা, মেমারি, চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর।

রাসায়নিক : দুর্গাপুর, আসানসোল।

মোটরযান : কাঁকসা, আসানসোল, বর্ধমান।

ইলেকট্রনিক্স : বর্ধমান, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল।

চর্মশিল্প : গলসি, বর্ধমান, মেমারি।

হস্তশিল্প : বর্ধমান, বনকাপাসি, পাটুলি, দরিয়াপুর, কাটোয়া, ভাতার।

প্লাস্টিক : দুর্গাপুর, আসানসোল।

কৃষিভিত্তিক শিল্প : সমগ্র পূর্বাঞ্চলে শতকরা হিসাবে কৃষিভিত্তিক, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাস্টিক, মোটরযান মেরামত শিল্প ইউনিটের স্থান হল যথাক্রমে ৩১.০০, ৩.০০, ২০.০০, ৪.০০ এবং ২ শতাংশ।

এই জেলার একটা বিরাট সংখ্যক লোক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল। নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সৃষ্টি করেছে এক নতুন সম্ভাবনা। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হল নতুন নতুন ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট স্থাপন এবং পুরনো কারখানাগুলোর আধুনিকীকরণ।

দুর্গাপুর ইস্পাতশিল্পের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জন্য দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চলের অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরামিক ইউনিট উপকৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষিত অনুদান প্রকল্প ১৯৯৩-এর মাধ্যমে অসংখ্য Training unit হয়েছে, যার যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ ২ লাখ টাকার মধ্যে এই জেলায় গড়ে উঠেছে। যেমন গত ৫ বছরের হিসেব হল প্রায় ৭৫০০ জনের মতো শিল্পোদ্যোগী শিল্প স্থাপনের জন্য জেলা শিল্প কেন্দ্র অফিস থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প তো আছেই, নতুন নতুন শিল্পও আছে যেমন সিমেন্ট, পলিথিন শিট, ভেষজ, ঢালাই কারখানা, বিস্কুট তৈরি, পাট থেকে দড়ি তৈরি করা, অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্র তৈরি, এল পি জি গ্যাস সিলিন্ডারজাত করা, পাটকাঠি থেকে ফাইবার বোর্ড, হসপিটাল-পরিষেবামূলক ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি।

নতুন শিল্পও স্থাপন হয়েছে বেশ কয়েকটি যেমন দুর্গাপুর অঞ্চলে রিফ্রেকটরি ইউনিট, রং তৈরি, ফেরো অ্যালয়, পলিথিন পাইপ, কোল্ড স্টোরেজ, বর্ধমান অঞ্চলে বিস্কুট তৈরির কারখানা, রাইসব্রান তেল, হ্যাচারি, ঠাণ্ডা প্রক্রিয়ার টায়ার রিট্রেডিং, এল পি জি গ্যাস রিফিলিং, পাটের ব্যাগ তৈরির কারখানা, পাটের দড়ি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স সুইচ তৈরির কারখানা, ধানভাঙা মেশিন, স্প্রেয়ার, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। গত পাঁচ বছরের দুর্গাপুর-আসানসোল এবং বর্ধ[illegible]র ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের খতিয়ান :—

সাল	নতুন শিল্প স্থাপন					
	দুর্গাপুর		বর্ধমান		মোট	
	সংখ্যা	কর্মসংস্থান	সংখ্যা	কর্মসংস্থান	সংখ্যা	কর্মসংস্থান
৯১-৯২	৩৫১	১১৬৪	৭০৭	২১০৩		
৯২-৯৩	১০৭	৫১১	২৫৯	৮৫৩		
৯৩-৯৪	১৪৬	৬১২	১২৯	৩৮৭		
৯৪-৯৫	২১১	৯১২	১৭২	৫৬২		

গত কয়েক বছরে শিল্পের যে সমস্ত [illegible]গতি হয়েছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হল।

হস্ত ও কারুশিল্প

হস্ত ও কারুশিল্পে এই জেলা যথেষ্ট [illegible]ধিকারী। এই শিল্পের প্রসার মূলত পূর্বাঞ্চলেই ঘটেছে। [illegible]ংশই শিল্পই পরিবারভিত্তিক। এই জেলার দরিয়াপু[illegible] ডোকরা শিল্প, নতুনগ্রামের কাষ্ঠ শিল্প, বনকাপাসির শোলা [illegible], এই জেলার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। জাতীয় স্তরে [illegible]রে হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকজন শিল্পী পুর[illegible]। হস্তশিল্পের বিভিন্ন আইটেম বর্ণিত হল।

শোলাশিল্প

শোলা জলজ উদ্ভিদ। প্রায় সবুজ রঙের [illegible]ছাল ছাড়ালে যে সাদা অংশটি দেখা যায় তাকেই শোলা [illegible]। দেব-দেবীর গড়নে, অঙ্গসজ্জায়, ফুল, চাঁদমালা থেকে [illegible]র গৃহসজ্জার কাজে শোলা ব্যবহৃত হয়। মূলত মঙ্গলকোট[illegible] বনকাপাসি-ভাতার ব্লকের মোহনপুর অঞ্চলে এই শিল্পীর[illegible]েন। এছাড়া কামারপাড়ায় কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত [illegible]ং কাটোয়া শহরে কিছু শিল্পী আছেন। বনকাপাসি গ্রা[illegible] মালাকার, ছেলে আদিত্য মালাকার, নাতি আশিস [illegible]য় পুরস্কার পেয়েছেন। রাজ্য পুরস্কারও পেয়েছেন ক[illegible]শিল্পী।

ডোকরা শিল্প

এক বিশেষ ছাঁচ ঢালাই পদ্ধতিতে পিতল [illegible] থেকে তৈরি দেব দেবীর মূর্তি ও পশু-পাখির মূর্তি তৈরী [illegible] যায়—যেগুলি ডোকরা শিল্প নামে খ্যাত। ১. নং আউ[illegible] দরিয়াপুরে এই শিল্পীরা বাস করছেন। এই শিল্পী[illegible]ত হয়েছে দরিয়াপুর ডোকরা শিল্প সমবায় সমিতি। [illegible]সামগ্রী সমবায় সমিতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প নিগমে [illegible] বিক্রয় হয়। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের সাহায্যে কো-অপারেটিভের নিজস্ব উৎপাদন [illegible], অফিস ঘর নির্মিত হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে। [illegible] সহযোগে জীবন বীমা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। [illegible]শিল্পীরা জাতীয় স্তরে ও রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

কাঁথা স্টিচ ও অন্যান্য সূচিশিল্পের কাজ

এই জেলায় কাঁথা স্টিচের কাজে পারদর্শিতার জন্য বহু শিল্পী খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। আউসগ্রাম ১ নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের তকদিবা বেগম এই কাজে দক্ষতা দেখিয়ে রাজ্যস্তরে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে ২ জন শিল্পী রাজ্য স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণপুর, হরিপুর, মুরাতিপুর, মজলকোট গ্রামে এই শিল্পীরা বাস করছেন। বর্ধমান ও কাটোয়া শহরেও কিছু শিল্পী বাস করছেন যেমন মনিকণা রায়, রাধারাণী দাস যাঁরা রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

কাঠের কাজ

পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের নতুনগ্রামে মূলত এই শিল্পীরা বাস করেন। নতুনগ্রামের দেব-দেবীর মূর্তি, প্যাঁচার খ্যাতি অনেক স্থানেই সুপরিচিত। বর্ধমান শহরের ধ্রুব শীল তাঁর শিল্পকর্মের জন্য জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। নতুনগ্রামের কয়েকজন শিল্পীও কাটোয়া শহরের রাধেশ্যাম দাস রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

মাটির কাজ

মাটির তৈরি এবং পোড়ামাটির তৈরি পুতুল, টব, দেব-দেবীর মূর্তি ছাড়াও বর্তমানে মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত গয়না তৈরি করছেন এই জেলার শিল্পীরা। বর্ধমান শহরের হরিহর দে পোড়ামাটির কাজ করে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিল্পী রাজ্যস্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন।

বাঁশের কাজ এবং বেতের কাজ

আউসগ্রাম ২ নং ব্লকের বেশ কয়েকজন শিল্পী হরেক রকম গৃহস্থালী জিনিসপত্র ছাড়াও তৈরি করছেন ঘর সাজাবার নানাবিধ সামগ্রী। বেতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা বাস করছেন নতুনগ্রাম অঞ্চলে। সম্প্রতি এই গ্রামের দুজন শিল্পী আগরতলা থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে কাজ শুরু করেছেন।

পট শিল্প

সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পের জনপ্রিয়তা কমেছে। তবুও কিছু কিছু শিল্পী এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কাটোয়া শহরে এই শিল্পীদের দেখা পাওয়া যাবে।

পাথর খোদাই শিল্প

পাথর থেকে নানাবিধ মূর্তি তৈরি করে চলেছেন এই জেলার শিল্পী সরোজনারায়ণ ভাস্কর, যিনি কাটোয়া শহরে বাস করেন। রাজ্যস্তরে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন।

এ ছাড়া সুতো ও পুঁতির গহনা (ম্যাক্রামে) তৈরি, সফ্‌ট ডল, শঙ্খ শিল্প, পাটজাত বস্ত্র তৈরিতে এই জেলার শিল্পীরা যুক্ত আছেন। জামদানি শাড়ি তৈরি করছেন ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, কালনার শিল্পীরা। বিভিন্ন ডিজাইন, চাহিদা অনুযায়ী হস্তশিল্প তৈরি করা, কারিগরি দক্ষতা বাড়াবার জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা, প্রয়োজনভিত্তিক অর্থের বন্দোবস্ত করা এবং হস্তশিল্প উপযুক্ত মূল্যে বাজারজাত করার মধ্য দিয়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের হস্তশিল্প বিভাগের স্থানীয় শাখা, মঞ্জুষা, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় এই জেলার হস্তশিল্পীরা এগিয়ে চলেছেন। হস্তশিল্প উন্নয়নে গত পাঁচ বছরে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তা নিয়ে বর্ণিত হল।

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিভাগ	বিষয়
(১)	দরিয়াপুর ডোকরা শিল্প সমবায় সমিতি গৃহ	২৫	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ	ডোকরা শিল্প
(২)	বনকাপাসি	২৫	”	শোলা শিল্প
(৩)	মুরাতিপুর	২৫	”	কাঁথাস্টিচ
(৪)	পাটুলি	১০	ভারত সরকারের হস্তশিল্প উন্নয়ন বিভাগ	কাষ্ঠ শিল্প
(৫)	বর্ধমান	১০	”	খড় শিল্প
(৬)	বর্ধমান	১০	”	কাষ্ঠ শিল্প
(৭)	বর্ধমান	১০	”	পাটের কাজ

অর্থ সাহায্য

জেলা শিল্পকেন্দ্র থেকে ঋণদান

শিল্পীর সংখ্যা : ৩৪ সাহায্যের পরিমাণ : ১৯৬,০০০ টাকা

শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের উপর রিবেটের পরিমাণ

১৯৯২-৯৩	১৯ জন	৩৮,৪৪১.০০ টাকা
১৯৯৩-৯৪	২৭ জন	৭০,১৩২.০০ টাকা
১৯৯৪-৯৫	২৯ জন	১১৮,৪৬০.০০ টাকা

কলকাতা হস্তশিল্প মেলায় শিল্পীর অংশগ্রহণের সংখ্যা ও শিল্পসামগ্রী বিক্রির খতিয়ান

১৯৯২-৯৩	১৯ জন	১৯২,৯৫০.০০ টাকা
১৯৯৩-৯৪	২৭ জন	৩৫১,১৬০.০০ টাকা
১৯৯৪-৯৫	২৯ জন	৫৯২,২৯৮.০০ টাকা
১৯৯৫-৯৬	৪০ জন	৫২১,৩১৬.০০ টাকা

গ্রামীণ বয়স্ক হস্তশিল্পীদের পেনসন প্রদান

১৯৯১-৯২	৪৫ জন	৩৫,০০০.০০ টাকা
১৯৯২-৯৩	৫৬ জন	৬৭,২০০.০০ টাকা
১৯৯৩-৯৪	৫৯ জন	৬২,৭০০.০০ টাকা
১৯৯৪-৯৫	৬৭ জন	৭০,৯০০.০০ টাকা
১৯৯৫-৯৬	৬৮ জন	৬৮,০০০.০০ টাকা

প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (স্বনিযুক্তি প্রকল্প) উৎসাহী শিক্ষিত বেকারদের এই প্রকল্পে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়, উৎপাদনমূলক, পরিষেবামূলক, ব্যবসা করার জন্য। ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যে কোনও উদ্যোগী, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, পারিবারিক আয় যদি ৪৮,০০০.০০ টাকার মধ্যে হয়, তবে তিনি এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এই স্কিমে অসংখ্য যুবক-যুবতী উপকৃত হয়েছেন ছোট ছোট শিল্প ইউনিট স্থাপন করে। এই ধরনের প্রকল্পের নাম : আটা চাকি, মশলা চাকি, তেলকল, পেরেক তৈরি, লোহার কারখানা, গ্রিল, পলিপ্যাক তৈরি, পোশাক তৈরি, তাঁত বোনা, পুতুল তৈরি, হস্তশিল্প, লেদ মেসিন, কাঠের সামগ্রী, আসবাবপত্র, সাবান, মেসিনে মুড়ি ভাজা, শাড়ি ফল্‌স, মিষ্টি তৈরি, রেস্টুরেন্ট, জেরক্স, সাইকেল রিপেয়ারিং, চামড়ার ওয়াশার, শালপাতার বাটি-থালা, টিভি অ্যান্টেনা, অলঙ্কার, বই বাঁধাই, কেব্‌ল টিভি, ভি ডি ও ছবি তোলা, ওষুধের দোকান, বইয়ের দোকান, মাশরুম তৈরি, হার্ডওয়্যার, সারের ব্যবসা, অটোমোবাইল সারানো, টিভি-রেডিও সারাই, ইঞ্জিনিয়ারিং জবিং, ধান ভাঙা মেসিন তৈরি, এক্স-রে মেসিন, বায়ো-কেমিক্যাল লেবরেটরি ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের অগ্রগতি যদিও সাফল্যজনক নয়, তবুও জেলাগত হিসাবে বর্ধমানের স্থান অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক উপরের সারিতে। নিম্নের পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করে।

সাল	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্প অনুমোদন		টাকা প্রদান		শতাংশ হিসাবে বর্ধমান জেলার স্থান
		সংখ্যা (ক)	পরিমাণ (খ)	সংখ্যা (ক)	পরিমাণ (খ)	
৯৩-৯৪	৫৫০	১৫৭	১২৮.৩৩ লাখ	১৩২	৯১.৯৬ লাখ	১৬.০০
৯৪-৯৫	২৫৭০	৯১৩	৬৭৫.৩ লাখ	৫১২	৩১২.২ লাখ	১২.৬
৯৫-৯৬	২৫৭০	১৬৯৩	—	৬৫০	—	১৮.১

দুর্গাপুর-আসানসোলের সহায়ক শিল্প

দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চলের শিল্পের মূল উপাদান লোহা, কয়লা গত ১৫ বছর ধরে দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন নতুন ভারী শিল্প কয়লাভিত্তিক রাসায়নিক শিল্প গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। কলকাতার কাছাকাছি এই এলাকা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা , উন্নত পরিকাঠামো, নিয়মিত পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সুযোগ থাকায় শিল্প উদ্যোগীদের কাছে খুবই পছন্দসই স্থান। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের বড় বড় শিল্প ইউনিটগুলির অবস্থিতি, ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে এই এলাকায় আরও গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে সহায়ক শিল্প বা অ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রি। ১৯৭৮ সালে ভারত সরকারের রচিত বি পি ই কর্মনীতির মাধ্যমে সহায়ক শিল্পের বিকাশ হয়ে আসছে। এই অঞ্চলের ১৪টি কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন বড় বড় শিল্প কারখানার মধ্যে ১০টিতেই সহায়ক শিল্প উন্নয়ন সেল গঠিত হয়েছে যার কাজ হল নতুন ক্ষুদ্রশিল্প গঠনে সাহায্য করা, নতুন নকশা ও কারিগরি জ্ঞান দিয়ে, কাঁচামাল সরবরাহ করা, কাজের জন্য বরাত দেওয়া পেমেন্টের ব্যাপারে সাহায্য করা। এসবই করা হয় ক্ষুদ্র সহায়ক শিল্পগুলোকে যাতে ইউনিটগুলো প্রতিযোগিতার বাজারে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। ১৮৩টির মতো ক্ষুদ্রশিল্প এখন পর্যন্ত বড় শিল্প ইউনিটের কাছ থেকে সহায়ক শিল্পের অনুমোদন পেয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

পি এস ই-র নাম	সহায়ক শিল্পের সংখ্যা
১। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প	২৯
২। অ্যালয় স্টিল প্রকল্প	৬
৩। হিন্দুস্থান কেবল্‌স, রূপনারায়ণপুর	৬
৪। ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড, সাঁকতোরিয়া	১২৯
৫। হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার	৪
৬। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড	৯
মোট	১৮৩

১৯৯৩-৯৪ সালে বড় বড় শিল্প ইউনিট কর্তৃক ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলির প্রদত্ত বরাতের খতিয়ান নিম্নে বর্ণিত হল।

১। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প	৩.৭৯ কোটি টাকা
২। অ্যালয় স্টিল প্রকল্প	১.৬ কোটি টাকা
৩। হিন্দুস্থান কেবল্‌স	২.৫২ কোটি টাকা
৪। হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার	০.২৭ কোটি টাকা
৫। ইস্কো	১.৪০ কোটি টাকা
৬। বার্ন স্ট্যান্ডার্ড	০.৩১ কোটি টাকা

দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের আধুনিকীকরণ প্রকল্প এই অঞ্চলের ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলিকে বর্ধিত হবার নূতন সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারত সরকারের শিল্প দপ্তরের স্থানীয় অফিস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের সহায়ক শিল্প উন্নয়ন সেল (জেলা শিল্প কেন্দ্র, দুর্গাপুর), মেকন সি এম ই আর আই-এর সহযোগিতায় স্থানীয় ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলি এই প্রকল্পে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে। ১২৬টির মতো ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট প্রায় ৪৮,৭৭৩ মেট্রিক টনের স্ট্রাকচারাল ফেব্রিকেশন কাজের জন্য বরাত পেয়েছে।

জেলায় সংরক্ষণের অভাবে যে সমস্ত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বা উৎপাদকরা উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না, তাহা নিম্নে বর্ণিত হল।

১। **রাইসব্রান তৈল :** উপযুক্ত আধুনিক চালকলের অভাবে, প্রায় ১৯ লাখ টনের মতো ধানের ফলন সত্ত্বেও একটা বিরাট পরিমাণ তেল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার বাজার দর কয়েক কোটি টাকা। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ নতুন চালকল স্থাপন এবং হাস্কিং মিল আধুনিকীকরণের যে কর্মসূচি নিয়েছেন,

তা জনসাধারণের [illegible] বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। আগামী দিনে এই সম[illegible]টা সমাধান হবে। বর্ধমান জেলায় বড় এবং ছোট [illegible]বটির মতো শিল্প ইউনিট আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্প[illegible] যে কর্মসূচি নিয়েছে রাইসব্রান তেল উৎপাদন তার মধ্যে এ[illegible]। [illegible] করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে বর্ধমানে আরও নতুন শিল্প [illegible] উঠবে। বর্ধমান শহরেই রাইসব্রান ভোজ্য তেল ইউনিট [illegible] চলছে।

২। **চামড়া [illegible]:** এই জেলায় গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ। [illegible]ট্যানারির অভাবে কাঁচা চামড়া এই জেলার বাইরে চলে [illegible]। জেসি-১ নং ব্লকে ১টি ট্যানারি স্থাপিত হয়েছে। পশ্চি[illegible]বাজারের শিল্পজনিত যে সমস্ত আইটেমের উপর জোর [illegible]ছে চামড়াজাত দ্রব্য তার মধ্যে একটি, দেশ ও বিদেশে[illegible]র চাহিদা।

৩। **খাদ্য [illegible]:** সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়া[illegible] খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ফল, সবজিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের [illegible]ক কর্মসূচি নিয়েছেন। রাইস মিল, বিস্কুট কারখানা, ম[illegible] কারখানা ছাড়া জেলায় এ ধরনের শিল্প বিশেষ গড়ে [illegible]। জেলায় প্রায় ১২ লাখ টনের মতো শিল্প এখনও গড়ে [illegible]। কালনা মহকুমার প্রচুর পেঁয়াজের ফলন হলেও উপযুক্ত [illegible]ণের অভাবে চাষীরা উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না।

৪। **পাটজাত [illegible] ব্যবহার:** এই জেলার কালনা সাবডিভিশনের [illegible] এলাকায় পাটের চাষ হয় যার উৎপাদন প্রায় ১,৬২,০০০ [illegible] বেল। পাটভিত্তিক শিল্প গড়ার এখানে প্রচুর সুযোগ [illegible]। সমুদ্রগড়ে তৈরি হয়েছে পাটের সুতলির কারখানা, বর্ধ[illegible] কো-অপারেটিভ সেক্টরে কয়েকজন যুবক তৈরি করছেন [illegible] বস্ত্র সামগ্রী যার কদর দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজার দিন [illegible]। পাটজাত সুতোর ব্যবহার দিন দিনই বাড়ছে। কালনা [illegible] যে সমস্ত অঞ্চলে তাঁতিরা এই ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন, [illegible]ধ্যে উৎসাহ বাড়ছে ব্যাপক ভিত্তিতে এই জাতীয় সুতোর [illegible] এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ভারত সরকারের সংস্থা, ন্যাশনা[illegible]র জুট ডাইভারসিফিকেশন সম্প্রতি জুট মিল ব্যতীত [illegible]ক্টরে পাটের ব্যবহারে জোর দিয়েছে। আন্তর্জাতিক [illegible] দপ্তর থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পোদ্যোগীরা নানাবিধ সুযো[illegible]। এই নিয়ে জেলা পরিষদ, বর্ধমানের উদ্যোগে বেশ [illegible] সভাও হয়ে গেছে।

কালনা মহকুমার শিল্প তালুকে হতে চলেছে, পাটকাঠি থেকে ফাইবার বোর্ড তৈরিরর বড় কারখানা। আগামী দিনে এই শিল্পের আরও প্রসার ঘটবে।

পরিকাঠামো

শিল্প গঠনের জন্য পরিকাঠামো দরকার। ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেড অথবা উন্নত জমি এই অভাব পূরন করে শিল্পোদ্যোগীদের বিশেষ সাহায্য করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে রাস্তার, পয়ঃপ্রণালীর, জলের বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত থাকে। বর্ধমান জেলায় নিম্নলিখিত স্থানে জমি বা খড়ের ব্যবস্থা আছে।

স্থান		পরিচালনা
১। মালকিতা (বর্ধমান)	জমি	জেলা পরিষদ, বর্ধমান
২। কালনা	জমি	জেলা পরিষদ, বর্ধমান
৩। শক্তিগড়	খড়	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম
৪। দুর্গাপুর	১। জমি	আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা
	২। খড়	পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম
৫। কন্যাপুর	জমি	আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা
৬। মঙ্গলপুর (প্রস্তাবিত)	জমি	আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা
৭। কাটোয়া	জমি	কাটোয়া পৌরসভা

শিল্পোদ্যোগীদের জমি, খড়, বিদ্যুৎ সংযোগ, জেলা শিল্প কেন্দ্রের প্রান্তিক ঋণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অথবা পশ্চিমবঙ্গ অর্থ নিগমের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অযথা বিড়ম্বনা ভোগ করতে না হয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাড়পত্র পাওয়া যায় সেই দিকে লক্ষ রেখেই ওয়ান উইনডো সিস্টেম 'সিডা' পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করেছেন।

দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলের শিল্পোদ্যোগীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দুর্গাপুর-আসানসোল উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায় সংস্থার জেলা শিল্পকেন্দ্র দুর্গাপুরের সহযোগিতায় এই ধরনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার দ্রুত শিল্প গঠনের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই তা কার্যকরী হচ্ছে। বর্ধমান জেলাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রস্তুত।

বন্যানিয়ন্ত্রণ, দামোদর পরিকল্পনা ও বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশ

নিশীথ কুমার দত্ত

রাঢ় বঙ্গের বুক চিরে চলে গেছে দামোদর নদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ি অঞ্চল (পালামৌ) থেকে এই নদের উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। দামোদরকে গঙ্গার চেয়ে প্রাচীন নদী বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা। নদের বৈশিষ্ট্য হল বছরের অন্যান্য সময় খুব কম জল থাকলেও বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে বেহুলা নদীর পথ ধরে কালনার কাছে ভাগীরথী নদীতে পড়ত। কিন্তু ইংরেজি ১৭৭০ সালের প্রবল বন্যার সময় শক্তিগড়ের কাছে পূর্ব প্রবাহ ছেড়ে হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়ে হুগলি, হাওড়ার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রূপনারায়ণ নদীতে মিশেছে।

এক সময়ে জেলার মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হত "ওরে নদ দামোদর তোরে নিয়ে আতান্তর"।[১] "পশ্চিমবঙ্গের দুঃখের নদ" বলেও ছিল এর অখ্যাতি। দুর্গাপুরে ব্যারেজ তৈরি হবার আগে দীর্ঘজীবনে বহুবার বহু বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে তবে আমি এখানে বর্তমান শতাব্দীর তিনটে প্রলয়ঙ্করী বন্যার কথাই কিছু বলব। বর্তমান শতকের যে বন্যার কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে সেগুলো হল ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৪৩ ও ১৯৭৮ সালের বন্যা। এই চারটে বন্যার সময় কত একর-ফুট জল নদী দিয়ে বয়ে গেছে তার একটা পরিমাণ দেওয়া হল :[২]

১৯১৩	আগস্ট মাসে	৩২ লক্ষ একর ফুট
১৯৪৩	,,	২২ ,, ,, ,,
১৯৫০	,,	২২ ,, ,, ,,
১৯৭৮	,,	২১ ,, ,, ,,
		(ব্যারেজ হওয়া সত্ত্বেও)

[একর ফুট। একর জমির ওপর। ফুট গভীর জল দাঁড়ালে যতটা জল হয়।]

১৯১৩ সালের বন্যাকে স্থানীয় ভাষায় ''বিশ সালের বান'' বলা হয় কারণ সেটা ছিল বাংলা ১৩২০ সাল। ওপরের হিসেব থেকে বুঝতেই পারা যায় যে সেটা এক ভয়াবহ বন্যা ছিল। এখানে আগস্ট মাসের শেষ দিকে (১৯১৩) যখন বন্যা হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বিলেতে ছিলেন। ২৪ আগস্ট ''লিভারপুল জাহাজে'' উঠেছেন দেশে ফিরবেন বলে। এমন সময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বর্ধমানের এই বন্যার কথা পড়ে মর্মাহত হন। জার্মানির খবরের কাগজে এই বন্যার কথা ছাপা হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ''আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়'' স্মৃতি কথায় এই বন্যার বর্ণনা আছে। তিনি লিখেছেন ''বন্যার প্রথম অবস্থায় কলকাতা হইতে বর্ধমানের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হাওড়া হইতে বর্ধমানগামী সমস্ত ট্রেন বন্ধ। লাইনের অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী এক ইঞ্জিন হাওড়া থেকে ছাড়ে সেই ইঞ্জিনে চড়িয়া শক্তিগড় পর্যন্ত আসিলাম। শক্তিগড় পর্যন্ত আসিয়া আমরা বন্যার প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখিলাম। যেদিকে চাহিলাম সেদিকেই ধূ-ধূ করিতেছে জলরাশি। সেই জলরাশি অতিক্রম করিয়া তখন বর্ধমানের দিকে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। এই বন্যায় হাজার হাজার বাড়ি ঘর নিশ্চিহ্ন হয়, লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু ভেসে যায়, শত শত শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা জলে ভেসে যায়। জল সরে যাবার পর বড়-বড় গাছের ডালে মরা মানুষ আটকে থাকতে দেখা যায়। কলকাতার বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বন্যার্তদের সাহায্য পাঠায়। কলকাতা থেকে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়, বাঘাযতীন, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, অমূল্য উকিল প্রভৃতি বর্ধমানে এসে গ্রামে গ্রামে সাহায্য বিতরণ করেন। রায়না, খণ্ডঘোষ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়।''

১৯১৩ সালের পর দ্বিতীয় বড় বন্যা হয় ১৯৩৫ সালে যেটাকে স্থানীয় লোকেরা ''বিয়াল্লিশের বান'' বলে। এই বন্যার বিশদ বিবরণ সেকালের মাসিক বসুমতী[৩] পত্রিকায় ছবিসহ ছাপা হয়। এই বন্যায় জীবনহানির পরিমাণ ১৯১৩-র বন্যার চেয়ে কম কারণ এই বন্যায় বাঁধ ভেঙে আসে। রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল, অন্ডালের মদনপুরা অঞ্চলের খুব ক্ষতি হয়। কয়লাখনি অঞ্চলের বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েন। বন্যার পরই দেখা যায় মড়ক। শস্যহানি হওয়ায় ধান-চালের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। এই সুযোগে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রচুর ধনী হয়ে ওঠে। ১৯৩৫-এর পর উল্লেখযোগ্য বান হয় ১৯৪৩ সালে। এই বছরের প্রবল বন্যায় শক্তিগড়ের কাছে রেললাইন ভেঙে যায়, জি, টি, রোডের ব্যাপক ক্ষতি হয় ফলে কলকাতার সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব সাজসরঞ্জাম আসা বন্ধ হয়ে পড়ে। সেইজন্যে তৎপরতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে লাইন সারা হয়। দামোদরের বন্যায় যাতে আর রেল লাইন নষ্ট না হয় তার জন্য শক্তিগড়ের কাছে জলনিকাশি কালভার্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও তা অটুট আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকেই বর্ধমান শহর সামরিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের এক প্রধান ধান উৎপাদন কেন্দ্র। বর্ধমান জেলা, তাই ১৯৪৩ সালের এই বন্যার পরই ইংরেজ সরকার বন্যানিয়ন্ত্রণে তৎপর হন।

দামোদর বন্যার কারণ : "ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে প্রায়ই প্রবল বর্ষা হয়। নদীর উচ্চ উপত্যকা অঞ্চল বয়ে সেই জল সমতলে নেমে আসে। বর্ধমানে দামোদরের খাত খুবই প্রশস্ত হলেও হুগলি জেলায় এই খাত খুবই অপ্রশস্ত। প্রাচীন এই নদে পলি জমে নদী গর্ভ খুব অগভীর হয়ে গেছে। নদীর দু পাড়ে গাছ কেটে ফেলায় মাটি এসে নদীতে জমে। জলের প্রবল চাপে পাড়বাঁধ (Embankment) ভেঙে হানার সৃষ্টি করে।

বন্যানিয়ন্ত্রণ : দেশ স্বাধীন হবার পরই ১৯৪৮ সালে ৭ জুলাই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। দামোদরের উচ্চ প্রবাহে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে জলধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই আড়াআড়ি বাঁধকে ড্যাম বলে। জল আটকে জলাধার সৃষ্টি করা হয়। এই জলাধার থেকে তীব্র বেগে জলকে নিয়ে নামিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এই জলকে ব্যারেজে পাঠিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৫ সালে দুর্গাপুরে ব্যারেজ তৈরি করা হয়। ব্যারেজের কাজ হল নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করে সেই জলকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সেচ খাস মারফৎ জমিতে জল দেওয়া। ব্যারেজের বাড়তি জলকে স্লুইস গেট (Sluice Gate) দিয়ে নদীতে পাঠানো হয়। দুর্গাপুর ব্যারেজের জলকে নদীর দুদিকে বড় বড় গভীর খাল দিয়ে চালানো হয়। বামতীরের খালকে লেফট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেল (Left Bank Main Canal) বলে ও দক্ষিণ তীরের খালকে রাইট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেল (Right Bank Main Canal) বলে। এই আর বি এম সি থেকে বাঁকুড়া, বড়জোড়া, সোনামুখী, ইন্দাস পাত্রসায়ের অঞ্চলে সেচের জল দেওয়া হয়। এল বি এম সি থেকে বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া উদয়নারায়ণপুর, আমতা অঞ্চলে জল দেওয়া হয়। বর্ধমান শহরে কানাইনাটশালে দামোদরের সেচ প্রকল্পের অফিস। এখানকার সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে গেলেই বন্যানিয়ন্ত্রণে এদের সদাব্যস্ততা চোখে পড়বে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এক বড় অন্তরায় দামোদর উপত্যকার ড্যামগুলো সব বিহার রাজ্যে আর ব্যারেজ হল পশ্চিমবঙ্গে। দুই রাজ্যের মধ্যে চটজলদি যোগাযোগ সহজ নয়। সম্প্রতি দুই সরকারের মধ্যে এক চুক্তি এই মর্মে হয়েছে। এতে ড্যাম ও ব্যারেজে জল বণ্টন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ আরও সহজ হবে।"

১৯৭৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা প্রমাণ করেছে যে ড্যাম ও ব্যারেজ করলেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে না। ১৯৭৮ সালের আগস্ট

মাসে এমন এক স্থায়ী নিম্নচাপের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এই প্রবল বৃষ্টিপাতে ব্যারেজের জলের চাপে ব্যারেজ বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যারেজের জলে দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল, অন্ডাল শিল্পাঞ্চলের প্রচুর ক্ষতি হয়। বর্ধমান সদর ও গ্রামাঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি হয়। ব্যারেজে পলি জমে তার জলধারণ ক্ষমতার হ্রাস পায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে নদী খাতের ড্রেজিং প্রয়োজন। ব্যারেজের পলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু এগুলো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। হুগলি ও হাওড়ায় দামোদরের খাতকে চওড়া করা প্রয়োজন।

দামোদর পরিকল্পনা ও জনজীবনে তার প্রভাব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি রাজ্যের ভ্যালি অথরিটি-র (Tennese Valley Authority) অনুকরণে এখানে দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট (Damodar Valley Project) গঠন করা হয়। এটা একটা বহুমুখী পরিকল্পনা এর প্রধান উদ্দেশ্য হল (ক) সেচের জল সরবরাহ, (খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (গ) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (ঘ) জলপথ পরিবহন ও ম্যালেরিয়া নিবারণ।[৬]

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জল সরবরাহের ফলে বর্ধমান জেলার মানুষের মধ্যে এনেছে এক বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন। বোরো চাষের এলাকা প্রচুর বেড়েছে। ১৯৫৫ সালে বর্ধমান জেলায় খরিফে ৫,৮৯৪৫৩ একরে, বোরো ১,০১৮৭৬ একরে, রবি ১৯৫২১ একরে, D. I. C Office থেকে সংগ্রহ করা তথ্য। ক্ষেতমজুর এখন আর অন্নাভাবে দিন কাটায় না। বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া থেকে প্রচুর ক্ষেতমজুর বর্ধমানে আসছে। ধনী চাষীরা গ্রামে প্রায় সকলেই পাকাবাড়ি করছে এর ফলে মজুরেরা কাজ পাচ্ছে। সিমেন্ট, রড, ইঁটের ব্যবসা বেড়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ায় গভীর নলকূপ দিয়ে চাষের বাড়তি সুযোগ হয়েছে। বর্ধমান শহরে দামোদরের বালি তোলা এক বড় ব্যবসা। রবি ফসলের চাষ বাড়ায় জেলায় অনেক হিমঘর তৈরি হয়েছে। বন্যায় আর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয় না বলে গ্রাম থেকে শহরে এসে লেখাপড়াও বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে পাম্প ও ট্রাকটারের ব্যাপক ব্যবহার হওয়ায় এইসব শিল্পও উন্নত হচ্ছে। চাষীর অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় সূতী বস্ত্রের ব্যবহারও প্রচুর বেড়েছে। দামোদর এখন বর্ধমান জেলার জনজীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ।[৭] বর্ধমান জেলার গ্রামীণ এই উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র :

(১) লোককথা সংগ্রহ করা হয়েছে বৃদ্ধ চাষীদের কাছ থেকে।
(২) নদী বিজ্ঞানের কথা—শিবরাম বেরা।
(৩) মাসিক বসুমতী—ভাদ্র সংখ্যা ১৩৪২।
(৪) নদী বিজ্ঞানের কথা।
(৫) কানাই নাটশালে DI-এর Superentending Engineer শ্রীনিরুপম মিত্রর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৬) দামোদর পরিকল্পনা—চন্দ্রশেখর ঘোষ।
(৭) শহরে ও গ্রামে সরেজমিন অনুসন্ধান।

দামোদর নদ
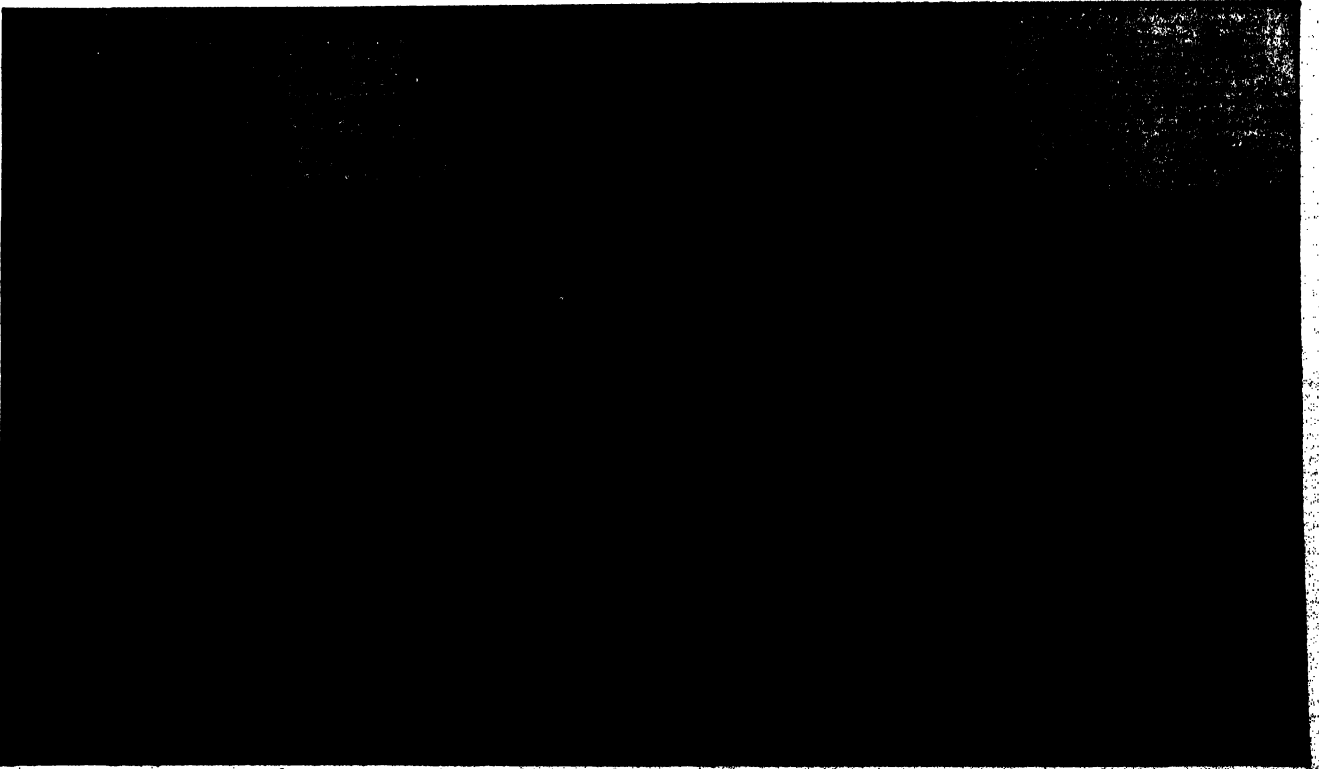
সবুজায়ন ও সামাজিক বনসৃজনে বর্ধমান জেলা

এন ভি রাজশেখর
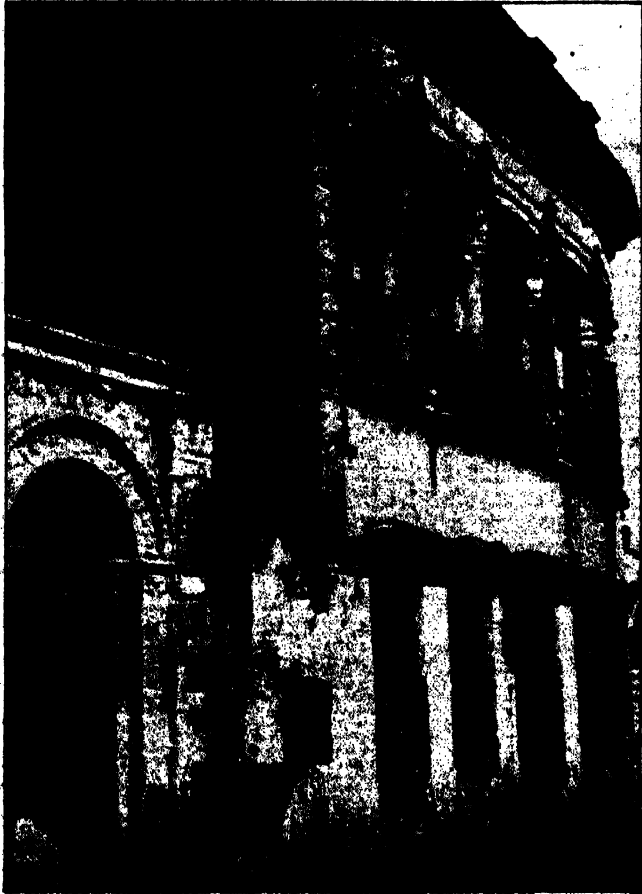
বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৭,০২৪ বর্গকিমি। এর মধ্যে বনভূমির আয়তন ২৪,৩৩৭ হেক্টর বা ২৪৩ বর্গকিমি। এই জেলায় মাথাপিছু বনের পরিমাণ .০০৫ হেক্টর, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এটা .০২ হেক্টর এবং ভারতে ১২ হেক্টর। বনভূমি সীমাবদ্ধ থাকলেও, বনভূমির বাইরে পড়ে আছে সরকারি বা বেসরকারি পতিত জমি ও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন পতিত জমি। এইসব জমিতে বন সৃষ্টি করে বনের আয়তন বাড়াবার পক্ষে ১৯৮১ সাল থেকে সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। বর্ধমান জেলায় এই কাজে সহায়তা করতে ১৯৮২ সালের ১ জুলাই দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বর্ধমান বনবিভাগ ও দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ যুগ্মভাবে বর্ধমান জেলায় বনসৃজন প্রকল্প রূপায়িত করছে। বর্ধমান বনবিভাগ বিশেষভাবে বনভূমি এলাকায় নিয়োজিত। অপরদিকে দুর্গাপুর সমাজভিত্তিক বনসৃজন বিভাগ বনভূমির বাইরে যথা পথিপার্শ্বে, ক্যানেল ও নদীপাড়ে, রেললাইনের ধারে এবং ব্যক্তিগত অব্যবহৃত জমিতে বনভূমির সম্প্রসারণ ও পরিবেশ রক্ষায় নিয়োজিত। বর্তমানে ৯৪-৯৫ সাল অবধি বনের শতকরা পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৯৪ শতাংশ।

সামাজিক বনসৃজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সবুজায়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষিত করার সঙ্গে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন জ্বালানি, পশুখাদ্য ও ঘরের জন্য খুঁটি ও আসবাবপত্রের কাঠ সহজলভ্য করে তোলা। এই উপলক্ষে বিগত কয়েক বছরে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রায় পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৩,৫০০ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে।

সামাজিক বনসৃজনের পাশাপাশি অবক্ষয়িত শাল ও অন্যান্য বৃক্ষের বনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীল করে তোলার মাধ্যমেও সবুজায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপলক্ষে উক্ত বনগুলি পুনর্নবীকরণ, পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাতে যুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই রাজ্যপাল মহোদয় এক আদেশবলে বন সংরক্ষণ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এই পরিকল্পনার সুফল ভোগীগণ যাঁরা উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করবেন তারা সিদ্ধান্ত-নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ ভোগ করতে পারবেন।

এই উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য বনবিভাগ, পঞ্চায়েত ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বর্ধমান বনবিভাগে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ৭২টি বন সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫,৫৬৫ জন সদস্য এই বন সংরক্ষণ কমিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এভাবে প্রায় ১৭,৬০৭ হেক্টর বনভূমি বন কমিটির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

বন কমিটি গঠনের দ্বারা জনসাধারণ যে সুযোগ-সুবিধা পাবেন তার বাইরেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বনবিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে জঙ্গলের উপর নির্ভরতা কমানো যায় এবং বন সন্নিহিত মানুষের আর্থিক উন্নতি ঘটে। যেমন ৯৫-৯৬ সাল অবধি প্রায় ৩,৪৭৫ হেক্টর ক্ষয়িষ্ণু বন পুনর্বাসনকল্পে মাটির উপর থেকে কেটে দেওয়া হয় এবং প্রায় ৪৫০ হেক্টর Thining করা হয় এবং ২৫০০ হেক্টর বনের উন্নতিকল্পে বহু কোঁড় ছাঁটাই করা হয়। জনসাধারণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এবং তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে বিভিন্ন বন কমিটি এলাকায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫৭টি মাটির বাঁধ, ১৪টি পুকুর এবং ৬৮টি পানীয় জলের কুয়া খনন করা হয়েছে।

বন সন্নিহিত মানুষের স্বনির্ভরতা ও পৌনঃপুনিক আর্থিক উন্নতিকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের সহযোগিতায় বনবিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে যেমন মাছ চাষ, ছাতু চাষ, কলম কাটিং ইত্যাদি প্রশিক্ষণ বনকমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রদান করেছেন। এছাড়া গুটিপোকা চাষ করার জন্য প্রায় ৫৫ হেক্টর সরকারি জমির উপর অর্জুন গাছের বাগান করা হয়েছে।

১৯৯৫-৯৬ সালে যে সমস্ত বন সংরক্ষণ কমিটির বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং গাছের বয়স ৮ বা ১০ বছর হয়েছে সেইসব এলাকার জঙ্গল কাটা হয়েছে এবং এর বিক্রিত মূল্যের ২৫ শতাংশ বন কমিটির সদস্যদের সরকারি আদেশনামা অনুসারে প্রদান করা হবে। এই এলাকার পরিমাণ প্রায় ১৮০ হেক্টর শাল জঙ্গল এবং ৮০ হেক্টর প্ল্যান্টেশন। এই জঙ্গল কাটাইয়ের কাজ ১৪টি বন কমিটির এলাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

আমরা আশা করব যে বনবিভাগ, পঞ্চায়েত ও বনসন্নিহিত মানুষের এই সবুজায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং বর্ধমান জেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।
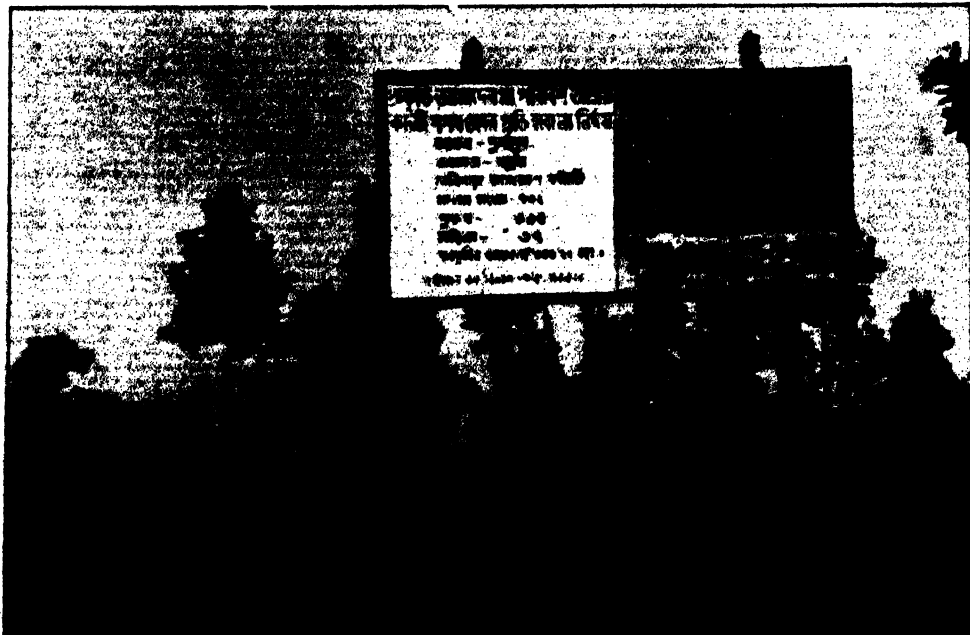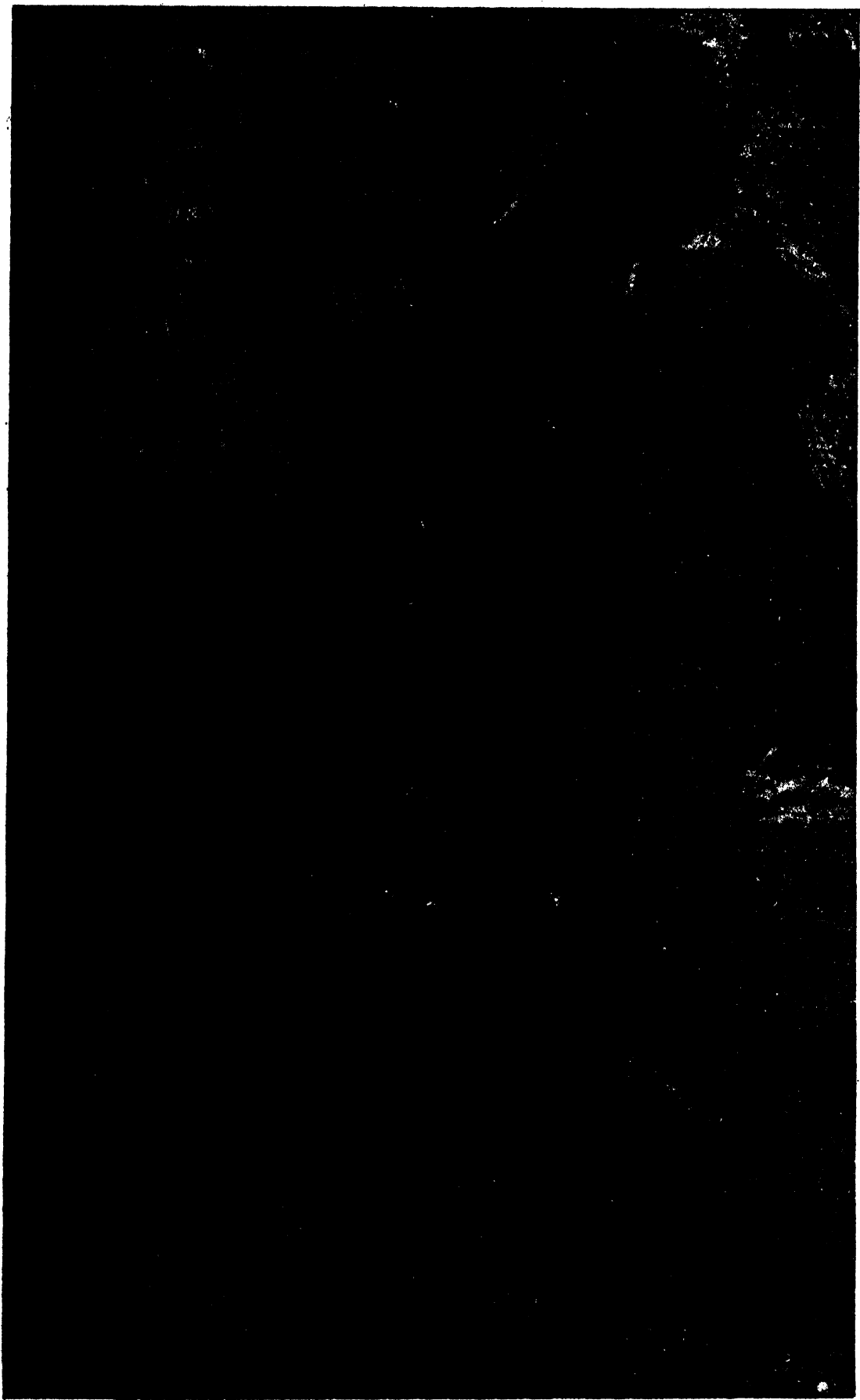
জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও গণবণ্টন ব্যবস্থা

Ration কথাটির আভিধানিক অর্থ যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের নাগরিকদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমাদের রাজ্যে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৪ সালের ৩১ জানুয়ারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রথম রেশন ব্যবস্থা চালু হয়। ওই ব্যবস্থায় শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে সরবরাহের পরিমাণ একরকম ছিল না। বরং শহরাঞ্চলের সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য গ্রামাঞ্চল প্রায়ই বঞ্চিত হত। স্বাধীনতার পর সেই ব্যবস্থায় ছেদ পড়ে এবং পুনরায় ১৯৫৭ সালে সারা রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা চালু হয় যা সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা বা Modified Rationing বলে পরিচিত। তারপর ১৯৬৫ সালে ৫ জানুয়ারি কলকাতা ও রাজ্যের শিল্পাঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে Satutary Rationing বা বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়। বর্তমানে শিলিগুড়িতে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধিত ব্যবস্থা চালু আছে এবং গোটা রাজ্য এলাকা অনুযায়ী ওই দুইরকম রেশন ব্যবস্থার আওতায়। এখন রেশন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য ছাড়াও আরও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যথা—বিস্কুট, চা, কাপড়-কাচা ও গায়ে-মাখা সাবান, মশলা, পামলীন ভোজ্য তেল, জনতা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, লংক্লথ, নুন, কেরোসিন তেল, ময়দা, বিজয়া ঘি, লেখার খাতা, দেশলাই ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। ওইসব জিনিস সরবরাহে

মাঝে মধ্যে বিঘ্নও ঘটে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সরবরাহ নিয়মিত রাখার জন্য সদা সচেষ্ট। নাগরিকদের সহযোগিতা আরও একটু বেশি হলে সরকারের পক্ষে সুবিধা হয়। অনেক সময় নাগরিকরা রেশন দোকানের মাধ্যমে ওইসব জিনিস সংগ্রহ করেন না ফলে দোকানে অবিক্রীত-থাকা অবস্থায় জিনিসপত্র নষ্ট হয় এবং দোকানদাররা পুনরায় মাল তোলার জন্য কোনরকম উৎসাহ পান না। বর্তমানে এই ব্যবস্থাকে Public Distribution System বা গণবণ্টন ব্যবস্থা বলা হয়। এই গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে যা Revamped P. D. S. বলে পরিচিত। প্রতিবছর ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ভূমিহীন খেত-মজুরদের সস্তা দরে চাল দেওয়া হয়। গত ১৯৯৫ সালে ৭ সপ্তাহ ৪ (চার) টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হয়েছে। এ বছরও সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী চাল দেওয়া শুরু হয়েছে। চলবে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর '৯৬। চালের দাম প্রতিকেজি ৪ টাকা।

গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যের জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি বরাদ্দ সময়মত পাওয়া যায় না। অতীতে বহু ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে রাজ্যের সমস্যা বেড়েছে এবং নাগরিকরা বঞ্চিত হয়েছেন। রাজ্যের নিজস্ব সংগ্রহের দ্বারা গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব নয়। আমরা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা দিই এবং কেন্দ্র আমাদের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করে। বর্ধমান জেলা রাজ্যের শস্যভাণ্ডার হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় এই জেলাকে রাজ্যের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার সিংহভাগটাই বহন করতে হয়। যদিও এই জেলা তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সবটা সংগ্রহ করতে পারে না তবুও অন্যান্য জেলার থেকে অনেক বেশি করে। একটা হিসাব দিলে বুঝতে পারা যাবে। গত ১৯৯২-৯৩ সংগ্রহ বছরে রাজ্যের লক্ষমাত্রার ৫৬% এই জেলায় বরাদ্দ ছিল আমরা ওই বরাদ্দের ৭৩.৩% সংগ্রহ করেছিলাম। ৯৪-৯৫ বছরে রাজ্যের লক্ষমাত্রার ৪৬% এই জেলার বরাদ্দ ছিল; আমরা সংগ্রহ করেছি ওই বরাদ্দের ৬৭.১৯%। এই বছরে বরাদ্দ আছে ৪৭%, কতটা হবে এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে পরিমাণটা পূর্বেকার বছরের সঙ্গে সঙ্গতি অবশ্য থাকবে।

এই জেলায় সংশোধিত গণবণ্টন ব্যবস্থায় মোট ৪৫টি ডিস্ট্রিবিউটারের মাধ্যমে ১৮৭৪টি রেশন দোকানে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করা হয় জনসাধারণকে বিক্রির জন্য। বিভিন্ন কোম্পানির কেরোসিন তেলের এজেন্ট ও বড় পাইকারি বিক্রেতার মাধ্যমে রেশন দোকানে কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হয়। এজেন্ট ও বড় পাইকারি বিক্রেতার সংখ্যা এই জেলায় যথাক্রমে ৪৭ ও ১৫৩। বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থায় কেরোসিন তেল রেশন দোকানের মাধ্যমে দেওয়া হয় না, তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তবে দু-রকম রেশন ব্যবস্থাতেই প্রয়োজন অনুযায়ী কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তার সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতা প্রশংসনীয়। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু আছে সরকারি প্রচেষ্টা ও পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকায়। ভূমিহীন খেত-মজুরদের চাল বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতা ছাড়া কোনদিন সম্ভব হত না।

বর্তমানে সংশোধিত গণবণ্টন ব্যবস্থায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অনুযায়ী কার্ড পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত—'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ'। গ, ঘ, ঙ শ্রেণী কোনও সময়েই চাল পাবে না। 'ক' শ্রেণী পাবে সারাবছর। 'খ' শ্রেণী বছরে কয়েক মাস। ওই ব্যবস্থার বদলে আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্ডের শ্রেণীবিন্যাসের কথা বিবেচনাধীন। তবে জনসাধারণ যদি সচেতন না হন বা সহযোগিতা না করেন তাহলে শুধু সরকারি প্রচেষ্টায় এই ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে চালু রাখা যাবে না।

জেলা নিয়ামক, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

ভূমিকা

অবিভক্ত ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। ১৯৪৬ সালে 'ভোর কমিটি' তৈরি হয় এবং এই কমিটিকে তৎকালীন 'স্বাস্থ্যচিত্র' অনুসন্ধান পূর্বক এই নতুন পরিকল্পনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সুপারিশ করে :

১। রোগ প্রতিরোধ এবং রোগের চিকিৎসা বিভাগকে একত্রিত করতে বলা হয়।

২। অল্প সময়ের মধ্যে প্রতি চারহাজার জনসংখ্যায় একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে প্রতি ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ জনসংখ্যায় একটি করে সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা বলা হল।

৩। চিকিৎসার শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন—
বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত ৩ মাস জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ-প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষাদান এবং সামাজিক চিকিৎসক তৈরি করা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে ৭/৮টি কমিটি তৈরি করা হয়েছে এবং পরিকল্পনা করা হয়েছে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে *'Rural Health Scheme'* তৈরি করা হয়।

এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করা হয়েছে ১৯৮৩ সালে, যার লক্ষ্য হল **'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'** ; এটি রূপায়িত করতে হবে :

১। জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করা এবং এলাকার মধ্যেই তার সমাধানের ব্যবস্থা করা।

২। বিশুদ্ধ জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং sanitation বা পরিচ্ছন্নতার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বৈষম্য এবং অব্যবস্থাগুলি দূর করা।

৪। নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা যাতে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে।

৫। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে—আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

৬। অপুষ্টির কারণগুলি দূরীকরণ।

৭। নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাতে অন্য কোনও উপায়ে অল্প খরচে রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

৮। সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন।

এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলি নেওয়া হয়েছিল। যেমন :

(ক) প্রতি পাঁচহাজার এবং পাহাড়ি বা দুর্গম এলাকার প্রতি তিনহাজার জনসংখ্যার একটি করে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র যেখানে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন।

(খ) প্রতি ত্রিশহাজার জনসংখ্যায় একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য স্থাপন।

(গ) প্রতি একলক্ষ জনসংখ্যায় একটি করে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) প্রতি একহাজার জনসংখ্যায় একজন করে C. H. G.

(ঙ) গ্রামীণ দাইদের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া।

(চ) অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বর্ধমান জেলার বিবরণ

বর্তমানে এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৬৬ লক্ষ। বর্ধমান জেলার আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, অধিবাসী এবং তাদের আচার আচরণ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন ভিন্ন রকমের কালনা, কাটোয়া এবং বর্ধমান মহকুমা (সদর) কৃষিপ্রধান। এইসব অঞ্চলে চাষবাসই প্রধান জীবিকা, জমিও অপেক্ষাকৃত নিচু। এখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বন্যা, তা ছাড়া জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। পাশাপাশি দুর্গাপুর আসানসোল মহকুমা শিল্প কারখানায় এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানের জমি উঁচু ও কঠিন। এই এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় খরা এবং শিল্প ও খনিজ সম্পর্কিত স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে।

বর্ধমান জেলার একটা প্রধান সমস্যা হল পেটের অসুখ। এর প্রধান কারণ হল বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের অপ্রতুলতা। তা ছাড়া মলমূত্র ত্যাগের সুব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতার অভাব।

আবার কিছু কিছু এলাকায় ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া মশাবাহিত কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে, যেমন ম্যালেরিয়া, এনকেফালাইটিস, ডেঙ্গু জ্বর ইত্যাদি। অত্যধিক জনসংখ্যা ও রোগাক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধির ফলে হাসপাতালগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ, ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাটোয়া হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ১৮০, কিন্তু এখানে সর্বদাই ৩৫০ থেকে ৪০০ জন রোগী ভর্তি হয়ে থাকে। এর ফলে রোগীদের দেখাশোনা ও চিকিৎসা করা সঠিকভাবে সম্ভব হয় না। অন্যান্য হাসপাতালগুলির একই অবস্থা। পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় সেই কর্মসূচিগুলিও যথেষ্ট অবহেলিত। শতকরা ৮০ ভাগ অর্থব্যয় করা হয় রোগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত খাতে। এ ছাড়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে উন্নত করা দরকার তাহলে জটিল রোগ ছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসা ব্লকে করা যাবে। এর ফলে মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ অনেক কমে যাবে। কিন্তু প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই বাড়িগুলি ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। বাসস্থানগুলিও সবসময় বসবাসের যোগ্য নয়। বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহের অভাব এবং ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীর অভাব রয়েছে। তা ছাড়া অনেকের আবার ঠিকমত কাজ করবার মানসিকতার অভাব রয়েছে। তাই ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিপূর্ণতার দিকে বেশি করে লক্ষ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। একাধারে রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

যাইহোক বর্ধমান জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো ও বিগত কয়েক বছরের স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলির রূপায়ণের পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল।

১৯৯১ সালের গণনা অনুযায়ী

জনসংখ্যা	৬০৫০৬০৫ জন	পুরুষ	৩১৮৬৮৩৩ জন
আয়তন	৭০২৪ বর্গ কিমি	মহিলা	২৮৬৩৭৭২ জন
গ্রাম			
শহর			

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	:	১টি
মহকুমা হাসপাতাল	:	৪টি

[কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল]

গ্রামীণ হাসপাতাল	:	৬টি
জেলা গ্রামীণ হাসপাতাল	:	১টি

[নির্মাণাধীন]

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র : ৩০টি

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (নতুন) : ১০৪টি

[এর মধ্যে I. P. P. IV-এর ৬টি কেন্দ্র এখনও চালু হয়নি]

স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র : ৭২৮টি

[এর মধ্যে ৬৭৮টি চালু আছে।]

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প

ব্লক : ১২টি

আসানসোল কর্পোরেশন : ১টি

বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি : ১টি

শিল্পাঞ্চল হসপিটাল : ১৬টি

নার্সিংহোম : ১২৪টি

চালু স্বেচ্ছাসেবী সংঘ : ৮টি

জাপানি এনকেফালাইটিস অনুসন্ধান কেন্দ্র : ১টি

[B. M. C. H. Community Medicine]

Health Infrastructure during past, during present and be in future in this district of Burdwan.

A *Health Infrastructure before 1985-86*

1. Sub-Centres : 454 Nos.
2. Old S. H. C. (Now P. H. C.) : 91 Nos.
3. Old P. H. C. (Now B. P. H. C.) : 30 Nos.
4. Rural Hospitals : 4 Nos.
5. Sub-Divisional Hospital : 4 Nos.
6. State Homeo Dispensary : 18 Nos.
7. Dental Centre attached to Old PHC (i.e. BPHC)/S.D. Hospital : 18 Nos.

....

B. **Health Infrastructure constructed/setup during 1985-86 to uptil**

(1) *Constructed under I. P. P.-IV*

(i) Sub-Centre Building : 224 Nos.
(ii) Old S.H.C. (Now PHC) Improvement-I : 17 Nos.
(iii) Old S.H.C. (Now PHC) Improvement-II : 71 Nos.
(iv) New P.H.C. : 12 Nos.
(v) New Old P.H.C. : 1 Nos.
(vi) Old P.H.C. (BPHC) Improvement : 24 Nos.
(vii) Rural Hospital by upgradation of existing PHC/BPHC : 2 Nos.
(viii) Multipurpose Worker's Training Annexee attached to Rural Hospital/BPHC : 8 Nos.
(ix) Supervisors' Training School & Hostel (Now Promotee's Training School) : 1 No.

(2) *Establishment in other scheme*

(i) Homeo Dispensary : 7 Nos.
(ii) Sub-Centre : 27: (including 224 of IPP-iv)
(iii) Augmentation of 30 addl. beds by new construction at Katwa S.D. Hospital : 30 addl. beds.

Puls Polio & School Health

(C) **Health Infrastructure be setup/constructed/Improved in future as taken up by the Health Deptt./Direct**

(i) Establishment of a District Type Rural Hospital at Bamchandaipur, Burdwan : 1(100 beded for the present)
(ii) Improvement of existing Health Care Systems by upgradation, strengthening and expansion of the Middle Tier Hospitals : 4 S.D. Hospitals 6 Rural Hospitals.

বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর শূন্যপদ

(1) Medical Officer : 75 (Except S.D. Hospital)
(2) C.H.So : 11
(3) Pharmacist : 33
(4) Driver : 22 + 3 (25)
(5) B. S. I. : 11 + 1 (12)
(6) P. H. N. : 15
(7) H. S. (F) : 17
(8) H. S. (M) : 18
(9) Malaria Inspector : 8
(10) Sanitory Inspector : 10
(11) Social Welfare Officers : 20
(12) Health Assistant (M) : 259
(13) Health Assistant (F) : 58
(14) Nursing staff (Indoor) : 88 (Including L.R.)
(15) Clerk : 15
(16) Medical Tech. (Lab.) : 22
(17) X-Ray Tech. : 4
(18) Gr. 'D' Staff Including Sweeper : 134
(19) Vehicle : 17

কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে এই জেলার আরও দুই একটি সমস্যা রয়েছে। যেমন, H.A.(M), Leprosy এবং Group 'D' এই দুটি পদে নিয়োগ আটকে রয়েছে বেশ কিছু বছর ধরে vigelence-এর জন্য।

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত ১৫০ থেকে ২০০ জন কর্মচারী পিছু মাত্র ২ জন করণিক আছেন। যার ফলে ঠিকসময়ে কাজকর্ম হয় না। বহু ব্লকে ২ জন করণিকও নেই।

মানকর রুরাল হসপিটালে ৩০টি শয্যা কিন্তু M.O. মাত্র ২ জন। আবার বদ্যিপুর P.H.C. (শয্যা - ১৫টি); গুসকরা P.H.C. (শয্যা - ১০টি) বরশুনা P.H.C. (শয্যা - ১০টি)।

এইসব P.H.C.গুলিতে একজন করে M.O. থাকায় ২৪ ঘন্টা কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অগ্রগতির পথে বাধা

১। ব্লকে কোনও Cashier না থাকায় ডাক্তারবাবুকেই Cashier সাজতে হয়; ব্লকে কোনও টাকা রাখার জায়গা না থাকায় মাহিনার উদ্বৃত্ত টাকা ডাক্তারবাবুকেই রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

২। অধিকাংশ ব্লকেই গাড়ি না থাকায় কর্মচারীদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবায় সুষ্ঠ ও সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয় অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই এখনও পর্যন্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা না থাকায় যখন তখন সামান্য কারণেই Messenger দ্বারা কাজ করাতে হয়।

৩। অধিকাংশ BPHC-র অবস্থিতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই খারাপ যার জন্য বহু কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

৪। অধিকাংশ BPHC-তে কোনও Boundary wall, সুষ্ঠ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালে যাতায়াতের রাস্তা নেই।

৫। BPHC-তে বিদ্যুতের অবস্থা খুবই করুণ। প্রতিষেধক রাখার ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

৬। কতকগুলি New P.H.C. যেমন, বড়শুল, বদ্যিপুর এবং গুসকরা যেখানে সবসময়ই Patient ভর্তি থাকে এবং একটি করে ডাক্তার অনুমোদিত আছে। কিন্তু একজন ডাক্তারের পক্ষে ২৪ ঘন্টা কাজ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য ওই Postগুলিতে ডাক্তারবাবুরা join করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আবার মানকর রুরাল হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৩০টি কিন্তু ডাক্তারবাবুর Post মাত্র ২টি। এ ক্ষেত্রেও প্রায় একই সমস্যা দেখা দেয়।

'২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য', রূপায়ণে কিছু প্রস্তাব

১। ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২ জন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের পরিবর্তে ৫ জন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের প্রয়োজন। ৫ জনের মধ্যে ৩ জনকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হতে হবে।

২। Aurvedic Homeopathy, Dental ডাক্তারদের দ্বারা ব্লক Medical Officer-রা বিশেষ কিছু সাহায্য পান না। তাঁরা যাতে বিশেষভাবে Block Medical Officer-এর সাহায্যে আসেন তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। অধিকাংশ Block P.H.C.-তে Telephone এবং Ambulence-এর এখনও কোনও ব্যবস্থা নেই। কাজ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই দুটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন।

Performances of the District

(1) Sterilization

90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96
48986	44721	52387	49279	4854	44021

(2)	Immunization	:	109% (continued)
(3)	Coverage C̄ 1st Round of P.P.I.	:	416416—77.7%
(4)	Coverage C̄ 2nd Round of P.P.I.	:	92.2%
(5)	School Health	:	3,56,559 (total check up)
(6)	Total outdoor patients treated	:	32,00,000 (Approx)
(7)	Total Deliveries	:	63,000 (Approx)
(8)	Total T. B. Patients treated	:	29,256
(9)	Total Leprosy Patients treated	:	10,478
(10)	Total Diarrhpea : (a) Affected	:	18,147 [Village : 1062]
	(b) Death	:	251 [Ward : 4]
(11)	Total Japanese Encephalities : (a) Attack	:	597
	(b) Death	:	164
(12)	Infant Mortality Rate	:	69.2%
(13)	Maternal Mortality Rate	:	2.4%
(14)	Birth Rate	:	27.9%
(15)	Growth Rate	:	(+) 24.8%
(16)	Death Rate	:	8.2%

৪। কিছু কিছু S.H.C. আছে যেখানে সবসময় Bed চলে সেখানে একটির পরিবর্তে দুটি ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন।

৫। B.P.S.C.-তে শূন্য S.W.L.D.; U.D., M.I.S.I.; B.S.I. পদগুলি ও অন্যান্য শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন।

৬। সেহাবা বাজারে একটি নতুন Rural Hospital-এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

৭। সব A.C.M.O.H. এর বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োজন।

৮। প্রত্যেক B.P.H.C. তে জল, Boundary Wall এবং Quarter থেকে Hospital-এ যাওয়ার ভাল রাস্তা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিকল্পে কিছু যুক্তি

'২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য', এই কর্মযজ্ঞটিকে সফল করার জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দরকার, যেমন

১। সিংগোটের পরিবর্তে সেহাবা বাজারে একটি Rural Hospital-এর দরকার।

২। B.P.H.C.গুলিতে আরও ১ জন অর্থাৎ ৪ জন করে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দেওয়ার দরকার এবং প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার।

৩। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তত ২টি করে গাড়ির প্রয়োজন। একটি জরুরি রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং অন্যটি Office এবং Public Health-এর কাজের জন্য।

৪। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে Telephone এর ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি।

৫। প্রতিটি শূন্যপদ যাতে ঠিকমত পূরণ করা হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে।

৬। Medicine supply এবং Fund Allotment ঠিকমত থাকলে বর্ধমানের সুনাম, প্রথম স্থান অধিকার করার তা বজায় থাকবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় এই জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে গেলে দলমতনির্বিশেষে সব স্তরের কর্মচারীদের আন্তরিকতা নিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি এবং জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। সব ধরনের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো, দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনুযায়ী বেতন বিন্যাস এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

P.W.D. Construction, Electric এবং P.H.E-র সঙ্গে কাজকর্মের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী Allotment of Fund-এর বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। I.P.P. IV abolish হবার পর কোনও Retention order না থাকায় সবকিছু কাজ আটকে যাচ্ছে ; এর সত্বর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে।

Block স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে পারলে এবং কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা নিয়মিতকরণ হলে কাজকর্মে সকলে অনুপ্রেরণা পাবেন। এর ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক চাপ বহন করতে পারবে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলি ভালভাবে রূপায়িত হতে পারবে। মহকুমা এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে অত্যধিক রোগীর চাপ কমবে। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে জনসাধারণকে আরও সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে তোলা সম্ভব হবে।

এইভাবে আমরা '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচি রূপায়ণের পথে সফল হব।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

বর্ধমান জেলা : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভৌগোলিক এলাকা	:	৭০২৪ বর্গ কিলোমিটার
লোকসংখ্যা	:	৬০,৫০,৬০৫ জন
পুরুষ	:	৩১,৮৬,৮৩৩ জন
স্ত্রী	:	২৮,৬৩,৭৭২ জন
গ্রামে	:	৩৮,৫৩,৩৯৭ জন
শহরে	:	২১,৯৭,২০৮ জন
তফসিলি	:	১৬,৬০,৪৯৩ জন
আদিবাসী	:	৩,৭৬,০৩৩ জন

মহকুমা	:	৬
দূরদর্শন রিলে কেন্দ্র	:	২
পুলিশ থানা	:	৩২
লোকসভার আসন	:	৪
বিধানসভার আসন	:	২৬
মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন	:	২
মিউনিসিপ্যালিটি	:	৯
পঞ্চায়েত সমিতি	:	৩১
ব্লক	:	৩১
গ্রাম পঞ্চায়েত	:	২৭৮
মৌজা	:	২৮২৬
গ্রাম	:	২৫৭০
শিক্ষার হার	:	৫১.৮৪ শতাংশ

উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে স্টেশন

বর্ধমান, খানা, পানাগড়, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, রানীগঞ্জ, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মেমারি, কাটোয়া, নবদ্বীপ, অম্বিকা-কালনা

প্রধান নদী : দামোদর, অজয়, ভাগীরথী।

শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৭০	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪২১
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০৮	জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২১৭
হাই মাদ্রাসা	১২	জুনিয়র হাই মাদ্রাসা	১৪
সিনিয়র হাই মাদ্রাসা	২	ডিগ্রি কলেজ	২৫

কারিগরি বিদ্যালয় ও কলেজ ১১

স্বাস্থ্য-পরিষেবা

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	১	১০৪০ শয্যা
মহকুমা / স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৪	৬৪৫ শয্যা
গ্রামীণ হাসপাতাল	৬	২৭০ শয্যা
ব্লক স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩০	৪১৫ শয্যা
নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৯০	৪৯৩ শয্যা
এম সি ডাবলিউ কেন্দ্র	১	
উপকেন্দ্র	৭২৮	

গ্রন্থাগার

গ্রামীণ গ্রন্থাগার	১৯০	জেলা গ্রন্থাগার	২
মহকুমা গ্রন্থাগার	৬	টাউন গ্রন্থাগার	৯
এলাকা গ্রন্থাগার	১	শহরকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার	১

যোগাযোগ ব্যবস্থা

রেলপথ	৬১২ কিলোমিটার
এক্সপ্রেস ওয়ে	১৯ কিলোমিটার
জাতীয় সড়ক	১৫৮ কিলোমিটার
রাজ্য সড়ক	১৮৯ কিলোমিটার
ব্ল্যাকটপ পি ডাবলিউ ডি ও পি ডাবলিউ	১৩৬২ কিলোমিটার
জেলা পরিষদ	৩৮৬ কিলোমিটার
মিউনিসিপ্যালিটি	৪৩৯ কিলোমিটার

চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহ	:	৫২
ভিডিও হল	:	১২৫
ডাকঘর	:	৬০২
টেলিগ্রাফ অফিস	:	৪৮
ডাক-তার অফিস	:	৯৮
সমবায় সমিতি	:	২৫৭১
বিদ্যুৎ সংযুক্ত মৌজা	:	২৪১৭
চালকল	:	২০৩
ধান-ঝাড়া কল	:	৯৭৯
এম আর ডিস্ট্রিবিউটার	:	৪৪
এম আর ডিলার	:	১৮৪৬
কেরোসিন তেল এজেন্ট	:	৪৪
এল পি জি ডিলার	:	২২

বর্ধমান জেলার দ্রষ্টব্য স্থান

(১) **বর্ধমান (শহর):** মেঘনাদ সাহা তারামণ্ডল, বিজ্ঞান কেন্দ্র, হরিণ উদ্যান, কার্জন গেট, ১০৮ শিবমন্দির, কৃষ্ণ সায়র পার্ক, বর্ধমানেশ্বর শিবমন্দির, সর্বমঙ্গলা মন্দির, সোনার কালীবাড়ি, সাধক কমলাকান্তের কালীবাড়ি, কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির, বর্ধমান রাজবাড়ি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-গোলাপ বাগ, বর্ধমানের রাজ উপাসনা মন্দির, পীর বাহারাম, শের আফগান সমাধি, খাজা আনোয়ার বেড়, বর্ধমান দামোদরের উপর কৃষক সেতু, টাউন হল ময়দান, বর্ধমান সংস্কৃতি হল।

(২) **দুর্গাপুর:** কুমারমঙ্গলম পার্ক, এ জোন, দুর্গাপুর দামোদর ব্যারেজ, ভবানী পাঠকের গুহা, সিটি সেন্টার।

(৩) **আসানসোল:** শতাব্দী পার্ক, মাইথন বাঁধ, কল্যাণেশ্বরী মন্দির, কবিতীর্থ চুরুলিয়া, পানীফলা উষ্ণ প্রস্রবণ, বারাবনী, রনডিহা, পানাগড়।

(৪) **কালনা:** পাখিরালয়, টেরাকোটা মন্দির, ১০৮ শিবমন্দির, ভাস্কর পণ্ডিতের দেউল ও শ্যামা-রূপা মন্দির, কাঁকসা।

(৫) **কাটোয়া:** পাণ্ডুরাজার টিপি, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট।

তথ্য সংগ্রহ: ধীরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক